বিজ্ঞানে
মুসলমানদের
অবদান
মুহাম্মদ নূরুল আমীন

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

এম. এম, এম. এ

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❒ বাংলাবাজার ❒ মগবাজার

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

[বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য ও শিল্পকলায় মুসলমানদের গৌরবময় অবদানের বিবরণ]

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

ISBN- 984-31-1370-5

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহ্সান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০২
পঞ্চম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ : ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহ্সান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণ : চৌকস
ফকিরাপুল, ঢাকা

বিনিময় : তিনশত টাকা মাত্র

BIGGANE MUSALMANDER OBADAN by Muhammad Nurul Amin. Published by Muhammad Golam Kibria Ahsan Publication, Dhaka. Fifth Edition February, 2013 Price : Tk. 300.00. ($ 5.00) only

AP-2006/07

কবি

আবদুল হালীম খাঁ

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

করকমলেষু

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

প্রকাশকের কথা

বর্তমান দুনিয়ায় মুসলিম জাতির অবস্থা দেখলে মনে হয় তারা ধনে এবং জ্ঞানে দরিদ্র। কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়! যে জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পৃথিবীতে তারা জ্ঞানের মহিমা প্রচার করবে, পৃথিবীকে শাসন করবে; শাসিত হবে না, আল্লাহর অসামান্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, কিন্তু কেন তারা আজ এমন অসহায়? তারাই আজ সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত? নিগৃহীত? অথচ মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, তুমি মন মরা হয়ে থাকবে, কষ্টে থাকবে।'

কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আহ্বানের পাঁচটি আয়াতে প্রথমে পড়ার কথা বলা হলো এবং তারপর কলমের কথা। অথচ দুঃখের সাথে বলতে হয় কোটি কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী আজও কলম ব্যবহার করতে জানে না। কুরআনের বহু জায়গায় 'ইলম'-এর কথা বলা হয়েছে। 'ইলম'-এর অর্থ– জ্ঞান, আবার Science-এর আরবী অর্থ 'ইলম'। বলা হয়েছে যারা জানে এবং যারা জানে না তারা সমান নয়। ইসলামে বিদ্বান ব্যক্তির বহু ধরনের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মুসলমানদের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিলো তা আজ আমাদের খুঁজে বের করতে হয়। অথচ একদিন এমনটি ছিলো না। মুসলমানই কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞানের মশালকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। জন্ম দিয়েছিলেন মানব ইতিহাসের অনন্য সাধারণ একটি অধ্যায়ের, যে অধ্যায়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছিলেন কট্টরপন্থী অনেক ইসলাম বিদ্বেষীও।

এমন মুসলমানরা, ঘুমন্ত বাঘরা আজ নানাদিক থেকে অত্যাচারিত। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিদ্যার দৌড়ে তারা আজ পেছনে। তাদের জাগানোর জন্য প্রয়োজন নব-রেনেসাঁর এবং নতুন উপলব্ধির।

এই লক্ষ্যে মুসলমানদের অনন্য সাধারণ ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা তুলে ধরেছেন তরুণ লেখক ও গবেষক মুহাম্মদ নূরুল আমীন তার এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি 'বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলমান' ও 'প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলমান'-এই দুইটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ নূরুল আমীন দীর্ঘ দুই দশক থেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে লিখছেন বিবিধ বিষয়ে। বিশেষ করে মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস। এ ধরনের একটি গ্রন্থের প্রয়োজনের কথা বার বার বলছিলেন বিদগ্ধ পাঠক ও সুধীজনেরা। আল্লাহর অশেষ রহমতে গ্রন্থটি পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. গোলাম মোয়ায্যাম গ্রন্থটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন।

যে কোন গ্রন্থ নির্ভুলভাবে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া খুবই কষ্টকর। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমরা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোন তথ্যগত ভুল বা মুদ্রণ প্রমাদ পাঠকের কাছে দৃষ্টিগোচর হয়, মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন।

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”

লেখকের কথা

'ইক্‌রা' শব্দটির মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিলো ইসলামের যাত্রা, যে জীবন ব্যবস্থায় বলা হয়েছে 'এক ঘণ্টা জ্ঞান অর্জন করা সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। কুরআনে কারীমের অনূন্য সাত শতাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও এ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞানী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের সমার্থক মূল্যবান পথ নির্দেশ করেছেন বিশ্ববাসীর কাছে জ্ঞানের মহিমাকে উচ্চকিত করে। কুরআন এবং নবীর এ মৌলিক নির্দেশ বুকে করে যাযাবর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব জাতি অচিরেই বিশ্ব সভ্যতার মশালকে নিজেদের হাতে ধারণ করলো, ফলে মধ্যযুগের সেই কুহেলিকায় জ্বলে উঠলো এক দেদীপ্যমান আলোর উৎসব। পুরনো জাতি সমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহে মেতে উঠলো মুসলিম অনুবাদকবৃন্দ, জ্ঞান-গবেষণার এক পর্যায়ে তাঁরা জন্ম দিলো এক অসামান্য যুগের– যা বিশ্ব সভ্যতায় আরব সভ্যতা নামে পরিচিহ্নিত হলো।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং জ্ঞান গবেষণার নতুন নতুন অভিধার তালাশে মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীরা পৃথিবীর সামনে জ্বালালেন এমনই দীপ্ত শিখা যা সেই নবম-দশম শতাব্দী থেকে অষ্ট-উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরিক্রমায় যুক্ত করলো এক অনন্য মাইলফলক। আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার যুগের পথিকৃৎ হয়ে রইলো সেই যুগ প্রবর্তক বিজ্ঞানীগণ। আধুনিক বিজ্ঞান শুধু চমক প্রদ আবিষ্কারের জন্যই নয়, তার নিজের অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানের কাছে ঋণী। Robert Briffault দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন : “Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to that of Arabs does not consist in startling discoveries or revolutionary theorise; science owes a great deal more to the Arab culture, it owes its existence.”

মুসলিম অমুসলিম অনেক সুধীজন আছেন যারা মধ্যযুগকে বলতে চান অন্ধকার যুগ। হয় অজ্ঞতা, নয় হীনমন্যতা বশতঃ তারা এ কথা বলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার। আবার

অনেকে সেই বিজ্ঞানীদের বর্তমানের তুলনায় কৃতী মানতে ঘর্মাক্ত হন। কিন্তু সেই যুগ সেই পরিস্থিতিতে তা মোটেই কম কৃতিত্বের কথা নয়। আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কারের সাথে সংখ্যা গণনা যিনি আবিষ্কার করেন তার তুলনা আজ হাস্যকরও মনে হতে পারে, কিন্তু তা ছিলো কম্পিউটার আবিষ্কারের চাইতেও নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম, কুরআন শাশ্বত বিধান। বিজ্ঞান ও ধর্ম পৃথক জিনিস, যদি উভয়ের পথ দু'দিকে বেঁকে যায়। কিন্তু আমরা দেখি বিজ্ঞান শাশ্বত নয়। এক সময়ে বিজ্ঞান যা বলে, পরে তা বদলে যেতে পারে। 'We have seen that the new self consciousness of science has resulted in the recognition that its claims were greatly exaggerated." (Limitations of Science, Page-194) একইভাবে আমরা Science and the Modern World গ্রন্থের লেখক Whitehead-এর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি- "All our ideas will be on wrong perspective if we thing that this recurring perplexity was confined to contradiction between religion and science and it these controversies religioin was always wrong and that science was always right." এই কারণেই বোধকরি বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন : Science without religion is lame and religion without science is blind. (দ্রষ্টব্য, Philip Frank Einstin, Page, 342-47)

পবিত্র কুরআনে কারীম নিজের বক্তব্য মতেই 'বিজ্ঞানময়'। আধুনিক বিজ্ঞানের এখন চলছে চরমোৎকর্ষকাল। আজও কুরআনের কোনই বক্তব্যকে এই বিজ্ঞান অসার প্রমাণ করতে পারেনি। বরং এ বিষয়ে গবেষক ড. মরিস বুকাই'র স্বীকারোক্তি "কুরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই-যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে"। (দ্রষ্টব্য, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান : আখতার উল আলম অনূদিত, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১২) পবিত্র গ্রন্থের এই অভ্রান্ততার ও বিজ্ঞানময়তার খবর মুসলিম গৌরবময় যুগের পরে মুসলিম জাতি ভুলে রইলেও ভুলে থাকেনি পাশ্চাত্য। ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় কুরআনের প্রচুর অনুবাদ হয় এবং তারা কুরআন গবেষণার মাধ্যমে প্রচুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার পৃথিবীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়। মানুষ জানত মানুষের কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। কিন্তু কুরআনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রথম জানলো যে, মানুষের উৎক্ষিপ্ত কথা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইরশাদ হচ্ছে 'একদিন সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তোমার প্রতিপালকের আদেশ অনুযায়ী।' (সূরা যিলযাল : ৪-৫) এই আয়াতে বাতাসে সব কথা বাণীবদ্ধ হয়ে থাকার ইংগিত করা হয়েছে। একই সাথে বিশ্বনবীর (সা.) বাণী- 'তোমরা দু'টি জিনিসের ব্যাপারে সতর্ক থাক। একটি তোমাদের স্ত্রীরা, অন্যটি এই পৃথিবী যার উপর তোমরা আস্ফালন করে চলছো।' (মুসলিম)

এই হাদীসে মানুষের কথা রেকর্ড হয়ে থাকার ইংগিত দেয়া হলো। সুতরাং বেতার আবিষ্কারের বহু শতকের সাধনা এই বাণীগুলোতে নিহিত এবং পাশ্চাত্য যথার্থভাবে তা কাজে লাগিয়েছে। অথচ বলা হলো অমুক বিজ্ঞানী অমুক আবিষ্কার করেছে।

একইভাবে মহাকাশ, চন্দ্র সূর্যের পরিক্রমণ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, মানুষ ও জীবের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, উদ্ভিদ, প্রাণী ও রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে যেসব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার পাশ্চাত্য করেছে তার বেশির ভাগই কুরআনে উল্লেখ করা ছিল হাজার বছর আগেই।

মুসলিম জাতি তাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিল কুরআনের বলেই, এই গ্রন্থ ছিল তাদের মূল প্রাণশক্তি- 'We must not be surprised to find the Quran regarded as the fountainhead of all the sciences. Every subject connected with heaven or earth, human life, commerce and various trades are occasionally touched upon and this gave rise to the production of numbrous monographs forming commentarise on part of the holy book'. (Dr. Hartwig Herschfeld : New Researches in to the Composition and Exegesis of the Quran. (1906).

বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। তাদের রচিত কালজয়ী গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে ইউরোপে পাঠ্য ছিল। ইবনে সীনা, আল রাজী, আবুল কাসেম জাহারাভী, ইবনুল হাইছাম, জারকালী, জাবির বিন হাইয়ান, মূসা আল খারেজমী, ইবনে নাফিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও রচনাবলী সেইদিনও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পাঠ্য ছিল। ইবনে সীনার 'কানুন' ছয়শত বছর এখানে পঠিত হয়- 'Al Qanun has remained a Medical Bible for a longer period then any other work.' (William Osler : Evolution of Modern Science) আবুল কাসেম জাহরাভীর 'আল তাসরীফ' সম্পর্কে ব্রিটানিকা উল্লেখ করেছে - "AL-Tasrif stood for nearly 500 years as the leading text book on surgery in Europe, preferred for its concise lucidity even to the works of the classic Greek medical authority Galen." (H.G. Wells : The Outline of History, London. 1920)

এভাবে বহু প্রামাণ্য তথ্যের উল্লেখ করা যায়, যাতে আধুনিক ইউরোপ এ সকল বিজ্ঞানীদের প্রতি প্রণত হয়েছেন ও খোলাখুলি স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আবার মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেক আবিষ্কারকে আত্মস্থ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি পাশ্চাত্য। তারা এসব পুরোধা মহাত্মাদের নাম বিকৃত করেছেন, কৃতিত্ব ঢেকে দিয়েছেন নানা জাল বিছিয়ে। অসংখ্য মুসলিম মনীষীদের নাম ও রচনাবলী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্র হাতবদলের জিঘাংসায় মুসলিম কীর্তির বেশির ভাগ নিদর্শনই ধ্বংস হয়েছে বর্বর ইউরোপীয়দের হাতে। নদীতে নিক্ষেপ করে, রান্না

বান্নার কাজে এবং গ্রন্থের স্তূপে আগুন দিয়ে তারা ধ্বংস করেছে অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলো। তারা জানতো না-সেদিন তারা কি করেছিলো। ১৬ শ' শতাব্দীতে খৃষ্টান বিজ্ঞানী রামুস মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাজারে ইবনুল হাইছামের একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন পুরনো এক বইয়ের দোকানে ধূলি বালিময় ছেঁড়া ঐ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়ে তিনি এমনই আনন্দিত হন যে, যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের অত্যাচারে যখন মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই সময়ে ইহুদী বিজ্ঞানী মার্টিন লেভী মধ্যযুগের আরব বিজ্ঞানীদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করছেন- "of the over 6,00,000 manuscripts dispersed throughout the world relatively a few have been studied for their scientific content, their origin and their influence upon further work and development in the same area." (Early Arabic pharmacology, M. Leve)

বিজ্ঞান জগতে মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠযুগ চিহ্নিত হয় সাধারণত ৭৫০ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ- এই সাড়ে তিনশত বছর। অথচ এই উত্তরাধিকার কাজে লাগাতে ইউরোপকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। পৃথিবীতে কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী নয়। এই দিক দিয়ে ইউরোপ এত দেরীতে কেন আরব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ পেল, কারণ ইউরোপে একমাত্র স্পেন ছাড়া কোনখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্পেনেও যদি মুসলমানরা ঢুকতে না পারতো তা হলে নিশ্চিত আধুনিক সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতো।

স্মর্তব্য, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান আল গাফিকির নেতৃত্বে ফ্রান্স বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যে সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার কারণে ইউরোপ মুসলিম সভ্যতার আলো থেকে এতগুলো শতাব্দী বঞ্চিত হয় বলে ঐতিহাসিকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'টুরস' বা 'পয়টিয়াস'-এর যুদ্ধ নামে সুপরিচিত এই যুদ্ধে মুসলমানরা সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ না করলে অতি সহজেই তারা ইউরোপ দখল করে নিতে পারতো। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন তদানীন্তন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হতো। জওহর লাল নেহেরু লিখেন : On the plains of Tours the Arabs lost the empire of the world when almost in their grasp... Instead of Christianity, Islam would then have become the religion of Europe and all manner of other charge might have taken place.' (Glimpses of World History, London, P-146)

এডওয়ার্ড ক্রীসী তাঁর The Fifteen Decisive Battles of the World গ্রন্থে-

এই যুদ্ধকে মানব ইতিহাসে সংঘটিত ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। জ্যাক আনাতোল ফ্র্যাঁস দাবী করেছেন যে, এই যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল অসভ্যতা ও বর্বরতার নিকট বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার। তাঁর চমৎকার ভাষায়- "The most tragic event in history is that of the Battle of Tours when the science, art and civilization of Arabia fell back before the barbarism of Franks," (Anatole France : La Vie en Fleur)

সে যাই হোক, মুসলমানদের অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এই গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। এই প্রচেষ্টা এর আগেও হয়েছিলো। বিশেষ করে এম, আকবর আলী সাহেবের বৃহৎ অবদানের কথা আমরা জানি। তাঁর রচনার বিশালত্বের কারণে সম্ভবতঃ তা সাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছুতে পারেনি। তাছাড়া এই অসামান্য কাজগুলো করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থভুক্ত গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা বিষয়ক লেখাগুলোর জন্য তাঁর উপর নির্ভর করা হয়েছে অনেকাংশে। অন্যান্য রচনাগুলোর উৎস যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এই লেখাগুলোর বেশির ভাগই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং স্বতন্ত্র নিবন্ধ হিসাবে লেখার কারণে কিছুটা পুনরাবৃত্তি চোখে পড়তে পারে। আমাদের বিশ্বাস, এতে মূল বক্তব্যের ব্যত্যয় ঘটবেনা। অনেক রচনা নতুন তথ্য উপাত্ত দিয়ে পুনরায় সজ্জিত করা হয়েছে। কিছু লেখা আরো বিস্তারিত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই সংস্করণে করা সম্ভব হয়নি। আশা করি পরবর্তীতে এদিকে খেয়াল রাখা হবে।

এই লেখা প্রকাশ ও গ্রন্থাকারে পরিবেশনার কাজে আমি অনেকের কাছে সবিশেষ ঋণী। অনেক বন্ধু, সুধী ও সম্পাদক আমাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে ধন্য করেছেন- তাঁদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। যেহেতু এই গ্রন্থ আমার প্রথম কাজ তাই নানা ধরনের অপূর্ণতার দায় স্বীকার করছি। তবুও উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মহলের কিছুটা লাভ যদি এ থেকে পাওয়া যায় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান, তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মদ নূরুল আমীন
হাবিলদার বাড়ী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

প্রথম পর্ব

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম অবদান

আল-কুরআন ও আবহাওয়া বিজ্ঞান

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৃথিবীকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- বিজ্ঞানের এতো উৎকর্ষ ইতোপূর্বে কোন কালে আর হয়নি। আজ বিজ্ঞানের বদান্যতায় মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, দূরাশাকে বিজয় করেছে, হতাশাকে দিয়েছে তৃপ্তি। তবুও মানুষ বসে নেই। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাপারগুলো আজ সেই মানুষের কাছেই আশ্চর্য ঠেকে। বিশ্বাস পর্যন্ত হয়না অনেক কিছু। খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়- প্রাচ্যের মানুষ, মানুষের চাঁদে ভ্রমণকে সহজভাবে নিতে পারেনি। এমনকি খোদ চাঁদ বিজয়ী আমেরিকায় এমন অনেক গোঁড়াপন্থী মানুষের অস্তিত্ব আছে- যারা নাকি এখনো একথা বিশ্বাস করতে পারেনা যে- মানুষ চাঁদের বুকে পা রেখেছে।

বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষতার সাথে সাথে পবিত্র ইসলামের শাশ্বত পয়গাম আরো বেশী করে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্টতার প্রমাণ পাচ্ছে। আধুনিক যুগের মানুষ ঝুঁকে পড়ছে সর্বাধুনিক ধর্ম ইসলামের প্রতি। উল্লেখ্য, আজকালকার বৈজ্ঞানিক সমাধান যাই হোক না কেন, ইসলাম তার অনুগামী নয় কখনো- বরং বিজ্ঞানকেই বারবার ফিরে আসতে হয়েছে ইসলামের কাছে। বিজ্ঞান আজ যা শত বছরের গবেষণায় প্রমাণ করছে, তা কোন গবেষণা ব্যতীত ইসলাম তথ্যগত বুৎপত্তিসহ বর্ণনা করেছে। ফলে আজকের বিজ্ঞান কুরআনের কাছে বারবার হার মানছে। তদ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামের দর্পণ আল কুরআন সকল সময়ের সর্বাধুনিক বিজ্ঞান গ্রন্থ।

আবহাওয়া বিজ্ঞান আজকালকার স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি বিজ্ঞান। সমকালীন সময়ে এটা এমন উন্নতি লাভ করেছে যে, বহু পূর্বেই আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি মাটির বুকে মানুষের হাতে চলে আসে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, উন্নত বিশ্বের তিনটি দেশ মিলে ব্যয়বহুল এক ধরনের স্যাটেলাইট আবহাওয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে মহাকাশে। যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মাইল উপরে বসে, তা ঐ তিন দেশের তিন ভাষায় তথ্য ও ছবি পাঠায় নির্বিঘ্নে। এমনকি তা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের ১ বছর পূর্বের আবহাওয়ার গতিবিধি মানুষকে জানাতে পারবে।

আবহাওয়া বিজ্ঞান প্রধানতঃ আগাম দুর্যোগ মোকাবিলার সতর্কতা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের প্রধান ভাষ্যকার বিজ্ঞানময় আল কুরআন বহু আগেই আবহাওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত ও মূল্যবান পর্যালোচনা করেছে। স্মর্তব্য, কুরআনের প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা ও বিষয়জ্ঞান কেবল জানার জন্য বলা হয়নি। কুরআন বলে দিয়েছে ওসব কেন হয়, কিভাবে হয়, কি প্রতিকার- এবং এতে সর্বোতভাবে মানুষের জন্য কি শিক্ষা রয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের জন্য শিক্ষা ও গবেষণার উপাত্ত হিসাবে কুরআন বৈজ্ঞানিক থিওরীসমূহ বিবৃত করেছে। যেমন বলা হচ্ছে- "তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছু নিজ দয়ায়, যাতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন"। (সূরা জাসিয়াহ : ১৩)

আবহাওয়া বিজ্ঞানে আলোচিত প্রধান বিষয়গুলো হলো- মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, তুষার বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ধূলিঝড়, অগ্নিবায়ুর ঘূর্ণি, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রধ্বনি, ভূ-কম্পন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় নিয়ে কুরআন বহুবার আলোকপাত করেছে। তবে বৃষ্টির কথা এসেছে বেশী বেশী। কারণ বৃষ্টির অবদান পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনস্বীকার্য। আবার এ বৃষ্টিই অনেক সময় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআনের একেবারে প্রথমদিকের কিছু আয়াতে আবহাওয়া বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। বর্ষণমুখর অমাসিক্ত ঘনমেঘ, বিদ্যুৎ চমক এবং বজ্রপাত– এ তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কাফির এবং কপটচার মানুষদের বিপরীতে মুমিনদের মাহাত্ম্য বর্ণনায়। এরশাদ হচ্ছে- "(তাদের উদাহরণ) যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘনমেঘ যাতে গভীর অন্ধকার রয়েছে, বজ্রধ্বনি এবং বিদ্যুৎ চমক ।" (সূরা বাকারা : ১৯)

কাফির এবং কপটচারী মুনাফিকদের উদাহরণ দেয়া প্রথম জিনিসটি হলো বর্ষণমুখর ঘনমেঘ- যা আবার গভীর অন্ধকারে সিক্ত। অধুনা আবহাওয়া বিজ্ঞানের মতে আকাশে ভাসমান মেঘের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কোন কোন মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় আবার কখনো হয়না। বিশ্বের সকল আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আকাশে অবস্থিত মেঘকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করেন।

ক. Cirus: উচ্চ স্তরের মেঘ। যা ভূমিপৃষ্ঠের ২৫,০০০ ফিট উর্ধ্বে দেখা যায়।

খ. Cumulus: যার অবস্থান ৫,০০০ হতে ১০,০০০ ফিট উর্ধ্বে।

গ. Stratus: বায়ুমণ্ডলে ২০০০ হতে উর্ধ্বে ঝুলতে থাকে।

ঘ. Nimbus: ১০০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থান। এগুলোই কালো বৃষ্টির মেঘ।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ প্রকারের মেঘই মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক- যার সাথে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের তুলনা করেছেন। তদ্রূপভাবে এ ধরনের পরিস্থিতির সময় বিদ্যুৎচমক ও বজ্রধ্বনির ভীতিকর অবস্থার সাথে তাদের চারিত্রিক সাযুজ্য বর্ণিত হয়েছে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের অন্যতম। বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন হিতকর দিকসমূহ কুরআন আলোচনা করেছে। বলা হচ্ছে : "আল্লাহ আকাশ থেকে বারিপাত দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর পুনঃজীবিত করেন।" (সূরা বাকারা : ১৬৪) বর্ষণ দ্বারা বিবর্ণ বিশুষ্ক পৃথিবী ভরে উঠে সজীবতায়, শস্য ক্ষেত্র, গাছপালা, জীবজন্তু বিচরণ করে নতুন উদ্যমে। আল্লাহ যদি ফোঁটা ফোঁটা না করে বন্যার মতো বৃষ্টি দিতেন তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতো না। এ রকম বর্ষণ সহ্য করা সম্ভব হতোনা কোন জীবের পক্ষে। তিনি মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য পানিকে কোথাও উন্মুক্ত, কোথাও ভূগর্ভে হেফাজত করেছেন। কোথাও জমাট তুষাররূপে সংরক্ষিত করেছেন- যা কখনো নষ্ট হয়না বরং সূর্যের তাপে দ্রবীভূত হলে কাজে আসে।

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ অপসারণে বৃষ্টির ভূমিকা বর্ণনাতীত। মুষলধারে বৃষ্টি অপরিষ্কার ধূলিকণা দূর করে, ময়লা দূর করে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলে। উদ্ভিদের চারা উদ্গমন ও শস্য উৎপাদনে বৃষ্টির ভূমিকা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, "তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি উহা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গম করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা বের করি, পরে তা থেকে সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি আর যায়তুন ও দাড়িম্ব।" (সূরা আন্‌আম : ৯৯) অন্যত্র বলা হচ্ছে- "তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।" (সূরা নাহল : ১০)

বৃষ্টি যেমন আল্লাহর অপার অনুগ্রহের প্রতিফলন অন্যদিকে তা তাঁর গজবেরও উপকরণ হয়ে থাকে। বৃষ্টির ছোঁয়ায় আমরা যেমন আপ্লুত হই, তেমনি অতিবৃষ্টি মানুষের জান-মালের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি বয়ে আনে। মানুষের ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতার কারণে এ পরিণতি হয়। আল্লাহ 'লূত' সম্প্রদায়কে তাদের চরম অবাধ্যতার কারণে মুষলধারে বর্ষণ দ্বারা নাস্তানাবুদ করেছেন। কুরআন বলছে– "তাদের উপর (কওমে লূতের) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছিল লক্ষ্য কর।" (সূরা আ'রাফ : ৮৪)

সীমালংঘনকারী লূত জাতিকে শাস্তিস্বরূপ প্রথমে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় ও পরে ভূমিকম্পের মাধ্যমে সারা ভূমি উল্টিয়ে দেয়া হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্ডন নদীর মধ্যস্থানে আজো সেই চরম শিক্ষার ভূখণ্ডটি Dead Sea বা মৃত সাগর নামে পরিচিত। অনুরূপ বৃষ্টি ও অসম বন্যায় ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো অবাধ্য 'কওমে নূহকে'। (সূরা হুদ : ৪৪)

প্রবাহিত বায়ুর বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা নিরীক্ষা আবহাওয়া বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক বিষয়। মানুষের জন্য সু সংবাদবাহী এবং দুঃসংবাদবাহী বায়ু প্রবাহের ব্যাপারে বলা হচ্ছে- "তাঁর নিদর্শনাবলীর এটা একটা যে- তিনি (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন..." (সূরা রূম : ৪৬) অন্যত্র "আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তারা নিশ্চয় অকৃতজ্ঞ হয়।" (ঐ : ৫১) কল্যাণকর বায়ু - যা ঠাণ্ডা-গরম আরাম প্রদান করে থাকে। এই বায়ু প্রবাহের উৎস এলাকা এবং গন্তব্য এলাকার স্থলে খাত গভীরতার আনুকূল্য বিষয়ক জ্ঞান নিহিত আছে। অনিষ্টকর বায়ু প্রবাহের ক্ষেত্রেও বাতাসে প্রচণ্ড বেগ, সম্বন্ধে বিবেচনা নিহিত রয়েছে। যেগুলো অধুনা আবহাওয়া বিজ্ঞানে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণার বিষয়।

বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক সম্পর্কে কুরআনে এসেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে একদল ইহুদী আল্লাহকে তাদের সামনে সরাসরি দেখিয়ে দেবার আবদার করেছিল। তাদের এ স্পর্ধা দেখে আল্লাহ তাদের প্রতি বজ্রপাত বর্ষণ করেন। ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বলা হচ্ছে- "তারা বলেছিল, প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও, তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল..."। (৪ : ১৫৩)

আকাশে বিদ্যুৎ চমকের পরপরই উচ্চস্বরে যে শব্দ শোনা যায়, তাকে বজ্রধ্বনি বলে। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় বিদ্যুৎছটার পথে বায়ু হঠাৎ উষ্ণ হয়ে আয়তনে বেড়ে উঠে। এতে শব্দ হয়। এ ধরনের বৈদ্যুতিক চাপ কিভাবে সৃষ্টি হয় তা বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি আজো। বজ্রাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে সাবধানতাই অবলম্বন করা হোক না কেন, আল্লাহ যে কোন সময় এই নিরাপত্তা ভেঙ্গে দিতে পারেন। কুরআন বলছে- "বজ্রনির্ঘোষ ও ফিরিশতারা সভয়ে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রাঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা এ দ্বারা আঘাত করেন।".. (সূরা রা'দ : ১৩)

বজ্রপাতের পূর্বে যে বিজলী চমক দেখা যায় সে সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে- "তিনিই তোমাদেরকে বিজলী দেখান- যা ভয় ও ভরসার সঞ্চয় করে।..." (সূরা রা'দ : ১২) বিজলী চমকের ফলে বজ্রপাতের কারণে যদিও ক্ষতি সাধিত

হতে পারে তবুও এর একটি ভাল দিক রয়েছে। বায়ুতে যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে তা এই বিদ্যুৎ চমক দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একীভূত হয়ে মাটিতে পড়ে- যা খুবই মূল্যবান সার।

জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধেও কুরআনে বলা হয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভাষায় বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে থাকে ও বায়ুমণ্ডলের কোন অঞ্চলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাকে ঝড় বলে। এর উপরে আছে ঘূর্ণিঝড়।

ধূলিঝড়, টর্ণেডো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঝন্‌ঝা বায়ু। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্থান এ ধরনের প্রবল ঝন্‌ঝার সম্মুখীন হয়েছে। এমনি স্মরণকালের ঘূর্ণিবায়ুগুলো কেড়ে নিয়েছে লাখো জান-মাল। এটা প্রভুর পক্ষ থেকে গজব স্বরূপ। কুরআন বলছে- "তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছো যে, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না কিংবা তোমাদের উপর কঙ্কর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবেনা।" (বনী ইসরাঈল : ৬৮)

প্রবল বেগে ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস বইবার সময় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক বাতাস ঘর্ষণ খেয়ে বিদ্যুৎচ্ছটার সৃষ্টি করে ও তাতে বিচ্ছুরিত হয় আলোকরশ্মি। একে বলা হয় 'সেন্ট এলমোর ফায়ার'। ১৯৬০ সালের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ উপকূলের এবং ১৯৯১ এর প্রবল ঘূর্ণিঝড় এর সময় এ ধরনের অগ্নিঝড় মানুষ দেখতে পেয়েছিলো। যাতে গাছের পাতা-পল্লব পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আবহাওয়া বিজ্ঞানে এধরনের 'অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড়' বলে কোন শব্দ নেই। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে- "... অতঃপর এর উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে যায়।" (সূরা বাকারা : ২৬৬) মরুভূমিতে সংঘটিত এ প্রকারের ঝড়কে বলা হয় 'লুহাওয়া'।

বায়ুমণ্ডল বিষয়ক আবহাওয়া বিজ্ঞান ভূ-পৃষ্ঠ প্রকৃতির স্থিতিশীলতা নির্ভর-তাই আবহাওয়াবিদরা ভূ-পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ভূমিকম্প এর পর্যবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে 'সাইস্‌মগ্রাফ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্প মাপা হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়ার ভূমিকম্পে প্রায় ২৫ হাজার লোক নিহত হয়। এর চাইতে গুরুতর এবং লঘু ভূমিকম্প ও হয়েছে। এতে জান মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বহুতলা অট্টালিকা খসে পড়ে তাসের ঘরের মতো। প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প সম্পর্কে কুরআনে হুশিয়ারী রয়েছে। বলা হচ্ছে- "স্মরণ কর, যখন স্বীয় ভূমিকম্পে পৃথিবী ভয়ানক কেঁপে উঠবে এবং পৃথিবী তার ভেতরে যা কিছু আছে সব বের করে দেবে।" (সূরা যিলযাল : ১-২)

বর্তমানে আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস' দেয়ার জন্য নদ-নদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট অববাহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আর এ তথ্য থেকে পূর্বাভাস, বন্যা ইত্যাদির সংবাদ দিয়ে থাকেন। নদ-নদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধি, অবিরাম বৃষ্টিপাত ও প্লাবন থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কুরআনে বহু ইংগিত ও নির্দেশ নামা রয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট আবহাওয়াবিদদের গভীর গবেষণার উপাত্ত হতে পারে। জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার নিমিত্তে বেড়িবাঁধের উপকারিতার কথা বহু আগে কুরআন ঘোষণা করেছে। (সূরা সা'বা : ১৫-১৬)

আবহাওয়া বিজ্ঞান সংক্রান্ত অসংখ্য জ্ঞান মঞ্জুষা ছড়িয়ে রয়েছে কুরআনে কারীমে। আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাত্তের গতিবিধি, গঠন, সংঘটন বিক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অপার মূল্যবান সূত্র প্রচুর পরিমাণে গবেষণা ব্যতীতই কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। পৃথিবী পাদের পাহাড় নদী, সাগর, মরুভূমি ভূ-গঠন প্রকৃতি, পৃথিবীর আবর্তন, পরিভ্রমণ, চাঁদ-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষপথ পরিক্রম বিষয়ক ভূমন্ডলীয় জ্ঞানের অবদান আবহাওয়া বিজ্ঞানে অপরিসীম। ঋতুভেদ, বায়ু প্রবাহ, ঝড়বৃষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন আবহাওয়া বিজ্ঞানে- অপরিহার্য। পবিত্র কালামে পাকে এ ধরনের অসংখ্য সূক্ষ্ম বর্ণনা রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে- "নিশ্চয় আসমান জমীন সৃষ্টির মধ্যে, রাত-দিনের আবর্তনে, সাগরে মানুষের উপকারে চলাচলকারী জলযানসমূহে, আকাশ হতে বর্ষিত বৃষ্টিতে- যা দ্বারা আল্লাহ মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং জীব বিস্তার করেন-তার মধ্যে, বায়ু প্রবাহের মধ্যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমনাগমনের মধ্যে-জ্ঞানী লোকদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।" (২ : ১৬৪)

এ ধরনের আয়াতসমূহে মহান প্রভু বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ের প্রতি চিন্তাশীল গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আবহাওয়া বিজ্ঞানীদেরও। এ আকর গ্রন্থেই তাদের চূড়ান্ত নির্দেশনা রয়েছে-সন্দেহ নেই।

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রধান শাখার নাম রসায়ন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের দেহের ভিতর সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে শুরু করে সুউচ্চ সীমানায় নক্ষত্রলোকে সংঘটিত ঘটনাবলী পর্যন্ত বিস্তৃত রসায়নের পরিধি।

রসায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রধানতঃ পদার্থের গঠন, উহার ধর্মাবলী, পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়ায় নূতন পদার্থের সৃষ্টি এবং পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়, সে শাখারই নাম রসায়ন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় রসায়নের অবদান রয়েছে। বস্তুত সমগ্র বিশ্বটাই দাঁড়িয়ে আছে রসায়নের উপর। প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে রসায়ন বিজ্ঞানের পরিধি। বর্তমান প্রচলিত রসায়নের প্রধান শাখাগুলো হলো ঃ

১. ভৌত রসায়ন (Physical Chemistry),

২. জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)

৩. অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry)

৪. ফলিত রসায়ন (Applied Chemistry).

৫. প্রাণ রসায়ন (Bio-Chemistry).

৬. ভেষজ রসায়ন (Pharmaceutical Chemistry),

৭. বিশ্লেষণমূলক রসায়ন (Analytical Chemistry)

৮. নিউক্লিয়ার রসায়ন (Nuclear Chemistry) এবং

৯. মহাশূন্য রসায়ন (Space Chemistry).

রসায়নের ইতিহাস যতোটুকু জানা যায়, তাতে বলা যায় মিশরে প্রথম রসায়ন চর্চা শুরু হয়। পিরামিড তৈরীর বহু পূর্বে নীল নদীর তীরে মেমফিসের

বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্দিরের পুরোহিতরা জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি শেখাতেন। সেই সঙ্গে, চলতো মমি তৈরী করতে টুকরো টুকরো কাঠ জোড়া দেয়ার জন্য গদ ও সিমেন্ট তৈরীর ব্যবস্থা। নানা প্রকার গাছের আঠা, গম, যব ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করা হতো কাগজ। এ সব কাজে আগুন দিয়ে জ্বাল দিতে হতো, ভালভাবে জ্বাল দেয়ার জন্য হাপরেরও আবিষ্কার হয় মিশরে। এভাবে মিশরে রসায়ন চর্চা চলে। নানা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তারা দেখলো বালু, পাথরী চুন, সোডা ইত্যাদি কোনো এক পরিমাণ করে আগুনে গরম করলে জিনিসটা স্বচ্ছ কাঁচে পরিণত হচ্ছে। ৩৫০০ বছর আগে মিশরীয়রা যেভাবে কাঁচ তৈরী করতো, আজও সে কায়দাই ব্যবহৃত হচ্ছে, কেবল নতুন যন্ত্রপাতি ছাড়া। এরপর বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে তারা রঙ্গীন কাঁচ তৈরী করা শিখলো, তা থেকে শিশি বোতল তৈরী। সিরিয়ায়ও এ পদ্ধতি চালু হয়ে গেলো। সিরিয়ানরা এ নিয়ে বসে থাকেনি, কাঁচ থেকে কিভাবে নকল মণি-মুক্তা ইত্যাদি তৈরী করে মানুষের চোখে ধূলা দেয়া যায় এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। নকল সোনা তৈরীর পদ্ধতি এবং অন্য জিনিসকে কিভাবে সোনা বানানো যায় তারা সে চেষ্টাও চালালো। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক পর্যায়ে আরবে ইসলামের আগমন ঘটে এবং রসায়ন নিয়ে আরবরাও জড়িয়ে পড়ে।

আরবদের পূর্বে রসায়ন বিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত ছিলো না; উপায় উপকরণের কারণ হিসাবে এ চর্চা পরিচালিত হতো। রসায়নকে বিজ্ঞান হিসাবে মুসলমান সাধকরাই প্রতিষ্ঠিত করেন। হাম-বোল্ট উল্লেখ করেছেন : 'আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র মুসলমানদের উদ্ভাবন এবং এই বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব অতুলনীয়রূপে চিত্তাকর্ষক।' মূলতঃ প্রাচীন রসায়নের অসারতা প্রমাণ করে, শিল্প রসায়নের প্রচলিত (Industrial Chemistry) দৌড়কে থামিয়ে দিয়ে তত্ত্বীয় রসায়ন তাদের হাতেই জন্ম লাভ করে। Sir Fduard Thorpe তাঁর History of Chemistry গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ Experimental Alchemy as distinguished from Industrial Chemistry may as already stated, beside to have originated with the Arabians. ঐতিহাসিক রেজা-ই করীম এ প্রসঙ্গে লিখেন : "জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের পরেই আরবদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রসায়ন শাস্ত্রে। বিজ্ঞান অধ্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রীকদের মতো অস্পষ্ট অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভরশীল না হয়ে আরবগণই প্রথম হইতে নিরীক্ষণ পদ্ধতির (experiment) প্রবর্তন করেন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ (observation) এবং সত্য উদঘাটনের প্রবল ইচ্ছা আরবদিগকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য করতো।'

রসায়নের ইংরেজী প্রতি শব্দ কেমিষ্ট্রী (Chemistry); শব্দটি যে আরবী 'আল কিমিয়া' থেকে উদ্ভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারো মতে, আরবী আল কিমিয়া মিশরীয় 'কামিত' (অর্থ-কাল) শব্দ হতে নিষ্পন্ন। অন্য মতে, এটি গ্রীক Chumeia, Chemeia থেকে এসেছে, যার অর্থ গলিত ধাতু। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী থেকে আল কিমিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর পূর্বে রসায়ন তথা আল কিমিয়াকে ইচ্ছা মাফিক নামে ডাকা হতো। যেমন- The Sacred Art, The Divine Science, The Occult Science, The Art of Hermes ইত্যাদি। আরবীতে 'আল কিমিয়া' ছাড়াও 'আল হিকমা আস্ সানাআহ' নামেও এ বিজ্ঞানকে অভিহিত করা হতো।

মুসলিম রসায়ন চর্চার পটভূমি

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন রসায়ন নিয়েও আলোচনা করেছে। ধর্মীয় গ্রন্থ হওয়ায় কেবলমাত্র কুরআনের প্রতি যারা ইতোপূর্বে উন্নাসিকতা দেখিয়েছেন তা আজ ধোপে টেকে না। কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ আধুনিক বিজ্ঞানীরা আজতক আবিষ্কার করতে পারেনি। বরং দিন যতো যাচ্ছে এই মহান গ্রন্থের বিজ্ঞান ময়তার দাবী ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ড. মরিস বুকাই এ ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়বোধ লুকাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন : কুরআনের বাণীতে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুবিধ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আমাকে গোড়াতে বিশেষভাবে বিস্মিত করেছিলো।... বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত কুরআনের বাণী সংখ্যায় সুপ্রচুর। এসব বাণী অবতীর্ণ ও সংকলিত হয়েছিলো তেরশত বছরেরও আগে। অথচ এতো বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত হয়ে ও সেসব বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কিভাবে যে এত বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারলো, সে বিষয়টাই আমাকে বিস্মিত করেছে সবচাইতে বেশী।'

রসায়ন বিষয়ে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। এম আকবর আলী তাঁর "Science in the Quran' গ্রন্থের Chemistry অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ক আয়াতসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করেন :

১. সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে আয়াত;

২. দুধ ও মধুর উৎপাদন সম্পর্কীয় আয়াত;

৩. বৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদ ও সব্জি উৎপাদন সম্বন্ধীয় এবং

৪. বাতাস থেকে খাদ্য বিষয়ক আয়াত।

এ সব বিষয় নিয়ে ' বিজ্ঞান না কোরান' গ্রন্থে মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সম্পূরক

আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেন : 'রসায়ন বিজ্ঞানে কুরআনের দান অনস্বীকার্য। বিস্তৃত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে বিশ্লেষণ করবার মতো অজস্র সূত্র এতে নিহিত।... কে না জানে যে এই কোরানের সূত্রের উপর নির্ভর করেই জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অন্যান্য দেশকে হার মানিয়ে দিয়েছে।'

ইসলামের প্রথম দিকেই রসায়ন নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। মহানবী (সা) ঔষধ নিয়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। হাদীস গ্রন্থগুলোতে 'তিববুন নবী' শীর্ষক অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। তাই ঔষধকে যদি রসায়নের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামের প্রথম রাসায়নিক। এরপর চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর নাম উল্লেখ করা যায়। রসায়ন সম্পর্কে তাঁর বাণী আরবী সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। 'দারুল হিকমা' তথা জ্ঞানের দরজা উপাধি প্রাপ্ত আলী রসায়ন চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই, তবে তিনি যে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন তার প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি আরব রসায়ন সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি স্পষ্ট ধারণার জন্ম দেয়। তিনি তাঁর কোনো শিষ্যকে বলেছিলেন :

'পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুতের মতো
কোনো বস্তুর সাথে মিশিয়ে দিতে পারো তাহলে
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে।'

নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরীর এই ফরমূলার পরিকল্পনাকারী হিসাবে তাঁকে সর্বপ্রথম রসায়ন বিজ্ঞানী আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

দশম শতাব্দীর অন্যতম রসায়নবিদ মাহরারিস তাঁর গ্রন্থে হযরত আলীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। লেখকের রসায়ন চর্চা সম্পর্কে এক ব্যক্তি আলীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ নিরবতার পর বলেছিলেন : 'তুমি আমাকে নবুয়তের বোন এবং মনুষত্বের রক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? খোদার দোহাই এ নিশ্চয়ই আছে এবং থাকবে। এর মধ্যে মূল নেই বা অংশ নেই এরকম কোনো বস্তু পৃথিবীতে নেই। খোদার দোহাই, আমি জানি পারদ সোনা, ফিটকিরি মরিচা ধরা লোহা ও সবুজ তামার মরিচার মধ্যে অনন্ত ধন নিহিত রয়েছে। একটা অন্যটার উপর কাজ করে, এর পানি এ থেকেই বেরিয়ে আসে। তারপর তুমি গুপ্ত তেল এবং স্থায়ী আরক নিয়ে সুখী হবে।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এগুলো আসলে কি জিনিস?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন- 'এ হলো স্থূল পানি, বদ্ধ বায়ু, বর্ণপরিবর্তনীয় অগ্নি এবং তরল মাটি।' এ বর্ণনা থেকে তাঁর প্রজ্ঞা ও ধারণার ব্যাপারে সম্যক অবগত হওয়া যায়।

খালেদ বিন ইয়াজিদ

হযরত আলীর সোনা তৈরীর রাসায়নিক পরিকল্পনার উত্তরাধিকার বহন করেন হযরত মুয়াবিয়ার পৌত্র খালেদ বিন ইয়াজিদ। উমাইয়া যুগের বিরল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনেকগুলি আরবীতে অনুবাদ করেন। ফিহরিস্তের মতে, ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম অন্য ভাষা থেকে আরবীতে গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এ দৃষ্টিতে তাঁকে আরব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচনার প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

খালেদের রাসায়নিক কার্যকলাপ-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ খুব একটা পাওয়া যায়না। তবে আল্ রাজী, আবুল কাসেম প্রমুখ পরবর্তীতে খ্যাত রসায়নবিদ তাঁদের রচনায় খালেদের নাম ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ফলে তাঁর এ বিষয়ের চিন্তাবিদ হিসাবে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। খালেদের রচনার বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে তাঁর একই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন বলে ইবনে নাদিম ফিহরিস্তে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো 'কিতাবুল হারারাত', 'সাহিফাতিল কবীর,' 'সাহিফাতিস্ সগীর' এবং 'ওয়াসিয়াতিহি ইলা ইবনিহি ফিস্ সান আ'।

জাফর আস্ সাদিক

মহানবীর অধস্তন পুরুষ, শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস্ সাদিক (জন্ম ৬৯৯ মতান্তরে ৭০২ খৃ.) এর নাম পরবর্তী রসায়নবিদ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের ওস্তাদ ছিলেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে, জাবির বিন হাইয়ান ২ হাজার পৃষ্ঠায় যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাতে তাঁর শিক্ষক জাফরের আবিষ্কৃত সমস্যাগুলিও সন্নিবেশ করেন এবং এতে গ্রন্থের ৫০০ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়। জাফরের যে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় সেটি হলো 'রিসালা জাফর আস্ সাদিক ফি ইলমিস্ সালা ওয়াল হাজারিল মোকাররম' (Book of the epistole of Jafar on the Science of the art and the noble stone)। জার্মান প্রাচ্যবিদ Ruska এটি সম্পাদনা করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি জাফরের কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈততা পাওয়া যায়।

রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান

এম আকবর আলী লিখেছেন : 'জাবির ইবনে হাইয়ানকে বলা চলে পৃথিবীর সর্বপ্রথম রসায়ন বৈজ্ঞানিক । তাঁর পূর্বে যে রসায়নের চর্চা হয়নি তা নয়, কিন্তু সে চর্চার মধ্যে ঠিক বর্তমানে বিজ্ঞানের চর্চা বলতে সাধারণতই যে ধীরস্থির নিয়মানুগতিক সুবোধ্য ধারার কথা মনে হয় তেমন কোনো নিয়মানুগতিক ধারার অস্তিত্বই ছিলো না। রসায়ন ছিলো তখন যাদু বিদ্যার অন্যতম প্রতীক। সাধারণ সমাজ একে দেখতো ভয়ের চোখে, বিদ্বান সমাজ একে বিজ্ঞান হিসাবে আমলই দিতেন না। মুসলিম বিদগ্ধ সমাজেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।... রসায়নের যখন এমনি অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সেই সময়েই জাবিরের আবির্ভাব। এই সময়ে তিনি যে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে রসায়নকে তার অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে দর্শন, অংক ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সমতুল্য পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে উন্নতি করতে পেরেছিলেন, তার জন্যেই তিনি বিজ্ঞান-জগতের অসংখ্য ধন্যবাদের যোগ্য।'

আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান আল কুসী আরব বংশোদ্ভূত, কুফা ভিন্নমতে তূসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। ৭২২ খৃ./৭৩০ খৃ. প্রভৃতি তারিখ বিভিন্ন স্থানে জন্ম তারিখ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। জাবিরের জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। তবে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শুরু হয় আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) রাজত্ব কালে। কুফায় তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলেছিলো। ফিহ্‌রিস্তের মতে, তাঁর রসায়নাগারও এখানে স্থাপিত হয় এবং তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরে কুফার প্রান্তে অবস্থিত দামাস্কাস গেটের নিকট নতুন রাস্তা তৈরী করতে কতোগুলো ঘর ভেঙ্গে ফেলার সময় ২০০ পাউণ্ড ওজনের একটি সোনার তাল ও একটি খল পাওয়া যায়। অবশ্য হিট্টি এ ঘটনার সময় তাঁর মৃত্যুর দুইশ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো উল্লেখ করেছেন। ৭৭৬ বা ৮১৩ খৃ. দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো বলে উল্লেখ করা হয়। জাবির বিন হাইয়ানের জীবনী আলোচকদের মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ আল জিলদাকীর (মৃ. ১৩৬০ খৃ.) রচিত 'কিতাবুল বুরহান ফি আসরাবে ইলমুল মিজানে' সবচেয়ে সম্মত আলোচনা করা হয়েছে। জাবিরের সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত জীবনী আলোচক Holmyad এর মতের সাথে উক্ত জিলকাদীয় বর্ণনায় বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন : 'আজদ বংশীয় জাবির কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার পর ইমাম জাফর সাদিকের নিকট

গমন করেন, পরে তিনি বারমাকীদের সঙ্গে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি অনেক পরীক্ষা কার্য চালান। বারমাকী মন্ত্রী জাফরের সহায়তায় তিনি হারুনুর রশীদের অনুগ্রহ ভাজন হন। তিনি খলীফার জন্য কিতাবুল জুহর (The Book of Blossom) বা কিতাবুল নুহাস (The Book of Copper) প্রণয়ন করেন। তাঁরই উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের জন্য গ্রীক গ্রন্থাবলী কনষ্টান্টিনোপল থেকে আনীত হয়। তিনি ৯০ বছরের ও অধিককাল জীবিত ছিলেন।'

জাবিরের পিতা ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক। সেই সূত্রে চিকিৎসা বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিলো। এমনকি পিতার মতো চিকিৎসা ব্যবসা দিয়ে তিনি কার্যক্রম শুরু করেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি যে বহুমুখী বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিকিৎসা, ইউক্লিড ও আল মাজেষ্টের ভাষ্য, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও কবিতা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এছাড়া সুফীবাদ, Appollonius এর আধ্যাত্মিকবাদ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। গ্রীক ভাষা জানতেন এবং গ্রীক ভাষাতেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের লেখার সাথে পরিচিত হন।

ইবনে নাদীমের মতে জাবির বিন হাইয়ান দু'হাজারের বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। অতিশয়োক্তি মনে হলেও এতে আশ্চার্যের কিছু নেই। তাঁর প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর অনেকগুলোর গড় পৃষ্ঠা ৮/১০ এর মতো এমনকি অনেকগুলোর পৃষ্ঠা মাত্র ২টি। জাবিরের গ্রন্থসমূহের বিষয় ও সংখ্যা মোটামুটি নিম্নরূপ :

রসায়ন বিষয়ে রচনা-	২৬৭টি
কিতাবুত্ তাকদীর ধরনের গ্রন্থ-	৩০০টি
দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ-	৩০০টি
যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-	৩০০টি
চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ	৫০০টি
দার্শনিক যুক্তিখণ্ডন বিষয়ক-	৫০০টি
জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও অন্যান্য	৫টি

রসায়ন বিষয়ক রচনা জাবির বিন হাইয়ানকে চির অমর করে রেখেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম রচনা হলো 'কিতাবুর রহমত; 'কিতাবুত তাজমী' এবং 'জিবাক উশ্-শরকী। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর কিছু রসায়ন গ্রন্থের নাম হলো :

১. উস তুকিসিল উসিল আউয়াল ইলাল বারামেক (The First Book of Foundation to Barmaecides) ১৮৯৯ সালে ভারতে লিথো ছাপা হয়।

২. তাফসিরুল উস্তুকিস্ (An Explanation of Istuqus)

৩. সুন্দুকুল হিকমা (The casket of Wisdom) কায়রোর রাজকীয় লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

৪. কিতাব ইখরাজ মা ফিল কাওয়াতে ইলা আল ফিল (The book of extraction from Potentiality to Actuality), ঐ

৫. কিতাবুল হুদুদ (The book of definitons), ঐ

৬. কাশফুল আসরার ওয়া হাক্কুল আসতার (The unveiling of Secrits and the Reasling of veils) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বর্তমান।

৭. রিসালা ফিল কিমিয়া (Letter on Chemistry) কায়রো, ঐ

৮. খাওয়াসুল ইক্সিরুজ জাহাব (The progerties of Elinir of gold) প্যারিস Bisi, Nat, Argbe- এ পাণ্ডুলিপি বর্তমান।

৯. কিতাবুল মুকাবিলা ওয়াল মুমাসিলা (The book of Comparison and Similituoles) বার্লিন মিউজিয়ামে পাণ্ডুলিপি বর্তমান।

১০. কিতাবুর রহমত (The book of Mercy) লিডেনে রক্ষিত আছে।

১১. কিতাবু রহমাস্ সগীর (The little book of Mercy) প্যারিস।

১২. কিতাবুত্ তাজমী (The book of concentration), লিডেন।

১৩. কিতাবুত্ তাজরীদ (The book of Abstraction), ভারত।

১৪. কিতাবুস সহল (The book of Ease), ব্রিটিশ মিউঃ।

১৫. কিতাবুস্ সাফী (The book of purity), ঐ

১৬. কিতাবুল ইহরাক (The book of combustion)

১৭. কিতাবুত্ তাকলীস (The book of Calcination)

১৮. কিতাবুল আবদাল (The book of Exchanges)

১৯. কিতাবুল উসুল (The book of Roots i. e fundamental principles) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত।

২০. কিতাবুর রাহা, (The book of Repose)

২১. কিতাবু সিরর আল মাকতুম (The book of the Hedden Secret)

২২. কিতাবুজ জাহাব (The book of Gold)

২৩. কিতাবুল ফুদ্দা (The book of Silver)

২৪. কিতাবুল্ নুহাস (The book of Copper)

২৫. কিতাবুল্ হাদীদ (The book of Iron)

২৫. কিতাবুল উসরুর (The book of Lead)

২৭. কিতাবুল কালী (The book of Tin)

২৮. কিতাবুল খারসিনি (The Book of Tutenag)

২৯. কিতাবুল ইজাজ (The book of Abbreviation)

৩০. কিতাবুল নার ওয়াল হাজার (The book of Fire and Stone)

৩১. কিতাবুত্ তানকীয়া (The book of Cleanning)

৩২. কিতাবুত্ তানজীল (The book of Reduction per descensum)

৩৩. কিতাবুস সুমুম (The book of Poisons)

৩৪. তাদবীরুল হুকামাল কুদামা (The book of Operation of the Ancient Sages)

৩৫. কিতাবুর রিয়াদ (Book of Garden)

এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্নতায় এ তালিকা আরো প্রবৃদ্ধ হয়েছে।

জাবিরের রাসায়নিক মতবাদ ও কার্যাবলী ঃ

রসায়ন শাস্ত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে জাবির 'কিতাব ইলমেস সানতিল ইয়াহিয়া ওয়াল হিকমাতিল ফালাসিফা' (The book of knowledge of the Dlvine art and Philosophical wisdom) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ রসায়ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। এতে দ্রবণীয় বস্তু বা ধাতুসমূহের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয় এবং খনিতে কিভাবে আগুনের সাহায্যে ধাতু উৎপন্ন হয় সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালানো হয়। কেননা কৃত্রিম উপায়ে এ সমস্ত তৈরী করতে মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তারা জানেন যে রসায়ন বিজ্ঞান প্রকৃতিরই অনুকরণ এবং সেই অনুসারেই গড়ে উঠে।

জাবিরের মতে, রসায়ন সাধনায় ১০টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে সাফল্যের আশা করা যায়। তা হলো ঃ

১। সাধকের জানা উচিত কেন তিনি এই প্রক্রিয়া অনুসারে কাজ করছেন।

২। এ বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রায়োগিক ভাষা জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়।

৩। যা অসম্ভব ও নিরর্থক তা নিয়ে কোন চেষ্টা না করা।

৪। কাজের সময় ও ঋতু সাবধানের সাথে ঠিক করা।

৫। ল্যাবরেটরী নির্জন স্থানে হওয়া উচিত।

৬। রসায়নবিদের বন্ধু-বান্ধব যেন বিশ্বস্ত হয়।

৭। পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার মত নির্মল অবসর থাকা দরকার।

৮। ধীর স্থির ও বাক সংযত হতে হবে।

৯। তাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং

১০। তিনি কার্যকলাপের শুরুতেই উদ্ভূত বাহ্যিক পরিবর্তন ও আকার প্রকার দেখেই কাজ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না।

রাসায়নিক বস্তুসমূহকে জাবির জীবিত ও মৃত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক রাসায়নিক বস্তুই অন্য জীবজন্তুর মত দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এর একটি হলো দৈহিক অংশ অন্যটি আধ্যাত্মিক। রসায়নবিদের কাজ হলো দেহ ও আত্মার সঠিকভাবে বিভাগ করে, যে দেহ যেমন আত্মার খাপ খায় তাকে তাই দিয়ে সাজিয়ে দেয়া। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে গন্ধক ও পারদ থিওরীর কথা উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল ইজাহতে তিনি বলেছেন ঃ ধাতুসমূহ আসলে পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণ। এ উভয়ের পার্থক্য কেবল আভ্যন্তরীণ গুণের। এই আভ্যন্তরীণ গুণের পার্থক্যও প্রধানত গন্ধকের জন্যেই। আবার গন্ধকের এ পার্থক্যও হয় স্থানের এবং সূর্যের তাপের জন্য। অনেক জাতের গন্ধকের মধ্যে সোনালী রংয়ের গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। এটি পারদের সঙ্গে যুক্ত হলে সোনা তৈরী হয়। সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর পার্থক্য হল যে সোনা আগুনে পোড়ানো যায় না, এটি ঠিকই থাকে।

বিভিন্ন গ্রন্থে গন্ধক ও পারদ সম্পর্কে জাবির যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর এই থিওরীরই শেষ পরিণতি Phlogiston theory. যদিও এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব সামান্য কিন্তু এ ব্যবধান অতিক্রম করতেই বিজ্ঞান জগতের লেগে যায় ৮০০ বছর।

রাসায়নে ব্যবহৃত জিনিসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে তিনি 'উসতুকা সিল আস' (Book of Foundation to Barmaccides) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ যারা পাথর ব্যবহার করার পক্ষপাতী তাদের মতে রসায়নের জ্ঞান পাথরের মধ্যে নিহিত, জান্তব বা উদ্ভিদ জাতীয় জিনিসের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ব্যবহারের মধ্যে নয়।

তারা বলেন রসায়নবিদরা পাথরের বর্ণনা দেয়ার সময় ধাতব পদার্থের দিকেই লক্ষ্য করেছেন অন্যকিছু তাদের লক্ষ্য নয়। এ ধাতব পদার্থগুলি হলো - গন্ধক, জারনিখ, পারদ এবং আজসাদ (বস্তুসমূহ)। এগুলিকে রূহ, জিসম, নফস এবং জসদ-এ চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যে সমস্ত জিনিস আগুনের তাপে উবে যায় সেগুলো হলো আরওয়াহ। এ দুই রকমের এবং সংখ্যায় ৬টি গন্ধক, জারনিখ, নিশাদল, কর্পুর, তৈল এবং পারদ। এগুলোর মধ্যে ৩টি আগুনে পোড়ে এবং যে সমস্ত জিনিস তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরও পোড়ায়। এ তিনটি জিনিস হলো গন্ধক, জারিখ বা আর্সেনিক সালফাইড এবং তৈল। অন্য তিনটি আগুনের তাপে উবে যায়। এগুলো নিজেরাও আগুনে পোড়ে না অন্যকেও পোড়ায় না। এগুলো হল ঃ নিশাদল তথা সাল এমোনিয়াক, পারদ এবং কর্পুর।

জাবিরের রাসায়নিক কার্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার এম, আকবর আলী লিখেন ঃ রসায়ন শাস্ত্রকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে কাজে লাগিয়ে নিতে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়, জাবির তার প্রায় সবগুলির সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। পূর্বেকার প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলিকে সংস্কার ও পরিমার্জিত করে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াগুলোকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলিত করে তোলেন। পাতন (Distillation) উর্ধপাতন (Sublimation) পরিস্রাবন (Filtration), দ্রবণ (Solution), কেলাসন (Crystallisation), ভস্মীকরণ (Calcination), গলান (Melting), বাষ্পীকরণ (Evaporation), প্রভৃতি রসায়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলিকে তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে অনুশীলন করে বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে কি কি পরিবর্তন হয় এবং কেমন করে সেগুলোতে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকটি রাসায়নিক কাজে তিনি যেভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন সেভাবেই যে তিনি সেগুলোকে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাঁর গ্রন্থ থেকেই সে কথা ভালভাবেই বুঝা যায়।

রসায়নের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানের রীতির দিক দিয়ে তাতে তেমন ত্রুটি ছিলোনা। সীসাম্ম থেকে সীসা তৈরী করা, সীসা-শ্বেত (White lead) প্রস্তুতকরণ, পারদকে লাল কঠিন পদার্থে পরিণত করা প্রভৃতি প্রক্রিয়া থেকে এটি চিহ্নিত করা যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জাবিরের অগ্রসর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। Liber Secretorum Calids Filil Iadichi নামক ল্যাটিন অনুবাদে তাঁর ছয়টি রাসায়নিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে -

১। বস্তুর রূহ ও নফস থেকে ক্লেদ বের করে তাড়িয়ে দেয়া।

২। এই শুদ্ধিকৃত দেহকে তরল করা।

৩। দেহকে তাশমি প্রথায় শুদ্ধ করা।

৪। দেহকে সাদা করা বা তাড়াতাড়ি গলান।

৫। তাহলিল করা।

৬। আক্‌দ করা বা দেহকে রুহের সাথে মিলিয়ে দেয়া।

জাবিরের অনেক গ্রন্থ্ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদের কারণে তিনি ইউরোপে Geber নামে পরিচিত।

জাবিরের পর রসায়ন বিজ্ঞানে যাঁর নাম উজ্জ্বল, তিনি প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাকারিয়া আর রাজী। এ উভয়ের মধ্যবর্তী কয়েকজন সাধক আল কেমী তথা রাসায়নিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন যদিও এ সম্পর্কে তাদের কার্যকলাপের তেমন খোঁজ নেই। সূফীবাদের আদি প্রবক্তা জুন্‌নুন মিশরী (মৃত্যু ৮৬০ খৃঃ) এর নাম রসায়নবিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইবনুল কিফতি। তিনি তাঁকে জাবিরের সমপর্যায়ের রসায়নবিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর রসায়ন চর্চা আধ্যাত্মিক রসায়নে সীমাবদ্ধ ছিলো। খুব সম্ভব সত্যিকার রসায়ন বলতে কিছুই ছিলনা। তাঁর দুটি গ্রন্থ্ বিখ্যাত যথা ঃ মাফাতিহুল উলুম এবং মুজাররাত।

সমসাময়িক আল জাহিয (মৃ. ৮৬৭/৬৮ খৃ) রসায়ন চর্চা করেছিলেন। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জীবজন্তু সম্বন্ধীয় 'কিতাবুল হাইওয়ান' গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন-যা পরবর্তীকালে (Evolution, Adaptation, Animal Psychology) প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা থিওরী উদ্ভাবনে সহায়তা করে। আল জাহিয জীবজন্তুর অপ্রয়োজনীয় অংশ শুষ্ক পাতন করে এমোনিয়া তৈরী করতে পারতেন। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য রাসায়নিক কার্যাবলী সম্পর্কে বিশেষ জানা যায়না।

রসায়ন চর্চার ক্ষেত্রে জুন্‌নুন মিশরীও আল জাহিযকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন আলী ইবনে ওয়াহাশিয়া আল কালদানী (মৃত্যু দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) তিনি 'কিতাবুল ফালাহ আন্ নাবাতিয়া' (Nabatean Agricalture) নামে একটি গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন।

উক্ত তিনজনের চেয়ে রসায়ন চর্চায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবুল মনসুর মোয়াফ্‌ফাক। সামানীয় নৃপতি মনসুর ইবনে নূহের রাজত্বকালে (৯৬১-৯৭৬) হীরাতে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কার্যাবলী অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট

Pharmacology বিষয়ক। ফার্সীতে প্রথম Meteria Medica প্রণয়নের চিন্তা করেন এবং ৯৬৮-৯৭৭ খৃঃ সময়কালে 'কিতাবুল আবনিয়া হাকায়েক আল আদবিয়া' গ্রন্থ লিখেন। এ গ্রন্থ থেকেই তাঁর রসায়ন জ্ঞানের কথা সম্যক জানা যায়। এতে তিনি নাতরুন (sodiamCanbonate) ও কালি (potassuim Carbonate) এর মধ্যেকার পার্থক্য ভালভাবে তুলে ধরেন। এ ছাড়া Arsxnious oeid, Cupric oxide, Silicic acid Antimon প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত প্রথম ফার্সীতে রচিত গদ্য গ্রন্থ, গ্রন্থটির প্রাচীন একটি পাণ্ডুলিপি ভিয়েনাতে পাওয়া গেছে।

জাকারিয়া আর রাজী ঃ

(জন্ম ৮৬৩ খৃ.) চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে সমধিক খ্যাতিমান হলেও রসায়নে তাঁর দান স্মরণীয় হয়ে আছে। আল্ জাবিরের পর তিনিই প্রকৃত রসায়নবিদ। রাজীর জীবন কাহিনী তেমন জানা যায়না, তবে তিনি কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী এলবুরুজ পাহাড়ের দক্ষিণ দিককার রাই নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনের ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাগদাদে গমন করেন এবং বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনার তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিতাবুল মাদখাল, কিতাবুল আসবার গ্রন্থ দ্বয়ে তিনি রাসায়নিক বস্তুগুলোর সম্বন্ধে দৃষ্ঠ ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে 'Chemestry in Iraq and Persia in the 10th Century' গ্রন্থে বলা হয়েছে : We believe we may safely claim that henceforward Ar- Rasi must be accepted as one of the most remarkable seekers after knowledge that the world has ever seen not only `unique in his age and unequalled in his time' but without apeer until modern science began to down in Europe with Galileo and Robert Boyle. The evidence of his passion for objective truth that is furnished by almodt every page of the kitab al Asrar and Nadkhl at Talimi '

আল বিরুনী রাজীর ১২টি রসায়ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন.

১। মুদখালুত তালিমী (Book on Instructive or Practical Introduction)

২। মুদখালুল বুরহানী (Book on the Demonstrative, theoretical Introduction)

৩। কিতাবুল ইসবাত সানাহ্ ওয়ার রদ্দে আল মুনকিরিহ্ (Book of confirmation of the Art Refutation of those who deny it)

৪। কিতাবুল হাজার (Book of the Stone)

৫। কিতাবুদ্ তাদবীর (Book of the Operation)

৬। কিতাবুল আকসির (Book of the Elixir)

৭। কিতাবু শারাফ আস্ সানাহ (Book of the Nobility of the Art)

৮। কিতাবুল তারতীব (Book of the Method)

৯। কিতাবুত্ তাদাবীর (Book of the Operations)

১০। কিতাবুল মিহান (Book of the Testing)

১১। কিতাবুশ শাওয়াহিদ (Book of the Evidences)

১২। কিতাবু সিরুল হুকামা ওয়া হিয়ালিহিম (Book of the Secret of the Sages and their Devices)

'কিতাবুল আসরার' নামে যে গ্রন্থের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বস্তুসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রথম পরিচ্ছেদে ভাল ও মন্দ নিয়ে এবং শেষ পরিচ্ছেদে সেই সব বস্তু দিয়ে যা তৈরী করা যায় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত এর প্রথম অংশে যন্ত্রপাতির আকার এবং দ্বিতীয় অংশে সেগুলির ব্যবহার বিধির বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এই অধ্যায় ৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে রুহীয় বস্তুগুলোর পরিষ্কারকরণ ও বিশুদ্ধিকরণ সম্পর্কে আলোচনা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেহ, লবণ ও পাথর ভস্মীকরণ সম্পর্কে, তৃতীয় অংশে দেহ, রূহীয় ও অন্যান্য বস্তুর তাশমী সম্পর্কে, চতুর্থ অংশে রূহীয় বস্তুর তাহলীল ও তাদের পরবর্তী মিশ্রণের সম্বন্ধে, পঞ্চম অংশে নানা প্রকার আকদ সম্পর্কে, ষষ্ঠ অংশে পানি লাল করার এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিয়ে কার্যকলাপ সম্পর্কে এবং শেষ অংশে জান্তব বিষয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজীর 'কিতাবুল শাওয়াহীদ' গ্রন্থের স্থান রসায়ন বিজ্ঞানে কত উঁচুতে তার

কিছুটা আভাস পাওয়া যায় Dr. Stapleton -প্রমুখ এর মন্তব্যে : The value of the shawahid for the study of the origins of chemistry can hardly be over estimated. It may be summed up by the same phrase as has been applied by ledere to the Hawi, a similar compilation made by Ar Ragi for the Science of Medicine. Both are rightly defined as `precius mosaics'

রাজী যবক্ষার এসিড পুনরাবিষ্কার করেন। পরবর্তী সালে ইউরোপীয় সুধী সমাজে রসায়ন শাস্ত্রের সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতরূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

হাজী খলীফা 'কাশফুজ জুনুন' গ্রন্থে ইবনে উমায়েল নামক সমসাময়িক একজন রসায়নবিদের নাম উল্লেখ করেছেন। তার পূর্ণ নাম মোহাম্মাদ ইবনে উমায়েল আল হাকিম আত্ তামিমী। জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না; গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে তিনি ৯১২ খৃ. ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিকরা ৯০০-৬০ এর মধ্যে তাঁর জীবনকাল চিহ্নিত করেছেন। ১৯০৩ সালে লক্ষ্মৌতে প্রাপ্ত তাঁর একটি আরবী পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে তার রাসায়নিক চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে।

১। কিতাবুল মা' আল্ ওয়ারকী ওয়াল আরদ আন্ নাজমীয়াহ (Book of the silvery water and sturry earth) গদ্যে রচিত

২। রিসালত আল্ শামস ইলাল হিলাল (Epistle of the Sun to the crescent Moon) পদ্যে রচিত

৩। আল কাসিদাতুল নুনিয়া (Poem rhymuing in Nun) পদ্য

৪। ইমতিয়াজুল আর ওয়াহ (Combination of the Spirit)

৫। খাওয়াসুল বাররে ওয়াল বাহর (Properties of land and sea)

৬। কাশ্‌ফে আসসিরুল মাসুদ ওয়াল ইলমুল মাকনুন (Explanation of the protected secret and hidden knowledge)

৭। কিতাবুল মিসবাহ (Book of the Lamp)

৮। মিফতাহিল হিকমাতিল উজমা (Book of the Key or keys of greuter wisdom)

এ সময়কার রসায়ন চর্চা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় আবু আবদুল্লাহ বিরচিত 'মাফাতিহুল উলুম' বিশ্বকোষে। সম্ভবত ৯৭৬ খৃ. প্রণীত এই গ্রন্থটি পৃথিবীর

সর্বপ্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ১৪ টি বিষয় এবং সে সম্পর্কে তৎকালীন পরিস্থিতির পরিচয় দেয়া হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডের নবম ভাগে আল কিমিয়া তথা রসায়ন নিয়ে তিন অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রসায়ন ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, দ্বিতীয় ভাগে রাসায়নিক পদার্থ, ধাতু ও পাথর থেকে প্রস্তুত ঔষধাদি এবং শেষ পরিচ্ছেদে ঐ সকল জিনিসের ব্যবহার বিধি ও কার্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে আবদুল মালেক আল কাছি

একটি মাত্র গ্রন্থ লিখে রসায়ন বিজ্ঞানে নিজের নাম যুক্ত করে নিয়েছেন একাদশ শতাব্দীর আবুল হাকিম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক আল খারেজমী আল কাছি। তিনি বাগদাদে থাকতেন এবং ১০৩৪ খৃ. তাঁর পৃষ্ঠপোষক আবুল হাসান ইবনে আবদুল্লাহর জন্য 'আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ' 'Essence of the Art and Aid of worker' নামে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এর একটি অসমাপ্ত আরবী পাণ্ডুলিপি রামপুরের নওয়ার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালে ডঃ ষ্টেপলটন এ পাণ্ডুলিপিটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি হায়দ্রাবাদের নিজামিয়া লাইব্রেরীতে ফার্সীতে রচিত উক্ত গ্রন্থের একটি অনুবাদও পান।

রসায়নে 'আইনুস সানাহ' গ্রন্থটি খুবই মুল্যবান সংযোজন। বড় ধরনের আলোচনা এখানে সম্ভব নয় শুধুমাত্র এর আলোচিত অধ্যায়গুলির উল্লেখ করা হচ্ছে; গ্রন্থটি ৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রথম পরিচ্ছেদে আছে বস্তুসমূহের নাম, তাদের শ্রেণী ও রূহ নফস নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাদের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে কি পরিমাণ ও অনুপাতে জিনিস এতে ব্যবহার করতে হবে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে যেসকল বস্তু 'সাদা' এবং যে সকল জিনিস 'লাল' এর উপযোগী তাদের মধ্যকার পার্থক্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদে এতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতির দরকার তার বর্ণনা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কোন জিনিস অপ্রাপ্তব্য হলে তার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস ব্যবহার করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে যারা রসায়ন চর্চা করে লাভবান হতে চান তাদের উৎসাহ দেবার জন্য দুইটি প্রধান কার্যপন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা এতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম জগতের অনন্য সাধারণ বৈজ্ঞানিক, অনেকগুলো বিষয়ে যিনি মৌলিক আলোচনা করেছেন ইবনে সীনাও রসায়ন নিয়ে আলোকপাত করেছেন। রসায়নকে

প্রণালীবদ্ধ করায় তাঁর সহযোগিতা স্মরণীয়। রামপুর লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাসায়নিক সংগ্রহ গ্রন্থে ইবনে সীনার গ্রন্থ বলে একটি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ১২টি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১। এ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি তৈরীর প্রক্রিয়া (Sodium Hydrate এর সলিউশন)

২। জাদ্ আর রাগওয়াহ্ তৈরী প্রক্রিয়া (Calcium Polysulphide এর সলিউশন)

৩। লাল এর জন্য পারদ ঘনীভূত (Coagulate করার প্রক্রিয়া)।

৪। লাল তৈরী করতে যে ঘনীভূত পারদ ব্যবহৃত হয় তারই তাখনিক চলানোর পন্থা।

৫। সোনা বা তামার ভস্মীকরণ (Calcination)

৬। ভিট্ৰিওল ও অন্যান্য লবণ দ্রবণ।

৭। গন্ধক থেকে আরক বের করা।

৮। দ্রবণ পদ্ধতি।

৯। আরক এর দক্ষতা সহকারে ব্যবহার।

১০। গাদের ব্যবহার বা শাসা গন্ধক তৈরী করার প্রক্রিয়া।

১১। ঘনীভূত করার (Coagulation) পদ্ধতি এবং

১২। কাজ কি ভাবে সম্পন্ন হয় তার বর্ণনা --

দ্বাদশ শতাব্দীর কবি ও বিজ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে আবদুস সামাদ আল ইস্পাহানী (জ. ১০৬১ খৃ.) 'আত্ তুগরাই' নামে প্রসিদ্ধ। সেলজুক আমলে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। রসায়ন বিষয়ে তাঁর নাম আলোচিত হয়নি বললেই চলে। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ

১। জাওহারিন নাদের ফি সানয়াতেল আকসির-(Book of the brilliant slone for the preparation of elixir.)

২। জামেউল আসরার ওয়া তারাকিবুল আনওয়ার-(Collection of the secrets and composition of light)

৩। মাফতিহুর রাহাম ওয়া মাসাবিহুল হিকমাহ্-(Keys of Mercy and lamps of wisdom.)

৪। হাকায়েকুল ইশতিহাদ ফিল কিমিয়া-(Truths of the evidence submitted with regard to alchemy.)

৫। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রসায়ন আলোচকদের মধ্যে আল জাওবেরী আল দামেস্কী, আবদুল লতিফ দামেস্কী (১১৬২-১২৩৭ খৃ.) উমার বিন আদিম হালাফী আল হানাফী (১১৯২-১২৬২খৃ.) আল হাসান আর রাহমাহ (মৃত্যু ১২৯৪/৯৫খৃ.) ইবনে কায়মুনা মিশরী (মৃত্যু ১২৭৭/৭৮ খৃ.) আবুল কাসেম আল ইরাকীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নবম-দশম শতাব্দীতে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সোনালী ফসল ফলেছিল একাদশ শতাব্দীর পরে তাতে ঢিলেতাল শুরু হয়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তা আরো প্রলম্বিত হয়। অধিকাংশ লেখকই পূর্ববর্তী লেখক বিজ্ঞানীদের অনুসরণ অনুকরণ করেছেন। রসায়নের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মাঝে মাঝে যে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এসময়ে মৌলিকতা নিয়ে আবির্ভূত হননি তা নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রসায়নে আবুল কাসেম আল ইরাকী তেমনই এক বিজ্ঞানী।

ধাতুর পরিবর্তন হয়না ইবনে সীনার এই মতবাদের বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করেন আত্ তুগরাই প্রমুখ। একসময় এর পক্ষে-বিপক্ষে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। আবুল কাসেম এই তিক্ততার অবসান করার চেষ্টা করেন এবং ধাতুর যে পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়ে দেখিয়ে দেন। তিনি শীশার সাথে রৌপ্যের মিশ্রণে যে Argentenous Lead তৈরী হয় সেটাকে শীশার আংশিক পরিবর্তন বলে ঘোষণা করেন, এর পক্ষে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক কারণও প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালের Phlogiston theory Benzene এর Centre formula-র মত তাঁর এ মতবাদও তখন অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়।

আবুল কাসেমের ৯টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ইলমুল্ মুকতাসাব ফি যারায়েতিজ জাহাব' (Knowledge acquired concerning the cultivation of gold)। এতে রসায়নের প্রত্যক্ষ মতবাদ (Radical alchemical doctrin) স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনে সীনার মতবাদের ঠিক বিপরীত তাঁর বর্ণিত এই মতবাদ। আলী ইবনে আইদাসুর জিলদাকী এ গ্রন্থের এক বৃহৎ ভাষ্য প্রণয়ন করেন 'নিহায়তে আত্ তালাব' (End of research) নামে। Holmyard এই গ্রন্থ সম্পাদনা করে ইংরেজী অনুবাদ করেন। আবুল কাসেমের অন্যান্য গ্রন্থাদি হলো -

১. যুবদাতু তালাব ফি যরয়েজ জাহাব (Cream of the search upon the sowing of gold)

২. আরফুল আবীর ফি ইলমিল ইসকির (Perfume of saffron upon the knowledge of the elixir)

৩. দুর্‌রিল মাখতুম বিস্ সুয়ার (Pearls sealed with figures)

৪. আকালিম আস্ সাব্‌য়ে ফিল ইলমিল মওসুম বিস্ সানয়াতে (The seven climes on the science called art of alchemy) কায়রোর সুলতানিয়া লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এর কপি রক্ষিত আছে।

৫. উয়ুনুল হাকায়েক (Sources of the truths and explanation on the ways) ১২৬০-৭৭ খৃ. মধ্যে গ্রন্থটি রচিত।

৬. কিতাব কানজিল আফখার ওয়া সিররিল আজম ফি তাসরীফিল হাজারিল মুকাররম (The most glorious treasure and greatest secret concerning the transmutation of the noble stones)

৭. কিতাবুন্ নাজাত ওয়াল ইত্তিসাল ফি আয়নিল হায়াত (Salvation and conjunction with the source of life)

চতুর্দশ শতক কার্যত মুসলিম বিজ্ঞানের পতনের যুগ। এর পূর্বেই ইউরোপীয়রা আরবী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ তাদের ভাষায় অনুবাদ শুরু করেন এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় এ সময়ই । তাই এ সময়ে যে সকল মুসলিম বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয় তাঁরা তেমন পৃথিবীর মনযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি। বিজ্ঞানের মশাল বর্তিকা মুসলমানদের হাত হতে খৃষ্টানরা গ্রহণ করে, যার ফলশ্রুতি আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়গান।

সে যাই হোক, চতুর্দশ শতকে আল জিলদাকী মিশরে তাঁর রাসায়নিক কার্যকলাপ চালান। তিনি ১৩৪২/৪৩ খৃ. অন্যমতে ১৩৬০/৬১ খৃ. কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। সারটন তাঁর ১৫টি রসায়ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। বিশ শতকে এসে এগুলো নিয়ে সীমিত আলোচনা তাই রসায়নে তাঁর স্থানও নির্ণীত হয়নি আর তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা যায়না। জিলদাকীর কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ

১. বদরুল মুনীর (The brilliant moon on the secrets of elixir)

২. বাগিয়াতুল খবীর (The wish of the expert)

৩. দুররুল মাকনুল (Hidden pearls)

৪. মিসবাহ ফি আসরাবে ইলমিল মিফতাহ (The lamp of the secrets of alchemy)

রসায়নের Practical ব্যবহারে যাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আলী আল কাশানী। তিনি প্রথম মৃৎপাত্র গ্লোজ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ বিষয়ে ১৩০০ খৃ. তিনি ফার্সী ভাষায় অদ্বিতীয় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃৎপাত্র মিনা করা সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'জাওয়াহিরিন আরাইস' গ্রন্থেও আলোচনা করেছেন।

আরব রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

রসায়নকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মর্যাদায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন জাবির বিন হাইয়ান। কল্পকথার ঝুড়ি থেকে হাতে কলমে কাজ করার অভ্যাস তাঁর হাতেই গড়ে উঠে। এভাবে কাজ করতে গিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁদের ব্যবহৃত রাসায়নিক কতগুলো পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা গেল ঃ

তাকতির ঃ কারা (Cucurbit) এবং আমবিক (alembic) ব্যবহার করে বিন্দু বিন্দু পতিত নির্যাসকে একটি গ্রাহকের (receiver) মধ্যে ধরা। এটিকে বর্তমানের distillation প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। পাতন প্রথা হিসাবে এটি ব্যবহৃত হতো সাধারণত। তাকতির প্রধানত ঃ distillation হলেও filtration ও decantation হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসতিনজাল ঃ পাত্রের উপরে অন্য একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্র (descensory) ব্যবহার করে জিনিসগুলো শোধন করা। ইসতিনজাল অর্থ নামানো। অর্থাৎ যে জিনিসটিকে শোধন করতে হবে সেটিকে তলায় ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে রেখে গরম করলে জিনিসটি গলে ছিদ্র দিয়ে নিচের পাত্রে জমা হয়। ময়লা ও অপরিষ্কার গাদ ইত্যাদি উপরের পাত্রে ধরা থাকে।

তাজসীদ ঃ এ শব্দের অর্থ যে বস্তু নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধকরণ দেহ বসিয়ে দেয়া। প্রক্রিয়া হিসাবে তা অনেকটা ইসতিনজাল'এর মতো। ধাতু ও তৎকালীন প্রস্তর নামে অভিহিত ৬টি ধাতব পদার্থের উপর সাধারণত এই প্রথা ব্যবহৃত হতো।

তাশবীয়াহ ঃ এর ইংরেজী অনুবাদ assation ও roasting. এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বস্তুটি প্রথমে একটি শীলের উপর রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া হতো, তারপর ভিজা বস্তু চারিদিকে লেপা একটি বোতল বা বাটিতে রাখা হতো। অন্য একটি পাত্র আগে থেকেই চুলার উপর রাখা পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

যখন আগুনের তাপে অতিরিক্ত পানি উঠে গিয়েছে মনে করা হতো তখন বোতলের মুখ বন্ধ করে অবিরত তাপ দেয়া হতো যতক্ষণ না প্রক্রিয়াটি শেষ হয়। এ পদ্ধতি বর্তমানের air bath এর অনুরূপ।

তালগীম (amalgamation) ঃ ধাতুর সাথে পারদের সংমিশ্রণ প্রথা হলো এই 'তালগীম'। এ শব্দ থেকেই ইংরেজী amalgam শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত উর্ধপাতন (sublimation) ও ভস্মীকরণের (calcination) পূর্ব অবস্থা হিসাবে এ প্রথা ব্যবহৃত হতো। যে ধাতুকে এ প্রক্রিয়ায় আনা হবে তাকে প্রথমে পারদের সাথে মিশিয়ে নিয়ে alloy প্রস্তুত করে নেয়া হতো। এই 'এলয়' বানানোর প্রথাকেই 'তালগীম' তথা বন্দীকরণ নাম দেয়া হয়।

গোসল (lavation বা washing) ঃ এটি উর্ধপাতনের পূর্ব প্রথা। ধাতুকে লবণ মিশিয়ে গরম করে, সে অবস্থায় ফিল্টারের উপর পানি দিয়ে ধোয়া হতো। এর পরেই বস্তুটি উর্ধপাতন উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা হতো।

তাসইদ ঃ বর্তমান উর্ধপাতন (sublimation) প্রথা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে ব্যবহৃত হয় আরব রসায়নে 'তাসইদ' প্রথাও অনেকটা সেইরকম ব্যবহৃত হতো।

তাখ্‌নিক (constriction) বা 'তারখিম' (incubation) ঃ এটি 'তাসইদের' একটি সহজ প্রথা। এতে ফ্লাস্কের মধ্যে ধাতুটি রেখে আস্তে আস্তে তাপ দিতে হবে। তবে যদি বস্তুটির সারাংশ বের করতে হয় তবে তেলের সাথে মিশিয়ে নিয়ে ফ্লাস্কে রাখতে হবে। তাপ দিতে দিতে পানি বা তৈলাক্ত জিনিসটি যখন উবে যাবে তখন বোতলের মুখ বন্ধ করে বিশেষভাবে তাপ দিতে হবে যতক্ষণ না সমস্ত জিনিসটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফ্লাস্কের ডালার কাছে জমা হয়।

তাকলীস ঃ ভস্মীকরণ, বর্তমানে ইংরেজীতে যাকে বলা হয় calcination. এতে কাদা লেপা পাত্রটি প্রত্যক্ষভাবেই আগুনের তাপে দেয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না জিনিসটি গুড়ো গুড়ো হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে তাপ দেয়া চলতে থাকে। 'তাকলীসের' অন্যতম আরেকটি প্রথা হলো 'তাসদীয়াহ'।

তাসবিল ঃ ইংরেজীতে lixivation, এর উদ্দেশ্য হল জিনিসটাকে এমন সূক্ষ্ম দানাতে পরিণত করা যে সেগুলো পানির উপর ভাসতে থাকে। এ পদ্ধতিতে ভস্মীকরণ প্রথাও নিহিত আছে।

এছাড়া আরব বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি হিসেবে 'তাশমী' (ceration) 'তাহ্লীল (solution), 'তামজিয' (combination), 'আকদ' (coagulation বা Fixation) ইত্যাদি প্রথাও ব্যবহৃত হতো।

আরব রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ঃ

এই রসায়নবিদদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রগুলো সাধারণ জিনিস বানানোর জন্য ব্যবহৃত হতো, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্রপাতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতো।

১ম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ঃ

১. কুর (কামারের চুল্লী)

২. মিনফাক বা যিক্ (হাফর)

৩. বুতাকা (crucible)

৪. বুত বার বুত (পর পর স্থাপিত দুটি মুচি)

৫. মিগরাফা (বড় হাতা)

৬. মাশক (কামারের বড় চিমটি)

৭. মিকতা (কাঁচি)

৮. মুকাস্সির (হাতুড়ি)

৯. মিবরাদ (উখা)

১০. মিসবাক (লোহার ছাচঁ)

২য় শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ঃ

১.নিষ্কাশন নলসহ কার'আ (cucurbit) এবং আমবিক (alembic)

২. কাবিলা বা ধারক পাত্র

৩. কারআ ও আমবিকুল আ'মা (যাতে নিষ্কাশন নল নেই)

৪. উছাল (aludel) ৫. কাদাহ বা (পাত্র) ৬. কুজ (কাঁচের পাত্র)

৭. কারুরাহ (বোতল), ৮. বারনিয়াহ (ধাতু গরম করার মাটির পাত্র)

৯. মিরজল (কড়াই), ১০. নাফিখু (কয়লা ভর্তি ষ্টোভ) ১১. মিহরাস (খল), ১২. সালাইয়া (পাথরের চওড়া শীল), ১৩. কিমআ (কাঁচের ফানেল), ১৪. রাউওক (ফিল্টার), ১৫. কাফাস (ফিল্টে মোড়া বাক্স), ১৬. কিনদিল (ল্যাম্প) ইত্যাদি।

আরব রসায়নে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ঃ

আরব রসায়নে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি (আকাকির) তিন ভাগে বিভক্ত। ১. মৃত্তিকীয় বা খনিজ ২. জান্তব ও ৩. উদ্ভিজ।

মৃত্তিকীয় দ্রব্যাদি ঃ ৬ ভাগে বিভক্ত। শাখা পরিশাখাসহ সেগুলো হল ঃ

১. আত্মীক বা রুহীয় বস্তু ঃ সাধারণত পারদ, সাল এ মোনিয়াক, আর্সেনিক সালফাইড হরিতাল এবং গন্ধক এ ৪টি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. আজসাদ বা দৈহিক দ্রব্য ঃ দ্রবণীয় ধাতুগুলো এ শ্রেণীর, যেমন লোহা, সোনা, রূপা, টিন, শীশা, খারচিনি বা দস্তা।

৩. প্রস্তর জাতীয় দ্রব্য ঃ সাধারণত ১৩ টি বস্তুকে এ শ্রেণীতে ফেলা হয়। Pyrites, iron oxide, copper pyrites, green malachite, turquaise, haematite, arsenic oxide, lead sulphide, অভ্র ও এসবেষ্টস, Gypsum, কাঁচ বা Sodium carbonate, ম্যাগনিসিয়া, তুতিয়া এ জাতের দ্রব্য।

৪. তুতিয়া জাতীয় দ্রব্য ঃ এরা ৬ প্রকার, যথা ঃ যাজ, সুরী, ফিটকিরি, কালকান্দ, কালকাদিস, কলকাতার।

৫. সোহাগা জাতীয় বস্তু ঃ এরাও ৬ প্রকার, যথা ঃ রুটি জাতীয় সোহাগা, স্বর্ণকারের সোহাগা, তিনকার, জারাওযান্দি, বাবলা জাতীয় গাছের আঠা এবং নাতরুল বা Sodium sesqui carbornate

৬. লবণ জাতীয় বস্তু ঃ এ সকল দ্রব্য ১১ প্রকার, যথা ঃ মিষ্টি লবণ, তিক্ত লবণ, আন্দারানী (rock salt), মিশ্রির মত বড় দানা বিশিষ্ট বস্তু, নাফতা, ভারতীয় লবণ, ডিমের লবণ, সোডিয়াম কার্বনেট নামে পরিচিত দ্রব্য, প্রস্রাবের লবণ (Microcosmic salt) চুনের লবণ (Slacked lime), ওকের ছাইয়ের লবণ (Potassium carbonate)

জান্তব জাতীয় পদার্থ ঃ ১০ শ্রেণীর দ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত। যথা ঃ চুল, মাথার খুলি, মগজ, পিত্তরস, রক্ত, দুধ, প্রস্রাব, ডিম, ঝিনুকের ভিতরকার অংশ এবং শিং।

উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ ঃ আরব রসায়নবিদরা এ জাতীয় পদার্থ ব্যবহারে তেমন আগ্রহ দেখাননি, কেবল 'উশনান' নামক ঘাসের ছাই রসায়নে ব্যবহৃত হতো।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত যে সকল দ্রব্য আরবরা প্রস্তুত ও ব্যবহার করতেন তার মধ্যে রয়েছে, মারতাক (lead oxide), উসরুনজ (red lead), ইসফিদাজ

(tin oxide), যানজার (copper acetate) সাকতাহ (copper oxide), তুতিয়া (lead sulphide), জাফরান আল হাদীদ (iron acetate), দাউস (water of iron), যুনফুজার (cinnabar), শাক্ক (white arsenic), মানহাকুনিয়া (calcium silicate), আল কিলি (caustic soda), যাদুর রাগ ওয়া (calcium polysulphide), পারদ-এমোনিয়াম ক্লোরাইডের ক্বাথ (solution of mercury & ammonium cheoride) ইত্যাদি।

আরব রসায়ন এবং বর্তমান আধুনিক রসায়নের পার্থক্য অনেক। তবু সেকালের বিচারে মুসলমানদের এ সাধনা ছিল একটি বৈপ্লবিক ঘটনা, তাই সময়ের পরিধিতেই এই রসায়ন চর্চার ইতিহাস বিচার্য। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন ঃ বিজ্ঞান হিসেবে রসায়ন প্রশ্নাতীত ভাবেই মুসলমানদের আবিষ্কার। আবূ মূসা জাবির ইবনে হাইয়ান আধুনিক রসায়নের প্রকৃত জন্মদাতা। রসায়নে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে, কারণ তাঁর নাম প্রিস্টালী আর লাভোসিয়েরের যুগের ন্যায় রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ চিহ্নিত করে। তাঁর পরে আরো রসায়নবিদ জন্মেছেন যাঁদের মৌলিকতা আর পরিশ্রম, জ্ঞান গভীরতা আর পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্মতা ছাত্রদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম রসায়নের পূর্ণতার পর যখন ইউরোপীয় রেনেসাঁ জন্মলাভ করতে শুরু করে তখনও সেখানে রসায়ন বলতে যাদু বিদ্যাকেই বুঝাত। দশম-একাদশ শতকে জাবির-রাজী প্রমুখের রসায়নাগারে যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তার শত বছর পরও ইউরোপে চসার (chaucer) রসায়নের পুঁতিগন্ধময় কাণ্ড কারখানা থেকে বাঁচার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, দান্তে আল কেমীদের অষ্টম নরকে স্থান দিয়েছিলেন। এসব ঘটনা থেকে মুসলিম রসায়নবিদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের স্থান নির্ণয় করতে কারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়না।

মুসলিম পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা ঃ

'ভৌত বিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞান প্রধানতঃ সুসংবদ্ধ ঐসব বিষয় অনুসন্ধান করে যা জড় পদার্থে পরিলক্ষিত হয়'- পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার এই অভিমত। কিন্তু ইসলামে বিজ্ঞানসমূহে এ ধরনের কোন পার্থক্য করা হয়নি। এজন্য ইসলামে পদার্থ বিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। 'মুহাম্মদ : এনসাইক্লোপেডিয় অব সীরাহ' গ্রন্থে আফযালুর রহমান লিখেন ঃ "মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ইহাকে প্রাকৃতিক দর্শনের শিরোনামের আওতায় আলোচনা করেছেন। ইব্‌নে সীনা তাঁহার 'শিফা' (নিরাময়)

নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁহার 'ফান্না' (বৈজ্ঞানিক কৌশল) নামক গ্রন্থেও এই বিষয়ের বিশদ উল্লেখ রহিয়াছে। আল্ কিন্দি, নাসির আল-তুসী, আলী রিযা, আল বিরুনী, আল-বাগদাদী, মুল্লা সাদরা ও সাবজিওয়ারী প্রমুখ মুসলিম মনীষীও তাহাদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা রচনায় এ বিষয়ে লিখেছেন। আল্লাহর এই বিস্ময়কর জগৎ সম্পর্কিত বর্ণনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম-সূত্রাবলীর প্রতি যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করে, তাহার ফলে মুসলিম বিজ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ, এমনকি মরমী গুপ্ত জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু এই বিষয়ে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্থান, কাল, জড়বস্তু ও গতির মত বিষয়ে এইসব পণ্ডিত আগ্রহী হন ফলে, পদার্থ বিদ্যা ও খোদ প্রাকৃতিক দর্শনে প্রাকৃতিক শক্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠে।'

পদার্থ বিজ্ঞানের আওতায় কুরাআনে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি এবিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হচ্ছে- "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের কাঠামোসহ প্রদীপটি উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রসদৃশ্য; ইহা পূত-পবিত্র করা হয় যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি-উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানব জাতির জন্য উপমা সন্নিবেশ করিয়া থাকেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (২৪ ঃ ৩৫)

এ আয়াত প্রাকৃতিক দর্শন ও জড়বিশ্বের প্রেরণার উৎস। আয়াতের মরমী দর্শনের কথা বাদ দিলেও আয়াতটিতে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকারীর জন্য নানা পার্থিব বিষয় যেমন আলো, প্রদীপ, কাঁচ, উজ্জ্বল নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আছে। এ অনুপ্রেরণার ফলেই দেখা যায় পদার্থ বিজ্ঞানের আলোর শাখায় মুসলমানের বিরাট অবদান। আলোক বিজ্ঞান, বর্ণালী, প্রতিবিম্বন, প্রতিসরণসহ আলোর নানা বিষয়ের গবেষণায় তাঁরা নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্দি, হাইছাম ও নাইরেজী প্রমুখের আলোক বিজ্ঞান গবেষণা এ স্বীকৃতির পরিচয় বহন করে। আলোর গতি সম্পর্কীয় আয়াতে যে ধারণা দেয়া হয়েছে তাতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মনযোগ আকর্ষিত হয়েছে।

আল বিরুনী আলো ও গতি সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন ঃ

১. 'তাজরীদ আল্ শাআ'য়াত ওয়াল আনওয়ার আনিল ফাসায়েহে মুদাওয়ানাতে ফিল আসফার'- এতে তিনি আলো ও রশ্মির আলোচনায় পুঞ্জীভূত ভুলভ্রান্তি দূরীভূত করেন।

২. 'তাহ্শীলু আশ্ শাআ'য়াত বেআব'আদেত তর্কে আনিয়স্ সা'আত'- সময়ের জটিল পদ্ধতিতে আলো সম্পর্কীয় আলোচনা।

৩. 'তামহিদুল মুসতাকার্রে লিমানিল মামারবে'- এতে আলোর গতিপথ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানী ইবনুল হাইছাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মত। তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিজ্ঞানে তার নাম অত্যন্ত উচ্চকিত। ইস্তাম্বুলের অধ্যাপক ইসমাইল পাশা (মৃ. ১৯০২) তাঁর গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ১১টি গ্রন্থ পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে বিরচিত, এছাড়াও বিভিন্ন লাইব্রেরীতে তাঁর ১৩টি পদার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

ইবনুল হাইছাম পদার্থ বিজ্ঞান আলোচনায় যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াভিভূত করেছে। এ সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাবিত সমস্যাসমূহ ও সমাধান এই বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা horribly prolix বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান কালের নামজাদা বিজ্ঞানী J.F. Allen এর বক্তব্য 'Al-Hazen could be said to have a 20th Century mind in a 10th Century setting'.

পদার্থ বিজ্ঞানের সব শাখাতেই ইবনুল হাইছামের অবদান আছে, তবে 'আলো'-র বিষয়ে অবদানই তাঁকে বর্তমান বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় করে রেখেছে। আলোর প্রবাহ, আলোর সাথে বিভিন্ন রং এর সম্পর্ক, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং এই প্রতিফলন প্রতিসরণের জন্য নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম ও মরীচিকা সম্বন্ধে তিনি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 'মাকালাতু ফিজ্জুয়ে' গ্রন্থে তিনি আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে টলেমির ফরমূলাকে কেবল ক্ষুদ্র প্রতিসরণ কোণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বৃহৎ কোণের বেলায় এটা খাটেনা-এই বক্তব্য সপ্রমাণ করেন। ড. রাজী উদ্দীন সিদ্দিকীর মতে, তিনি আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কার করেন, যা বর্তমান Snell's Law নামে পরিচিত। গোলাকার স্বচ্ছ কাচঁখণ্ড বা গোলাকার পাত্রে রাখা পানির মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণ নিয়েও তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

ইবনুল হাইছামের মতে, একটি হালকা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী আরেকটা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করবার সময় আলোর যে প্রতিসরণ বা দিক পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের তারতম্যই তার কারণ।

তিনি নির্ভুলভাবে আন্দাজ করেছিলেন যে, ভারী মাধ্যমের চেয়ে হালকা মাধ্যমে আলোর বেগ দ্রুততর হয় এবং এর ভিত্তিতে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সময় আলোর রশ্মি কোন দিকে কিভাবে বেঁকে যায় তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। পরবর্তীকালে নিউটনও এ বিষয়ে সঠিক বর্ণনা করতে পারেননি। প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী Pierre de Femet ইবনুল হাইছামের উক্ত থিওরীর বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদান করেন তাঁর ন্যূনতম সময় (Principle of Lest Time) এর প্রস্তাবনায়।

এই আরব বিজ্ঞানী আলোর আপতন ও প্রতিসরণ পথ এবং দুই মাধ্যমের অন্তবর্তী সমতলের উপর অঙ্কিত সরল রেখা একই সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। এর ৫শত বছর পর লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Willebrod Snell(1591-1600) উক্ত দুই পথের কোণের মধ্যে যে একটি সম্পর্ক রয়েছে তা উদ্ভাবন করেন। ইবনুল হাইছাম তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় কত উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিলেন তা এ ঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

'রিসালাতু ফিশ্‌শফক' (Courses on Twilight) গ্রন্থে তিনি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা নির্ণয় করেন। মাকালাতে ফি কাওস ফাজহিন ওয়াল হালাত' (Memair on the Rainbow and the Halo) গ্রন্থে রামধনু, বস্তুর ছায়াপাত নিয়ে আলোকপাত করেন। মাকালাতু ফিল মারাইয়াল মুহরিকা বিল কুতুঅ' Memoir on conical burning mirrors) গ্রন্থে Dioptra প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনায়, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ ও তার নানা দোষ যেমন গোলাপেরণ (spherical aberration) বর্ণাপেরণ (Chromatic abberation) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এছাড়া মাকালাতু ফিল মারাইলাল মুহরিকা বিদ দাওয়ারের (Memoirs on Circular burning, Glasses), মাকালাতু ফিল জুয়েল কামার' (Memoiro on the light of the moon) গ্রন্থেসমূহে আলো দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। পদার্থ বিদ্যার আলোর শাখায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুল মানাজির' গ্রন্থে প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ। তাঁর

প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ বিজ্ঞানে নতুন পথ খুলে দেয়। এতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, চোখ থেকে আলোক রশ্মি কোন বস্তু উপর পড়লেই সে বস্তুটা দেখা যায়না বরং কোন বস্তু থেকে আলোর রশ্মি চোখে এসে পড়লেই তবে সে বস্তু আমরা দেখতে পাই। ইউক্লিড, এরিষ্টটল, টলেমী প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীর মতবাদের বিপরীতে এ বক্তব্য তৎকালীন পদার্থ বিদ্যায় এক বিরাট বিপ্লব সাধন করেছিল। কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞান পূজারী জগত তাঁর এ মতবাদ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকের ইহুদী বিজ্ঞানী জোসেফ বিন জুদা আকনিন ইউরোপে এ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন ফলে ইউরোপের রেনেঁসা যুগে 'কিতাবুল মানাজির' গ্রন্থটি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। লেখার এক শতাব্দীর মধ্যেই জিরার্ড ও উইটেলে কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এ অনুবাদের মারফতই ইউরোপে বিজ্ঞানের জন্মদাতা ফ্রান্সিস বেকন, রোজার বেকন জন, পেকহাম প্রমুখ পদার্থ বিজ্ঞানী বিশেষ করে Optics শাখার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৬/১৭ শতাব্দীতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, জোহানেস কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এ গ্রন্থকে ভিত্তি করে আলোর ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৭ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কেপলার (1571-1630), দেকার্তে, রোমার (১৬৪৪-১৭১০) প্রমুখ আলোর গমনে কোন সময়ের দরকার হয় না' এ মতকে সত্য জেনে বসেছিলেন, অথচ হাইছামসহ আল বিরুনী, ইবনে সিনা ১১ শতকে প্রমাণ করিছিলেন যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত, আলোর যাতায়াতে সময় লাগে প্রভৃতি মতবাদ।

ইবনুল হাইছামের আলোর মতবাদ, ইউরোপে কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝা যায় তাঁদের উচ্ছসিত বাক্যবানে। পোলেন্ডের Dr. Zygnunt Rybilli বলেন- The name of Al-Haitham is connected with history of Polish science by an old tradition his work having served as basis for further research by our thirtteenth century scholar witelo Coilek Who also made Al-Haithams work accessible to Europe in Latin translation, আমেরিকার জর্জ সারটনের কথায় ঃ Kitab at Manager must be listed among the leading elassics; indeed, it influenced scientific thought for six centuries. অষ্ট্রেলিয়ার Sir M. L. Oliphant এর মতে, 'His elegant use of geometry and mathematics in physics preceeded by seven hundred years, the discoveries of Newton'.

আলোর মতবাদের মতো তাপ নিয়েও মুসলমানরা আলোচনা করেছেন। কুরআনের আয়াত- 'তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরাই কি ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি কর না অমি? আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু। '(৫৬ ঃ ৭১-৭৩) ' তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর, অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল, তখন সে বলিল; 'তোমরা হাফার দম নিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ হইল সে বলিলঃ তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি উহা ঢালিয়া দিই তার উপর' (১৮ ঃ ৯৬)। সূরা রাদ এ আছে- 'অলংকার ও তৈজসপত্র নির্মাণের জন্য তাহারা আকরিক ধাতু অগ্নিতে গলায় (১৩ ঃ ১৭)। 'তিনি সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তিনি বর্ষণ করেন শিলা ও ইহা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন।' (২৪ ঃ ৪৩)- ইত্যাদি বর্ণনা পরমাণুর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করে ইহাকে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দেয়ায় নিশ্চিতভাবে তা মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা দান করেছে।

আল নাজজাম, বাকিল্লানী, ইবনে রুশদ, আল্ গাজালী প্রমুখ মনীষীগণ তাঁদের পরমাণু সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা প্রকাশে এ থেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ঃ "প্রকৃতির দর্শনের ভিত্তি পরমাণু সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ।" মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রতিটা জিনিসকে একক বিশ্বের অংশ বলে মনে করেন। তাঁরাই প্রথমবারের মতো, মানবেতিহাসে পারমাণবিক বিশ্বের ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। কুরআনের অণু-পরমাণু সংক্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণী আয়াতসমূহ তাঁদেরকে পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র পদার্থের অংশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। তাই পরমাণুর যে ধারণা তাঁরা দিয়ে যান, তা মানবজাতির পরবর্তী আবিষ্কার ও গবেষণায় বিভিন্ন কাজে লেগেছে।

বস্তুর ওজন পরিমাপের জন্য, বিশেষত আপেক্ষিক পরিমাণ বা ওজন গ্রহণের জন্য মুসলিম বিজ্ঞানীরা যন্ত্র হিসাবে তুলা যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রতি মননিবেশ করেন। ধাতব পদার্থের খনিজ ও সংকর ধাতুর আপেক্ষিক ওজন পরিমাপের জন্য বিজ্ঞান সম্মত সরঞ্জাম উদ্ভাবনে আল বিরুনী, আল্ আসফাযানী, আবদুর রহমান আল খাজিনী, জাবির বিন হাইয়ান, আল্ নায়রিযী প্রমুখ বিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুরআনে পদার্থ বিদ্যার যে সকল বৈপ্লবিক আয়াত রয়েছে তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। ইতালীর বিজ্ঞানী প্রথম বেতার যন্ত্র

আবিষ্কার (জগদীশ বসুকে ও প্রথম আবিষ্কারক উল্লেখ করা হয়) প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের সহায়তায় হয়েছে। 'মানুষের বক্তব্য রেকর্ড হওয়া' বিষয়ক কুরআনের থিওরী তাঁকে এ কাজে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতামত যে, আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনেকগুলোর সমাধান পবিত্র কুরআনে হাজার বছর আগেই পেশ করা হয়েছে। ইউরোপে পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলির যুগ হিসাব করলে দেখা যাবে, তখনকার সময় সেখানে ব্যাপকভাবে কুরআন অনুবাদ ও চর্চা এবং সাথে সাথে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ অনূদিত ও গবেষণার সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

আজ তাদেরই কোন কোন মনীষী মধ্যযুগকে তথা আরব সভ্যতার যুগকে 'অন্ধকার যুগ' (?) বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। কিন্তু দিনে পেঁচা চোখ বুজে থাকলেও সূর্য উঠবেই- এ শাশ্বত সত্য প্রমাণ করার জন্য তাদের গবেষকরাই যথেষ্ট। একটি মাত্র উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এ বিষয়ের ইতি টানা হচ্ছে - ঐতিহাসিক Briffanlt তার Making of Humanity গ্রন্থে জানিয়েছেন ঃ 'Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world, but its fruits were slow in ripening. Not until long after Moorish calture had sunk back into darkness did the giant to which it had given birth rise in his might. It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life.

For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory - natural science and the scientific spirit.'
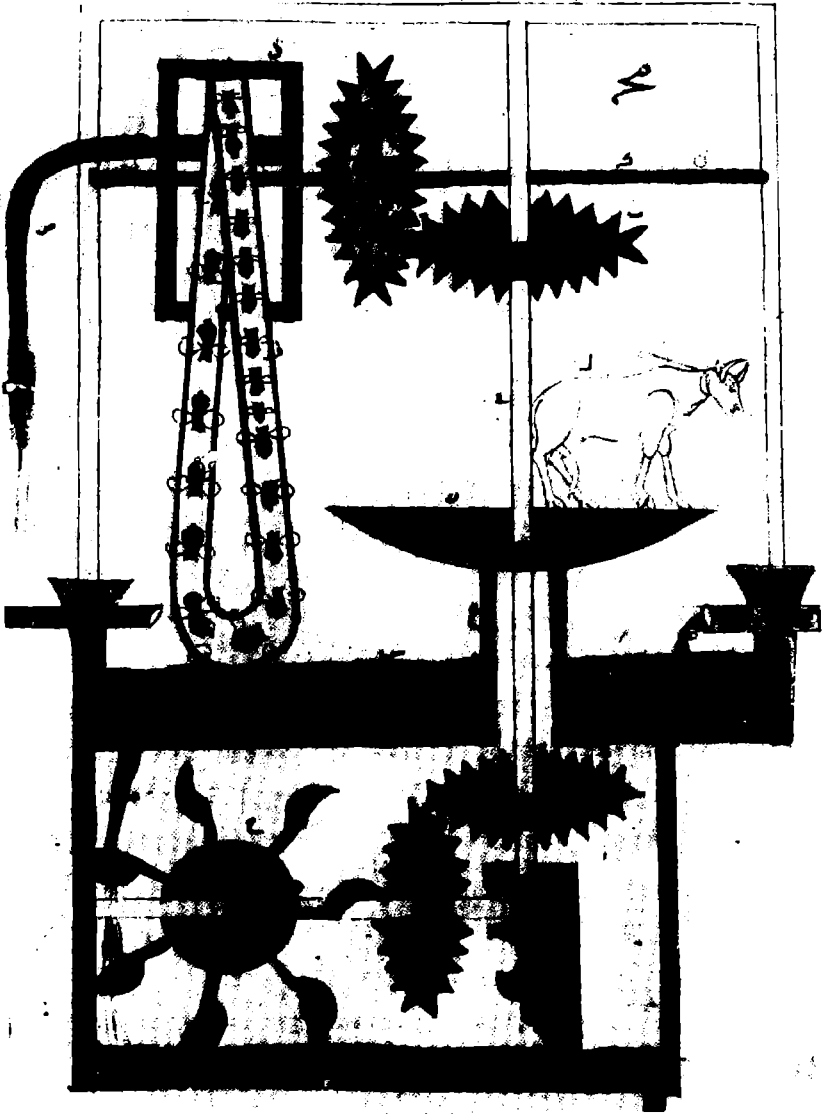
মুসলমানদের তৈরী একটি হাইড্রোলিক পাম্পের চিত্র।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টির সূচনাতেই চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ এবং রোগব্যাধি মোকাবেলায় যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। আর তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল তাদেরই সৃষ্টি ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি মাধ্যমে। এরপর আসে লতা-পাতা গাছ গাছড়ার ব্যবহার। ওষুধ হিসেবে যা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তা বার্লিন এ Museum of Ethnology-তে রক্ষিত প্রাচীন মানুষের একটি খুলিতে রক্ষিত পোয়া ইঞ্চি গর্ত করে দেখা যায়। অনুমান যে, এ গর্ত হয়েছে মাথার খুলিতে তুর্পিন করার জন্য। ফ্রান্সে প্রাপ্ত এবং পশ্চিম ইউরোপ ও বোহেমিয়ায় নব্য প্রস্তর যুগের (Neolithic) অনেক খুলিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। মনে করা হয়, শির পীড়া, মৃগীরোগ প্রভৃতি তাড়াতে এ শল্য বিদ্যার আশ্রয় নেয়া হত।

ওষুধের প্রথম আবিষ্কার কে করেছেন তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আল কিফতি তাঁর 'তারীখুল হুকামাতে' লিখেছেন, নবী ইদরিস (আ.) প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে 'ওহী' আসে। বিজ্ঞানী ইসহাক বিন হোনায়েন তাঁর 'কিতাবু তারীখুল আতীব্বা'তে লিখেন, মিশরীয়রাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি জন্মদাতা। ইরাকীরা মনে করে তারাই প্রথম এ বিজ্ঞানের জন্ম দেন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনে করতো, চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো ভগবানের প্রত্যাদেশ। ঋকবেদে স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষা ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মের ব্যাপারে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। সে যাই হোক, চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান আলোচনার পূর্বে ইসলামী যুগের কয়েকটি সভ্যতার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার।

প্রাক-ইসলামী যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ

বস্তুবাদী চিন্তাধারায় পণ্ডিতগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম উদ্ভব স্থান হিসেবে চিন্তা করেন ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটিকে। প্রথম সভ্যতার আলো এখানেই ফুটে। পৃথিবীর ৩টি বড় ধর্মের মতে, আদম হাওয়া বেহেশতের

যে জায়গায় বসবাস করতেন সেটা ব্যাবিলেনেই অবস্থিত। সুমেরীয়রা কোথা হতে ব্যাবিলনে এসেছিল তা জানা যায়না। তবে তাদের সভ্যতা যে উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা পৃথিবীর পরবর্তী সভ্যতার অনেকগুলিকেই প্রভাবিত করেছিল। এখান থেকেই উদ্ভূত হয় জ্যোতির্বিদ্যা, অংক, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও চিকিৎসা শাস্ত্র। ধাতুসমূহের যে সকল গ্রীক নাম তার অনেকগুলিই ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে গৃহীত।

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় যে চিকিৎসা একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট সময়ের উদ্ধারকৃত ফলক থেকেই অনুমান করা যায়। নিনেভের উদ্ধারকৃত ৩০ হাজার ফলকের মধ্যে ১ হাজার ফলকই চিকিৎসা সম্পর্কীয়। জানা যায়, তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান একাধারে যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র ও খাঁটি বিজ্ঞানের সমন্বয় ছিল। তখনকার দিনে অন্যান্য জাতির চাইতে তারা যে খ্যাতিমান ছিল সে সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

মিশরীয় সভ্যতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। গ্রীক কবি হোমার তাঁর বিখ্যাত 'ওডেসা'-এর এক বর্ণনায় বলেছেন, মিশরের লোকেরা চিকিৎসা বিষয়ে অন্যসব দেশের লোকের চেয়ে অধিক পারদর্শী। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে পারস্য নৃপতি সাইরাস (Cyrus the Great, 530 B.C)এবং দারিয়ুস উভয়েরই ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মিশরীয়। মিশরীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন 'হারমেস'। তাঁর গ্রন্থাবলী ছিল তখনকার চিকিৎসকদের মূল নির্দেশক। এরিষ্টটলের মতে, হারমেসের চিকিৎসা বিধানের অনুসরণে ৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই কোন ফল পাওয়া না গেলে অন্য ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হত। মিশরীয় দেবতা 'টথ' হলেন হারমেসের বিকল্প।

মিশরীয়দের 'মমি' সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান তাদের উন্নতির অন্যতম স্বীকৃতি। সাধারণ রাজা বাদশাহদের দেহে মৃত্যুর পর দেহকে অবিকৃত রাখার নিমিত্তে এক শ্রেণীর লোক এ কাজ করত। খৃষ্টপূর্ব অব্দে মিশরীয়দের চিকিৎসা বিষয়ক অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে 'The Papyrus Ebers (1553-1550 B.C)', 'The Berlin Medical Papyrus (1909 AD)', এবং 'The Hearst Medical Papyrus' অন্যতম।

ভারতে যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রচলিত ছিল তার সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ আরবরা অনুবাদ করেছিল। ফিহরিস্ত ১২টি ভারতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত এরকম বইয়ের

উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে 'কিতাব সুসরদ', 'কিতাব আসতানকর,' 'কিতাব সিরাক', 'কিতাব তুকালতল,' 'কিতাব সাকর লিল হিন্দ', আসমায়ে অকাফেরুল হিন্দ' ও 'এলাজাতু হাবার্লি লিল হিন্দ', অন্যতম।

অনেকের মতে ইরানীদের কাছ থেকেই গ্রীকরা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখেছিল। এ মতের কারণ হল খৃষ্ট পূর্ব ৭০০ অব্দে চিকিৎসা বিদ্যায় গ্রীকদের অবদানের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর ৩০০ বছর পরই গ্রীকরা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করে। এই সময়ে হিপোক্রেটস (খৃ. পৃ. ৪৬০ অব্দ) চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসা শাস্ত্রের 'জনক' রূপে চিহ্নিত হন। অন্য কোন সভ্যতার সংস্পর্শে না এসে দু'শ বছরের মধ্যে গ্রীকদের এত উন্নতি অবিশ্বাস্য, তাই অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা তাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে প্রভাব রেখেছিল বলা যায়।

জোরোস্তারের আভেস্তাসহ অনেক পারসীয় পুরনো গ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণে পারসীক সভ্যতা তছনছ হয়ে যায়। পুরনো ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়, খৃষ্টের জন্মের সময় যে তিন জন ব্যক্তি বেথেলহেমে আসেন তাদের তিনজনই পারসীক পুরোহিত চিকিৎসক।

চীনা সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, খৃষ্ট পূর্ব ৩০০০ অব্দে চীনা চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। Shen Nung এবং lung ছিলেন এর পুরোধা। Shen Nung (2838-2698 B.C) কে চীনারা Father of the medicine' নামে গণ্য করে। তাঁর রচনা Pentsao the great herbal একটি ভেষজ চিকিৎসা গ্রন্থ। এরপর Huang Ti (2697-2595 B.C) প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

পুরাকালে চীনে ৩ পদ্ধতির চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। তাহলো ১. একুপাংচার (Acupuncture), ২. মেক্সা এবং (Moxa) এবং ৩. মাসিজ (Massag) চীনে প্রথমটি আজো জনপ্রিয়। চীনে তাং বংশের রাজত্বকালে (Dynasty 619-908 A.D) চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। কনফুসিয়াসের বাণী "রোগ মুখ দিয়ে প্রবেশ করে; ভালোভাবে পাক না হলে তোমরা সে খাবার খাবে না"- চীনা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। খৃষ্ট পূর্ব ১০ শতাব্দী থেকে চীনে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে Chi Mir wong এবং Lien Teh Wn. তাঁদের History of Chinese Medicine গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : While the Chinese have acquired a lot of experience, accumulated a mass of information, collected a great variety of fact's formulated

some Fundamantal principles, anticipated many discoveries -- yet they have never pursued a single subject in a way calculated to lead them to final success.

গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানই বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এম, আকবর আলী লিখেছেন "আরব তথা মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যস্থতায় ইউরোপের রেনেসাঁর যুগে তথাকার বিজ্ঞানীরা গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই হাতের কাছে পেয়েছিলেন এবং তারই উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান নতুন করে গড়ে তুলতে থাকেন। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর পর থেকে আজকের দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই পরিণতি।

এহিয়া নহুবীর মতে, গ্রীক মনীষী আসকলবিউসই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তাঁর পরে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদরা হলেন, ওরাস, মিনস্, বরমাজিনস, আফলাতুন তিতব্বি, দ্বিতীয় আসকলবিউস, মালিনুস ও বুকরাত প্রমুখ।

বলা প্রয়োজন, এঁদের আবির্ভাবের সময়কালে এক হাজার বছরের মত প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। আরো আছেন- Empedocles of AKragas (500-430 B.C) Diogenes of Apollonia (430 B.C), Demokritos of Abdera (494-404 B.C), Hippocrates (460-359 B.C) প্রমুখ। শেষোক্ত জনকেই আধুনিক কালে চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - De aera, aquis et locis, prognosticon, De Dioeta acutorm, De morbis popalaribus, Aphorismi, De natura hominis, De octimestri partu, De genitura, De septimanis, Proeceptiones এবং secreta অন্যতম।

রোমান চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ হিসেবে Dioscorides (40-90A.D), Andromachos, Ruphos, (100 A,D), Soranos (98-138 AD), ও Galen (130-199 AD) বিখ্যাত।

এছাড়া গ্রীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে Aristotle (384-322), Polybas (340 B.C), Pranagoras (340 B.C), Herophilus of Chalcedon (300-250 B.C), এবং Eudemos প্রমুখ চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন।

Galen রোমান চিকিৎসাবিদদের অন্যতম পুরোধা। Campbell এর মতে, তাঁর ৫৯টি গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়; তন্মধ্যে ১৬টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য। তন্মধ্যে কয়েকটা হল : Ars Medica, De elementis secundum Hippocratem, De tempermentis, De facultatibas naturalibus, Introductio sive medicus, Opera varia অন্যতম।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অবস্থা ও পটভূমিতে সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আল্ কুরআন, মহানবী (সা) বাণী জ্ঞান সাধনায় সম্পূর্ণ নতুন দিক নিদের্শনা প্রদান করে আরব সমাজে। এই উত্তরাধিকার আরবদের মাধ্যমে তাদের বিজিত বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে; ফলত : বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় মুসলিম যুগ ও সভ্যতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। মুসলিম সভ্যতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নতি লাভ করে নতুন বিশিষ্টতা ও অবদানে।

ইসলামের আবির্ভাব ও চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ

ইসলাম পৃথিবীতে মহান আল্লাহর এক অভিনব দান। জীবন যাপনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ পরিসরে আলোচনাসহ মানুষের আত্মিক আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বৈষয়িক সাধনার এক অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে ইসলামে। ধর্মীয়, নৈতিক ও পারলৌকিক আদেশ নির্দেশের বিধান ছাড়াও মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিক উন্নতিকল্পে ইসলামের যে নির্দেশ তা অন্য যে কোন ধর্ম গ্রন্থেই বিরল। ইসলামের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন; এক বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞান-সাধনার জন্য অসংখ্য বার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ করে পৃথিবী, নভোমণ্ডল, দিন রাত বিবর্তন, মহাশূন্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত, মানবদেহ ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবার চিন্তাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সকল ভিত্তি কুরআনের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিশ শতকে এসে বিজ্ঞানের নতুন কোন আবিষ্কার কুরআনের কোন বৈজ্ঞানিক থিওরীকে ভুল প্রমাণিত করতে পারেনি। অনেক পণ্ডিত এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রসঙ্গত ফরাসী বিজ্ঞানী কৃত 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ' গ্রন্থটির কথা বলা যায়। Hartwig Herschfeld ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'New Researches in to the Composition and Exegesis of the Quran' গ্রন্থে চমৎকার ভাবে বলেছেন ঃ We must not be surprised to find the Quran regarded as the fountain head of the all seiences. Every subject connected with heaven or earth, human life, commerce and various trades are occasionally touched upon and this gave rise to the production of numerous monographs forming commentaries on parts of the holy book. In this way the Quran was responsible for great discussions, and to it was also indirectly due the marvellous developement of all branches of scince in the Muslim world.

কুরআনের ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে প্রায় ৭০০টি আয়াত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে। জার্মান পণ্ডিত Dr. Karl Opitzy তাঁর Die Medizin Im Koran' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯৭টি সূরার ৩৫৫টি আয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট। তিনি এ সকল আয়াত নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আয়াতসমূহকে তিনি ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হলো ঃ

১. Medizin তথা চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে এতে রয়েছে ঃ

ক. সৃষ্টি, ভ্রূণ, গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থা, শিশু পরিচর্যা, আয়তকাল ইত্যাদির আলোচনা।

খ. শরীর জ্ঞান (Anatomy), শরীর বৃত্ত (Physiology).

গ. নিদানশাস্ত্র (Pathology) নিদান (Etiology) মনন বিদ্যা (Psychology), মনন নিদান (Psycho-Pathology)

ঘ. সাধারণ চিকিৎসা ও বিশেষ চিকিৎসা।

ঙ. মৃত্যু ও পুনর্জীবন।

২. Hygiene তথা স্বাস্থ্য বিদ্যা ঃ

ক. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি; পোষাক, বিশ্রাম, পুষ্টি, পানীয় ইত্যাদি।

খ. সমাজগত স্বাস্থ্যবিধি; ঘরবাড়ি, সংক্রামক ব্যাধি।

গ. আকস্মিক মহাদুর্ঘটনা, মহামারী।

৩. Gesundheitsgesetze তথা স্বাস্থ্য বিধান ঃ

ক. শারীরিক পুষ্টি বিধান; মদ, মাংস, ইত্যাদি বিষয়ক।

খ. যৌন রিধি বিধান, সুষ্ঠ ও অসুষ্ঠ যৌনক্রিয়া ।

গ. আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান; ত্বকচ্ছেদ, রোজা, ওজু, গোছল, পীড়া, ক্রান্তি, বিনোদন ইত্যাদি।

ঘ. সামাজিক বিধি বিধান; হত্যা, প্রতিশোধ, অভিভাবকত্ব।

মহানবীর (সা) চিকিৎসা বিধান ঃ

এ সম্পর্কে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। হাদীসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বুখারীতে 'তিব্বুন নবী' শীর্ষক ৮০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ হাদীসগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশই রোগ নিরাময়ের জন্য; নিবারণের ব্যবস্থা খুবই কম। তা সত্ত্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিশ্বনবী (সা) যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তার ফল

সুদূর প্রসারী হয়েছে। Prof. Brown বলেছেন, নবী মুহাম্মদ (সা) চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে ভাষ্য- Prophet Muhammad is a traditions Familiar to all muslims is said to have linked medicine in importance with theology.'

রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হিসেবে মহানবী (সা) মোটামুটি ৫টি পদ্ধতি ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন ঃ

১। হাজামত বা রক্তমোক্ষণ পদ্ধতি;

২। লোলুদ বা মুখ দিয়ে ওষুধ ব্যবহার;

৩। সা'উত বা নাক দিয়ে ওষুধ ব্যবহার;

৪। মাসী'ঈ বা পেটের বিশোধনের জন্য ওষুধ ব্যবহার;

৫। কাওয়াই তথা লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দেওয়া।

আর ঔষধ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন ১. মধু; ২. কালজিরা; ৩. সামুদ্রিক কুস্তা বা বুড়; ৪. মেহেদী; ৫. খেজুর; ৬. জলপাই; ৭. কাকরোল; ৮. মক্কার সোনামুখী গাছ; ৯. মান্না' ব্যাঙের ছাতার মত এক প্রকার উদ্ভিদ; ১০. ঘৃতকুমারী (মুসব্বর); ১১. এন্টেমনী; ১২. মৌরী; ১৩. মাদুরের পোড়া ছাই; ১৪. উটের দুধ প্রভৃতি।

সাধারণত জ্বর, মাথাধরা, চোখ উঠা, কুষ্ঠ, প্লুরিসি ইত্যাদি রোগের ঔষুধ হিসেবে উক্ত জিনিসগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী চিকিৎসা শাস্ত্রে মহানবীর ব্যবহৃত কিছু শব্দ নতুন সংযোজিত হয়েছে, প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হতোনা। যেমন- 'জুজাম' (Tubercular Leprosy); 'জাতুল জানব' (Pleurisy), 'কুস্তা', 'উদ্হিন্দি', 'ইছমিদ', 'শিওনিজ', ইত্যাদি।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ

মহানবীর (সা) যুগে আরবে চিকিৎসক হিসেবে যার খ্যাতি ছিল তিনি হারেস বিন কালাদা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তিনি মুশরিক থেকে গিয়েছিলেন। আরবের প্রথম খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন হারেস। রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে নবী (সা) তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং লোকজনকে তার কাছে পাঠাতেন। তিনি পারস্যে চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রথমে সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন পরে তায়েফে এসে বসবাস ও চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি কালামুল হারেস মা'আ কিসরা' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে

উল্লেখ পাওয়া যায়। হারেসের চিকিৎসা বিধির অন্যতম হলো অত্যাধিক আহারই সকল রোগের কারণ; যদি নীরোগ জীবন যাপন করতে চাও তা হলে সকালে ঘুম থেকে উঠবে; ঋণমুক্ত থাকবে এবং স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করবে। যতদূর সম্ভব ঔষুধ পরিহার করবে, পেটের অসুখে জোলাপ ব্যবহার করবে, পানীয় হিসেবে মদের চেয়ে পানি বেশী উপকারী ইত্যাদি। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা)-এর সময়, ভিন্নমতে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে হারেস মৃত্যুবরণ করেন।

নজর বিন হারেস নামে এসময় একজন চিকিৎসক ছিলেন। কোন কোন মত অনুযায়ী উক্ত হারেসের পুত্র এই নজর। এই পাপাত্মা নবীর (সা) কুৎসা করতো ফলস্বরূপ বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং নবী তাকে প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন।

আবু হাফসা ইয়াজিদ নামে একজন চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি ইহুদী ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। Wusten field তাঁর গ্রন্থ Geschichte der Arabian Aerzte-তে আবু হাফসাকে এ সময়কার অন্যতম চিকিৎসাবিদ বলে উল্লেখ করেছেন।

নবী (সা)-এর সময় ইবনে উবায় রামছাতুন তামিমী নামে একজন ক্ষত ও অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ ছাড়া জয়নাব ও রাফিজা নামের দুই জন মহিলা চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত জয়নাব খোলাফায়ে রাশেদার যুগে চক্ষু রোগের চিকিৎসা করতেন। অন্যজন ছিলেন আনসার সাহাবীয়া। তিনি মসজিদে নববীর আঙিনায় তাঁবুতে যে হাসপাতাল করা হয়েছিল তার প্রধান ছিলেন।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রারম্ভ; অনুবাদ যুগ ঃ

উমাইয়া খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চাইতে সামরিক শক্তি এবং রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক উন্নতিকল্পে বেশী সময় ব্যয় করেছেন। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা বলতে যা বুঝায় তা হয়েছিল মূলতঃ আব্বাসীয় আমল হতেই। কুরআনের শিক্ষা ও মহানবীর অনুপ্রেরণায় মুসলিম সভ্যতার সূচনা প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় আমলেই সংগঠিত হয়। অধ্যাপক কে. আলী লিখেন ঃ 'আরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয় আমলে। গ্রীক, ইরানীয়, সিরীয় এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র ও শিক্ষক জুন্দিশাপুরের কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। গ্রীক হতে সিরীয় ও পাহ্লভী ভাষায় অনুবাদের কাজ পঞ্চম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়েছিল এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্যালেন ও হিপোক্রাটের গ্রন্থগুলি সিরীয় ভাষায়

অনূদিত হয়েছিল। এ যুগে গ্রীক, ইরানী ও ভারতীয় অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। জুন্দিশাপুরের কলেজটি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম উন্নতির যুগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. ৭৫০-৯০০ খৃ. সময়কাল অনুবাদের যুগ;

২. ৯০০-১১০০খৃ. মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ;

৩. ১২৫০-১৬৫০ খৃ. মুসলিমদের পতন ও ইউরোপের উত্থান যুগ;

৪. ১৬৫০ চলমান সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ।

বিজ্ঞানময় ধর্ম ইসলামের অনুপ্রেরণায় আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বার উন্মোচিত হয়। এ সম্পর্কে ১৯৬৮ খৃ. প্রকাশিত An Introduction to the History of Medicine গ্রন্থে Chales Green Cumston বলেন When they (Mahometans) Came in contact with the debris of ancient civilizations they showed their aptitude by putting into practice the beautiful precepts of the Prophet, who said to his followers "Teach science which teaches fear of God..... Science protects from error and sin. The study of science has the value of a fast; in a noble heart they inspire the highest feelings and they correct and humanize the perverted.... Unfortunately during the centuries of decadence the heads of religious brotherhood limited the obligations to pxrely religious studies."

আগেই বলা হয়েছে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা শাস্ত্রে নিজেদের অবদান যুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল পূর্ববর্তী বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থসমূহ আরবী-সিরিয়াক প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ। নিজস্ব উদ্যোগ ও সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও এক দল অনুবাদক এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। এতে মুসলমান ছাড়াও অংশ গ্রহণ করেছেন ইহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ ধর্মের বিশিষ্ট অনুবাদকগণ। এ কাজে কোন ভেদ টানা হতো না। মুসলিম শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ও ধর্মীয় উদারতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। ধর্ম পৃথক হলেও প্রতিভা গুণে রাষ্ট্রীয় পরিপোষকতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। অন্যের কথা বাদ দিলেও ক্রুসেড যুদ্ধের মুসলিম নায়ক গাজী সালাহুদ্দীন নিজের চিকিৎসাবিদদের মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন।

নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন অনুবাদকের নাম তুলে ধরা হল ঃ

১. জুরজিস
২. হোনায়েন বিন ইসহাক
৩. ঈসা হাক বিন হোনায়েন
৪. হুবায়ন আল আসম
৫. ঈসা বিন ইয়াহিয়া বিন ইবরাহীম
৬. কুস্তা বিন লুফা বলোবাক্কী
৭. আইয়ুব আল মারুফ বিল আবরল
৮. ইসা বিন মাসারজিস
৯. শহীদ আল ফারখী
১০. মাসরজিস
১১. ইবনে শহীদ আল ফারখী
১২. আল হাজ্জাজ বিন মাতার
১৩. জারওয়া বিন মানাওয়া আন্নামী আল হিমসী
১৪. হিলাল বিন আবী হিলাল আল্ হিম্সী
১৫. ফসীয়ুন আত্ তারজামান
১৬. আবু নসর বিন নারী বিন আইয়ুব
১৭. বাসিল আল মাতরান
১৮. ইসতাফান বিন বাসিল
১৯. মুসা বিন খালেদ
২০. ইসতাছ
২১. জিরুন ইবনে রাবিতা
২২. তদরস আস্ সনকল
২৩. সারজিস আর রাসী
২৪. আইয়ুব আর রাহাবী
২৫. ইউসুফ আন্ নাকেল
২৬. ইবরাহীম বিন সালাত
২৭. সাবেত আন্ নাকেল
২৮. আবু ইউসুফ আল কাতিব
২৯. ইউহান্না বিন বখতইস্ত
৩০. আল্ বাতরিক

৩১. ইয়াহিয়া বিন আল্ বাতরিক
৩২. কুস্তা আর রাহাবী
৩৩. মনসুর বিন বানাস
৩৪. আবদ্ ইস্ত বিন বাহারিজ
৩৫. আবু উসমান সাঈদ বিন ইয়াকুব আদ্ দামিস্ক
৩৬. আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন বক্স
৩৭. আবুল হাসান আলী বিন ইব্রাহীম বিন বকস
৩৮. শিরস্তয়া বিন কুতরুব
৩৯. মোহাম্মদ বিন মুসা আল্ মুনাজ্জম
৪০. আলী বিন ইয়াহিয়া আল মারুফ
৪১. ছাদরেস আল উসকাফ্
৪২. মোহাম্মদ বিন মুসা বিন আব্দুল মালেক
৪৩. ঈসা বিন ইউনুছ আল্ কাতিব আল্ হাসিব
৪৪. আলী আল মারুফ বিল কাইয়ুম
৪৫. আহম্মদ বিন মোহাম্মদ আল্ মারুফ ইবনুল মোদাব্বের
৪৬. ইব্রাহীম বিন মোহাম্মদ বিন মূসা আল্ কাতিব
৪৭. আবদুল্লাহ বিন ইসহাক
৪৮. মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক জাইয়াত প্রমুখ।

বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের উপর মুসলিম চিন্তাধারা ও গবেষণার সমন্বয়ে গড়ে উঠে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান। মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদানের ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের পরিচিতি উল্লেখ করার পূর্বে এ বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলীর বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি তাঁর 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "চিকিৎসা বিজ্ঞান আর শল্য চিকিৎসার কৌশল হচ্ছে একটি জাতির প্রতিভার লক্ষণ আর ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিকতার কঠোর পরীক্ষা, কিন্তু মুসলমানেরা এ দুটির চরম উন্নতি সাধন করে। চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রীকদের হাতে নিঃসন্দেহে উচ্চ পর্যায়ের উন্নতি লাভ করেছিল, কিন্তু গ্রীক সভ্যতা এই শাস্ত্রকে যেখানে রেখে যায়, আরবরা তার উপর বহুতর উচ্চ পর্যায়ের উন্নতি সাধন করে আর প্রায় আধুনিক পর্যায়ের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ...ঔষধের বস্তুগুলির পরীক্ষার কথা আলেকজান্দ্রিয়ার স্কুলে ডাইস্কোরাইডসের মনে উদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক আকার আরবদের সৃষ্টি। তারা রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ আবিষ্কার করে আর বর্তমানে

যাকে 'ডিসপেনসারী' বলে, তারও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তারা। তারা প্রত্যেক নগরীতে সাধারণ হাসপাতাল স্থাপন করে, যাকে বলা হতো 'দারুল শিফা' বা আরোগ্য নিকেতন অথবা 'মারিস্তান' বা রোগী নিকেতন, আর সেগুলির খরচ বহন করতো রাষ্ট্র। ...অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে গ্রীকদের অত্যন্ত মামুলী ধরনের ধারণা ছিল, আর তাদের ঔষধ ছিল অতি অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলমানরা এই উভয় বিদ্যাই এক একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে উন্নীত করে। সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি পৃথিবীর সর্বত্র গবেষণা আর অনুসন্ধানের সুবিধা দান করে, ফলে প্রচলিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীকে অসংখ্য নতুন নতুন মূল্যবান সংযোজনের দ্বারা তারা সমৃদ্ধ করে তোলে।"

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ ও তাঁদের মূল্যায়ন ঃ

প্রকৃতপক্ষে ৭ম শতাব্দীতে মুসলিম চিকিৎসকদের মূল অভিযাত্রা শুরু হয়। আরবের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিতে মুসলিম দুনিয়ায় যে বহুমুখী জ্ঞানবেত্তার উন্নতি দেখা দেয় তা ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে মহিমাময় করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বাইরের খৃষ্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইয়াহিয়া আন্ নাহবী চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবদের অবদানের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সর্ব প্রথম। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের সমালোচক হিসাবে তিনি মিশরের গভর্ণর আমর ইবনুল আসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এবং এক গীর্জার পাদ্রী।

৮ম শতকে মুসলিম রসায়নবিদ জাবির বিন হাইয়ান এর আগমনে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন তৎপরতা দেখা দেয়। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনে নাদিমের মতে, তিনি এ শাস্ত্র সম্পর্কে ৫০০টি পুস্তক প্রণয়ন করেন। আল বাতরিক (মৃ. ৭৯৬-৮০৬ এর মধ্যে) চিকিৎসা বিষয়ক গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করেন খলিফা মনসুরের আমলে।

আল-কিন্দি আরবজগতের প্রথম বিখ্যাত দার্শনিক হিসাবে পরিচিত হলেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আনুমানিক ৮০০ খৃ. তিনি কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঔষুধের সাথে গণিতের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। Encyclopaedia Britanica এর নিবন্ধকার R.R. Wr. এর মতে, তাঁর ২৭০টি গ্রন্থের ২৭টি চিকিৎসা সংক্রান্ত; তন্মধ্যে দু'টির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম 'কিতাবু ফি কিমিয়া আল ইতর ওয়াত্ তাসিদাত' অন্যটি 'আকরাবাদিন'। প্রথমটিতে তেল, মলম, আতর তৈরীর কৌশল এবং শেষটিতে রোগ এবং রোগের ঔষধের ব্যবস্থা পত্র সম্বন্ধে। অধ্যাপক লেভী ১৯৬৬ সালে তাঁর যে গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তাতে ২২৬টি ব্যবস্থা পত্র রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে ঠাণ্ডা, সর্দি, বাত,

কালপিত্ত, দুর্বলতা, যকৃত ও পেটের পীড়া, বৃক্ক ও মুত্রাশয়ের অকর্মণ্যতা, ফোঁড়া ফাটানোর পুলটিশ, প্লীহার জন্য পুলটিশ, ভগন্দরের ঔষধ, আগুনে পোড়ার ঔষধ, চুল দাড়ি বড় করার ঔষধ, কাজল তৈরীর ব্যবস্থাপত্র অন্যতম। ১৯৬২ সালে ইরাকে কিন্দির জন্য সহস্র বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে Prof Richard J. Mc. Carthy আল কিন্দির কার্যাবলী সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্দি ২৩৫ হি. / ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আরবী ভাষায় সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আলী ইবনে রাব্বান। তাঁর 'ফিরদাউসুল হিকমত; চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ এবং এখনো অতি উচ্চ মূল্যের অধিকারী। The Nataral Science and Medicine এর গ্রন্থকার Martin Pleesner এর ভাষায় : The oldest surviving Arabic encyclopaedia of Medicin, The Firdaus -al-Hikma or Pradise of Wisdom is in some respect unsurpassed. ইবনে রাব্বান খলীফা মোতাওয়াক্কিলের অনুপ্রেরণায় মুসলিম হন। ৮৫৫ সালে তিনি 'কিতাবুদ দীন ওয়াদ দাওয়াত প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রায় ১৫টি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৩টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চিকিসা বিশ্বকোষটি ড. মোহাম্মদ জুবায়ের সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। অন্য দুটি হচ্ছে 'কিতাবু হেফজিস সিহাত' ও 'দীন ওয়াদ দাওলত'। প্রথমটির পাণ্ডুলিপি Oxford এর Bodleain লাইব্রেরীতে সংরক্ষরিত এবং দ্বিতীয়টির পাণ্ডুলিপি ম্যানচেষ্টারের John Rylands এ সংরক্ষিত।

আবুল হাসান আহমদ আত্ তাবারী একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চোখের চিকিৎসা সম্পর্কে লিখেছেন। তার গ্রন্থ- 'মুয়ালাজাতুল তুকরাতিয়া' হিপোক্রেটের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে। সাবুর বিন সাহল (মৃত্যু ১৫৫হি./৮৬৯ খৃ.) পারস্য বংশোদ্ভূত আরবীয় চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন।

পাশ্চাত্যে রাজেস্ (Rhazes) নামে পরিচিত আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী (841-926), নবম শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিস্ময় । শুধু তাই নয় তিনি চিরকালের এক মহান বিজ্ঞানী। তিনি মোট ৩৫ বছর চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। Browne এর মতে, `Al-Razi was the most original and respectable physician of Islam. He is the author of works that are informed by personal knowledge and experience and useful books.

রাজী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ১১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মৌলিক অবদান সম্পর্কে Campble বলেন- He was a great clinical and ranks with Hippocrates as one of the original portrayers of disease. He was the first to introduce chemical preparations into the practice of medicine. His 'Liber de Variolis et Morbillis' is the oldest and most original work on small Pox and Measles and constitute a distinet original contribution to medicine by the Arabians. He was the first to distinguish them one from another and to write a lucid account that was almost modern in its presentation of clinical detail.'

আল রাজী হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। Prof Mettler এর মতে, তিনি প্রথম শিশু রোগ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে হিসাবে তাঁকে 'Pediatrics' এর জনক বলা যেতে পারে। শিশু রোগকে তিনি ২৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। রাজী সর্ব প্রথম স্নায়ু দৌর্বল্য মানসিক রোগ হিসাবে Neuropsy chiatric সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Intreventicalar hydrocephalus সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। 'কিতাবুল মনসুরী' গ্রন্থে তিনি 'সন্ন্যাস রোগ' ও 'পক্ষাঘাত' সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, তার মতে, রক্ত ও শ্লেষ্মার জন্যই এ রোগ হয়। তিনি প্রথম সন্ন্যাস রোগের চিকিৎসায় ভিজা কাঠি লাগান এবং টাইফয়েডের বেলায় ঠাণ্ডা পানি, ব্যবহার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'Sherringtons Conditional Reflex Theory মতবাদের পূর্বাভাস দেখতে পাওয়া যায়, তার Of Habit Which become Natural গ্রন্থে।

গ্রীকরা পারদকে অত্যন্ত বিষাক্ত মনে করতেন কিন্তু রাজীই পারদের মলম প্রবর্তন করেন। বানরের উপর পরীক্ষার পর তিনি এ উদ্ভাবন করেন। আল রাজীর চিকিৎসা গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি যেমন 'কিতাবুল হাবী' 'কিতাবুল মনসুরী' 'জুদরী ওয়াল হাসবাত' 'তাফসীমুল ইলাল'- প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর গ্রন্থসমূহের যে সকল ল্যাটিন অনুবাদ আছে তা হলো :

১. The Continens - ইহুদী ইবনে ফারাজ অনূদিত, ১২৮০ খৃ.

২. Liber ad-al Monsorem - অনুবাদ ক্রিমেনার জিরাল্ড।

৩. Liber Divisionum - ক্রিমেনার জিরাল্ড অনূদিত।

৪. Antidotarim - ইহুদী লেখক ইব্রাহীম কালচারী অনূদিত।

৫. De Aegritudinibus proeconum জনৈক হিব্রু কর্তৃক অনূদিত।

৬. De Proprietatibus Membrorum et Utititatibus et Nocumentis Animalium Aggregatus ex dictis antequoram - অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনূদিত এবং ১৪৯৭ সালে ভেনিশ থেকে প্রকাশিত।

৭. Liber de Variolis et morbillis - অনেকগুলো ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ভেনিশ ১৪৯৮ খৃ, ১৫৫৫ খৃ. বাসলে থেকে ১৫২৯ খৃ. ১৫৪৪ খৃ. আরজেনটর থেকে ১৫৪৯ খৃ. লণ্ডন থেকে ১৭৪৯ খৃ. এবং গর্টনজেন থেকে ১৭৮১ খৃ. প্রকাশিত সংস্করণ অন্যতম। মধ্যযুগে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়।

আল-রাজীর 'কিতাবুল মনসুরী' শরীরবিদ্যায় একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ। ১০ ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলো হল : এনাটমী ও ফিজিওলজি, মেজাজ, ঔষধ, স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শষ্য চিকিৎসা, বিষ, জ্বর ও অন্যান্য। এই গ্রন্থের প্রভাব সম্পর্কে Hakim Mohammed Sayeed প্রণীত Al-Tibb Al. Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে 'Razis works are held in great respect in the West. Manuscripts of his works are to be found in the libraries of Asia and Europ. A manuscript was purchased by Cambrige University a few years ago.

আল-রাজীর 'কিতাবুল হাবী' সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। খল্লিকানের মতে, এটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর পুরাকালের চিকিৎসা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। Prof. W. A. Greenhill বলেন, Not Withstanding defects, the Contnens of Rhages is Universally admitted to be one of the most valuable and interesting medical works of antiquity though it might at first sight appear to be one of the most repulsive. চক্ষুরোগ বিশেষ করে Opthalmic surgery -তে তাঁর বিশেষ অবদান আছে বলে সাধারণ মত প্রকাশ করেছেন। কাওসার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যতদূর সম্ভব কেটে ফেলে দিতে হবে, কোন দুর্বলতা দেখানো চলবে না। আল-রাজীর 'বাররুর সায়াত' গ্রন্থটি ১৭০০ সালে হুসেন জাবির আনসারী ফার্সীতে অনুবাদ করেন দিল্লীর সুলতান আজিম শাহের জন্য। Dr. P. Guigues এর ফরাসী অনুবাদ করেন 'La Guerison en une Heure per Rhazes নাম দিয়ে। ১৯৩২ সালে এলগুই - এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পথ্য ও খাদ্য সম্পর্কে রাজীর কয়েকটি রচনা

হলো 'কায়ফিয়াতিল আগাজী,' 'মাকালাতুন ফিল আগাজিয়াতেল মুখতাসের', 'কিতাবু তিব্বুল মুলুকী', 'তারতিব আকলেল ফাওয়াকেহ' রিসাল ফিল মায়ে ওয়াল মুবাররাদ' ইত্যাদি।

হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৭৭ খৃ.) পাশ্চাত্য জগতে Johannitius Onan এর Hunainus নামে পরিচিত। তিনি খলীফার নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। ইরাকের 'হিরা' অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। গ্যালেন সহ অনেক প্রাক-রোমান বিজ্ঞানী তাঁর মাধ্যমে আরবে পরিচিত হন। G.M.Wickens বলেন.... The most fomous of the traslators of this period was Hunayn ibn Ishaq (809-77) himself a Physician with a strong attachment to Galen' গ্যালেন ছাড়াও তিনি এরিষ্টটল, প্লোটো, ইউক্লিড, হিপোক্রেটস, আরিবাসিয়ন এর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়াও তিনি শতাধিক মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর পুত্র ইসহাক বিল হুনায়েন, খলীফা আল মুতাজিদের সভাসদ ছিলেন, তাছাড়া অনুবাদক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তার চিকিৎসা গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আদাবিয়াতুল মুফরেদাত' কুন্নাশুল খাফ্‌ফা, 'তরীখুল আতিব্বা, অন্যতম। তিনি ৯১০ খৃ. বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

কুস্তা বিন লুকা চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদান রাখেন অংকের মতো। তার ৭০টির মতো গ্রন্থের তালিকা এম আকবর আলী উল্লেখ করেছেন। মূসা বিন খালিদও প্রখ্যাত অনুবাদক ছিলেন।

সাবেত বিন কুরা মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রতিনিধি। চিকিৎসাবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রজ্ঞার কথা সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। ২৮৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাবেতের অনেক গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়। তিনি প্রায় ১২৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়কার বিজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে ইউসুফ আল খুরী পরিচিত। সাবেতের পুত্র সিনান বিন সাবেত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুষ্ঠুরীতি চালু করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতিমান। তিনি প্রায় ১৯টি বই লিখেছেন। সাবেত ও সিনান পরিবারের অনেক পুরুষই চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাবারীস্তানের আহমদ আত্ তাবারী, আলী ইবনে আব্বাস অন্যতম, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। শেষোক্ত জনের 'কিতাবুল মালিকী' তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৮৭৭ খৃ. এটি কায়রো থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৪৯২ সালে ভেসিলে ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক ছিলেন ষ্টিফেন। আলী ইবনে আব্বাসের (মৃত্যু ৯৯৪ খৃ.) একটি গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদকের পাণ্ডুলিপি

Gottingen লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের নাম 'Tractatus de Medicina'- ৩ খণ্ডে বিভক্ত; প্রতিটি খণ্ডের নাম যথাক্রমে Liber Saritates, Liber Morbi এবং Liber Signorum. আলী ইবনে আব্বাসের শ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুল মালেকী'- 'কামিনুস সানাআত' নামেও পরিচিত। সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে লায়নস্ সংস্করণের পর Michael de Capella এটি ভাষ্যসহ পরে পুনঃ প্রকাশ করেন। তার নাম হল - Liber Tolius medicinae necessaria Continens, guem Haly filus Abbas editit regiqul inscripsit, under regalis dispositionis nomen assumpsit. ২০ খণ্ডে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থটির প্রথম ১০ খণ্ডে তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে এবং শেষ ১০ খণ্ডে ব্যবহারিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় ও ৩য় খণ্ডে রয়েছে এনাটমী সংক্রান্ত রচনা। Dr. R. Koning লিভেন থেকে ১৯০৩ সালে এই দুই খণ্ডের Trais traites d'anatomic Arabes নাম দিয়ে ফরাসী ভাষায় ভাষান্তরিত করেছেন। বইটি ১৯তম খণ্ডের ১১০টি অধ্যায়ে সার্জারী নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

রোগের উপসর্গ কারণ ও চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আলী ইবনে আব্বাস পূর্বেকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাথে সমসাময়িক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতবাদ ও উল্লেখ করেছেন। হিপোক্রেটস, গ্যালেন থেকে শুরু করে ইসহাক বিন হুনায়ন পর্যন্ত অনেকের মতবাদ এর মধ্যে পড়ে। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমূল্য ইতিহাসও এতে সংযোজিত হয়েছে বলা যায়।

তাঁর সার্জারী সম্পর্কে আলোচনা করা সম্বন্ধে Mettler বলেন, 'আলী ছিলেন সুদক্ষ শল্যবিদ, যিনি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি ক্যানসারের অপারেশন করেছেন। সার্জারী ছাড়া শুদ্ধ চিকিৎসা বিষয়ে তিনি পথ্য, মেটিরিয়াকো মেডিকা নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনায় রোগ নিবারক হিসাবে বারবার বমন করানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ঔষুধ ব্যবহারের নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নারকেল ব্যবহার। একজিমা, পাঁচড়া, মেছেতা, গোদ, কুষ্ঠ, বসন্ত, হাম, ইরিসিপিলাস নিয়েও বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। যৌন বিষয়ক পদ্ধতিতে তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক সারটনের মতে, আলী ইবনে আব্বাসের গ্রন্থেই Capillary System এর প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তিনি তীক্ষ্ণ নিরীক্ষক ছিলেন, যেমন তাঁর মতে, সন্তান প্রসবের সময় জরায়ুর গতিময় আবেগে সন্তান আপনি বেরিয়ে আসেনা ঠেলে বের করে দেয়।

হাসান ইবনে নূহ ১০ম শতাব্দীর শেষদিকে অন্যতম চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তবে তাঁর খ্যাতি, তিনি ইবনে সীনার শিক্ষক ছিলেন। জিবাল প্রদেশের 'কুম' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম ও একাদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাগদাদে চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "কিতাবু গানা ওয়া মানা" ৩ খণ্ডে বিভক্ত এবং সব চাইতে বিখ্যাত। অন্যান্য গ্রন্থ হলো- ''মাকালাতু ফিত্তীব' 'মুসতালাহাতেত্ তীব এবং 'কিতাবু এলালিন এলাল'।

আবু মনসুর মুয়াফাক, আরব-চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুটো কারণে বিশিষ্ট। একটি হলো তিনি প্রাদেশিক ভাষা ফার্সীতে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, অন্যটি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে রসায়ন সংযোগ সাধন করেছেন। সামানীয় নৃপতি মনসুর ইবনে নূহের (৯৬১-৯৭৬ খৃ.) রাজত্বকালে হিরাতে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে গুটি কতেক মনীষী রসায়নকে যোগ করেছেন তিনি তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি সোডিয়াম কার্বনেট এবং পটাশিয়াম কার্বনেট কার্যকারিতার পার্থক্য সম্বন্ধে যেমন লিখেছেন তেমনি তামা ও সীসা প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের বিষক্রিয়ার পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। এছাড়া কলিচুনের (quick Lime) লোমনাশক গুণ, Plaster of Paris তৈরী করতে ও সার্জারীতে এর ব্যবহার সম্পর্কে, Cupric Oxide ও silicic acid প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

ইবনে সীনা প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মাতৃভাষা ফার্সী হওয়া সত্ত্বে তাঁরা আরবীতেই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন, এক্ষেত্রে প্রথম ব্যতিক্রম এই-আবু মনসুর মুয়াফাক। মাতৃভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রচারের এই বিজ্ঞানী-৯৭৫ খৃ. দিকে 'কিতাবুল অবনিয়া আন হাকায়েকুল আদবিয়া, নামে ফার্মাকোলজী বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর মালমসলা সংগ্রহে তিনি পারস্য ও ভারতবর্ষের বহু জায়গা ভ্রমণ করেন। ফার্সী-ভাষায় এটি সর্ব প্রথম গদ্যগ্রন্থ। ৫৮৫টি প্রতিষেধক, তন্মধ্যে ৪৬৬ উদ্ভিদ, ৫৪টি ধাতব ও ৪৪টি জান্তব ঔষধের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থটি ১০৫৬ খৃ. কবি আসাদী কপি করেন। ইউরোপের লাইব্রেরীতে যে পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আসাদীরই অনুলিপিকৃত। Prof F. R. Seligman ভিয়েনা থেকে সংগ্রহ করে প্রথমে ল্যাটিন ও পরে ১৮৫৯ খৃ. ফার্সী ভাষায় পাণ্ডুলিপি সংস্কার করে প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে আব্দুল খালেক আকন্দ, পল হর্ণ, অধ্যাপক রবার্ট, অধ্যাপক জলি যৌথভাবে Halle থেকে গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন, যার নাম Die Pharmako Logischess Crundsatgedes Abu Mansur.

মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাঈদ আত্ তামিনী আল মুকাদ্দেসী জেরুজালেমে জন্ম গ্রহণ করেন। আল কিফতির মতে, চিকিৎসা সম্পর্কে আত্ তামিনীর জ্ঞান ছিল সুদূর প্রসারী এবং ওষুধ তৈরীর প্রণালী ছিল বিজ্ঞানসম্মত। তিনি 'তিরয়াক' কে ফলপ্রদ ওষুধ হিসাবে দাঁড় করান। এ সম্পর্কে তাঁর একাধিক গ্রন্থও আছে। মিশরের খলীফার অনুরোধে তিনি লিখেন 'মান্দাতিল বেকা বে এসলাহে ফাসাদিল ওয়াত তাহরাবরুষ মিন জারারিল ওবা' নামক কয়েক খণ্ডের একটি গ্রন্থ। তামিনী ওষুধ নিয়ে বেশী গবেষণা করেছেন, তাঁর রচনাবলীর বেশীর ভাগই Materia medica নিয়ে রচিত। মিশরে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন শেখ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মোহাম্মদ আল বালাদি। তিনি গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে "তাদবীরুল হাবালা ওয়াল আতফাল ওয়াস সীবিয়ান" নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ইউরোপে স্পেনীয় খৃষ্টানরা শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। তাদের কাছে এটা অধার্মিকতা ছিল। পোপ ৮ম বেনিকস ১২৯৯ খৃ. এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেন এবং এনডিয়াস ভেসাসিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪) একটি শব-ব্যবচ্ছেদ করায় ইন্কুইজিশন তাকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউরোপে তখনও মান্ধাতার যুগে নিমজ্জমান। স্পেনে মুসলমানদের আগমনে এখানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয়। সার্জিকেল বিদ্যা ধর্ম নষ্টের কারণ যারা বলত সেই সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আল জাহরাবী (৯৩৬-১০১৩) ইউরোপে 'বুকাসিস' আল 'জাহারভিয়াস' ইত্যাদি নামে পরিচিত সমগ্র স্পেন তথা ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। হিট্টির মতে, স্পেনের আরব চিকিৎসাবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ।' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আত্ তাসরীফ' ২ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ৩০টি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। প্রথম খণ্ডে এনাটমী, ফিজিওলজী ও ডায়েটিটিকস সম্পর্কে এবং শেষ খণ্ডে সার্জারী সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। শেষ খণ্ডটিই এ বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম সচিত্র শল্যবিদ্যা গ্রন্থ। বইটিকে সারটন 'Medical Encyclopedia' নামে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থের সবখানেই রয়েছে মৌলিকতার ছাপ।

আবুল কাসেম আজ্ জাহরাবীর গ্রন্থের সার্জারী অংশটি বহুবার বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। জিরার্ড মূল আরবী পাঠসহ 'De Chirurgia' নামে ল্যাটিনে

প্রথম অনুবাদ করেন, এটি Salerno এবং Montepelliar বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক শতাব্দী যাবত পাঠ্য ছিল। গ্রন্থে ২০০ প্রকার সার্জারির যন্ত্রপাতির ছবি পরবর্তীতে ইউরোপের সার্জারীর যন্ত্রপাতির নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ড. ক্যামপবলের মতে, এটি ৫ বার পরপর ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং খুবই প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। ইউরোপের The Restorer of Surgery নামে পরিচিত Guy de Chaulic তাঁর গ্রন্থে ২০০ বার আবুল কাসেমের (Albucasis) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাছাড়া Roger of Parma Lanfrance, Salicate প্রমুখ তাঁর গ্রন্থ থেকে ঋণ স্বীকারপূর্বক বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

আবুল কাসেমের 'আত্ তাসরীফ' নানা কারণে ইউরোপের অপরিহার্য সার্জিকেল গ্রন্থ। এম. আকবর আলীর কথায়, "আবুল কাসিমের প্রকাশ ভঙ্গির মহিমায় গ্যালেনের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। তাই ইউরোপ যখন বিজ্ঞানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং আত্ তাসরিফের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে তখনও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার প্রভাব কমেনি। একটা কথা সর্ববাদী সম্মত যে তাঁর এই গ্রন্থের প্রভাবেই ইউরোপে সার্জারীর মান বিশেষভাবে উন্নত হয়।" এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী সমগ্র পৃথিবীতে মৌলিক অবদানের কারণে যতটুকু খ্যাতি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন ততটুকু পাননি। একটি কারণ তৎকালে সার্জারী সম্পর্কে ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজের বাঁকা দৃষ্টি অন্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীপ্যমান শিখা ইবনে সীনার আবির্ভাব।

সচিত্র যন্ত্রপাতির উল্লেখ 'তাসরীফের' বিশিষ্টতার অন্য প্রধান দিক। ড. এম. আবদুল কাদের লিখেন ঃ আরব নবজাগরণের পূর্বের অল্প কয়েকটি চিত্র পাওয়া গেছে সত্য, কিন্তু আবুল কাসিমের পূর্বে অস্ত্রোপাচার যন্ত্রের চিত্রাঙ্কনের কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা হয় নাই। মধ্য যুগের অধিকাংশ চিত্র তাহার গ্রন্থ হইতেই গৃহীত। অস্ত্র চিকিৎসার যাবতীয় পুস্তকে আজকাল যন্ত্রাদির চিত্রাঙ্কন অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই নব প্রবর্তনের জন্য বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট ঋণী।" আবুল কাসেমের লিখিত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি ইউরোপের গোথা, অক্সফোর্ডের Bodleian, প্যারিস, ফ্লোরেন্স, Bamberg, Francaise, মন্টেপেলিয়ার ভেনিস রক্ষণাগারে সুরক্ষিত আছে। ১৪৭১ খৃ. Liber Servitoris sive Liber নাম দিয়ে ভেসিল থেকে প্রকাশিত হয় সার্জারী অংশ। অনুবাদক যথাক্রমে Simon Januensi এবং Abraamo Judaeo ছিলেন। ১৪৯৭ খৃ. Chirurgia Parva নাম নিয়ে ভেনিশ থেকে আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং

পরে একাধিক সংস্করণ বের হয়। ১৫৩২ খৃ. Schott-এর অনুবাদে Strassburg থেকে প্রকাশিত হয় এই নামে Albucasis methodus medendi cum instrumentis ad omnes fere morbos depicts. এবং ১৭৭৮ সালে John Channing Oxford থেকে প্রকাশ করেন Albucasis de Chirurgia; এই অনুবাদের একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ১৮৬১ খৃ. Lucien Le Clere কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে।

আবুল কাসেম (বুকাসিসের)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কুষ্ঠরোগ, শিশুরোগ, রিকেট, কানের অসুখ, glucoma এর চিকিৎসা, শরীরে বিষক্রিয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন। তাঁর মোট গ্রন্থ প্রায় ৬টি।

একাদশ শতাব্দীর তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনুল জাজযার (মৃত্যু. ১০০৯ খৃ.) ল্যাটিন অনুবাদের কৃপায় যিনি ইউরোপে Algizar, Algazirco প্রভৃতি নামে পরিচিত, তিউনিসিয়ার কায়রান শহরের অধিবাসী ছিলেন। স্পেনীয় প্রভাবপুষ্ট এই বিজ্ঞানী 'যাদুল মুসাফির' গ্রন্থে বসন্ত, হাম, প্লেগ, সর্দি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি কনস্টেনটাইন আফ্রিকানা ল্যাটিনে, Synesis গ্রীক ভাষায়, Rabbi Moshen ben Tibbon হিব্রুতে অনুবাদ করেন। তিনি মোট ২২টি বই লিখেছেন।

এ সময়ে স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ইউরোপে যিনি Abenguefit নামে পরিচিত, আবুল মোতারিফ আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ ওয়াফিদ আল আযমী। ৯৯৭ খৃ. টলেডোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৭৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সাধারণ ওষুধ ব্যবহার করতেন এবং তাও অতি সাবধানে ও কদাচিৎ। তাঁর 'কিতাবুল আদবিয়াত আল মুফরাদাত' এখনও অমুদ্রিত কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ ল্যাটিনে অনূদিত। ১৫৩১ খৃ. Tacuin Sanitate ও Alkindus প্রকাশিত ও বহুবার মুদ্রিত। ইবনুল ওয়াফিদ balneotherapy বিষয়েও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যা ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল।

Canamusali নামে পাশ্চাত্যে পরিচিত ইরাকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম আম্মার বিন আলী আল মওসুলী খলীফা আল-হাকিমের (৯৯৬-১০২০ খৃ.) রাজত্বকালে খ্যাতি লাভ করেন। চক্ষু চিকিৎসা বিশেষ করে চোখের ছানি অপারেশনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে তাকে মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম মৌলিক চিকিৎসাবিদ বলা হয়। সারটনের মতে, The most

original of Muslim occulist, চোখ অপারেশনে তাঁর দক্ষতা আলী ইবনে ঈসা সমসাময়িক কালে আবির্ভূত না হলে খুবই খ্যাতি লাভ করতো তবুও আম্মার বিন আলীর দান মৌলিক। এগুলোর বক্তব্য সেটাই প্রমাণ করে-Ammar bin Ali in most unusally overshadowed by his contemporary, the more famous but less original Ali Ibn Isa.

'কিতাবুল মনতাখাব ফি এলাজিল আইন' আম্মারের চোখের রোগ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপাচারের বিশিষ্ট রচনা। চোখের ছানি অপারেশনে তিনি শোষণ করে নরম ছানি তুলে ফেলার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি একটি ফাঁপা সূচ Selerotic এ ঢুকিয়ে দিয়ে শোষণ করে লেন্স তুলে নিতেন। এতে anterior chamber -এ কোন ছিদ্র করবার দরকার হতো না এবং জলীয় পদার্থ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। বলা বাহুল্য, ১৯ শতকে ইউরোপে এ প্রথাই পুনরাবিষ্কৃত হয়। এলগুড বলেছেন : 'Europe rediscovered the principle in the nineteenth century : আম্মার চোখের Anatomy, Pathology এর চোখের ৬ প্রকার ছানি ও পীড়া নিয়ে মৌলিক চিন্তা উপহার দিয়েছেন। Nathan-hq-Miati ১৩ শতকের শেষদিকে হিব্রুতে 'এলাজিল আইন' অনুবাদ করেন। জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় ও অনেক অনুবাদ বের হয়। তাঁর অন্য চিকিৎসা গ্রন্থটি হল 'মুনতাখাব ফি এলমিন আইন ওয়া আলালেহা ওয়ালদাওলাতেহা বিল আদবিয়াতিল হাদীদ।'

প্রখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ ও গণিতবিদ ইবনুল হাইছাম চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে এক যুগপৎ অবদান রেখেছেন। Physics ও mathematics সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চোখের এনাটমী পরীক্ষা করে তিনি Scleroid, cornea, Choroid, Iris প্রভৃতির পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি চোখের retina, optic nerve এর কাজ, চোখের দুই রসের জলীয় (aqueous) এবং স্বচ্ছ (Vilreous) কাজ প্রভৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

বর্তমানের 'Lens-' ইংরেজী শব্দটি ইবনুল হাইছামের আরবীতে ব্যবহৃত 'আদাসা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আদাসা' অর্থ মসুরের ডাল, চোখের লেন্স মসুরের ডালের মত biconvex, ল্যাটিন অনুবাদকরা এই আদাসাকে তাই Lenticulum বলে অনুবাদ করেন। এই শব্দটি আজ lens নামে পরিচিত হচ্ছে।

ইবনুল হাইছামের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে চশমা আবিষ্কারে সাহায্য করে বলে তিনি চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ।

হিট্টির বক্তব্য, In certain experiments he approaches the theoretical discovery of magnifying gflasses which was actually made in Italy three centuries later.

আবুল হাসান আলী ইবনে রেজওয়ান আল মিশরী (জন্ম ৯৯৮-মৃতু ১০৬৬/৬৭ খৃ.) ইউরোপে Haly Even Rodan বা Rodohan নামে পরিচিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগ তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রকেলম্যান ২৭টি এবং আবি উসায়বিয়া তাঁর ৮৪টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল বিরুনী চিকিৎসা বিষয়েও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে তিনি ফার্মাসী বিষয় নিয়ে লিখেছেন। হামারনেহ বলেছেন : The introduction represents a Masterpice of noteworthy pharmaceutical literary accomplishment. It is a monumental contribution not only for this medieval Arabic period but to the history of pharmacy for all times.

মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে দুই জন মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানীর প্রতিভা আজো পৃথিবীর কাছে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দেদীপ্যমান তাঁরা হলেন আল রাজী এবং ইবনে সীনা। ইবনে সীনা বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় অপরিহার্য মৌলিক অবদান রেখেছেন তবে তার সবচেয়ে বেশী খ্যাতি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনে। গ্যালেনকে বলা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষক; আর ইবনে সীনাকে বলা হয় 'মুয়াল্লেমা সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষক।

আবু আলী আল-হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭) পাশ্চাত্যে 'Avicena' নামে পরিচিত। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু করেন এবং বুখারার সামানীয় সুলতান নূহ বিন মনসুরের (৯৭৬-৯৯৭) ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। মাত্র ২১ বছর বয়সে ইবনে সীনা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'আল কানুন ফিত্ তীব'। এছাড়া এ বিষয়ে তিনি আরো ১৫টি পুস্তক রচনা করেন।

ইবনে সীনার 'কানুন' প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ। একাদশ শতাব্দী হতে ১৭'শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৫টি শতাব্দীরও বেশী সময় কানুনের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত ছিল। A. C. Crombie বলেন, It saw many Latin editions, fifteen during the last thirty years of the fifteenth Centutry and farther twenty dur-

ing the sixteenth century. Several more were printed in seventeenth century. বলা হয়েছে কানুন হল মেডিকেলের বাইবেল। osler এর কথায় - Canon remained a Medical Bible for a longer period than any other work. গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। গ্রীক, রোমান, ভারত ও চীনা চিকিৎসা পদ্ধতির সার সংগ্রহ করে এই বৃহৎ চিকিৎসা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৫০টি গুল্ম, প্রাণীজ ও খনিজ ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলো ওষুধ এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৮০০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই খণ্ডে প্রত্যেকটি ওষুধের পরিচিতি, ব্যবহারের পরিমাণ, কার্যকারিতা, কোন্ কোন্ রোগে কোনটি ব্যবহার্য, বিকল্প ওষুধ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। প্রথম খন্ডে রয়েছে physiology এবং hygiene এর সাধারণ মূলনীতি নিয়ে আলোচনা।

'কানুন'-এর তৃতীয় খণ্ডে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ, সেগুলোর Symptom, diagnosis, Prognosis, চিকিৎসা এবং etilogy সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন ইবনে সীনা। মাথার রোগ যেমন, মাথাধরা, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, অবশতা, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের অসুখ; হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ, পৌষ্টিক নালী তথা পেট, অন্ত্র, যকৃৎ, পিত্ত ও প্লীহার রোগ, জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রোগ, গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ ছাড়াও পেশী, সন্ধিস্থান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। চক্ষু রোগ সংক্রান্ত অংশ ১৯০২ সালে Hirchberg এবং Lippert জার্মান ভাষায় 'Die Augenheilkunds des Ibn Sina নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির ৪র্থ খণ্ডে জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, খাদ্যের অনিয়ম, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, প্রদাহ, পচন, শারীরিক রসের গোলমাল, মহামারী, বসন্ত, যক্ষ্মা, ফোড়া, কুষ্ঠ, ঘা, হাড়ভাঙ্গা, স্থানচ্যুতি, আলসার, খনিজ উদ্ভিদ ও প্রাণীজ পদার্থের বিষক্রিয়া, সৌন্দর্য প্রসাধনী, চুল, নখ, চর্ম, গাত্রগন্ধ, লিউকোডারমা, পেডিকেলোসিস ইত্যাদি নিয়ে অলোচনা করা হয়েছে। ৫ম খণ্ডে বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র, বড়ি, পাউডার ও সিরাপ ইত্যাদি তৈরী করা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সম্প্রতি যে গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে ইবনে সীনার, তা থেকে জানা যায়, তিনি বর্তমানে যা psycho-therapy নামে পরিচিত তার সূত্রপাত করেন। কোটায়সের মতে, 'Avicenna was perhaps one of the first to state the intimate relations which exist between psychology and medicine and in his treatment of disease he kept in sight always the psychologi-

cal element so ipmportant to hasten a cure or prevent a crisis. দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া লাইব্রেরীতে ইবনে সীনার একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। পাটনা, বাঘপুর এর বৃটিশ মিউজিয়ামেও এ পাণ্ডুলিপির কপি পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে হার্টের রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মৌলিক পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

হাকিম আবদুল লতিফের ভাষায়; 'Avicenna's researches on 'Heart drugs' are most original and I belive are stil capable of revolutionizing our ideas on Heart Therapy' এতে মানুষের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা যেমন ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, আনন্দ, স্নেহ ও অন্যান্য অনুভূতি মানুষের হার্টের এবং রক্তের উপাদানের কাজের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ঔষধ হার্টে কি রকম কাজ করে এবং সেসব কোন অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে তারও আলোচনা করেন। মোটকথা, মানুষের নৈতিক গুণাবলী আত্মার সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে হার্টের উপর কাজ করে তা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। হার্টের অসুখের জন্য তিনি কতগুলো ওষুধের বিবরণ দিয়েছেন, তন্মধ্যে মদের দোষ, মুক্তা ও রেশমের গুটি, কাবুলী, আমলীক, লাল কোরাল, আম্বর, কর্পূর, গোলাপ পানি, সুগন্ধি, সুমিষ্ট ভেষজ, গাওজরানের পাতা এবং লাজওয়ারদ ইত্যাদির উপকার অন্যতম।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাজী এবং ইবনে সীনা দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে পণ্ডিতগণের মতে বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সেদিকে না গিয়ে বলা যায়, ইবনে সীনার অবদান প্রধানত তাত্ত্বিক বিষয়ে আর রাজীর অবদান প্রধানত ব্যবহারিক ক্লিনিকসে।

ইউরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে ইব্‌ন সীনার প্রভাব অসামান্য। Encyclopaedia Britania তে টমাস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেছেন, 'ইবনে সীনার 'কানুন' হিপোক্রোটস ও গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে।' ক্রিমোনার জিরার্ড এটি ল্যাটিন অনুবাদ করেন এবং কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের চিকিৎসা শাস্ত্রের পথ প্রদর্শক হিসাবে পরিগণিত ছিল। ঐতিহাসিক কে. আলী লিখেন ঃ 'বর্তমান কালেও এটি ইউনানী পদ্ধতির মুখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে এর ১৫টি ল্যাটিন ও একটি হিব্রু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতএব এর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত কোন গ্রন্থ এত বেশী পঠিত হয় নাই। ইতালীয় কবি দান্তে ইবনে সীনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলে ইবনে সীনা এত বেশী জনপ্রিয় ছিলেন

যে, এখনও প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের বিরাট হল ঘরে তাঁহার প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।'

বখত ইয়াশু পরিবার মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসা জগতে ৩ শত বছর ধরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আবু সাঈদ উবায়দুল্লাহ (মৃত্যু ১০৫৮ খৃ.) এ বংশের সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। পরিবারের সবাই খৃষ্টান ধর্মে অটল ছিলেন। আবু সাঈদ অনেকগুলো চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন।

আলী ইবনে ঈসা চক্ষু চিকিৎসকদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন। ইউরোপে তিনি Jesu Haly নামে পরিচিত। হিট্টির মতে, মধ্যযুগে আরব চিকিৎসা জগতে ৩২টি চক্ষু বিষয়ক রচনার মাঝে আলী ইবনে ঈসার 'তাজকিরাতুল কাহ্হালিন' সর্ব প্রাচীন ও সম্পূর্ণতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এলগুড বলেন : His Book is the most complete text book on eye diseased which the Arab school produced, besides being the most original of all the early treatises written on the subject. তিন খণ্ডে বিভক্ত উক্ত গ্রন্থের একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১ম খণ্ডে চোখের বহির্দেশের রোগ সম্পর্কে এবং ৩য় খণ্ডে চোখের অন্তর্ভাগের রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বর্তমানে opthalmoscope এবং চোখের retina ও ভিতরকার বিশ্লেষণ, চক্ষু চিকিৎসায় যে বিপুল পরিবর্তন এনেছে তখনকার দিনে তা ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্পনারও বাইরে। তারা তখনও ভাবতে পারতেন না যে চোখের অন্তর্ভাগের পরীক্ষায় বহুমূত্র, কিডনী রোগ cerebral tumour ইত্যাদি রোগের কথা সহজেই ধরা পড়ে। আলী ইবনে ঈসা সে সময়েই এসব ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। তাঁর মতে, চোখের দৃষ্টিহীনতা পেটের কোন রোগ বা মস্তিষ্কের কোন রোগের জন্যও হতে পারে। তিনি তাঁর গ্রন্থে ১৩০টি চোখের রোগের সুনিপুণ বর্ণনাসহ ১৪৩টি ঔষুধের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ছিল পাশ্চাত্য চক্ষু চিকিৎসার ভিত্তি। Mettler বলেন, এ গ্রন্থের অনুবাদ ইউরোপে ৭ শত বছর ধরে পাঠ্য ছিল। হিব্রু, ল্যাটিন, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় এটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ল্যাটিন অনুবাদের কারিশমায় Bengesla, Buhahylgyh, Beyengezle নামে পরিচিত ইয়াহিয়া ইবনে ঈসা ইবনে আলী ইবনে জাযলা (মৃত্যু ১০৮০ / মতান্তরে ১১০০ খৃ.) দরবারী চিকিৎসক ছিলেন। পরিণত বয়সে খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'কিতাবু তাকযীমুল আবদান' ও 'মিনহাজুল বায়ান ফি মা ইয়াসতামালাহুল ইনসান' তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক। তিনি জ্বর, চর্মরোগ ও

রোগের পূর্বাভাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। স্ত্রীরোগের বর্ণনায় তিনি তখনকার দিনেও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। বহু অনূদিত 'তাকবিম' গ্রন্থে ৩৫২টি রোগ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

সাঈদ ইবনে হিবাতুল্লাহ (১০৪৪-১১০৪খৃ.) ছিলেন খলীফা আল মুকতাদিরের চিকিৎসকমণ্ডলীর অধ্যক্ষ। তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থ 'Discourses on the Creation of Men' প্রধানত প্রজনন, গর্ভধারণকাল, প্রসব পুষ্টিসাধন, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে রচিত।

'জরিন দাস্ত' তথা শল্যবিদ্যায় 'স্বর্ণহস্ত' উপাধিপ্রাপ্ত, পারস্যের মুহাম্মদ ইবনে মনসুর জুরজানী- সেলজুক শাসক মালিক শাহের (১০৭২-১০৯২ খৃ.) সময় আবির্ভূত হন। চক্ষু চিকিৎসায় তাঁর গ্রন্থ নূরুল উয়ুন (The light of the Eyes) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডে সংরক্ষিত আছে।

'মুসলিম স্পেনে ইবনে জুহর পরিবার ছয় পুরুষ ধরে দীর্ঘ তিন শতাব্দী চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পাশ্চাত্যে Avenzoar পরিচিত আবদুল মালেক বিন আবিল আল জুহর, ১০৯১ হতে ১০৯৪ খৃ. মধ্যে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। সারটনের মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুধু Physician হিসাবেই থাকতে তিনি পছন্দ করতেন। আল রাজীর পর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ Clincian. Prof. E. R. Long তাঁর history of Pathology গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে জুহর পাকস্থলীর ক্যান্সার (gastric carcinoma), কণ্ঠনালীর ক্যান্সার ও serous pericarditis প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন itchmite এর জন্যে খোঁস পাঁচড়া (scabies) হয়। তিনিই সর্বপ্রথম পাণ্ডু রোগের (Jaundice) জন্য রেজওয়ার পাথর ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। এই ব্যবস্থা ষষ্ঠদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত ছিল। Noctole Mondares (1492-1588) তার এই ব্যবস্থা হুবহু অনুসরণ করেছেন।

ইবনে জুহরের ৩টি চিকিৎসা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। তাহলো 'কিতাবুত তাইসির' (Book of Simplification Concerning Therapeutics & diet), 'কিতাবুল আগজিয়া' (Book of Food Stuffs) এবং 'ইকতিসাদ ফি ইসলাহিন নফুস ওয়াল আজসাদ' (Book of the Iqtisad Concerning The Reformation of Souls and Bodies)। তবে এ বিষয়ে 'কিতাবুত্ তাইসির' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ড. এম. আবদুল কাদের জানিয়েছেন, অস্ত্র চিকিৎসায় ইবনে যুহরের আবিষ্কারও যথেষ্ট। শ্বাসনালী অস্ত্রোপচার (Wacheotoms) ও পাতলা হৃদয়

বেষ্টনী কোষের (Percarditis) মৌলিক বিবরণের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তার নিকট ঋণী। ড. ক্যাম্পবেলের মতে, 'মধ্যযুগের মুসিলম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে জুহরের প্রভাব সব চাইতে বেশী'।

জুহর এর কন্যা, পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে আরো চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়েছে। তদীয় পুত্র আবু বকর মোহাম্মদ এবং আবু বকরের পুত্র আবু মোহাম্মদ বিন আল হাফিদ চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বাগদাদের ইব্রাহীম বিন তিলমিজ (জন্ম ১০৭৩ খৃ.) আজুদী হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি গ্রীক ও আরবী চিকিৎসা গ্রন্থের অনেকগুলো ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম মহানবীর (সা) চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসগুলো নিয়ে একটি ভাষ্য তৈরী করেন। এছাড়া Pharmacopia বিষয়ে একটি গ্রন্থ তাঁর আছে।

সমসাময়িক আরো কয়েকজন চিকিৎসক হলেন আলী মালকা, হিবাতুল্লাহ আল ইসপাহানী- (মৃ. ১১৪৫ খৃ.), ইসমাঈল আল জুরজানী (ম. ১১৩৫-৩৬ খৃ.) আল গাফিকী, ইবনে রুশদ, ফখরুদ্দীন রাজী, অন্যতম।

ইসমাঈল বিন হাসান আল জুরজানী ফার্সীতে রচিত 'জাখিরায়ে খারিজম শাহী' তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট। ফার্সীতে সর্বপ্রথম Medical Encyclopedia' এটি। ৯ খণ্ডে বিভক্ত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সম্পর্কে এলগুড, বলেন, The importance of this work lies not merely in its contants, which are themselves a masterful, concise and easily understood exposition of the whole system of medicine as was taught in his day but rather in the language in which it was written. Al-Jurjani did for Persian science what the Bible did for the English Prose.

স্পেনের ইবনে রুশদ দার্শনিক হিসাবে খ্যাতিমান হলেও তিনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকও ছিলেন। দার্শনিক খ্যাতির কাছে তাঁর এই অবদান চাপা পড়ে গেছে। রেনাল এর মতে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর রচনার সংখ্যা ২০টি। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান' কুল্লিয়াত ফিত্ তীব'। ল্যাটিনে Colliget নামে অনূদিত হয়ে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ Liber Universalis de Medicana - হিসাবে প্রচারিত হয়। ১১৬২ খৃ. সময়ের পূর্বে লিখিত ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্ব কোষের শিরোনাম বিষয়গুলো হল-anatomy, Physiology, General Pathology, diagnesis, materia medica, hygiene, therapeutice. এই গ্রন্থ বহু ভাষায় বহুবার অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি ইউরোপে 'Averros' নামে পরিচিত।

৬-

ফুসফুসের গঠনতন্ত্র আবিষ্কারক মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু হাসান আলী ইবনে আবিল ইবনে নাফিস আল মিশরী (মৃত্যু ১২৮৮/৮৯ খৃ.) ইবনে নাফিস নামে সমধিক পরিচিত। পূর্ববর্তী খ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ভাষ্য রচনা ছাড়াও চক্ষু রোগ ও ঔষুধ বিষয়ে দুটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্যালেন ও ইবনে সীনার মত বিজ্ঞানীদের দুঃসাহসী প্রতিবাদ করে তিনি রক্ত চলাচল সম্পর্কে তাঁর মতামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অবিসম্বাদিত মতামত যে, শিরার রক্ত (Vinous blood)-এর দৃশ্য বা অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডান দিক থেকে বাম দিকের হৃত প্রকোষ্ঠে চলাচল করেনা বরং এ সব সময়েই ধমনী শিরার (Vinous artery) ভিতর দিয়ে ফুসফুসে পৌছায়, সেখানে বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে শিরার ধমনীর (Arterious vein) মধ্য দিয়ে বাম দিকের হৃৎপ্রকোষ্ঠে যায় এবং সেখানে এ জীবন তেজ (Vital sprit) গঠন করে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে নাফিসের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোন স্বীকৃতি পাননি। কেননা ১৯২৪ খৃ. পূর্বে তার এই অবদানের কথা কেউ জানত না। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী William Harvey (1578-1657) এই মতবাদের বর্তমান কৃতিত্বের অধিকারী। মিশরের বিজ্ঞানী ড. মহীউদ্দীন আত্ তাবায়ী তাঁর ডক্টরেট থিসিসে নাফিসের এই অবদানের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইবনে নাফিসের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আল মুজীয্ ফিত্ তীব' 'শামিল ফি সিনায়াত তিব্বীয়া' 'আল মুখতার মিনাল আগজিয়া', 'মুহাজজিব ফিল কুহল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আলোপ্পোর অধিবাসী খলীফা ইবনে আবিল মহসিন আল হালাবী চক্ষু চিকিৎসক ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে অমর। 'কাফি ফিল কুহল' তাঁর রচিত বিখ্যাত চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থ। প্যারিসের Bibliothique National-এ রক্ষিত এর একটি পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায় গ্রন্থটি ১২৬৫ খৃ. দিকে প্রণীত। চক্ষু রোগ ও এর চিকিৎসার বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াও চোখ, চোখের নার্ভ, মস্তিষ্ক এবং এ সংক্রান্ত চিকিৎসার ৩৬টি যন্ত্রপাতির ছবি বিস্তারিতভাবে অংকিত ও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ সময় সিরিয়ার বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ সালাহউদ্দীন ইবনে ইউসুফ এ বিষয়ে 'নুরুল আইয়ুন ওয়া জামিউল ফুনুন' (Light of the eyes and Collection of rules) নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়কার নাসির উদ্দীন তূসী, কুতুব উদ্দীন শিরাজী প্রমুখ বিজ্ঞানী চিকিৎসা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেন।

১৪ শতকে স্পেনে আবির্ভূত হন আলী ইবনে খাতিমা আল আনসারী (জন্ম

১৩২৪) প্লেগ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট রচনা 'তহসিনে গারাজিল ফাব্রিদ ফি তাফসিনিল মারাজিল ওয়াফফিদ' একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে প্রশংসিত। ম্যাক্স মায়ার হফের ভাষায় - 'To appreciate the teaching of these writers it must be remembered that the doctrine of the Contagious character of disease is not emphasized by the Greek physicians and it almost passed over by most medieval writers.

মাহমুদ ইবনে ইলিয়াস দুর্ধর্ষ মোঙ্গলের অধীনে থেকেও চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধনায় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর 'হাবী ফি ইলমুত তাদাবী' (The Containing or Continens concerning the Art of Treatment) গ্রন্থটিকে পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থ বলা চলে। ১৩৩৬/৩৭ খৃ. লিখিত এর একটি পাণ্ডুলিপি গোথাতে বিদ্যমান আছে; মোট পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

আরব দার্শনিক ইবনুল আকফানী (মৃত্যু ১৩৪৮/৪৯ খৃ.) চিকিৎসা বিষয়ে ৩টি বই লিখেন। সারটনের মতে তিনি, 'Iraqi physician, Naturalist and Encyclopedist. তাঁর 'আহওয়ালিল আইন' গ্রন্থে চোখের ৪৩টি রোখের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চোখের পাতার Phlegmon, কার্বাঙ্কল, Cramps, twitching ইত্যাদি রোগ নির্ণয় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

চতুর্দশ শতকের চিকিৎসা বিজ্ঞানী রশীদউদ্দীন ফজলুল্লাহ (জন্ম ১২৪৭ খৃ.) অধ্যাপক ব্রাউনের ভাষায় ছিলেন ঃ equally eminint as a physician, a statesmen, a historian and a public benefactor, জামিউত তাসানিফুর রশীদী- 'এর মধ্যে সন্নিবেশিত তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে চীনা চিকিৎসাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্দশ শতক থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনন্য শাখার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুসলমানদের পতনের যুগ শুরু হয়। তবু এ সময় চিকিৎসাবিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন- প্যালেস্টাইনে আবু সাঈদ আল আফিক (জন্ম ১৪০৭ খৃ.) তাঁর গ্রন্থ 'লামহা ফিত্তীব ও 'খুলাসাতুল কানুন'; স্পেনের মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ (পাশ্চাত্যে AL Belbanus পরিচিতি) একই স্থানের মোহাম্মদ বিন আলী আশ শাকুরী (জ. ১৩২৫/২৭ খৃ.), আলজেরিয়ার ইবনে আলী হাজালী (জ. ১৩২৫ খৃ.) সিরিয়ার আল মাসবিজি (মৃ. ১৩৭০ খৃ.) সাদাক বিল ইব্রাহীম মিশরী আল শাদহিলী অন্যতম। শেষোক্ত শাদহিলীর চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক অনন্য অবদান 'উম্‌দা আল কুহলিয়া ফিল, আমরাজুল বাসারিয়া' (Opthalmological sup-

port for the disease of the sight organ) সুবিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখের পার্থক্য নিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা দেন। মুসলিম জগতে চক্ষু বিষয়ক শাদুহিলীর এই গ্রন্থই সর্বশেষ বলা যেতে পারে। এরপর মরক্কোর আবদুল্লাহ বিন আজীজ মারাক্কুশীর 'দাহির আল কুসুফ ফিত্তীব'- এ সংক্রান্ত গ্রন্থ যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান পাবার মত একজন বাঙালী চিকিৎসক আছেন- এ রকম তথ্য জানা যেত না কিছু দিন আগেও। বাঙালীদের গর্ব এই বিজ্ঞানীর নাম মোহাম্মদ আল মাহদী বিন আলী সুনপুরী আল ইয়ামানী আল হিন্দী। তাঁর লকব সুনপুরী (সুবর্ণপুর!) বাংলার পরিচয় এবং ইয়ামীনী, ইয়েমেনে বসবাসকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ইয়ামেনের আল মুকরীতে স্থায়ী বসবাস করতেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। সারটন তাঁর- Introduction to the History of Sciernce গ্রন্থে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, He was not a native of Yaman but a Hindu perhaps a Bengali. The obligation of the Pilgrimage drew Muslims from evry Where to the sacred cities, some of them never returned home but spent the rest of their life in the Hijaz or southern Arabia. Apparmently that is what happend to Muhammad Al-Mahadi, who settled down in Yaman. (Vol. 111 Part-2. Page-1215). সারটন তাঁকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। এটা সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন এম আকবর আলী। মোহাম্মদ আল মাহদী (মৃত্যু ১৪৩২ খৃ.) চিকিৎসা বিষয়ে রচনা করেন 'রহমা ফিত্তীব ওয়াল হিকমা' 'শিফা ওয়াল আজসাম, 'তাস হিলুল আনাফী ফিত্তীব ওয়াল হিকমা' ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থটি ৫ ভাগে বিভক্ত এবং যথাক্রমে পদার্থবিদ্যায়, খাদ্যবস্তু ও ঔষুধ, স্বাস্থ্য, শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগ এবং সাধারণ রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি কায়রোতে ১৩০০, ১৩০২, ১৩০৪, হিজরীতে মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত সংস্করণের 'তিব্বুন নবী' নামে একটি খণ্ডও যোগ করা হয়। এই গ্রন্থ prof, Florian Pharaon কর্তৃ ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং Prof, Alphonse Berthirand এর একটি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। সারটন উল্লেখ করেছেন, He Wrote kitab Al-Rahma fil-Tibb wal Hikma (Book of Mercy concerning Medicine and (medical) Wisdom. It was wrongly ascribed to the Egyptian polygraph al-Suyuti . সারটনের এই শেষ বক্তব্য ঠিক নয়।

এ সময় তুর্কীর মোহাম্মদ আল আকসারাই (মৃ. ১৩৬৮/৭৮) ইসহাক বিন মুরাদ, মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, হাজী পাশা (মৃ. ১৪১৭)-এর নাম চিকিৎসাবিদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। হাজী পাশার ৪ খণ্ডে বিরচিত 'শিফাউল আসকাম ও দাওয়ায়ুল আমল' চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ, অনেকটা ইবনে সীনার 'কানুনে'র অনুরূপ। প্রখ্যাত ফার্মাসিষ্ট সিরাজের জয়নুল আত্তার (জ. ১৩২৯ খৃ.) 'মিফতাহুল খাজায়েন' (Key of treasurs) ফার্সীতে লিখিত একটি মেটেরিয়া মেডিকো হিসাবে খ্যাত। এনাটমী বিদ্যা নিয়ে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত, তাসবির' নামক এই গ্রন্থে রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত, তাসবির নামক এই গ্রন্থে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়, স্নায়ু, পেশী, শিরা, ধমনী ও Compossite organs নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সর্বশেষ বিদগ্ধ ব্যক্তি গ্রানাডার ইবনুল খতীব (জন্ম ১৩১৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।

এভাবে আরো অনেক চিকিৎসাবিদগণের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেকগুলো ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে সবচেয়ে বেশী নাম এসেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে। এই শত শত বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে প্রধান কয়েকজনের পরিচিতি উক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলিম চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রোগীর রোগ নির্ণয়ে যে বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করতেন তা হলো- ১. বাহ্যিক অবস্থা, ২. তার মল মূত্রাদির অবস্থা, ৩. তার গায়ের গন্ধ ৪. বেদনার প্রকৃতি, ৫. বেদনার স্থান, ৬. শরীরের স্ফীতির স্থান ইত্যাদি। এজন্য দেখতে হতো রোগীর শরীর বিভিন্ন অংশের অবস্থা, রং গন্ধ, চক্ষু গহ্বর, মুখের আকার-ভঙ্গী, অবসন্নতা, রোগীর আচরণ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি বিষয়।

ইবনে সীনার মতে, শরীরের ৬টি বিষয় নিরীক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায় তা হলো ঃ ১. অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমন, দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়া, বদহজম ইত্যাদি, ২. বেদনার স্থান ও তীব্রতার পরিমাণ, যেমন ডান দিকের বেদনা যকৃতের এবং বাম দিকের বেদনা প্লীহার অস্বাভাবিকতার জন্য হয়, ৩. মলমূত্রের স্বাভাবিক ব্যতিক্রম অর্থ্যাৎ কোষ্ঠ কাঠিন্যতা উদরাময় ইত্যাদি, ৪. শরীরের ফুলা দেখে কারণ নির্ণয়, যেমন- ইরিসিপ্লাস ঘন পিত্তরসের উপস্থিতির নিদর্শন আর শক্ত ফুলা কাল পিত্তরসের ৫. আকৃতি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ, ৬. এবং

বিশেষ কোন উপসর্গ যা থেকে প্রত্যক্ষ রোগ নির্ণয় করা যায়। এজন্য নাড়ী পরীক্ষা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইবনে সীনার মতে, পুরুষের বাম হাত এবং মহিলার ডান হাতের নাড়ী দেখতে হবে। প্রস্রাব পরীক্ষার ১৭টি ধাপ ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে মল পরীক্ষায় ইহার রং, পরিমাণ, উপরকার ফেনা, মলের ঘনত্ব, বায়ু নিঃসরণ বিষয়গুলো দেখতে হবে।

গ্রীক চিকিৎসা ছিল অনেকটা তাত্ত্বিক বিষয়, মুসলিম সাধনার মধ্যে এর পার্থক্য হল মুসলমানরা হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন ও পেতেন। গ্রীকদের অন্ধ অনুকরণ থেকে রাজী, ইবনে সীনা, আবদুল লতিফ, সাঈদ বিন বিশর প্রমুখ চিকিৎক বেরিয়ে এসেছেন। আল রাজী সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন হাম ও বসন্ত দুটি পৃথক রোগ। এ সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ 'কিতাব হাসবাতি ওয়াল জুদরি' ইউরোপের প্রায় ১ ডজন ভাষায় অনূদিত হয়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'Sherringtons, Conditional Reflex Theory' নামে আর রাজীর মতবাদটি পরিচিত। শিশুরোগ সম্পর্কে রাজীর মতবাদ সম্পূর্ণ নিজস্বতা দান করেছে। তাঁকে Paediatrics-এর জনক বলা যেতে পারে। তিনিই সর্বপ্রথম Internal বা Ventriculla Huydrocephalus সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং Hydrocephalus নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন।

মুসলিম ফার্মাকোলজী (Pharmacology) ঃ

মুসলিম ফার্মাকোলজী তথা 'ঔষধ বিজ্ঞানে' বিদেশী প্রভাব অন্যান্য বিষয়গুলোর মত কাজ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে তথ্যানুন্ধান করে জেনেছেন যে, বর্তমানের Materia medica, Therapy Pharma centics ইত্যাদিসহ ঔষুধের দ্রব্য গুণাবলী এক সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

আরব বিজ্ঞানীরা pharmacology বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিন্যাসে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা মোটামুটি ৭ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. সমার্থ শব্দের গ্রন্থ (Synonymatic Trealises);

২. ব্যবস্থাপত্র সংকলিত গ্রন্থ (Medical Formularise);

৩. ব্যবহারিক ঔষধ বিজ্ঞানের তালিকা (Materia Medica)

৪. বিকল্প ঔষুধ (Substitute Drugs)

৫. ফলাকারে সাজানো সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ (Tabular, Synoptic Texts)

৬. বিষ ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ;

৭. চিকিৎসার কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ (Works on Medical Specialities)

আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ঔষুধকে সাধরণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ ১. মুফরাদা থেকে তথা অযৌগিক; ২. মুরাক্কাব তথা যৌগিক। অযৌগিক ঔষুধগুলোকে ৪১ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- মূলাত্তিফ (rarifying), মুহাল্লিল (loosening), জালি (Polishing), মুখাশশিন (Making rough), মুসখি (relasing), মুফাত্তিই (opening), মুনজিদ (digistive), হাদীস (purgative), কাসীরুর রিয়াহ (Wind breaking), মুকাত্তি (Cutting off), জাযিব (pulling), লাজী (biting), মুহায্যির (epispastic), মুহাক্কিক (stimulent), মুকাররিহ (ulcerating), মুহরিক, (caustic), আক্কাল (consuming), মুফাত্তিত, (Wiping off), মুয়াফফিল (Pulrefying), কাবী (burning), কালীর (Wiping off hard), মুবাররিদ (cooling), মুকাব্বি (fortifying), রাদী (repellent), মুগাল্লিজ (incrassative), মুফহিজ (repellent), মুখাদ্দির (narcotic), মুরাত্তিব (moistening), মুনাফফিখ (making odorous), গাসসাল (Washer), মুওয়াস্সিখ লিল কুরা (making the ulcers filthy), মাজজাক (tearing), মুমল্লিস (emollient), মুজাফফিক (desicative), কাবিদ (astringent), আসিব (compressing), মুসাদ্দিদ (constipating), মুরগী (agglutinas), মুদামিল (cicatrizing), মুনবিত লিল লাহম (making flesh grow), খাতীম (covering).

সর্বশ্রেষ্ঠ আরব ফার্মাকোলিষ্ঠ ছিলেন ১৩ শতকের বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী (Botanist) ইবনুল বাইতার। ৪ খণ্ডে রচিত তাঁর গ্রন্থ জামে মুফরাদাতিল আদবিয়া ওয়াল আগজিয়া'তে ১৪০০ ঔষুধের নাম দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৩০০টি সম্পূর্ণ নতুন। এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের প্রায় প্রত্যেক ওষুধ ও তার তৈরী বিষয় নিয়ে কম বেশী আলোচনা করেছেন। ইবনে সীনা, ইবনে ওয়াহ্ শিয়া (মৃ. ৯০ মুয়াফফাক্ আল হারবাবী (মৃ. ৯৯০), ইসহাক বিন সুলায়মান (মৃ. ৯৩২), আত্ তামিযী (মৃ. ৯৯০), ইবনে জাজলা (মৃ. ১১০০), আল কোহেন আল আত্তার (মৃ. ১১৯২), মূসা বিন মাইমুনের (১২০০) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঔষুধ বিজ্ঞানী হিসাবে। রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা জাবির বিন হাইয়ান 'বিষ' বিষয়ক 'কিতাবুস সুসুম' (Book of poison) প্রণয়ন করেন যা আরব ফার্মাকোলজীর অন্যতম উৎস। তাবারী (মৃ. ৮৯৫), রাজী (মৃ. ৯২৫)ও এ সম্পর্কে বই লিখেছেন।

ওষুধ তৈরীর পদ্ধতি ঃ

মুসলিম বিজ্ঞানীদের ঔষধ তৈরী ও ব্যবহার পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শুররা (syrup) : কোন কিছুর রস হলো এই শুররা। গোলাপ, নেনুফার ভায়লেট ইত্যাদি ফুল থেকে রস তৈরী করতে হলে ফুলের পাতা ফেলে দিয়ে ৪ আউন্স পরিমাণ ফুল নিয়ে খুব গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো পাত্রের মুখ বন্ধ করে যতক্ষণ না রস বেরিয়ে আসে। এর পর ১ রাতল চিনি, কমলা ফুলের রস যোগ করে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিলে ঘন হওয়ার পর ব্যবহার করা হতো।

২. রব (rob) : সিরাপ তথা রস ও রবের মধ্যে পার্থক্য হল রব সাদামাটা ঘন রস আর সিরাপ চিনির সাথে জ্বাল দিয়ে তৈরী ঘন রস। যেমন সিট্রন লেবুর 'রচ' তৈরী করতে সিট্রনের মধ্যেকার জিনিস বের করে একটি পাথরের পাত্রে চটকে রস বের করা হতো, তারপর মৃদু জ্বাল দিতে হতো যতক্ষণ না এক চতুর্থাংশে না দাঁড়ায়। এ 'রস' সাধারণত ঠাণ্ডা, শুষ্ক, বিষ প্রতিষেধক, পিত্ত ঠাণ্ডা কারক, কোষ্ঠবদ্ধতা কারক, হৃৎপিণ্ড সবলকারীরূপে ব্যবহৃত হতো।

৩. লোহোক (lohochs) : কাশি ও ফেরিন জাইটিসের জন্য এই ঔষুধ প্রয়োজন হয়। ৬ দেরহাম আকাকিয়া, কাছিয়া, নাশাজতিজ, যষ্ঠিমধুর রস, চিনি এবং হালুয়া, ৫ দেরহাম করে কুইনসের খোসা ছড়ানো বীজ, চিনি মাখানো কদুর বীজ, মিষ্টি বাদামের খোসা নিয়ে ভেঙ্গে গুড়ো করে ছেঁকে নিয়ে ঘন ফেনাসহ জোলাপের সাথে মিশিয়ে দেয়া হতো। তারপর জ্বাল দিতে হতো সবগুলো একত্রে না মেশা পর্যন্ত।

৪. তাবাখ (decoction) : সাধারণত ক্বাথ তৈরীকরণ প্রথাকে বুঝায়। কোন কোন জিনিস এককভাবে বা অনেকগুলো জিনিস একত্রিত করে সেগুলোর ক্বাথ বের করে জ্বাল দিয়ে কমিয়ে ৩ ভাগের ১ ভাগ বা ৪ ভাগের এক ভাগ করে নিয়ে ব্যবহার করা হতো। এসব ক্বাথ তৈরীতে ব্যবহৃত হতোর রাষ্কুনী, মৌরী, নীলপদ্ম, কাঁটা গাছ, যষ্ঠিমধু, আকরকারা, চিতা, রেউচিনি, এক জাতীয় ফুল, সালাদ, পদ্ম জাতীয় মিষ্টি ফুল, কুস্তা, ডুমুর, মনাক্কা, খেজুর, সাবাসতান ইত্যাদি দ্রব্যাদি।

৫. নাকু ((infusion) : বিনা জ্বালের ক্বাথ। পানির মধ্যে শিকড়, বীজ, ছাল, গাছপালা, জীবজন্তু ও খনিজ দ্রব্যাদির কোন অংশ থেকে এ ঔষুধ তৈরী করা হতো।

৬. **সাফূফ (dry drug) :** সাধারণত গুড়ো হিসাবে এই ঔষুধ ব্যবহার করা হতো। মুসলিম জগতে এটি তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

৭. **নাতুল (foment) :** সেকঁ দেয়ার জন্য তৈরী হতো এ ঔষুধ। এটা গাছ গাছড়ার উপাদান দিয়ে তৈরী অল্প অল্প গরম ক্বাথ। মাথা ব্যথা ও শরীরের কোন অংশের বেদনায় সংশ্লিষ্ট অংশটি এ দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হতো বা মুছে দেয়া হতো। এ অনেক সময় সুগন্ধ করা হয় এবং অনেকক্ষণ ফুটিয়ে তৈরী করা হয়।

এছাড়া নানা প্রকার মোরব্বা, মিষ্টান্ন, মধু, দারিয়াক ঔষুধ হিসাবে এবং কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের শারীরবিদ্যা (physiology), এনাটমী, সার্জারী অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলিম চিন্তাধারার নতুনত্ব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গতি সঞ্চারে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগতি সাধন করেছেন চক্ষু চিকিৎসায়। এ বিষয়ে তাঁদের মৌলিক অবদান স্বীকৃত হয়েছে। ড. এলগুড বলেন, 'Glaucoma under the name headache of pupil' was first described by an Arab, Phlyetenulae and the 'string of pearls' vesicles on a blanched eye-ball appear for the first time in Arab literature.

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিস্তৃত ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাধনা সত্যিই এক বিরল গবেষণা ও আবিষ্কার যুগের জন্ম দিয়েছিল। পতনের যুগ হতে আজতক মুসলিম মানসে এই চেতনা যেন অবলুপ্ত হয়েছে। সভ্যতার চাবিকাঠি পাশ্চাত্যের হাতে নিরাপদে সমর্পণ করে বসে আছে যেন মুসলিম দুনিয়া। এই নিস্ক্রীয়তার অবসান কবে হবে?

মুসলিম হাসপাতাল ঃ

মুসলমানরা কেবল চিকিৎসা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকেননি; এসময় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন তাদের অনুপ্ররণা। চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে স্বাস্থ্য নিকেতন বা হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন তাই ছিল ইসলামের প্রথম হাসপাতাল। এই হাসপাতাল ছিল জিহাদের ময়দানের অনতিদূরে অবস্থিত।

প্রিয়নবী (সা) প্রত্যেক যুদ্ধেই ময়দানের নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যোপযোগী স্থানে চিকিৎসার জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিতেন। এছাড়া মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় ছিল রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রুষার জন্য তৈরী মিনি হাসপাতাল। মুসলমান এবং বিধর্মীদের সাথে সংঘাতে আহত মুসলমানদের চিকিৎসা হতো এতে। সাইয়্যেদা নাসীবা বিনতে কা'ব আল্ আনসারী (রা) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তিনিই ছিলেন প্রধান ডাক্তার যিনি ইসলামের এই প্রথম হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা আঞ্জাম দিতেন।

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান-এর সময়কালের পূর্ব পর্যন্ত এধরনের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অনেক ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ছিল। মুলতঃ ইসলামের এসব ভ্রাম্যমান হাসপাতালই পরবর্তীকালে মূল হাসপাতাল স্থাপনের সুতিকাগার ছিল। এ ধারায় খলীফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম বিপুল অর্থ ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এক বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন প্রথিতযশা চিকিৎসকগণকে তথায় চিকিৎসা সেবায় নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালে রোগী শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগে থাকতো আলাদা চিকিৎসক। উন্মাদ এবং স্বল্পবুদ্ধির লোকের জন্য এতে পৃথক বিভাগ ছিল।

পরবর্তীতে ইসলামী শাসনের বিভিন্ন সময়ে বাগদাদ, কার্ডোবা, দামিশ্‌ক, কায়রো প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব হাসপাতালে যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদগণ চিকিৎসা করতেন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগসহ চর্ম, কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসার জন্য এসব হাসপাতালে ছিল স্বতন্ত্র বিভাগ। তাছাড়া রোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্যও আলাদা বিভাগ পরিচালিত হতো। চিকিৎসা সচেতনতা, রোগ সচেতনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য হাসপাতালের আলাদা হলে বক্তৃতা মঞ্চের ব্যবস্থা থাকতো। সাদা ধবধবে রেশমী বস্ত্র আচ্ছাদিত মনোরম পরিবেশে হাসপাতালের শয্যাগুলো থরে থরে সাজানো থাকতো। প্রতিটি কক্ষেই প্রবাহমান বিশুদ্ধ পানির সুবন্দোবস্ত থাকতো। গোসলখানাসমূহে রোগীদের উপযোগী ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতালে অবস্থানকালীন দেয়া হতো জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পরিধেয় এবং তোয়ালে।

এসব হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সাথে আজকের অত্যাধুনিক হাসপাতালগুলোরও তুলনা করা যায় না। সে হাসপাতালসমূহে রোগীদের প্রয়োজন এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন হালাল পশু পাখীর গোশত, ফলফলাদিসহ বিভিন্ন

উপাদেয় খাদ্য সরবরাহ করা হতো। কুলীন-অকুলীন, গরীব-ধনী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই হাসপাতালসমূহ হতে সমানভাবে সুবিধা ভোগ করতো। অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় এবং খুব মনোযোগ এবং হৃদ্যতা সহকারে চিকিৎসা হতো বলে অতিদ্রুত রোগীরা আরোগ্য লাভ করতো।

ইসলামী যুগে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় শুধু শাসকদের অবদান ছিলো না। এ কাজে সমকালীন চিকিৎসকরা ক্ষমতাসীনদের সাহায্য সহযোগিতা দাবী করতেন। ফলে যেখানে সেখানে গড়ে উঠতো হাসপাতাল। শাসকরাও অকৃপণ হাতে সার্বিক সাহায্য দিয়ে হাসপাতাল স্থাপনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ইতিহাসের পাতায় সে কাহিনীসমূহ আজো সযত্নে রক্ষিত আছে।

ইসলামী যুগে হাসপাতালের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ওরিয়েন্টিষ্ট ডঃ ডানল্ড ক্যাম্বল লিখেছেন, "একমাত্র কর্ডোবায়ই ইসলামী শাসনামলে প্রায় ৫০০ চিকিৎসা কেন্দ্র ছিলো।" হাসপাতালসমূহের মধ্যে "আল জেকিরাজ" ছিল অন্যতম। সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত রাজ চিকিৎসকরা এটি পরিদর্শন করতেন। এছাড়া রাজকীয় চিকিৎসা প্রধানের উপর হাসপাতালটির পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। এ কার্যনিবাহী পদে মুসলমান হওয়ার কোন প্রয়োজন পড়তো না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, কৌশলী ও পরিশ্রমীদের এখানে নিয়োগ করা হতো। অনেক ইহুদী খৃষ্টান চিকিৎসক এতে কাজ করতো।

উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এক এক করে প্রত্যেক রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসে মত বিনিময় করতো। কর্ডোবার প্রত্যেক হাসপাতালেই রোগীর তালিকা পুস্তক লিখিত এবং রক্ষিত হতো। সরকারী চিকিৎসকরা দূরবর্তী স্থানের রোগীদের পরিদর্শন করতেন। গরীব এবং নিঃস্ব রোগীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন। তাদের প্রতি সেবা ও চিকিৎসায় কোন অবহেলা প্রদর্শন করা হতো না। স্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়ে হাসপাতালগুলি বর্তমান যুগের হাসপাতালগুলি হতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। বর্তমানে হাসপাতালসমূহের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং রোগীর প্রতি দরদহীন যে ব্যবস্থা চালু আছে তার চাইতে অনেক গুণ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্থান ছিল স্পেনসহ অন্যান্য স্থানের হাসপাতালগুলি।

মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষেও অসংখ্য হাসপাতাল ছিল। এসব চিকিৎসালয়েও সব রকমের সুবিধা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি মওজুদ থাকতো। অন্যান্য চিকিৎসা বিভাগের সাথে সার্জারী বা অস্ত্রোপচারের আলাদা বিভাগ ছিল। আবার শরীরের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রোপচারের জন্য ছিল আলাদা আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জন। ডঃ আমীন আসাদ খায়রুল্লাহর 'আত তীব্বুল

আরাবী' ইবনে আবী আসিবা কৃত 'তবকাতিল আতিব্বা' জুজী জায়দান প্রণীত 'তারিখে তমদ্দুনে ইসলামী' এবং ড. ডানল্ড ক্যম্বল রচিত 'এ্যারাবিয়ান মেডিসীন' নামক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জংগী ছিলেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব তিনি দামিশ্‌ক নগরীতে এক বিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এ হাসপাতালে সব ধরনের চিকিৎসা হতো। সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে এতে চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত করা হতো। হাসপাতাল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তিনি বিপুল অর্থসম্পদ ব্যয় করেন। হাসপাতাল সংলগ্ন ভবনে তিনি যে গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য মূল্যবান বই এবং পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর রোগীরা এখান থেকে চিকিৎসা সেবা পেতো।

'সুলতান নুরুদ্দিন জংগী হাসপাতাল' নামে উক্ত হাসপাতালের প্রধান এবং মুখ্য চিকিৎসক ছিলেন আবুল হিকাম ওরফে ইবনুদ দাখওয়ার, ইবনু আবী উসাইবা এবং ইবনু নাফীস প্রমুখ। তারা প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রত্যেক রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিতেন। তাদের রোগাবস্থা এবং অভিলাষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এ সময় প্রধান চিকিৎসকদের পেছনে পেছনে থাকতো সেবক -নার্সদের বিরাট কাফেলা। চিকিৎসকদের তাৎক্ষণিক নির্দেশ তামিলের জন্য এসব নার্স সর্বদা প্রস্তুত থাকতো এবং রোগীর যথাসাধ্য উত্তম সেবায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে। দৈনিক রোগীদের অবস্থার উন্নতি-অবনতি দেখার জন্য শয্যাপাশে চার্টের ব্যবস্থা থাকতো এবং সাথে ঔষধের পরিমাণ এবং খাদ্যতালিকাও।

হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক আবুল হিকাম ভি. আই. পি-দের পরিদর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে যেতেন। রোগী দেখার পর তিনি বিরাট এক হলরুমে বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারের মাঝখানে বসে চিকিৎসা বিষয়ক নোট লিখতেন। এ সময় বহু ডাক্তার ও ছাত্র-শিক্ষার্থী তাঁর কাছে বসতেন এবং জটিল রোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হতো। মারাত্মক এবং জটিল জরুরী কোন রোগীর চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন হতো।

সুলতান নুরুদ্দিন হাসপাতালে একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিশেষ যত্নের সাথে চিকিৎসা বিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়ানো হতো। বিভিন্ন রোগের শ্রেণী, রোগের ধারা, চিকিৎসা, ঔষধ, ইত্যাদি নিয়ে পরিচালিত হতো সূক্ষ্ম গবেষণা। এক্ষেত্রে এ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিরাট সাফল্য অর্জন করে। সে যুগের সকল খ্যাতিমান এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ ছিলেন এ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক। ফলে এখান থেকে অসংখ্য চিকিৎসক বের হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

বাগদাদ নগরীতে এক জাঁকজমকপূর্ণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন খলীফা আফদুদ্দৌলাহ। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর রাজী (৮৪১-৯২৬ খৃ.)। তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে গোশ্‌ত ঝুলিয়ে হাসপাতালের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা কাজ শেষ করেন। তিনি এবং সাবিত বিন সিনান ছিলেন হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক।

এ হাসপাতালের রোগীদের ঔষধ পত্র এবং খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য আরামাদির জন্য যাবতীয় খরচ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। আর্থিক এ প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হয়। পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অর্থের হাসপাতাল পরিচালনায় বিপত্তি ঘটলে যথাসময়ে উজীর আলী ইবনে সীনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।

কায়রো নগরীতে প্রতিষ্ঠিত মিসরের 'মানসুর কালাউন' হাসপাতাল ছিল বিখ্যাত। মিসরের বাদশাহ মানসূর কালাউন এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আন্ নাফীস (মৃত ১২৮৮ খৃ.) ইবনে আবি উসাইবা, ইবনে রিদওয়ান প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন এ হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ইবনে রিদওয়ান ছিলেন হাসপাতালের প্রধান পরিচালক। তিনি সহকর্মী ও অন্য রোগীদের আরাম ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ করার নির্দেশ দেন। দক্ষ পরিচালনা, শৃংখলা, পরিচ্ছন্নতা, অনাবিল স্বাস্থ্যকর স্থান, উন্নত চিকিৎসা এবং রোগীদের প্রতি সার্বক্ষণিক খিদমতের কারণে এ হাসপাতালের নাম চিকিৎসা জগতে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় পরিচিত ছিল। এ হাসপাতালের দ্বার সবার জন্য সবসময় খোলা থাকত।

এভাবে ইসালামের স্বর্ণযুগের প্রতি শহর, লোকালয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্প্রসারিত হয়। রোগীদের সুবিধার প্রতি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখা এবং আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করা ছিল এ হাসপাতালগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রাতিষ্ঠানিক হাসপাতাল ছাড়াও বিশেষত গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তখন ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পদ্ধতি চালু ছিল। যে সব অঞ্চলে ছোঁয়াচে এবং মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকত সেসব অঞ্চলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদল ঘুরে বেড়াতেন। আর সকল যুগে এটাই হল সহজ এবং ত্বরিত গতিতে চিকিৎসা সেবা পৌছানোর সর্বাধুনিক পন্থা। মোটকথা, রোগ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা, হাসপাতালে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষাদান, পাঠাগার সংগঠন, সমাজ ও রোগ সচেতনতা বিষয়ক বক্তৃতা দান, চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলমানরাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত পৃষ্ঠপোষক ও অগ্রপথিক।

মুসলিম যুগে সার্জারীর ক্রমবিকাশ

বর্তমানে অস্ত্র চিকিৎসা বা সার্জিক্যাল বিদ্যা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। আধুনিক ও নবনব গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফলে অনেক আশ্চর্যজনক অস্ত্রোপচার এখন সংঘটিত হয়। প্রাচীনকালে ভালো ভেষজ ঔষুধের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা থাকায় অস্ত্র চিকিৎসার তেমন প্রয়োজন পড়তো না। তাই সেকালে অস্ত্র চিকিৎসা জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

নবী করীম (সা)-এর সময়কালে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ছিলো যা পরবর্তীতে আরো প্রসারিত হয়। মুসলিম চিকিৎসাবিদদের অস্ত্র চিকিৎসা ও গবেষণার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যার কিছু বিবরণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের হাতেই সার্জারী বা অপারেশনের উৎকর্ষ ঘটে। তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে আস্তে আস্তে সার্জিক্যাল বিদ্যা জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুসলিম চিকিৎসাবিদরা পশু পাখী এবং প্রাণীর মৃতদেহ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সার্জারীর উপসর্গ ও সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয় করতেন।

নবী করীম (সা) প্রথম প্রথম অস্ত্রোপচারের অনুমতি দেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি শুধু অনুমতিই দেননি বরং খোলাখুলি সমর্থনও করে গেছেন। হাদীস বিশারদ হামিদ বিন জানজিয়া বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে কয়জন সাহাবী এসে আরজ করলেন যে, হুজুর! এক লোক মারাত্মক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে। আপনি তার চিকিৎসার অনুমতি দান করুন। "প্রিয় নবী (সা) বললেন ঃ কি রকম চিকিৎসা? সাহাবীগণ বললেন ঃ একজন ইহুদী আছে। সে পেট কেটে চিকিৎসা করে থাকে। নবী (সা) এ রকম করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সাহাবীগণ আরো কয়েকবার নবীজীর (সা) অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে নবীজী (সা) অনুমতি দিলেন। অবশেষে সে ইহুদীকে ডেকে এনে ঐ ব্যক্তির পেট কেটে পাথর বের করা হলো এবং পেটের চামড়া সেলাই করে দেয়া হলো। ক্ষতস্থানে মলম ব্যবহারের পর ঐ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠে। আরোগ্য লাভের পর একদিন ঐ ব্যক্তিকে মহানবী দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই কি সেই ব্যক্তি?" সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। এরপর প্রিয় নবী (সা) সেই ব্যক্তিকে কাছে ডেকে পেট দেখলেন এবং তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে বললেন ঃ "যিনি রোগ দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই সে রোগের চিকিৎসাও দিয়েছেন। কেবল মৃত্যু ছাড়া।"

শেরে খোদা হযরত আলী (রা) কে নিয়ে মহানবী (সা) একবার এক রোগগ্রস্ত সাহাবীকে দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার কোমরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। নবী বললেন ঃ "অস্ত্রোপচার করে জমাট রক্ত বের করে ফেলো"। হযরত আলী (রা) তখনই হুজুর (সা)-এর সামনে অস্ত্রোপচার করে জমাট রক্ত বের করে নিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির পিত্তাশয় রোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক চিকিৎসককে ডেকে আনিয়ে তার পেটে অস্ত্রোপচার করতে বললেন। তিবরানী শরীফে একটি ঘটনা রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তার শরীরের একটি ক্ষত অপারেশনের অনুমতি প্রার্থনা করে। প্রিয় নবী (সা) তাকে অনুমতি দেন। 'মুসনাদে বজ্জার' নামক গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির শরীরের মধ্যে তীর ঢুকে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে সময় দু'জন সহোদর ভাই মদীনায় আসে। নবী (সা) তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা লৌহ দিয়ে চিকিৎসা করতে জানে কিনা? তারা বললো- জাহেলী যুগে তারা এ রকম চিকিৎসা করতো। নবী (সা) সেইরূপ চিকিৎসার জন্য দুই ভাইকে নিদের্শ দেন। তারা লোহা দ্বারা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তীর বের করে ঔষুধ লাগিয়ে দিলে ঐ ব্যক্তি সুস্থ হয়।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়া হাদরামী (রা) হতে বর্ণিত। হাইয়ান বিন আবজর কেনানী (রা) নামক এক সাহাবী তার পত্নীর পেটে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করেছিলেন। (মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ)

রাসূলুল্লাহর (সা) সমকালীন যুগের এ রকম আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) কখনো হুজুরের (সা) অনুমতি নিয়ে, কখনো তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রোগ নিরাময় করেছেন। ভাঙ্গা এবং অকেজো প্রত্যঙ্গ ফেলে দিয়ে কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ স্থাপনের বর্ণনাও রয়েছে। স্মরণীয় যে, এ রকম ব্যবস্থাই আধুনিককালে প্লাস্টিক সার্জারী নামে পরিচিত। আবদুর রহমান ইবনে তারফা বর্ণনা করেন যে, তার দাদা আরযাফা ইবনে আসয়াদ জাহেলী যুগে বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। জাহেলী যুগে এক যুদ্ধে তার নাক কেটে যায়। তখন তিনি রৌপ্য নির্মিত এক নাক সংযোজন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর আরযাফা প্রিয় নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে বললেন যে, তার কৃত্রিম নাকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। নবীজী (সা) তাকে স্বর্ণের নাক তৈরী করে লাগানোর নির্দেশ দান করেন। আরযাফা (রা) স্বর্ণের কৃত্রিম নাক সংযোজন করেন। এরপর তাঁর আর নাকে দুর্গন্ধ হয়নি।

মুহাদ্দিস সুলাইমান বিন উমর (রা)-এর পিতার দুটো দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখে তাকে স্বর্ণের দাঁত বাঁধানোর নির্দেশ দেন। খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা)-এর কয়েকটি দাঁত সোনার বাঁধানো ছিল। কূফার গভর্ণর মুগীরা বিন আবদুল্লাহর দাঁত সোনায় মোড়ানো ছিল। হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান এ ব্যাপারে ইমাম ইব্রাহীম ইবনে আসওয়াদ নাখয়ীর নিকট প্রশ্ন করেন। যেহেতু স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষের জন্য নাজায়েয। ইমাম নাখয়ী বললেন, এতে কোন অসুবিধা নেই।

এছাড়া অনেক সাহাবীর দাঁত স্বর্ণ বাঁধানো ছিলো। এমনকি খলীফাতুল মু'মিনীন হযরত উসমান জিন্নুরাইন-এর দাঁতের উপরও স্বর্ণের খোল ছিল।

মুসলিম অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত গবেষণা পরে আরো দ্রুত বেগবান হয়। খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে ইবনে মাসবিয়া বাগদাদের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি বলেন, "খলীফা আমাকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত না রাখলে আমি আমার কৃষ্ণকায় পুত্রের অস্ত্রোপচার করতাম।" শল্য চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান নিয়ে অনেক মুসলিম চিকিৎসাবিদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় চিকিৎসক আবুল কাসেম জাহরাভী (৯৩৬-১০১০ খৃ.) মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন ছিলেন। ইউরোপে তিনি 'বুকাসেস' নামে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থ "আততাসরীফ" স্বাধীনভাবে লিখিত প্রথম সার্জিকেল গ্রন্থ। তাতে কাঠ বা তপ্ত দা'গুলি দিয়ে ক্ষত পোড়ান, মুত্রাশয়ের অভ্যন্তরে পাথরীভঙ্গ, অঙ্গচ্ছেদ এবং দেহ ব্যবচ্ছেদের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। হাড় ভাঙ্গা, স্থানচ্যুতি, মেরুদণ্ড ভঙ্গের পর পক্ষাঘাত, অস্ত্রের সাহায্যে চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসা ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তিনিই প্রথম পাথারীর ব্যবস্থা করে উহা ছেদনের উপদেশ দেন। আজ পর্যন্ত অস্ত্র চিকিৎসকরা তাই পালন করে আসছে। তিনি জটিলতম অস্ত্রোপচারে কুণ্ঠিত হতেন না। ছুরি, লৌহশলাকা ইত্যাদি নিঃসংকোচে তাঁর হাতে ব্যবহৃত হতো। আরব জাতির মধ্যে এত বড় চিকিৎসক সার্জন আর জন্মগ্রহণ করেনি।

অস্ত্র চিকিৎসায় ইবনে জুহুরের আবিষ্কারও যথেষ্ট। শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার ও পাতলা হৃদয় বেষ্টনীর কোষের মৌলিক বিবরণের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তার কাছে চির ঋণী। তিনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি প্রথম 'ফোড়ার' কথা উল্লেখ করেন।

চক্ষু চিকিৎসার প্রতি আরবরা অধিক মনোযোগ দিত। তাঁদের চক্ষু অপারেশনকারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা দক্ষ এবং পটু অস্ত্রোপচারকারী। তারা বিভিন্ন

প্রকার নয়টি ছানির কথা উল্লেখ করেন। তাতে অস্ত্রোপচারের জন্য নয়টি বিভিন্ন নিয়মের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনীয় মুরেরা ছানি তুলে বা বসিয়ে দিয়ে কিংবা সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা চক্ষু অপারেশন করত। তাদের সূচ গোলাকার ও ত্রিকোণাকার দু'প্রকারই ছিল। এদের কতেকটি ফাঁপা ও কাঁচ নির্মিত আংটা ব্যবহার করত। নাসারোগ (Polytic) উৎপাটনের জন্য তারা ধাতু নির্মিত আংটা ব্যবহার করত। অচেতনকারী পদার্থ ব্যবহারের সুবিধাও এ সমস্ত সুবিজ্ঞ প্রতিভাদীপ্ত চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কঠিন ও কষ্টদায়ক অস্ত্রোপচারকালে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তারা Dernel ও অন্যান্য Decochon ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন। দাউস আল্ আগারেবীর মতে, পাথরী, ছেদন, ফোঁড়া কর্তন এবং মুস্কচ্ছেদনে মাদকদ্রব্য প্রয়োগ কর্তব্য। শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সংজ্ঞানাশক দ্রব্য ফুসফুসে আকর্ষণ করাবার পদ্ধতি ও সুগন্ধ স্পোঞ্জসিক্ত করে শুকিয়ে রাখতেন। ব্যবহারের প্রয়োজন হলে ঈষৎ ভিজিয়ে মুখাবয়বে ও নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করতেন। সমসাময়িক ল্যাটিন ইউরোপে অস্ত্র চিকিৎসায় অশিক্ষিত হাতুড়িয়াদের দখল ছিল। নিদ্রা আনয়নকারী স্পঞ্জ আরব অস্ত্র চিকিৎসকদের উন্নতির অন্যতম সোপান।

সমস্ত অস্ত্রোপচারে স্পেনীয় মুসলিম শল্যবিদরা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। প্রত্যেকটি অপারেশনে চূড়ান্ত নিরীক্ষা করানো হত; অপেক্ষাকৃত নিষ্ফল চিকিৎসা হলে তারা দুঃসাহসিক অপারেশনের শরণাপন্ন হতেন। ইবনে যুহর বলতেন- ভেষজ যথানিয়মে প্রয়োগ করতে পারলেই যথাসম্ভব ক্ষত নিরাময় হয়। সুতরাং অস্ত্রোপচারের আগে প্রাকৃতিক ভেষজে আরোগ্যজনক ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হতো।

দ্বিতীয় সক্রেটিস নামে খ্যাত আবুল কাসেম (মৃত্যু ১০৭৭ খৃ.) অস্ত্রোপচারের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হত তা স্বগ্রন্থে চিত্রাংকন করেছেন। তাঁর অস্ত্রোপচারের বিবরণ সুস্পষ্ট। ব্যবহৃত গ্রন্থাবলীর চিত্র অংকিত হওয়ার তাঁর গ্রন্থ সবিশেষ মূল্যবান। আরব জাগরণের পূর্বে স্বল্প কতক চিত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আবুল কাসেমের পূর্বে অস্ত্রোপচার যন্ত্রের চিত্রাংকনের কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা হয়নি। মধ্যযুগের অধিকাংশ চিত্র তাঁর গ্রন্থ হতে গৃহীত। অস্ত্র চিকিৎসার যাবতীয় পুস্তকে আজকাল যন্ত্রপাতির চিত্রাংকন অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই মত প্রবর্তনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের গ্রন্থে বিশেষভাবে ঋণী।

স্বাস্থ্য বিদ্যা এবং শারীর বৃত্তে জ্ঞান লাভ ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সার্জারীতে জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কারণ রক্ত, ধমনী, অস্থিমজ্জা এবং মাংস প্রভৃতির আকৃতি

প্রকৃতি ও অবস্থান নিয়ে শরীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্য বিদ্যার আলোচনা করা হয়। শুধু চিকিৎসক নয় সাধারণ একজন মানুষও স্বাস্থ্য বিদ্যা এবং শরীর বৃত্তের অবদান অস্বীকার করতে পারে না। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হেতু এ দুটি বিষয় ইসলামে স্বীকৃত। মুসলিম দার্শনিক, চিকিৎসাবিদদের অবদানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোতে অপারেশনের জন্য অপরিহার্য শারীর বৃত্ত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আবদুল লতীফ ইউসুফ বাগদাদী (১১৬২-১২৩১ খৃঃ) কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মিসরের এক লাশের স্তূপে মানব দেহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়াও আবু আলী ইবনেসিনার 'আল্‌কানুন' আলী ইবনে আব্বাসের 'কামেলুস সানাসাত' এ বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। মূলতঃ এ বিষয়ে ইবনে সীনা এবং ইমাম রাজীর গ্রন্থাবলীর চেয়ে ভালো আর কোন বই নেই। অতঃপর সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে নফীস (মৃত্যু ১২৮৮ খৃ.) তার 'আল কানুন' এ শারীর বৃত্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইবনে কেনানী (মৃত্যু ১৪১৬ খৃঃ) ও এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইমাম রাজীর আরেকটি অসমাপ্ত গ্রন্থ 'মানাফিউল আ'জা'-তে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মুহাম্মদ বিন জাকারিয়ার গ্রন্থ 'হাইয়্যাতুল কুলব, হাইয়্যাতুস সেমাঘ' এবং 'হাইয়্যাতিল মাফাসিল' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখের দাবী রাখে। এসব বিজ্ঞানী সমকালীন যুগে এসব শাস্ত্রে নক্ষত্রের মতো ছিল।

তারা শুধু গবেষণা ও অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি, দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। এসব কেন্দ্রে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও থাকত সার্জারীর (অস্ত্রোপচারের) আলাদা বিভাগ। এসব বিভাগে থাকতেন অস্ত্রোপচারের আলাদা সার্জন বা অস্ত্র চিকিৎসক। আসলে মুসলিম চিকিৎসাবিদদের হাতেই সার্জারী এবং অপারেশনের উন্নয়নের সূচনা ঘটে। তাই আজকের আধুনিক সার্জিকেল বিদ্যা মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

বিজ্ঞানী আল জাযারী বর্ণিত রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি যান্ত্রিক গবেষণার ছবি।

ত্রয়োদশ শতকে ডাইস্করাইডসের 'মেটেরিয়া মেডিকো'র অনুবাদে ব্যবহৃত আরব ফার্মাসিস্টদের ঔষধ তৈরী প্রণালীর একটি চিত্র।
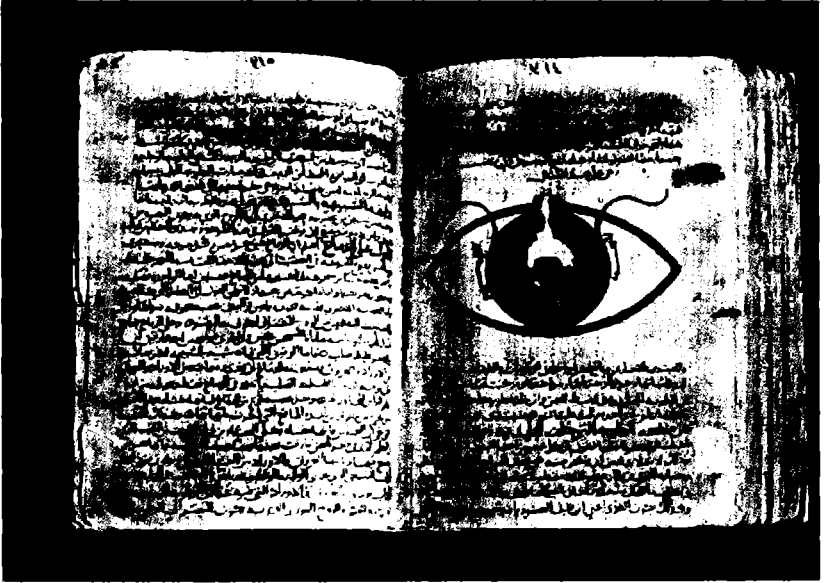
নবম শতকের হুনাইন ইবনে ইসহাক চোখের দৃষ্টি বিষয়ে গ্যালেনের একটি পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন। ত্রয়োদশ শতকের তৈরী এ অনুবাদের একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি।

মুসলমানদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা

জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাকাশ সম্পর্কীয় একটি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica লিখেছে "জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যাতে নভোমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি জ্যোতিষ্কের শ্রেণীবিভাগ, গতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।" ড. মরিস বুকাইলী লিখেছেন "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে সম্ভবত এটাই সর্বপ্রাচীন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনায় মহাপ্রভুর বিস্ময়কর সৃষ্টির বিশালতা ও বহুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এতে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের বিশালতা বর্ণনাকালে উভয়ের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বলা হয়েছে।"

জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এক বিষয় নয়। কিন্তু সুদূর অতীত থেকে তাই মনে করা হতো। জ্যোতিষশাস্ত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমভাগ প্রাকৃতিক বা বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয়ভাগ জ্যোতিষশাস্ত্র বা ভবিষ্যত গণনামূলক শাস্ত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোচিত হয় গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য ও অতিলৌকিক বস্তুসমূহের গতিবিধি আর জ্যোতিষ বা গণনা শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় মানুষ ও সাম্রাজ্যের উপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে যদি ও ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্বের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তবুও ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় বহু মুসলিম বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্রও চর্চা করেছেন, ইহা করেছেন তাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের মহাপ্রাকৃতিক প্রতীকী তাৎপর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে। কিন্তু তাঁরা রাশি নির্ণয় ও ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা হতে বিরত থাকতেন। তবে এটা স্বীকৃত যে, যারা এটা করেছেন তারা জীবিকার্জন ও পার্থিব খ্যাতির জন্য করেছেন।

উপরোক্ত কারণে পৃথিবীখ্যাত বহু মুসলিম বিজ্ঞানী জ্যোতিষ বা গণনা চর্চাকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং এটার যে বিজ্ঞানসম্মত কোন ভিত্তি নেই তাও যুক্তি সহকারে পরিবেশন করেছেন। ভবিষ্যৎ গণনার এদিকটা সম্পর্কে যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, আল গাজালী, আল বিরুনী. নাসিরুদ্দীন তুসী অন্যতম।

একথা প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন কোন জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ নয়। কিন্তু আল্লাহর মহান সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টিকৌশল, অত্যাশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও শৃঙ্খলা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে যেখানে মহাকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রীয় নানা মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির ভারসাম্য, ঐক্য ও সুসৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ মানুষের কাছে তুলে ধরে এক খোদার শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

কুরআনে কারীমের বেশ কিছু আয়াতে আসমান-জমীনের সৃষ্টি বৈচিত্র্য এবং মহাকাশের বর্ণনা পূর্বক এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আসমান সম্পর্কে বলা হচ্ছে- "তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন কোন খুঁটি ছাড়া।" (সূরা লুকমান ঃ আয়াত-১০) "তারা কি উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখেনা, আমি উহা কিভাবে নির্মাণ করেছি এবং উহাকে সুশোভিত করেছি আর এতে কোন ফাটলও নেই?" (সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত-৬) "তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড।" (সূরা রাহমান ঃ ৭)

গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের পরিক্রমণ. পরিভ্রমণ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে- "সূর্য ও চাঁদ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।" (সূরা রাহমান ঃ ৫) চাঁদ সূর্যের দিবারাত্রের গতি পরিবর্তনের সম্পর্কে কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে- "তিনিই সকাল উদিত করেন, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আনআম ঃ আয়াত-৯৬) একইভাবে নক্ষত্র সম্পর্কে বলা হচ্ছে- "তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তার মাধ্যমে তোমরা জল-স্থলে অন্ধকারেও তোমার পথ খুঁজে পাও; জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি।" (সূরা আনআম ঃ আয়াত-৯৭) "তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছুই- আপন অনুগ্রহে, চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।"(সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত-১৩)

প্রত্যেকের নির্দিষ্ট গণ্ডির কথা উল্লেখ করে এরশাদ হচ্ছে- সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রাম্যমান।" (সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত-৪০) "সূর্য ভ্রমন করে উহার নির্দিষ্ট গণ্ডির দিকে, উহা পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মনজিল অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।"(সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত-৩৮-৩৯)

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হচ্ছে- "কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে রাশি চক্র সৃষ্টি করেছেন এবং উহাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬১) "তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরের বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে প্রদীপরূপে।" (সূরা নূহ ঃ ১৫-১৬)

এভাবে কুরআনে কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয় এসব সৃষ্টি গ্রহ-নক্ষত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গতি প্রকৃতি, পৃথিবীর উপর ইহার প্রভাব সম্পর্কে মানুষ যেন আরো প্রভূত জ্ঞানার্জন করতে পারে আরো নতুন নতুন গবেষণা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করে বলা হচ্ছে- "ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম ঃ ২৪) বস্তুত কুরআন জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চিন্তাবিদদের গবেষণার মধ্য দিয়ে এক খোদার রাজ্যের বিস্তৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান লাভ এবং তাঁর মহানত্বের লীলা বৈচিত্র্য উপলব্ধি করাকেই উপলক্ষ্য বানিয়েছে। মোটকথা গবেষণার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য স্বীকার করানো কুরআনের জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার কারণ।

উপরোক্ত কারণ এবং আরো একটি কারণে মুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। তা হলো বিশ্বের বিভিন্নাঞ্চলের মুসলমানদের ইবাদতের সার্বজনীনতা এবং সৌরজগতের সাথে উহার সম্পর্ক। নামায, রোযা, কিবলা ইত্যাদির সময় ও দিক নির্ধারণে মুসলমানরা সৌরজগতের রহস্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

কুরআনের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় মুসলমানরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হন এবং এর ইতিহাসে অসামান্য কৃতিত্ব ও অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। অষ্টাদশ শতক হতে মুসলমানদের সবদিককার পতন শুরু হয়। বর্তমানেও চলছে এ স্থবিরতা। কিন্তু শত শত বছরের মুসলমানদের জ্ঞান সাধনা এবং অসামান্য অবদান কালের কপোলে যে তিলক রেখা এঁকে দিয়েছে তা ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া এতটুকু নিষ্প্রভ হয়নি। শত ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির দুর্বাদল মাড়িয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের কৃতিত্ব। ইসলাম আগমনের শতবর্ষের শেষপ্রাদ শেষ হতে না হতে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের এ শাখাতেও স্বর্ণোজ্জ্বল অবদান রাখতে শুরু করেন। সৌরজগত ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও

পরিক্রমা সম্পর্কে মুসলমানরা আবিষ্কার করেন বহু বিচিত্র তথ্য। তারা পৃথিবীর আকার অক্ষাংশের বির্বতন এবং বিষুব অনুগমন সংক্রান্ত তথ্য নিরূপণ করেন। গ্রহের তির্যক গতি সম্পর্কে আল মাইমুন এবং বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত প্রতিফলন তথ্য আবুল হাসান আবিষ্কার করেন। সর্বপ্রথম মুসলমানরাই ইউরোপে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারা দূরবীক্ষণ, দিকনির্ণয় যন্ত্রসহ দোলক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে উন্নতির সোপানে পৌঁছে দেন। মুসলমানরা নভোমণ্ডলে তাদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন। The Intellectual Development in Europe গ্রন্থের লেখক J. W. Draper একথা স্মরণ করে আকুণ্ঠ চিত্তে তাই স্বীকার করেন- "আরবগণ নভোমণ্ডলে যে অম্লান হস্তছাপ রেখে গেছেন, তা ভূ-মণ্ডলের নক্ষত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণকালে যে কোন অনুসন্ধিৎসু উপলব্ধি করতে পারবে।"

৭৬২ ঈসায়ী সনে খলীফা আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে বাগদাদ হয়ে পড়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি। এ সময় মাশাআল্লাহ ও নওবখ্ত নামক দুইজন জ্যোতির্বিদ বাগদাদের মানচিত্র নকশা তৈরী করেন। খলীফা মনসুরের দরবারের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল ফাজারী। তিনি এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা সহ বেশকিছু দরকারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। আল্ নিহওয়ান্দী প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি স্বীয় গবেষণাসিক্ত 'মুশ্তামাল' নামক যে নির্ঘন্ট প্রণয়ন করেন তা গ্রীক ও হিন্দু উভয় জ্যোতির্বিদার দিশারী হিসাবে সম্মান প্রাপ্ত হয়েছে।

মনসুরের পৌত্র মামুনের শাসনামলে সরকারী প্রচেষ্টায় বহু গ্রীক গ্রন্থ অনূদিত হয়। ব্যাপক অনুবাদ কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'বায়তুল হিকমা'। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নিয়মিত গবেষণার জন্য সামাসীয়া ফটকের নিকট স্থাপিত হয় একটি মানমন্দির। সিনাদ ইবনে আলী এবং ইয়াহিয়া বিন আবু মনসুর নিযুক্ত হল এর তত্ত্বাবধায়ক। মূসা ভ্রাতৃদ্বয়ও নিজেদের জন্য স্থাপন করেন আরেকটি মানমন্দির। শরফুদ্দীন স্থাপন করেন ইরানের জ্যোতির্বিদদের একান্ত পরামর্শে। মিসরে ফাতেমীয় শাসনামলে 'রাসাদ ই হাকামী' নামক একটি মানমন্দির ছিল। মুসলমানদের মানমন্দির প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ইউরোপীয়রা অনুকরণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

ইসলামের ইতিহাসের অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আল-খারেজমী (৭৮০-৮৫০ খৃ.) জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও অসাধারণ আলোচনা করেন। তাঁর প্রস্তুতকৃত নির্ঘন্ট পরবর্তীতে সম্পাদিত হয় এবং এডোলার্ড কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত

হয় যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ। বিখ্যাত গবেষক গিলস্পাই এর মতে, তাঁর রচনায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন নিরীক্ষা ও নির্দেশনা সুশৃংখল ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। বলা হয় তাঁর রচনায় উলেমীর গবেষণার প্রভাব রয়েছে। খারেজমী চন্দ্র, সূর্য ও তখনকার আমলে জানা পাঁচটি গ্রন্থের গতিবিধির চমৎকার ছক তুলে ধরেছেন। এছাড়া চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতির হিসাব সম্বলিত ছকসমূহও তিনি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন ত্রিকোণমিতির হিসাবও এসেছে তাঁর রচনায়। গিলস্পাই এর মতে খারেজমীর রচনায় টলেমীর প্রভাব থাকলেও স্বীকার করতে হয় তাঁর রচনায় জ্যোতির্বিদ্যার সহায়তাও নিয়েছিলেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ 'ব্রম্মস্পুতি সিদ্ধান্ত' থেকে তিনি বেশী উপকৃত হয়েছেন।

খারেজমী আবহাওয়ার শ্রেণী ভিত্তিতে ৬ ভাগের যে ভৌগলিক শ্রেণী বিন্যাস করেছেন তার প্রথমভাগে আছে বিভিন্ন শহর নগর, দ্বিতীয়ভাগে পর্বতসমূহ, তৃতীয়ভাগে সাগর মহাসাগর, চতুর্থভাগে দ্বীপসমূহ, পঞ্চমভাগে বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ এবং ষষ্ঠভাগে রয়েছে নদ-নদীসমূহের বিস্তারিত বিবরণ। Astrolabe বা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মাপার যন্ত্রবিশেষের উপর তাঁর দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া এসব যন্ত্রের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে তিনি 'কিতাবুল আমল বিল এ্যাষ্ট্রোলেব' নামক গাইড বুক রচনা করেন। হিব্রু পঞ্জিকার উপর তাঁর 'ইস্তিখ্‌রাজ তারিখুল ইয়াহুদ' নামক আরেকটি গ্রন্থ আছে। এছাড়া তিনি সূর্যঘড়ির উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আলী ইবনে ঈসা এবং ট্রান্স অক্সিয়ানার অধিবাসী আল ফারগানী তৎসময়ের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। Elements of Astronomy গ্রন্থাকার আল ফারগানী ইউরোপে 'আলফ্রাগানাম' নামে পরিচিত। এ গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন ক্রিমোনার জিরার্ড।

ইউরোপে বিশেষ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞরূপে পরিচিত বল্‌খের আবু মাশার আল জাফর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর চারটি গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়। তন্মধ্যে 'জিজ্‌ আবী মাশার' জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম প্রধান উৎস গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে আল বাত্তানী একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁকে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলা হয়। ইবনে নাদীম তাঁর পুরো নাম লিখেছেন- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জাবির বিস সিনান আল বাত্তানী। এই প্রতিভাবান মৌলিক গবেষকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মধ্যযুগের ল্যাটিন পণ্ডিতগণ। ৮৭৭ হতে ৯১৮ ঈসায়ী সনে তিনি রাক্কায় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন।

Willy Harner এর মতে, বাত্তানী একজন অনন্য সাধারণ জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতিবিদ ছিলেন। চন্দ্র-সূর্য এবং পরিচিত পাঁচটি গ্রহ সম্পর্কে তার সারণীসহ গবেষণালব্ধ উত্তরাধিকার সুবিখ্যাত। গ্রহ নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের গতিবিধির উপর এত নিখুঁত এবং ব্যাপক গবেষণাকর্ম তিনি ছাড়া আর কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। জ্যোতির্বিদ্যার উপর তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল জিজ্'। এতে তিনি ৯০১ ঈসায়ী সনের ২৩শে জানুয়ারী ও ২রা আগষ্ট সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তখন ছিলেন এন্টিওকে। তাঁর 'কিতাবুল জিজ' মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ্। এই গ্রন্থই তাঁকে চির অমর করে রেখেছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অমর বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল বিরুনী খারিজমের খিভা শহরতলীতে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিশাল গ্রন্থ্ 'কানুনে মাসউদী'। এ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই তিনি ত্রিকোণমিতিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার কাজে প্রভূত কৃতিত্ব লাভ করেন। সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনায় তিনি যে নিয়ম ব্যবহার করেছিলেন তা শুধু সে যুগেই নয় তার পরও অনেকদিন বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। তাঁর গণনারীতির এই ফর্মূলা হলো 'The formula of interpolation'- যা আজ নিউটনের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ নিউটন জন্মের বহু পূর্বেই আল বিরুনী তা শুধু আবিষ্কারই করেননি বরং একে ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইন তালিকাও তৈরী করেন।

কানুনে মাসউদীর আলোচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে obliquity of the Ecliptic (ক্রান্তিবৃত্তের আনাত) তাঁর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রের লম্বন বা Parallx of the Moon আলোচনার মধ্যেও তিনি প্রথমে নিজ গণনারীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন।

দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, দিক নির্ণয় ও গ্রহ্ নক্ষত্রাদির অবস্থান জ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্ণয়ে গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয় হয়েছে। স্থানাংকের যে কোন দুইটি বিষয় জানতে পারলে অন্যগুলি নির্ধারণ করার যে ফর্মূলা তিনি বাতলিয়েছেন তার প্রথম আবিষ্কারের গৌরব আল বিরুনীর নিজের। তাঁর এ অমর আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক অমোঘ মুক্তি বাণীর সন্ধান দিয়েছিলো। তাঁর পরবর্তী সকল বিজ্ঞানীই এই সূত্রের ঢালাও ব্যবহার করেছিলেন। এই সময়কার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উলুঘ বেগ আল বিরুনীর ভাষা, ভাববিন্যাস হুবহু অনুকরণ করতেও দ্বিধা করেননি। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে আল বিরুনীই প্রথম কানুনে মাসউদীতে পৃথিবীর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্তমানে বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিতে Helio centric মতবাদকে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার বলে চালানো হচ্ছে। অথচ এর

৩'শত বছর আগে রচিত আল বিরুনী ও আজ্জারকালি প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সীনা বিজ্ঞানের অন্যান্য জটিল বিষয়ের সাথে জড়িত থাকার সাথে সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। তিনি সংখ্যা গণনার জন্য যন্ত্রপাতির উদ্ভবের দিকে বেশী গুরুত্ব দেন। এর ফলে ইবনে সীনা সূক্ষ্ম গণনার উপযোগী Vernier-এর মতো একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। দশম শতকের শেষ দিকে বহু মুসলিম জ্যোতির্বিদ বাগদাদে বাস করতেন। এদেঁর মধ্যে আলী বিন আমজুর, আবুল হাসান আলী, আল খুজান্দি, মাসলামা বিন আহমদ উল্লেখযোগ্য। গাণিতিক ও কবি ওমর খৈয়ামও একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি নিশাপুরে মানমন্দির স্থাপন ও পারস্যপঞ্জিকা সংস্কার সম্মেলনে যোগ দেন। মঙ্গোলীয় যুগে নাসিরুদ্দীন তুসী প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে জ্যোতির্বিদ হিসেবে আরো অবদান রেখেছিলেন কুতুবুদ্দীন সিরাজী, আল হাসিব, বল্খী, নাইরিজা, সাহল কুহি, আবদুর রহমান সুফী, ইবনে হাতিম, খাজিনী, ইবনে তোফায়েল, বিতরুজী, উর্দী মহিউদ্দীন, মাগরিবী, গিয়াসুদ্দীন জামশেদ, উলুঘ বেগ, কাদিজাদা রুমী, ইবনে আমাজুর এবং আবুল হাসান প্রমুখ বিজ্ঞানী মনীষীগণ। এঁদের আবিষ্কার, গবেষণা গ্রন্থ ও সূত্রের মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে।
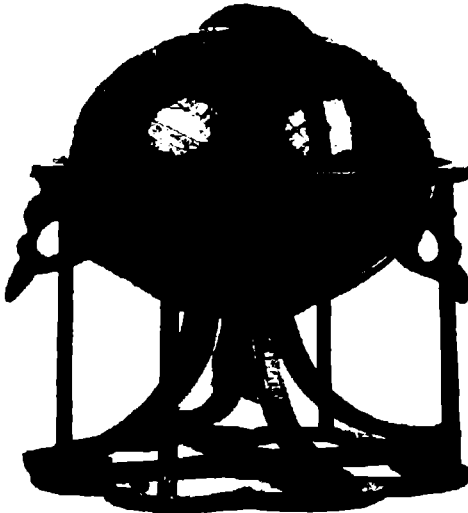
১৪৮০ খৃ. নির্মিত একটি দুর্লভ এস্ট্রোল্যাব।

রৌপ্য তারকা চিহ্নিত একটি গোলক। ১২৮৫ খৃ. আব্দুর রহমান আস সুফীর গ্রন্থ Book of Fixed Stars-এ বর্ণিত নিয়মানুসারে এটি নির্মিত।
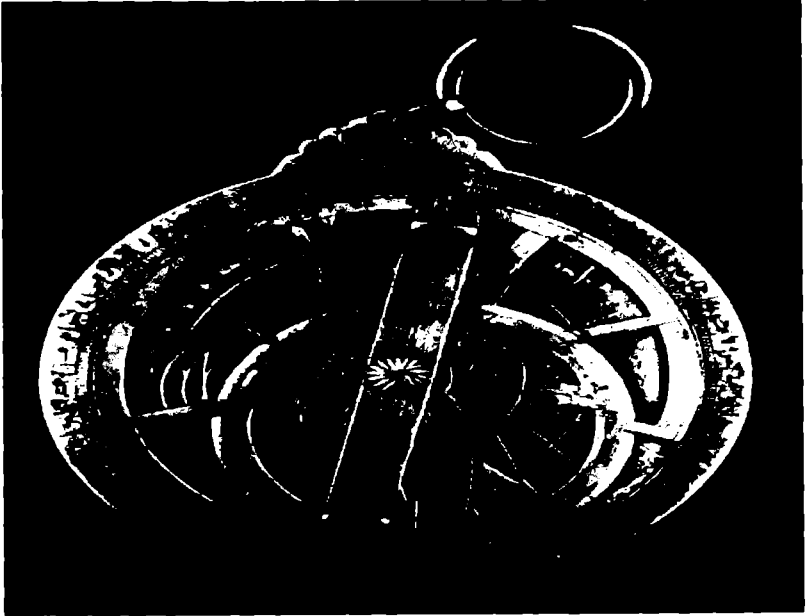
খৃষ্টীয় নবম শতকে নির্মিত একটি এস্ট্রোল্যাব।

আইনতত্ত্বে মুসলিম অবদান

'আইন শাস্ত্র' তথা 'আইন তত্ত্বের' ইংরেজী ও আরবী আভিধানিক অর্থ হলো যথাক্রমে 'Jurisprudence' এবং 'ফিকাহ্'। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারায় সমাজ এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্র সৃষ্টির পটভূমিতে আইনের আবির্ভাব হয়। প্রাথমিক মানব সমাজে গোত্রের অলিখিত নিয়ম-কানুন ছিল আইনের প্রাথমিক রূপ; আস্তে আস্তে মানুষের সভ্যতার দিকে প্রত্যাবর্তন, অপরাধ ও অন্যায় দমনের বিবেকের দংশন, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার অভিপ্রায়ে আইনের সূচনা হয়।

সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলিম তথা ইসলাম ধর্মের অবদান বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক অবদানের ক্ষেত্রগুলো মোটামুটি আলোচিত হলে ও আইনতত্ত্বে মুসলিম অবদানের বিষয়টি কেমন যেন কম আলোচনায় আসে। অথচ এ বিষয়েও ইসলামের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। হাজার বছরের মুসলিম প্রশাসনের ইতিহাসে ইসলামী আইনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, বিকাশ লাভ করেছে বৃহৎপরিসরে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতিকে যে সকল মানবিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ প্রদান করেছিলেন তন্মধ্যে 'ইসলামী আইন' অন্যতম। একজন সফল আইন প্রণেতা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব আকাশ অভিসারী। মহানবীর (সা.) আগমনের পূর্বেও বিভিন্ন জাতির আইন ছিলো, এখনও আছে। কিন্তু সে আইন এবং মুহাম্মদ (সা.) এর প্রদেয় আইনে মৌলিক তফাৎ বিদ্যমান। প্রসঙ্গত বলা যায়, এখনও পাশ্চাত্য আইনজ্ঞগণ এ অভিমত পোষণ করেন যে, আইন মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করে। Kant, Kelsen প্রমুখ চিন্তাবিদ আইনের মধ্যে নৈতিক ধারণা অন্তর্ভুক্ত করণের ঘোর বিরোধী। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) যে আইন প্রদান করেছেন, তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি আইনকে ধর্ম এবং নৈতিক বিষয়ের মধ্যে একত্রিত করেছেন। অন্যান্য আইনের সাথে এটাই তাঁর মৌলিক পার্থক্য। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরামের যুগ এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগে ইসলামী আইনের বিকাশ ঘটে নতুন ব্যাখ্যা এবং যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। একদল বিরাট সংখ্যক মুসলিম আইনজ্ঞ এ কাজে নিয়োজিত হন।

ইসলামী আইনের উৎস ও পরিচিতি

আল্লাহই ইসলামী আইনের মূল উৎস। তদীয় বাণী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) হাদীস ইসলামী আইনের মূল কেন্দ্রভূমি। পরিভাষায় ইসলামী আইনকে 'শরীয়াত' বা 'শরীয়াহ্' বলে আর যে বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর শরীয়াতের বুনিয়াদ তার নাম 'ফিকাহ'।

মহানবী (সা.) তাঁর যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলী পবিত্র কুরআন-এর অনুশাসনে সমাধান করতেন। কুরআনের পর ছিল তাঁর নিজস্ব বিচার এবং মতামত যা সাধারণত হাদীস নামে অভিহিত। এই দুটি উপায় ও উৎসের উপর ইসলামী জগতে আইন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখিত হয়েছে, "একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিরক্ষা সমস্যা এবং কমপক্ষে আপীল এর সীমা, অবাধ, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হযরত (সা.)-এর জন্য অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য প্রয়োজন মাফিক বিধি বিধানসমূহ এবং হযরত (সা.)-এর পক্ষ হইতে নির্দেশাদি প্রচারিত হইতে থাকে-যাহা উদ্ভূত সকল সমস্যা সম্পর্কিত হইত। তাহার সমীপে বাণিজ্যিক, বিবাহ-শাদী ও তালাক, নৈতিক ও চরিত্রিক অপরাধ সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং দিওয়ানী মামলাও উপস্থাপিত হইত। তিনি এইসব সম্পর্কে বিধানসমূহ প্রকাশ করিতন। নীতিমালা থাকিত এই যে, তিনি আইনের ভিত্তি রাখিতেন প্রথমতঃ কুরআন মজীদের উপর, অথবা কুরআনী বিধানাবলীর আলোকে নতুন নির্দেশনাসমূহ প্রণয়ন করিতেন। কখনও এমনও হইত যে, তিনি যে সমস্ত প্রাচীন প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতিকে কুরআনী মতাদর্শ ভিত্তিক পাইতেন তা গ্রহণ করিতেন।"

হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রণয়ন বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এই চুক্তিতে কতগুলো আইন ছিল কূটনীতি প্রসূত ধারণার অন্তবর্তী। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হয়ে রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে প্রায় দুই শতাধিক আয়াত মুসলিম আইন শাস্ত্রের উৎস। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তনশীল সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় এবং মুসলিম সমাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় কুরআন ও হাদীসের বিধান প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয় ফলে ইসলামী আইন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা শুরু হয়। মূল আইনের নিরিখে ব্যাপক গবেষণায় সৃষ্ট হয় নতুন শাস্ত্র ও নতুন পরিভাষার।

সাহাবা যুগে মুসলিম আইন

রাসূলের (সা.) যুগে কুরআন এবং তাঁর বাণীই ছিল সকল আইনের আধার। সাহাবায়ে কিরামের যুগে এই উৎস বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দেয়। অচিরেই উক্ত দুই উৎসের সাথে যোগ হয় 'ইজমা'। প্রখ্যাত আইন বিশারদ গাজী শামছুর রহমান লিখেন ঃ 'কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই এই উৎসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আবিষ্কৃত হয়। ইজমা হচ্ছে প্রবীণ নেতৃস্থানীয় ও বিশেষজ্ঞ সাহাবাগণের ঐক্যমত। জটিল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার নির্দেশ কুরআন মজীদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। ইজমার প্রমাণিকতা এখানে। ... এই যুগে ইজমা একটি সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। সাহাবাদের মধ্য থেকেও যোগ্য প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যে সমস্যাগুলোর কোনো প্রত্যক্ষ সমাধান কুরআন ও সুন্না'য় পাওয়া যেতো না, কুরআন সুন্নাহর আলোকে কমিটির সদস্যবর্গ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান দিতেন। এই সমাধান কালক্রমে আইনে মর্যাদা লাভ করে।"

এ যুগে উদ্ভূত সমস্যারই কেবল সমাধান নির্ণয় করা হতো, পরবর্তী কালের ভবিতব্য কোন সমাধান বের করা হতো না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের তখন দায়িত্ব ছিল খুবই ব্যাপক তাই এ ধরনের চিন্তা তাঁদের ছিল না। যে সকল সাহাবা আইন গবেষণায় বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.), হযরত উমার ফারুক (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), আবু মূসা আশয়ারী (রা.), মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.), উবাই ইবনে কা'ব এবং যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) প্রমুখ। তবে ইসলামী আইন গবেষণায় এ সময়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন প্রথম কাতারের গুণী সাহাবীদের অন্যতম। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কুরআনের ইজতিহাদ, হাদীসের মৌল তত্ত্ব উদঘাটন করে মাসআলা উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন 'তোমরা ইবনে উম্মি আবদ এর নির্দেশনা অবলম্বন কর।' 'নবী আরো বলেন, 'ইবনে মাসউদ যে সব বিষয় পছন্দ করে আমি তা আমার উম্মতের জন্য পছন্দ করি, আর যে সব বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি নেই সেগুলোকে আমি উম্মতের জন্য পছন্দ করিনা'- এসব উক্তির মাধ্যমে ইবনে মাসউদের জ্ঞান এবং তার নির্ভর যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তাঁর গবেষণার

নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- 'তিনি কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন অতঃপর এর ভিতরই অভিনিবিষ্ঠ হয়েছেন। আর ইলমী-প্রয়োজন সমাধানে তিনিই যথেষ্ট।

নিজের গবেষণালব্ধ অনেক সিদ্ধান্ত সাহাবায়ে কিরামের একটি দল সমসাময়িক কালে প্রদান করেছেন। বস্তুতঃ এগুলো আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত। বিভিন্ন বিষয়ে রায় প্রদান করেছেন- এ ধরনের 'মুফতি সাহাবীর' সংখ্যা মোট ১৪৯ জন।

মহানবী (সা.) এবং খুলাফা রাশেদার যুগকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিকাশের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ধরলে, তার পরবর্তীতে সমৃদ্ধ যে তৃতীয় যুগ শুরু হয়, তা ছিল বিশেষভাবে 'কিয়াসের' যুগ। দ্বিতীয় যুগেই 'কিয়াস' (তথা সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত)-এর উদ্ভব ঘটে।

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিশাল আকার ধারণ করলে আইনগত প্রশাসনের সমস্যা নতুন ও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে। ফকীহগণ এসব সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন, হাদীস এবং ইজমার পর চতুর্থ পথ তথা 'কিয়াসের' অবলম্বন শুরু করেন। কিয়াসের শাব্দিক অর্থ অনুমান। নতুন সমস্যা খোঁজার জন্য, শব্দের নিগূঢ় অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার 'ইল্লত' বা মূল কারণ নির্ণয় করতে হয়। তারপর সমস্যাটির কারণ নির্ণয় করতে হয়। যদি পূর্বের বিষয়টির 'ইল্লতের' সাথে পরবর্তী নতুন সমস্যাটির ইল্লাতের' সামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহলে পূর্ববর্তী সমাধানটি পরবর্তীটির জন্য প্রযোজ্য হয়- ইজতিহাদের এই প্রক্রিয়াকেই কিয়াস বলে। ইসলামী বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাবেয়ীগণের যুগে মুসলিম আইন চর্চা

এ যুগে মুসলিম আইন চর্চার কেন্দ্র মক্কা ও মদীনা হতে প্রসারিত হয়ে কুফা, বসরা, মিসর, সিরিয়া ইয়ামেন মোট সাতটি কেন্দ্রে প্রসার লাভ করে। এসব কেন্দ্রের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞরা হলেন ঃ

১. মদীনা কেন্দ্র ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব মাখযুমী (মৃঃ ৯৪ হি./৭১২ খৃ.), উরওয়া ইবনুল যুবায়ের (মৃত্যু, ৯৪ হি./৭১২ খৃ.), আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (মৃ. ৯৪ হি./৭১২ খৃ.), ইমাম আলী ইবনে জয়নুল আবেদীন (মৃ. ঐ), আবদুল্লাহ ইবনে আতবাহ বিন মাসউদ (মৃ. ৯৮ হি./৭১৬ খৃ.), সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (মৃ. ১০৬ হি. / ৭২৪ খৃ.), সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (মৃ. ১০৭ /৭২৫ খৃ.), কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খৃ.), নাফে (মৃ. ১১৭ হি. / ৭৩৫ খৃ.), মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (মৃ. ১২৪ হি./৭৪১),

ইমাম বাকের মুহাম্মদ ইবনে আলী (মৃ. ১১৪ হি./৭৩৩ খৃ. ইমাম জাফর সাদিক (মৃ. ১৪৮ হি. / ৭৬৫ খৃ.) আবু যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়াল (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৮খৃ.), ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আনসারী (মৃ. ১৪৪ হি./৭৬১খৃ.), রাবীয়া ইবনে আবী আবদুর রহমান (মৃ. ১৩৬ হি./৭৫৩ খৃ.)।

২. মক্কা কেন্দ্র ঃ মুজাহিদ, ইবনে জবর (মৃ. ১০৭ হি. / ৭২৫ খৃ.), আকরাম (মৃ, ঐ), আত্তার ইবনে আবী রিবাহ (মৃ. ১১৪ হি. / ৭৩২ খৃ.), আবদুল আজিজ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (মৃ. ১২৮ হি./৭৪৫ খৃ.)।

৩. কুফা কেন্দ্র ঃ আলকামা বিন কায়েস নখয়ী (মৃ. ৬২ হি./৬৮১ খৃ.), মাসরুক ইবনুল অজদা (মৃ. ৬৩ হি./৬৮২ খৃ.), উবায়দা বিন আমর সলমানী (মৃ. ৯২, হি./৭১০ খৃ.), আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ (মৃ. ৯৫ হি./৭৩১ খৃ.) শুরিহ ইবনুল হারিস আল কিন্দি (মৃ. ৭৮ হি./৬৯৭ খৃ.), ইব্রাহীম বিন ইয়াজিদ নখয়ী (মৃ. ৯৫ হি./৭১৩ খৃ.), সাঈদ ইবনে যুবাইর (মৃ. ৯৫ হি./ঐ), আমরব বিন শারজিল (মৃ. ৬৪ হি./৬৮৩ খৃ.), আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা (মৃ. ৮৩ হি./৭০২ খৃ.), আমের শাবী (১০৪ হি./৭২২ খৃ.), হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (খৃ. ১২০ হি./৭৩৭ খৃ.)।

৪. বসরা কেন্দ্র ঃ আবুল আলীয়া রফী ইবনে মাহরান (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ খৃ.), হাসান বসরী (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খৃ.), জাবির ইবনে ইয়াজিদ (মৃ. ৯৩ হি./৭১১ খৃ.), মুহাম্মদ ইবনে শিরিন (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৮ খৃ.), কাতাদা ইবনে দাআমাতাস্ সাদুমী (মৃ. ১১৮ হি./৭৩৬ খৃ.)।

৫. সিরিয়া কেন্দ্র ঃ আবদুর রহমান ইবনে গানম (মৃ. ৭৮ হি./৬৯৭ খৃ.), আবু ইদ্রিস খাওলানী (মৃ. ৮০ হি. /৬৯৯ খৃ.), কুবায়যা ইবনে যবীর (মৃ. ৮১ হি./৭০০ খৃ.), মাকহুল ইবনে আলী মুসলিম (মৃ. ১১৩ হি./৭৩১ খৃ.), রেজা ইবনে হুবুয়াহ (মৃ. ১১২ হি./৭৩০ খৃ.), উমর বিন আবদুল আজীজ (মৃ. ১০১ হি./৭৯১ খৃ.)।

৬. মিশর কেন্দ্র ঃ আবুল খায়র মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ খৃ.), ইয়াজীদ বিন আবী হাবিব (মৃ. ১২৮ হি. / ৭৪৫ খৃ.)।

৭. ইয়েমেন কেন্দ্র ঃ তাউস ইবনে কাইসান (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খৃ.), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (মৃ. ১১৪ হি. /৭৩২ খ.), ইয়াহিয়া বিন কাসীর (১২৯ হি. /৭৪৬ খ.)।

উল্লেখিত কেন্দ্র মধ্যে কুফা এবং মদীনা যথাক্রমে ইমামুল আজম ও ইমাম মালিক-এর তত্ত্বাবধানে চরম উজ্জ্বলতা লাভ করে। এ যুগেই প্রকৃতপক্ষে আইন বিষয়ে ইসলামী গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়। তানযীলুর রহমান লিখেন, "হযরত

নবী করীমের হিজরতের পর প্রায় দেড় শত বছর পর্যন্ত সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করা হইত। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যদি কোন বিষয়ের সমাধান পাওয়া না যাইত, তবে খুলাফায়ে রাশেদা এবং সাহাবা কিরামের জীবনের অনুরূপ ঘটনা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইত। ইহাতে ও সম্ভব না হইলে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা করা হইত। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আইনের কোন সংকলন না থাকায় ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও ফতোয়ার বিধি-বিধানে মতবিরোধ ও গরমিল সৃষ্টি হইতে থাকে। আব্বাসীয় আমলের বিখ্যাত জ্ঞানী ইবনুল মাকাফ্ফা (মৃত্যু. ১৪৪ হি.) সর্বপ্রথম তৎকালীন খলীফা আবুল মনসুর (মৃ. ১৫৮ হিজরী) এর নিকট দেশের সর্বত্র প্রচলন যোগ্য আইন সংকলনের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া একটি পত্র লিখেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে ইবনুল মাকাফ্ফার উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় নাই।" কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী শেষ না হতেই ইমাম আবু হানিফা আবির্ভূত হন।

মুসলিম আইন তত্ত্বের ভিত্তি ও ইমাম আবু হানিফা

মুসলিম আইনতত্ত্ব বিকাশের চতুর্থ যুগ শুরু হয় ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত (জন্ম ৮০ হিজরী/৬৯৯ খৃ.- মৃত্যু ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ.) এর মাধ্যমে। এটি মুসলিম আইন তথা ফিকাহ্র স্বর্ণযুগ বলে কথিত ও পরিচিত। বস্তুতঃ তাঁর হাতেই মুসিলম ফিকাহ্ জন্মলাভ করে।

আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। প্রথম জীবনে কাপড় ব্যবসায়ী এবং পরে খলীফা সুলায়মানের রাজত্বকালে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে অগাধ জ্ঞানবত্তার অধিকারী হন। ইমাম হাম্মাদ (মৃ. ১২০ হি./৭৩৭ খৃ.), ছিলেন তাঁর প্রধান ওস্তাদ এবং ফিকাহ শাস্ত্রের গুরু। তাবেয়ী ইমাম শাবী (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খৃ.), সালমা ইবনে কাহিল, আবু ইসহাক সাবয়ী, সামাক ইবনে হারব, হিশাম বিন উরওয়া প্রমুখের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মেধা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং অসামান্য প্রতিভা সম্পর্কে কোন বর্ণনা বাহুল্য মাত্র, তাঁর সৃষ্টিতে তার পরিচয় বিধৃত। আল্লামা যাহাবী লিখেন, 'বনী আদমের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম মেধাবী ছিলেন'।

ওস্তাদ ইমাম হাম্মাদের মৃত্যুর পর (১২০ হিজরী/৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। শিবলী নোমানী লিখেন ঃ 'ইমাম সাহেব দেশ ও যুগের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রসারিতভাবে আইন প্রণয়েনের কাজ শুরু করিলেন। কাজটি বিপদজনকও ছিল। এজন্য তিনি উহা শুধু নিজের উপরেই সীমাবদ্ধ করিয়া

রাখিলেন না। নিজের ছাত্রদের মধ্য হইতে কয়েকজন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রকে বাছাই করিয়া নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইলেন। তাহারা স্ব স্ব রুচি ও প্রতিভার বিকাশে পরবর্তীকালে এক এক বিষয়ের অথরিটি বানিয়েছিলেন।' ইমাম তাহাবীর মতে, ৪০ জন ছাত্র তাঁকে ফিকাহ্ প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন।

ফিকাহ্ প্রণয়নের পুরো ব্যাপারটি ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁকে ঘিরে বসতেন এবং কোন একটা আইনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হত। দীর্ঘ আলোচনায় ঐক্যমত হলেই আইনটি লিপিবদ্ধ করা হত। সদস্যদের স্বাধীন আলোচনার পর ইমাম রায় দিতেন। কোন সদস্য এরপরও মতানৈক্য পোষণ করলে সে বিষয়ও লিখে রাখা হত। কোন কোন আইনের ব্যাপারে মাসের উপর মাস আলোচনা চলত। একজন সদস্যও অনুপস্থিতি থাকলে সেদিন আলোচনা স্থগিত থাকত। তাঁর এ পদ্ধতি ছিল খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কিন্তু বড় কাজগুলি তো এ রকমই হয়। 'ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক গঠিত ফিকাহ সম্পাদনা কমিটির মাসআলা পর্যালোচনার ধরন সক্রেটিসের দর্শনশাস্ত্রের পর্যালোচনা অনুরূপ ছিল।'

এভাবে সুদীর্ঘ ২২ বছর (শিবলীর মতে, ৩০ বছর) সাধনার পর ১৪৪ হিজরী তথা ৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইমামের তত্ত্বাবধানে সম্পাদনা কমিটি পরিপূর্ণ ফিকাহ শাস্ত্র রচনা ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। ইহা 'কুতুবে আবু হানিফা' নামে পরিচিত হয়। এতে ৮৩ হাজার মাসআলা সন্নিবেশিত হয় যার মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদত সম্পর্কে এবং ৪৫ হাজার বাস্তব জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে। এর মধ্যে লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, পৌরনীতি, গণিত, ব্যাকরণ, ধর্মীয় অনুশাসন, শাস্তি প্রভৃতি আইন অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে ইমাম রাষ্ট্রীয় রোষে পড়ে জেলে যান, সেখানেও এ কাজ অব্যাহত থাকে। পরিবর্ধনের পর উক্ত আইনসমূহ ৫ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। এ বিশাল কাজের পর তাঁর খ্যাতি জগতময় ছড়িয়ে পরে, সর্বত্র তাঁর গৃহীত আইন প্রচলিত হয়, বিচারকেরা এ অনুযায়ী রায় প্রদান করতে থাকেন। আজও মুসলিম দুনিয়ার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ তাঁরই ফিকাহর অনুসারী। আল্লামা শিবলী নুমানী বলেছেন ঃ 'এরিষ্টটলকে যদি তর্ক শাস্ত্রের জনক বলা যায়, তবে নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফা (রা.) কে ফিকাহ শাস্ত্রের জনক বলা যায়।' 'ফিকাহে আকবর' এবং 'আলিম ওয়া মুতায়াল্লেম' নামে ইমামের দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। স্মর্তব্য যে, তাঁর কোন গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায়না, ইমামের ছাত্রদের রচনার মাধ্যমেই এই আইনগুলো আজ অবাধ ধরায় তাঁর মহিমা ঘোষণা করছে।

ইসলামী আইন সংকলনে আবু হানিফা যে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছিলেন তার মাধ্যমে এক অজ্ঞাত দরজা মুসলিম আইনবিদদের জন্য অবারিত হয়ে যায়। সহস্রাধিক ছাত্রের মধ্যে আবু হানিফার সর্বাধিক স্বীকৃত চার জন প্রধান ফকীহ হলেন ঃ ইমামা যুফার (জ. ১১০ হি./৭২৮ খৃ.-মৃত্যু ১৫৮ হি./৭৭৮ খৃ.), ইমাম আবু ইউছুফ (জ. ১১৩ হি. /৭৩১ খ. - মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৯), ইমাম মুহাম্মদ (জ. ১৩২ হি./৭৪৯ খৃ.-মৃ. ১৮৯ হি./৮০৪ খৃ.), এবং ইমাম হাসান (জ. মৃত্যু-২০৪ হি./৮১৯ খৃ.)। এদের মধ্যে ইমাম আবু ইউছুফ হানাফী আইন বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। তিনি হারুনুর রশীদের আমলে (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) সমস্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। আর হানাফী মজহাবের বেশিরভাগ শিক্ষা ইমাম মুহাম্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইউছুফ তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল খিরাজ' এবং 'কিতাবে ইখতিলাফে আবী হানিফা' অন্যতম। ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থগুলো অধিক অধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তন্মধ্যে 'জামে সগীর' জামে কবীর/ মসবুত, 'জিয়াদাত', 'ছিয়রে সগীর', 'ছিয়রে কবীর', হানাফী ফিকাহর উজ্জ্বল নিদর্শন। ইমামে আবু হানিফার অনুসারীর মধ্যে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী আইনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়া যান, তাদের মধ্যে- মুহাম্মদ বিন সুজায়া সলজী (মৃ. ২৬৭ হি./৮৮০ খৃ.), মূসা ইবনে সুলায়মান জুরজানী, ইয়াহিয়া ইবেন মুসলিম (মৃ. ২৪৫ হি. /৮৫৯ খ.), আহমদ ইবেন উমার খাসসাফ (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খৃ.), বুকার ইবেন কুতায়বা আসাদ (মৃ. ২৯০ হি./৯০২ খৃ.), আবদুল হামিদ ইবনে আবদুল আজীজ (মৃ. ২৯২ হি. /৯০৪ খ.), আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাবী (জন্ম ২৩০ হি./৮৪৪ খৃ.) অন্যতম। তাঁদের অনন্য সাধনা সম্পর্কে গাজী শামছুর রহমান লিখেন ঃ "সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সমকালীন ইসলামী বিশ্বে এই ইমামগণের তাকওয়া, নিঃস্বার্থ পরতা, একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ তা এবং গভীর পাণ্ডিত্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁদের মহৎ জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একদিকে তারা নিজেদের সমগ্র জীবন ফিকাহর খিদমতে উৎসর্গ করেছিলেন এবং এজন্য কোন প্রকার পার্থিব লাভ, খ্যাতি বা সম্মানের আশা তারা করেননি, আবার অন্যদিকে তেমনি কোন ভীতি বা লোভ লালসার শিকার তারা হননি।"

আরো কয়েকজন আইনবিদ

ইলমে ফিকাহর গবেষণা এবং সম্পাদনায় ইমাম আবু হানিফার পর আরো কয়েকজন মহান আইন বিশারদ মুসলিম আইনকে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এঁদের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল বাকি সর্ব প্রধান মাযহাবের তিন কীর্তি স্তম্ভ। আবু হানিফাসহ মোট এই চার ইমাম ইসলামী আইনকে এমন চরম শিখরে স্থাপন করেন যে, পরবর্তী উম্মাহর জন্য তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। এই চতুষ্টয়কে সমগ্র মুসলিম জগতের নব্বই শতাংশ মানুষ অনিবার্যভাবে গ্রহণ করে নেয়। ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন ঃ ' দুনিয়ায় শুধু এই চার ইমাম এর তাকলীদের প্রচলন হইল। অন্যান্য ইমামের কোন মুকাল্লিদ রহিলনা। জনসাধারণ এই ইমামদের বিরোধিতার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিল এই জন্য যে, তখন পর্যন্ত ইলমী ইস্তলাহাত অনেক বেশী হইয়া গিয়াছিল, যাহার ফলে দরজায়ে ইজতিহাদ পর্যন্ত পৌঁছা প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং অনুপযুক্ত লোকেরা নিজেদেরকে ফকীহ বলিয়া দাবি করিবে সেরূপ আশংকাও দেখা দেয়। মুসলিম জনসাধারণ পরিষ্কারভাবে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সকলকে ইমামদের তাকলীদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিল এবং প্রত্যেকেরই তাকলীদ কোন এক ইমামের সাথে নির্দিষ্ট হইয়া গেল।" নিম্নে পরবর্তী তিন ইমামসহ তাদের প্রধান ফকীহগণের নাম আলোচিত হল ঃ

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (৯৩ হি./৭১১ খৃ.), মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফার পরে যারা নতুন পথ প্রদর্শন করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। সুদীর্ঘ ৫০ বছর তিনি আইন গবেষণা ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত আইনসমূহ 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক রেজা-ই করীম লিখেন ঃ "আল মুয়াত্তা' গ্রন্থ ইসলামী আইন শাস্ত্রের সর্ব প্রাচীন নিদর্শন। ইহা আজ পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রায় ১৭০০ বিধান সম্বলিত এই বিখ্যাত গ্রন্থে 'ইজমা' ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মাগরিব এবং আন্দালুসিয়া হইতে আল আওয়াই এবং আল জাহিরী কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিগুলোকে অপসারিত করিয়া আজও উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব আরবে বাঁচিয়া আছে। আবু হানিফা এবং আল-মালিকের পরে ইসলামী আইন শাস্ত্রে এতই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, ইহাই আরবদের জ্ঞান সাধনার একমাত্র ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।"

মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ্শাফী (জন্ম ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. - মৃত্যু ২০৪ হি. /৮১৯ খৃ.) ছিলেন 'শাফেয়ী'-মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর 'মুসনাদ' শ্রেষ্ঠ আইন সংকলন। 'রেসালা ফি আদিল্লাতিল আহকাম' তাঁর রচিত উসূলে ফিকাহর সর্ব প্রথম গ্রন্থ এবং সাত খণ্ডে বিরচিত 'কিতাবুল উম্ম' একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বি আইন গ্রন্থ।

শাফেয়ীর চিন্তাধারা তাঁকে ইসলামী আইনতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা প্রদান করেছে।

ইমাম শাফেয়ী-এর পূর্বে আলেমগণ ইসলামী আইনের উৎস কিয়াস'-এর মাধ্যমে সমাধান দিতেন, বিচারবুদ্ধি প্রসূত এই সমাধানকে বলা হত 'রায়' আবার জনকল্যাণ করার উদ্দেশ্যে তারা অনেক সমস্যার সমাধান দিতেন এই পদ্ধতির নাম' ইসতিহ্‌সান'। এই 'রায়' এবং 'ইসতিহাসানের' উদার ব্যবহারের ফলে আইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয়। ইসলামী আইনকে এই মতপার্থক্যের বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করেন ইমাম শাফেয়ী। তিনি শুধুমাত্র 'কিয়াস'কে স্বীকৃতি দিয়ে এই বিভিন্নতার সুযোগকে সংযত করেন। "আইনতত্ত্বের ক্ষেত্রে শাফেয়ী যা অবদান রেখেছেন তা যে সর্বোতভাবে অভিনব এমন দাবি অসঙ্গত। তবে আইনের প্রায় সর্বগুলি প্রত্যয় এবং ধারণাকে তিনি প্রাথমিক স্তর থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নতি করেছেন। সকল প্রত্যয়ের মধ্যে তিনি একটি শৃংখলা এবং বিন্যাস এনেছেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি সব বিন্যস্ত প্রত্যয়ের আলোকে সমগ্র ইসলামী আইনতত্ত্বকে একটি বিশিষ্ট শৃংখলার মধ্যে সুষম অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন।" শাফেয়ী চিন্তাধারাকে যে সকল আইনজ্ঞ দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু উসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (মৃ. ২৮৮ হি./৯০০ খৃ.), আহম্মদ ইবনে উমার ইবনে শরীজ) (মৃ. ৩০৬ হি./৯১৮ খৃ.), ইবনুল কায়স (মৃ. ৩৩৫ হি./৯৪৬ খৃ.), ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া মিসরী (মৃত্যু ৮৩৮ খ.), ইবনুল হাদ্দাদ (মৃ. ৩৪৫ হি./৯৫৬ খ.), মুহাম্মদ ইবনে আবুদল্লাহ সাইরাফী (মৃ. ৩৩০ হি./৯৪১ খৃ.), অন্যতম।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (জন্ম ১৬৪ হি./৭৮০ খ.- মৃ. ২৪১/৮৫৫), বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে ইমাম শাফেয়ীর ছাত্রও মজহাবের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে নিজেই আলাদা মজহাব প্রতিষ্ঠিত করেন। ২১২ হিজরীতে/৮২৭ খৃ. খলকে কুরআনের ফিতনার বিরোধিতার ফলে তিনি গ্রেফতার হন। ২৩২ হি./৮৪৬ খৃ. তিনি নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করেন। মুতাজিলা মতবাদের বল্লাহীন চিন্তাধারাকে তিনি বাধা প্রদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 'খলকে কুরআন' ফিতনা ধ্বংস হয়। আহমদ ইবনে হাম্বলের আইন গ্রন্থের নাম 'মুসনাদ'। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী উল্লেখ করেছেন ঃ "মুসনাদ' গ্রন্থের রচনা ও সংকলন তাঁর বিরাট কীর্তি। তিনি ছিলেন মজহাবের একজন মুজতাহিদ এবং চিরস্থায়ী ইমাম।'

উক্ত চার মজহাব ছাড়াও আরো কতক মজহাব জন্ম লাভ করে কিন্তু তাদের প্রভাব ও অনুসারী হয়োতো সে যুগে কিংবা পরবর্তীতে পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলিম জাহানে চার মজহাবই আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। সুন্নাত আল জামাতের বাইরে খারেজি, শিয়া প্রভৃতি মজহাব প্রসার লাভ করে।

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে উমার ইবনে দামিশকী (৭৮৮ হি./১৩৮৬ খৃ,- মৃত্যু ৮৫৭ হি./১৪৫৩ খৃ.), সিরিয়াতে আওযায়ী মজহাব' প্রবর্তন করেন, স্পেনেও প্রসার লাভ করে এই মজহাব। পরবর্তীতে শাফেয়ী ও মালেকী মজহাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় স্থান হতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াজিদ আল বাগদাদী (জন্ম ২২৪ হি./৮৩৮ খৃ.), তাবারীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'তাবারী মজহাবের' প্রতিষ্ঠাতা, ইহাও পরে সুন্নাত জামাতের চার মজহাবে বিলীন হয়ে যায়।

দাউদ ইবনে আলী খালফ আল ইস্পাহানী (জন্ম ২০২ হি./৮১৭ খৃ.- মৃত্যু ২৭৫ হি./৮৮৮ খৃ.), 'জাহিরী' মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণেতা এবং কুরআন হাদীসের বাহ্যিক তথা জাহির অর্থ করতেন বলে তাঁর মজহাব এ নামে পরিচিতি। এই মজহাবের অবস্থাও একই ভাগ্য বরণ করে।

এই প্রচেষ্টাসমূহের ব্যর্থতা এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী-আইনের গবেষণা এবং সংকলনে চূড়ান্ত সময় চার-ইমামেই শেষ হয়েছে।

ইসলামী আইনের এই সর্বোত্তম সময়ে গবেষণা তথা ইজতিহাদ, মাসআলা বিন্যাস ও সম্পাদনার মৌলিক কাজ সম্পন্ন হয়। 'ইসলামী আইন শাস্ত্র' তথা 'ইসলামী সংবিধান' পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি লাভ করে। ইজতিহাদ গবেষণার পথ দরজা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু বিতর্কিত রায়ে প্রাধান্য দেয়ার রীতি বহাল থাকে।

ইসলামী ফিকাহ তথা আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোন সামান্য ঘটনা নয়। ঐশী নির্দেশ তথা ওহীর মধ্যে থেকে যে বিরাট বিশাল মহীরুহ উদগত হয়েছে তা বিশ্ব নন্দিত, ধর্মপরায়ণ, নিবেদিত চিত্ত আইনবিদের অবদানে সমৃদ্ধ। এই মহীরুহের লালন ও পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নগণ্য, আইনবিদরাই এই ভূমিকা পালন করেছেন। আবুল হাসান আলী নদভী লিখেন ঃ "ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ফিকাহ শাস্ত্রের এই সব ইমাম এবং মুজতাহিদ আলিম-উলামার আবির্ভাব এই ধর্মের জীবনীশক্তি এবং উম্মতের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও যোগ্যতারই দলিল। তাঁদের প্রচেষ্টা ও মেধার দ্বারা মুসলিম উম্মার কর্মমুখর ও পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত জীবনে একটি শৃংখলা ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক

বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃংখলা ও বিপর্যয় অবস্থার হাত থেকে উম্মাহ্ রক্ষা পায়। তারা ফিক্হ্ শাস্ত্রের এমন মজবুত বুনিয়াদ কায়েম করেন এবং এমন মূলনীতি প্রণয়ন ও বিন্যস্ত করেন, যেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে আগত মসলা-মাসাইল ও অসুবিধাদির সমাধান এবং সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনকে নিয়মিত ও শরঈ নেতৃত্বের নিদের্শনায় পরিচালনা করার পথ-নির্দেশ রয়েছে।

মুসলমানদের আইন চর্চা এবং তার উন্নতি বিধান শুধু মুসলিম জগতের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। হাজার বছরের পুরানো উৎস থেকে কিভাবে আধুনিক ব্যবস্থায় এই আইন নিজেকে মানিয়ে নিল তাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ইসলামের সার্বজনীন এবং সর্বকালের আধুনিক মননশীলতার যোগ্যতাও এর আরেকটি প্রমাণ। পণ্ডিত বার্নাড' শ সত্যিই বলেছেন, Islam is the only religion which appears to me to posses assimilating capacity to the changing phases of humainty which can make its appeal to every age."

দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির বিচারে ইসলামী আইনই প্রথম প্রকৃত আইনশাস্ত্র হিসেবে স্থান করে নেয়। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ তাঁর বিশ্বখ্যাত 'Introduction of Islam' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেন- 'মুসলমানগণই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। প্রাচীন কালেও আইনের প্রচলন ছিল ক্ষেত্রবিশেষ। এগুলো বিন্যস্ত থাকলেও সেসব আইনের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। সেই সময়ে আইনের দর্শন ও আইনের উৎস সম্পর্কে কোন আলোচনা হতো না। আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, প্রয়োগ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত। এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ বিষয়গুলো আইন বিশারদের বিন্দুমাত্র নাড়া দিতনা। মুসলমানগণ আইনের উৎস কুরআন ও হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। তারাই সর্বপ্রথম আইনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের পূর্বে আর কেউ আইনের মত এমন বস্তুনিষ্ঠ, এত বিমূত বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেননি।"

চার ইমামের পরবর্তী আজ পর্যন্ত যে সকল ফকীহ জন্মগ্রহণ করেন, তারা উক্ত চার মজহাবের কোন না কোনটা অবলম্বন করে আইনে নিজেদের মেধা এবং যুগের চাহিদাকে প্রতিফলিত করেছেন। নিম্নে এরকম কিছু আইনবিদগণের নাম তুলে ধরা হবে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম আইনবিদগণের যুগকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

১. ফিকাহ্ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ ঃ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ যুগের বিস্তার। আইনের ব্যাখ্যা এবং নীতি বের করার জন্য 'উসূলে ফিকাহ্' নামক নীতি নির্ধারণী শাস্ত্র এ সময়ে রচিত হয়। এটা ছিল চার ইমামের যুগ।

২. পূর্ণতা ও তাকলীদের যুগ ঃ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই দ্বিতীয় যুগের সময়কাল। এ যুগে সাধারণ ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। আলিমরা ও সাধারণ মানুষের মতো বিশেষ কোন ইমামের তাকলীদ করতে এবং উক্ত ফিকাহ্ মতে গ্রন্থাদির রচনা শুরু করেন। তাঁরা নিজ নিজ ইমামদের নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ করে মাসআলা বের করেন। শেষ পর্যন্ত চার ইমামের মজহাবের উপরই অনুসরণের ব্যাপারে সুন্নাত জামাতের অপামর ব্যক্তিবর্গের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. তাকলীদের যুগ ঃ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে আজ পর্যন্ত এ যুগ প্রবাহমান। ইসলামী আইনের স্বয়ং সম্পূর্ণতার কারণে ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। আলিম, সাধারণ জনগণ সবাই গত দুই যুগের আইনের প্রেক্ষিতে ঐ যুগের তাকলীদ করে। তাঁর উদ্ভূত কোন যুগের চাহিদা ও সমস্যার সমাধানের পথ সবসময় খোলা। এক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয়ের মূলনীতিই অনুসৃত হবে- এ ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত বিদ্যমান।

এই তিনটি যুগের মধ্যে প্রথম যুগের আলোচনা আগেই পরিবেশিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় যুগের ফকীহদের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল ঃ

১. আবুল হাসান ওবায়েদ উল্লাহ্ ইবনে হাসান আল খারকী (মৃ. ২৪০ হি./৮৫৪ খ.), হানাফী ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচনা হলো- 'মুখতাসারে শরহে জামে কবীর', 'জামে সগীর' 'উসূলে কারখী' ইত্যাদি।

২. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল মুরুযী (মৃ. ৩৪৪ হি./ ৯৫৫), তাঁর রচনা হলো 'কাফী'। উচ্চস্তরের হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

৩. মুহাম্মদ ইবনে আবুদল্লাহ্ আল বল্খী (৩৬৩ হি./৯৭৩ খৃ.), বলখের ইমাম, তাঁকে আবু হানিফা ছগীর উপাধি দেয়া হয়েছিল।

৪. আহমদ বিন আলী আল রাযী আল জাস্সাস ঃ (মৃ. ৩৭০/৯৮০), শার্হে মুখতাসারে কারখী', 'মুখতাসারে তাহাবী' 'রেসালা উসূলে ফিকাহ' তাঁর গ্রন্থ

৫. আহমদ ইবনে আলী রাযী ঃ (মৃ. ৩৭০ হি. /৯৮০ খৃ.),

৬. মুহাম্মদ সমরকান্দী ঃ (মৃ. ৩৭৩ হি. /৯৮৩ খ.), গ্রন্থ রচনা করেন।

৭. ইউসুফ বিন মুহাম্মদ জুরজানী ঃ (মৃ. ৩৯৮ হি./১০০৭ খৃ.), অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন।

৮. আহমদ ইবনে জাফর কুদুরী ঃ (জ. ৩৬২ হি./৯৭২ খৃ.), মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৬ খৃ.), 'মুখতাসারে কুদূরী' তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ।

৯. উবায়দুল্লাহ বিন উমার সমরকান্দী (মৃ. ৪৩০ হি. /১০৩৮ খৃ.)

১০. হুসাইন বিন আলী জমিরী ঃ (মৃ. ৪৩৬ হিজরী/১০৪৪খৃ.),

১১. মুহাম্মদ বিল হুসাইন বুখারী ঃ (মৃ. ৪৩০ হিজরী/১০৩৮ খৃ.),

১২. আবদুল আজীজ বিন আহমদ বুখারী ঃ (ম. ৪৪৮ হি./১০৫৬ খৃ.),

১৩. মুহাম্মদ ইবনে শারাখসী ঃ তিন খণ্ডে তিনি 'কাফী' রচনা করেন।

১৪. মুহাম্মদ বিন আলী দামগানী ঃ (জ. ৪০০ হি. / ১০০৯-মৃ. ৪৭৮ হি. / ১০৮৫ খ.),

১৫. আলী বিন মুহাম্মদ বয়দাবী ঃ (মৃ. ৪৮২ হি./১০৮৯ খৃ.),

১৬. বকর ইবনে মুহাম্মদ যরনজী ঃ (জ. ৪২৭ হি./১০৩৫-মৃ. ৪৭৪ হি./১০৮১ খৃ.),

১৭. ইব্রাহীম বিন ইসমাঈল সাফফার ঃ (মৃ. ৫৩৪ হি./১১৩৯ খৃ.),

১৮. হুসাম উদ্দীন উমার বিন আবদুল আজীজ ঃ (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪১ খৃ.),

১৯. উমার বিন মুহাম্মদ নসফী ঃ (মৃ. ৫৩৭ হি./ ১১৪২ খৃ.),

২০. আবদুর রাজ্জাক আল ওয়ালজী ঃ (মৃ. ৫৪০ হি./১১৪৫ খৃ.),

২১. ইবনে আবদুর রশীদ বুখারী ঃ (মৃ. ৫৪০ হি./১১৪৫ খৃ.),

২২. আবদুল গফুর ইবনে লোকমান ঃ (মৃ. ৫৪২ হি./১১৪৭ খৃ.),

২৩. মুহাম্মদ ইবনে আলী যরনগরী ঃ (মৃ. ৫৮৪ হি. / ১১৮৮ খৃ.),

২৪. মাসউদ ইবনে আহমদ কাসানী ঃ (মৃ. ৫৮৭ হি./ ১১৯১ খৃ.),

২৫. ফখর উদ্দীন কাযীখান ঃ (মৃ. ৫৯২ হি./১১৯৫ খৃ.),

২৬. আবদুল জলীল ফারগানী ঃ (মৃ. ৫৯৩ হি./১১৯৬ খৃ.),

২৭. আবুল ফতেহ খারেজমী ঃ (মৃ. ৬১০ হি./১২১৩ খৃ.),

২৮. হাসান ইবনে মুহাম্মদ লাহেরী ঃ (মৃ. ৬৫০ হি./১২৫২ খৃ.),

২৯. ইবনে লুববা উন্দলসী ঃ মালিকী ফকীহ ছিলেন/ (মৃ. ৩৩৬ হি./ ৯৪৭ খৃ.),

৩০. বকর বিন উলা কুশাইলী ঃ মালিকী ফকীহ (মৃ. ৩৪৪ হি./৯৫৫ খৃ.),

৩১. আবদুর রহমান নকরী 'করওয়ানী ঃ ঐ, (মৃ. ৩৮৬ হি./৯৯৬ খৃ.),

৩২. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আবহুরী ঃ ঐ (মৃ. ৫৯৫ হি./১১৯৮ খৃ.),

৩৩. ওয়াহিদ বিন হুসাইন যমীরী ঃ শাফীই ইমাম (মৃ. ৩৮৬ হি./৯৯৬ খৃ.),

৩৪. তাহের ইবনে আবদুল্লাহ তাবারী ঃ ঐ (৪৫০ হি./১০৫৮ খৃ.)

৩৫. ইব্রাহীম বিন আলী সিরাজী ঃ ঐ (৪৭৬ হি./১০৮৩ খৃ.),

৩৬. মালিক বিন আবদুল্লাহ জুবিনী ঃ ঐ (৪৭৮ হি./১০৮৫ খৃ.),

৩৭. মুহাম্মদ আল গাজালী ঃ ঐ প্রখ্যাত দার্শনিক, (মৃ. ৫০৫ হি./১১১১ খৃ.),

৩৮. তামিনী আল্ মওসুলী ঃ দামিশকের প্রধান বিচারপতি ছিলেন

৩৯. ইবনে মুহাম্মদ হরবী আনসারী ঃ হাম্বলী ফকীহ, (মৃ. ৪৮১ হি./১০৮৮ খৃ.),

৪০. ইবনে জাওমী আল বাগদাদী ঃ ঐ (মৃ. ৫৯৭ হি./ ১২০০ খৃ.),

এ তালিকায় আরো অনেক ফকীহগণের নাম উল্লেখ করা যায়। অধিকাংশ ফকীহগণের রয়েছে ফিকাহ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। তৃতীয় যুগের অসংখ্য বিশিষ্ট ফকীহ গণের মধ্যে কয়েকজনের তালিকা দেয়া হল ঃ

১. আউয়াল মাহবুবী বুখারী ঃ 'হিদায়া' ও ' বিকায়ার' গ্রন্থকার। (মৃ. ৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.),

২. ইবনে মওদুদ মওসূলী ঃ 'আল, মুখতার রচনাকার। (মৃ. ৬৮৬হি./ ১২৮৭ খৃ.),

৩. আবদুল্লাহ বিন আহমদ ঃ কাজে দাকায়েক গ্রন্থাকার। (মৃ. ৭১০ হি./১৩১০ খৃ.),

৪. উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ ঃ 'শরহে বেকায়া' প্রণেতা। (মৃ. ৭৪৭ হি./১৩৪৬ খৃ.),

৫. আলাম বিন আলাউ আন্দরকানী ঃ 'ফতওয়া তাতারখানী প্রণেতা। (৭৮৬ হি./১৩৮৪ খৃ.),

৬. ইবনে হুসসাম নাগুরী ঃ ফতওয়ায়ে হাম্মানিয়া প্রণয়ন করেন।

৭. মাহমুদ ইবনে আহমদ ঃ একাধিক শরাহ প্রণেতা। (মৃ. ৭৮৯ হি./১৩৮৭.),

৮. ইবনে মুহাম্মদ জুবজানী ঃ ঐ. (মৃ. ৮১৬ হি./১৪১৩ খৃ.),

৯. কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী ঃ ফতওয়া ইব্রাহীমশাহী প্রণেতা (মৃ. ৮৮৫/১৪৮০ খৃ.),

১০. বদরুল আল আইনী ঃ শারহে মানিউল আসার প্রণেতা, (মৃ. ৮৫৫ হি./১৪৫১ খৃ.)

১১. কামাল উদ্দীন সিয়ূতি ঃ ফতহুল কাদীর প্রণেতা, (মৃ. ৮৬১ হি./১৪৫৬ খৃ.),

১২. আহমদ বিন সুলায়মান রুমী ঃ বহুগ্রন্থ প্রণেতা, (মৃ. ৯৪০ হি./১৫৩৬ খৃ.),

১৩. মোল্লা আলী কারী ঃ নিকায়াহ, মিরকাত প্রণেতা, (মৃ. ১০১৪ হি./১৬০৫ খৃ.),

১৪. আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী ঃ লুমআত প্রণেতা, (মৃ. ১০৫৮ হি./১৬৮৪ খৃ.),

১৫. আলাউদ্দীন উবনে আলী ঃ দুররুল মোখতার প্রণেতা, (মৃ. ১০৮১ হি./ ১৬৭০ খৃ.),

১৬. সম্রাট আওরঙ্গজেব ঃ ফতওয়া আলমগীরী প্রণয়ন করান, (মৃ. ১১১৮ /১৭০৬ খৃ.),

১৭, খাজা মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ ঃ 'ফতওয়া নকশ বন্দিয়া' প্রণেতা

১৮. মহিবুল্লাহ বিহারী ঃ 'মুসাল্লামুস সুবুত' রচনা করেন। (মৃ. ১১১৯ হি./১৭০৭ খৃ.),

১৯. মোল্লা জিওন ঃ 'নুরুল আনওয়ার' প্রণয়ন করেন। (মৃ. ১১৩০ হি./১৭১৭ খৃ.),

২০. শাহ আবদুল আজীজ ঃ ফতওয়ায়ে আজিজিয়া প্রণেতা। (মৃ. ১২৩৯ হি./১৮২৩ খৃ.),

২১. আল্লামা শামী ঃ রদ্দুল মোখতার, ফতওয়া হামিদিয়া প্রণয়ন (মৃ. ১২৫২ হি./১৮৩৬ খৃ.),

২২. আবদুল হাই লখনবী ঃ মজমুয়ায়ে ফতওয়া প্রণয়ন। (মৃ. ১৩০৪ হি./১৮৮৬ খৃ.),

২৩. মাওলানা রামপুরী ঃ ফতওয়া রশীদিয়া প্রণেতা। (মৃ. ১৩১১ হি./১৮৯৩ খৃ.),

২৪. রশীদ আহমদ গাংগুহী ঃ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। (মৃ. ১৩২৩ হি./১৯০৫ খৃ.),

২৫. গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী ঃ বহু গ্রন্থ প্রণেতা। (মৃ. ১৩২৩ হি./ ১৯০৫ খৃ.),

২৬ আহমদ রেজা বেরলভী ঃ ফতওয়া রিজভিয়াহ প্রণেতা। (মৃ. ১৩৪০ হি./১৯২১ খৃ.),

২৭. হাফেজ আবদুল্লাহ ঃ মাখজানুল ফতওয়া প্রণেতা। (মৃ. ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খৃ.),

২৮. আশরাফ আলী থানবী ঃ বেহেশতী জেওর, ফতওয়া এমদাদিয়া প্রণেতা। (মৃ. ১৩৬২ হি.),

২৯. আযীমুল ইহসান ঃ বহুগ্রন্থ প্রণেতা। (মৃ. ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.),

৩০. মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ জওয়াহেরে ফিকাহ প্রণেতা। (মৃ. ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খৃ.),

এই তালিকা সংক্ষিপ্ত। আরো বহু ফকীহ ইসলামী আইনের সমৃদ্ধি করণে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

ইসলামী আইনের নীতিমালা প্রণয়ন

ইসলামী আইনের নীতিমালা (Criteria) গুলোকে 'উসূলে ফিকাহ' বলা হয়। যার মাধ্যমে ওহীসমূহ পর্যালোচনা করে শরীয়তের আদেশ-নির্দেশ নির্ণয় করা যায় এবং পরিভাষাসমূহের জন্য একটি মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা যায়। সেই নীতিমালার সমষ্টিকে 'উসূলে ফিকাহ' বলে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ 'উসূলে ফিকাহর' গ্রন্থ লিখেছিলেন, এরূপ তথ্য জানা গেলেও তাঁদের গ্রন্থাবলীর খোঁজ পাওয়া যায় ন। এক্ষেত্রে ইমাম

শাফেয়ী শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তিনি তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' এর শুরুতে ' রিসালায়ে উসূলে ফিকাহ' অবতরণিকা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। আরও যারা এ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাঁরা হলেন ঃ

১. আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ঃ 'কিতাবুল বুরহান, (মৃ. ৪৭৮ হি./১০৮৫ খৃ.),

২. ইমাম আল গাজালী ঃ 'আল মুস্‌তাস্‌ফা' (মৃ. ৫০৫ হি./১১১১ খৃ.),

৩. আবুল হোসাইন বসরী ঃ 'কিতাবুল আহাদ', (মৃ. ৪৩৬ হি./১০৪৪ খৃ.),

৪. ফকরুদ্দিন রাযী ঃ আল মাহসুল ফি উসূলুল ফিকাহ্ (মৃ. ৬০৬ হি./১২০৯ খৃ.),

৫. সাইফুদ্দীন আমুদী ঃ ফী উসূলিল আহকাম, (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৩ খৃ.),

৬. মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ঃ ইলমিল উসূল, (মৃ. ৬২৮ হি./১২৩০ খৃ.),

৭. ইবনে হাজের ঃ কিতাবুল আহকাম, (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খৃ.),

৮. আবু বকর জাসসাস ঃ কিতাবুল উসূল, (মৃ. ৩৭০ হি./৯৮০ খৃ.),

৯. আহমদ ইবনে সা.আতী ঃ উসূলে বযদুবী, (মৃ. ৬৯৪ হি./ ১২৯৪ খৃ.),

১০. মোল্লাহ জিওন ঃ নুরুল আনওয়ার, (মৃ. ১১৩০ হি./১৭১৭ খৃ.),

১১. নিজাম উদ্দীন শাফী হানাফী ঃ উসূলুশ শাশী, (৭৮১ হিজরীতে), সমাপ্ত করেন।

মানুষের জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা ইসলামী আইনে উঠে আসেনি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, লেন-দেন, অপরাধ-শাস্তি, উত্তরাধিকার, যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের হাত প্রাসারিত। বর্তমানে ইসলামী আইনের কার্যাবলী ছয়টি ক্ষেত্রে প্রসারিত। তা হলো–

১. ইবাদত ঃ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে।

২. মুয়ামেলাত ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন ঃ বেচা-কেনা, ব্যবসা, ধার, আমানত, ইত্যাদি বিধান দেয়।

৩. মুনাকিহাত ঃ বিয়ে, তালাক, নসব, অসিয়ত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকুবাত ঃ হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি

৫. মুয়াসিমাত ঃ আদালতের বিষয়াবলী, ঝগড়া, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি

৬. হুকুমাত ও খিলাফত ঃ যুদ্ধ, সন্ধি, ট্যাক্স, চুক্তি ইত্যাদি বিষয়াবলী।

এসব ক্ষেত্রের মধ্যে ইবাদত, পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন মুসলিম দেশসমূহে কম-বেশী পালিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এসব আইন গৃহীত হয়েছে। অনেক অমুসলিম দেশে ও সংখ্যালঘু মুসলিম জনসাধারণের জন্য পারিবারিক আইনসমূহ বলবৎ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। মুয়ামেলাত তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়

সীমিত ক্ষেত্রে মুসলিম আইন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে বলা যায়, 'সুদের' ইসলামী বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে যখন ভাবতে বসেছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অসহায়তার কথা, তখনই বিভিন্ন দেশে ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংকসমূহ। বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহের চাইতে উন্নত ব্যবস্থাপনা এই প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা আধুনিক যুগেও চমৎকার ফলদায়ী। একই সাথে মুসলিম বাণিজ্য নীতি অনুসরণ যেমন ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সকল লেনদেন, গ্যারান্টি চুক্তি, বন্ধক, অংশীদারী কারবার, হাওয়ালা তথা ঋণপত্র, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করলে সুফল নিশ্চিত বলা যায়। 'উকুবাত' তথা বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় মূল্যবান ভূমিকা রাখে। ইসলামী বিধানে অপরাধের শাস্তি কঠিন হওয়াতে মানুষ অপরাধে সহজে প্রবৃত্ত হয়না। বর্তমানবিশ্বে অপরাধের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে শাস্তির পরিমাণ 'মানবাধিকারের' নাম দিয়ে কমানো হচ্ছে। অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে অবস্থা যে খারাপের দিকেই যাচ্ছে তা বলা বাহুল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই যদি ধরি, ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ২২৫২০টি, অর্থাৎ প্রতি ২৩ মিনিটে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। (সূত্র, Jaseph F. Sheley, Exploring Crime P-73, Wadsworth Publishing Co. California) সেইক্ষেত্রে Time ম্যাগাজিনের জানুয়ারী ১৯৯৫-তে পরিবেশিত তথ্যে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তথ্য মতে, ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫ মিনিটে একজন মানুষ খুন হয়। এই হল তাদের আইনের সুফল। অথচ ইসলামী শাস্তির বিধান আছে এরকম দেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সৌদি আরবের কথাই যদি ধরা যায়, অপরাধ খুবই কম। এক পরিসংখ্যান মতে, আমেরিকায় একদিনে যে অপরাধ সংঘটিত হয় সৌদি আরবে তা ১১ বছরেও হয়না।

খিলাফত ও হুকুমাত সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যায় ইসলামী মতবাদ খুবই স্পষ্ট। যুদ্ধ, চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের প্রসার ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

প্রখ্যাত মনীষী আবদুর রহমান আয্যাম লিখেছেন ঃ 'ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ 'লীগ অব নেশনস্' গঠন করার তেরশ বছর পূর্বে 'হিলফ আল ফুজুল' গঠিত এবং খোজাদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। লীগ অব নেশন্স্ যেসব শর্ত চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল তের'শ বছর আগেই ইসলাম তা সম্পাদন করেছিল। তা

হলো, অত্যাচারিতকে সাহায্য করে যৌথ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মিথ্যার বিনাশ করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা।'

আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে এভাবেই গড়ে উঠে। প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক আইন বলতে যা বুঝানো হতো তাতে কোন আন্তর্জাতিকতা ছিলনা। বস্তুত তা আইনও নয়; তা ছিল রাজনীতিরই অঙ্গ বিশেষ। রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরই এটা নির্ভরশীল ছিল। মুসলমানরাই প্রথম আইনকে একটি নির্দিষ্ট বিধি ও ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন; সঙ্গে জুড়ে দেন দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়টি।

মহানবীর যুগে যেসব চুক্তি ও আইন প্রণীত হয়েছে, সেগুলোতে আন্তর্জাতিক ধারাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। পরে মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপ্তি লাভ করলে তা আরো বিকশিত হয়। প্রসঙ্গত যায়েদ ইবনে আলীর (মৃ. ১২০ হি./৭৩৭ খৃ.), যে চুক্তি পত্রটি পাওয়া গেছে তা উল্লেখযোগ্য। ইসলামী আইনসমূহ আব্বাসীয় আমলেই ভিত্তি প্রাপ্ত হয় তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময়ে মুসলিম ফকীহদের হাতেই আন্তর্জাতিক আইনসমূহ বিকাশ ও স্থাপনা লাভ করে। ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ জানিয়েছেন ঃ "মুসলমানদের হাতে আন্তর্জাতিক আইন স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এমনকি ১৫০ হিজরীর পূর্বে প্রণীত বিভিন্ন বিবরণ বা রচনায় এতদ্সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সে সময়ে আন্তর্জাতিক আইন বলতে স্বতন্ত্র কোন শিরোনাম ছিলনা, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 'সিয়র' শীর্ষক শিরোনামে এ আলোচনা স্থান পেয়েছে।"

ইমামে আজম আবু হানিফা আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইবনে হাজর উল্লেখ করেছেন, আবু হানিফা এ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল–

১. এখানে সমস্ত বিদেশীদের একই পাল্লায় পরিমাপ করা হয়েছে।

২. বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আইনতত্ত্বের জনক হিসাবে আবু হানিফাই যে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে বক্তব্য ও নীতিমালা উদ্ভাবন করেন তা জানা যায়। এরপর আবদুর রহমান আল্ আওযায়ী 'সিয়র' বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। আওযায়ী (মৃ. ১৫৭ হিজরী/৭৭৪ খৃ.), এর পর ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ী এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে যিনি আন্তর্জাতিক আইনসমূহকে একটি সুস্পষ্ট কাঠামোয় দাঁড় করান, তিনি আবু হানিফা এবং পরবর্তীতে আবু ইউসুফেরই ছাত্র হাসান আশ্ শায়বানী।

মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (জ. ১৩২ হি./৭৫০ খৃ.-মৃ. ১৮৯ হি./৮০৪ খৃ.), ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফাই তাকে আইন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন। তার ১৮ বছর বয়সেই ইমাম (১৫০ হি./৭৬৮ খৃ.), ইন্তিকাল করলে জাফর এবং ইমাম আবু ইউসুফ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁদের হাতেই তিনি ফিকাহ বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হন। আইন শিক্ষাকালেই তিনি লিখতে শুরু করেন, আর সৃজনশীল দক্ষতার স্বাক্ষর তার এসময় পাওয়া যায়।

শায়বানী আইন বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ লিখেছেন, তন্মধ্যে 'কিতাব আল আছল', 'কিতাবুল জামে আস্ সাগীর', 'কিতাবু জামে আল কাবীর', 'কিতাব সীয়ার আল সগীর', 'সীয়র আল কাবীর' অন্যতম। প্রত্যেকটি গ্রন্থে তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে গুরুত্ব সহকারে সংকলিত করেন। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফের উত্তরাধিকার তিনি এতে তুলে ধরেন। শায়বানী সর্বপ্রথম বৈদেশিক বিষয়ক আইনগুলোকে একত্রিত করে মুসলিম আন্তর্জাতিক বিষয়ক আইনসমূহকে আপন সৃজনশীলতায় একটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব প্রদান করেন। এ কারণে তাঁকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের 'জনক' বলা হয়।

বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক আইন প্রচলিত আছে তার জনক বলা হয় 'হিউগো গ্রোশিয়াসকে'। কিন্তু ওই মহান আরব চিন্তাবিদ শত শত বছর আগেই প্রথম আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেন। আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে খাটো করার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শায়বানীকে 'মুসলমানদের হিউগো গ্রোশিয়াস' বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়। আরব ভাষী খৃষ্টান গবেষক প্রফেসর মজীদ খাদ্দুরী তা মানতে রাজী নন; তিনি বলেন, "তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান ও আইনের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে শায়বানী কম পরিচিত হলেও গ্রোসিয়াসের সাথে শায়বানীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা হলে তাতে এ প্রাচীন লেখকের সম্মান বৃদ্ধি পাবে না- কারণ আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়েই আছে।" গ্রোসিয়াসের প্রণীত আইনের দুর্বলতার পটভূমিতে শায়বানীর প্রয়োজন এবং মূল্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে শায়বানীর একটি রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'দি হপকিনস প্রেস' থেকে। 'দি ইসলামিক ল অব নেশনস্- শায়বানী'জ সীয়ার' নামক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক ফিলিপ সি. জেসাপ বলেন ঃ 'শায়বানীর উপদেশ সংক্রান্ত মূল গ্রন্থাংশের প্রকাশনা বিশেষভাবে সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ, পশ্চিম ইউরোপীয় অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলে কথিত হিউগো গ্রোশিয়াসের আন্তর্জাতিক আইন বর্তমানে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অত্যন্ত ব্যাপক ও ভিন্নমুখী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ অনুপযোগী এই প্রশ্নে বিতর্ক এখন গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের লেখনী ও আন্তর্জাতিক রায়ে ল অব নেশন্‌স সম্পর্কে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী অগ্রদূতগণদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যুগে যুগে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে কতিপয় মতবাদ কত ব্যাপকভাবে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।"

শায়বানী তাঁর রচনায় এ আইন লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে 'সীয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটির একটি অর্থ, জীবনীর ধারাবাহিক বিবরণ; অন্য অর্থ হচ্ছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচরণ। দ্বিতীয় অর্থটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। 'কিতাবুল আছল' নামক বিরাট গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন।

ইস্তাম্বুল এবং কায়রো থেকে তাঁর রচনাসমূহ সংগ্রহ করে মজীদ খাদ্দুরীর সম্পাদনায় ইংরেজীতে অনূদিত হয়। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশ খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হলেও পুরো রচনা তখনও প্রকাশিত হয়নি। শায়বানীর সর্বপ্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তা ৬৩৮ হিজরী/১২৪০ খৃষ্টাব্দ তারিখ অঙ্কিত। অধ্যাপক খাদ্দুরী শায়বানী 'সীয়ার' এর যে অনুবাদ দাঁড় করিয়েছেন তা থেকে সংবদ্ধ আইনের শিরোনাম অধ্যায় নিম্নরূপ ঃ

১. যুদ্ধের আচরণ সম্পর্কীয় হাদীস

২. শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর আচরণ সম্পর্কীয়

৩. যুদ্ধ লব্ধ মাল সম্পর্কীয়

৪. মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা এবং যুদ্ধরত এলাকায় সম্পর্ক বিষয়ক

৫. শান্তি চুক্তি সম্পর্কীয়

৬. 'আমন' বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কীয়

৭. স্বধর্ম ত্যাগ সম্পর্কীয়

৮. মতভেদ বা বিবাদ ও রাজপথে ডাকাতি সম্পর্কীয়

৯. কিতাব আল-সীয়ারের ক্রোড়পত্র

১০. কিতাব আল খারাজ (করারোপণ সম্পর্কীয় পুস্তক)

১১. 'উশর' (তথা উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ) সম্পর্কীয় পুস্তক

মুসলিম আইনকে ভিত্তি দেয়া এবং তাকে জগতের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করায়

মুসলিম আইনজ্ঞদের প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। কিন্তু মুসলিম আইনের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর বর্ণনা এক ব্যাপক বিষয়। আইন তত্ত্বের বৈষয়িক বিবৃতি এই লেখার উদ্দেশ্য নয় বরং আইনের পূর্ণতা সাধনে মনীষীদের অবদান তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। শেষ করার পূর্বে ইসলামী আইন এবং মানব রচিত আইনের মৌলিক কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে। শহীদ আবদুল কাদের আওদা মৌলিক তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তা হলো ঃ

ক. ইসলামী আইন হচ্ছে আল্লাহর বিধান; অন্যান্য আইন হচ্ছে মানবিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফসল। ঐশী বিধান পূর্ণত্ব এবং মহত্ত্বকে ধারণ করে থাকে, আর মানবিক বিধান মানুষের অপূর্ণতা, অপারগতাকে ধারণ করে বলে বিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

খ. ইসলামের আইন আল্লাহর বিধান আল্লাহ চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেন তার আলোকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় সংগঠিত হয়, সমাজ পরিবর্তন হয় ঐশী বিধান পরিবর্তন হয় না, নবতর ব্যাখ্যা নিয়ে ইহা যে কোন যুগে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। অন্যদিকে মানব রচিত আইন দ্বারা সেই সমসাময়িক নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিকে বোঝান হয়, যাকে একটি সমাজ নিজেদের প্রয়োজনের পারস্পরিক আদান প্রদান ও ব্যবহারিক দিকটির সংগঠন এবং নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য রচনা করে। তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই আইন ও দ্রুত পরিবর্তন হয়।

গ. ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সংগঠন ও তার বিভিন্ন দিকের পুনর্গঠন। এর দ্বারা সে সমাজে সৎ ও পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার ঘোষণাবলী ততখানি উন্নত মানের হয়েছে, যা তা অবতীর্ণ কালীন সময়ের সমগ্র দুনিয়ার মানদণ্ডের তুলনায় অধিক উন্নত মানের বলে প্রতীয়মান। আর বর্তমানেও তা একই মানের রয়েছে। আর মানব রচিত আইনের ক্ষেত্রে নীতিগত কথা হচ্ছে সে দল ও সমাজের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠন করেনা। আইন সমাজ গঠন হবার পরে তার কর্মময় ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাখ্যা ও বিবর্তন উপস্থিত করে। কিন্তু আইনের এ দর্শনটি পাল্টে গেছে। তাই বর্তমানে সেও নিজেকে সমাজের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস উভয় কাজের দায়িত্বশীল ভেবে থাকে।

গণিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

বিজ্ঞানে অংকশাস্ত্রের অবস্থান 'মা'-এর মতো। সকল বিজ্ঞানের সূত্রপাত অংকশাস্ত্র হতেই আরম্ভ হয়। কোথা হতে এ শাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ হয়েছিলো নিশ্চিত জানা না গেলেও মানুষের প্রয়োজনে হিসাবের ব্যবহার যে আদি যুগেই শুরু হয়েছিলো এ সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধানের অপেক্ষা করতে হয়না। অনেকে মেসোপটেমিয়া ও মিশরকে অংকশাস্ত্রের আদি ভূমিরূপে চিহ্নিত করেন। এ দৌড়ে চীন ও ভারতবর্ষ ও কম যায়না। সে যাই হোক, মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই শাস্ত্র যে বহু সভ্যতায় অনুচর্চিত হয়েছিলো এবং নানা পর্বে উন্নতি লাভ করেছিলো তা নিশ্চিত।

মুসলিম যুগে অংকশাস্ত্রের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা আসে পবিত্র কুরআন হতে আর সেই অনুপ্রেরণা শাস্ত্র চর্চার মর্যাদা লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। পবিত্র কুরআনে সংখ্যা বিজ্ঞান এবং হিসাব বিজ্ঞানের যে ধারণা দেয়া হয়েছে তা মূলতঃ এসেছে এক আল্লাহর একত্ববাদ হতে। সাঈদ হোসেন নাজী তাঁর- 'ইসলামিক সায়েন্স' গ্রন্থে ইখওয়ানুস-সাফার গাণিতিক মতবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'মানুষের অন্তরে সংখ্যার অবয়বগুলি জড়বস্তুতে অস্তিত্ববান অবয়বের অনুরূপ। ইহা উর্ধ্বলোকের একটি নমুনা। গণিতের জ্ঞানের মাধ্যমে একজন তপস্বী ক্রমান্বয়ে অন্যান্য গাণিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। সংখ্যা বিজ্ঞান বিজ্ঞানসমূহের বুনিয়াদ, জ্ঞানের মৌল উপাদান, বেহেশতী বিজ্ঞানের মূল, সংখ্যারাশির স্তম্ভ, প্রথম স্পর্শমণি ও মহান রসায়ন।'

কুরআনে সংখ্যা চর্চা বিষয়ক অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা মু'মিন এ বলা হচ্ছে- 'আল্লাহ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর অবস্থান করছিলে? ওরা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন। বা একদিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।' (২৩ ঃ ১১২-১১৪) আল্লাহর অফুরন্ত করুণা সম্পর্কে বলা হচ্ছে; যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা কর, তবে উহার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (১৪ঃ৩৪) মুসলিম নারীর তালাক ও ইদ্দত, কাফিরদের শাস্তি, ক্রয়-বিক্রয়, সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, উত্তরাধিকার আইন, রমজান, যাকাত ফিতরা, বিচার ও অন্যান্য অনেক উপলক্ষ গণনা ও হিসাবের আওতাভুক্ত। এ সকল বিষয়ের প্রেরণা মুসলিম বিজ্ঞানীদের

গণিত চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে বললে অত্যুক্তি হয়না। আল্লামা আফযালুর রহমান লিখেছেন ঃ ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে সংখ্যাসমূহের প্রতীকী ভূমিকা গণিত চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছে। ...কুরআন চর্চার প্রেরণাই গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিতে বিরাট গবেষণার সহায়ক হইয়াছে এবং মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিতের ক্ষেত্রে নয়া নানাবিধ প্রয়োগ-পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছেন।'

মহানবীর ইন্তিকালের পর, অনেকের মতে তাঁর জীবিতকালেই হিজরী সন গণনা আরম্ভ হয়ে যায়। অন্য মতে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের সময়ে তিনি ৬৩৮/৩৯ খৃ. দিকে হিজরী সন চালু করেন শাসন ও রাজত্ব ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে। ৬২২ খৃ. ২০ সেপ্টেম্বর হিজরতের প্রকৃত তারিখ হলেও ৬২২ খৃ. ১৫ জুলাই শুক্রবার হতে হিজরী সনের যাত্রা আরম্ভ হয়। পঞ্জিকা তথা তারিখ নির্ধারণের ব্যবস্থা হবার পর মুসলমানরা আরবী অক্ষরসমূহকে 'আবজাদ' সংখ্যামালার গণনা অনুযায়ী ব্যবহার করা শুরু করে। আরবী হরফের সংখ্যা মানগুলো হলো ঃ

আলিফ-১	ত্বা-৯	ফা-৮০	যাল্-৭০০
বা-২	ইয়া-১০	ছোদ্ব-৯০	দ্বোত্-৮০০
জ্বিম-৩	কাফ-২০	ক্বাফ্-১০০	জোয়া-৯০০
দ্বাল-৪	লাম-৩০	রা-২০০	গাইন-১০০০
ছোট হা-৫	মীম-৪০	সীন-৩০০	ওয়াত-৬
নুন-৫০	তা-৪০০	যা-৭	ছিন-৬০
ছা-৫০০	বড় হা-৮	আইন-৭০	খা-৬০০

বিজ্ঞান হিসাবে এর স্থান যেখানেই হোক না কেনো সুসংবদ্ধ গণনা পদ্ধতির নিয়মের এটি ছিলো প্রাথমিক প্রচেষ্টা। ষাট শতাব্দীর পর মুসলিম বিজয় বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হলে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও নির্বিঘ্ন হওয়ার পর প্রধানত মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন হয়। গ্রীক ও অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রভাব মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তা নায়কদের জাগিয়ে তোলে নতুন প্রেরণায়। আব্বাসীয় আমলের শুরু থেকেই হয় নতুন যুগের সূচনা ।

আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল্ মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) রাজত্বকাল ছিলো মুসলিম জাহানের জন্য বিশেষত বিজ্ঞান চর্চার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনেক বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ তাঁর রাজসভা অলংকৃত

করেছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন আবু ইসহাক আল ফাজারী। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনিই প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর চিন্তাধারা ছিলো খুব উচ্চাঙ্গের। জানা যায়, তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র আস্তারলব (astrolabe) নির্মাণ করেন এবং অংক শাস্ত্রের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করেন। গণিত বিষয়ে (Armillery sphery) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ এখনও অনেক বিষয়ে প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। আল ফাজারী প্রথম আরব গণনা পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করে আরব বর্ষগণনা ও দিনপঞ্জী প্রণয়ন করেন। ভারতের তৎকালীন বিজ্ঞানী কঙ্কায়ন বা মঙ্ককে 'সিন্দহিন্দ' নামক গ্রন্থসহ তিনি মনসুরের দরবারে আনয়ন করেন। ফাজারী ৭৭৭ খৃ. মৃত্যু বরণ করেন।

আল ফাজারীর পুত্র আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম পিতার উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়েছিলেন। তিনি উক্ত 'সিন্দহিন্দ' গ্রন্থটি খলীফার আদেশে ৭৭২/৭৩ খৃ. আরবী অনুবাদ করেন। তাঁর এ অনুবাদের উপর ভিত্তি করেই আল খারেজমী তাঁর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকা (astronomical table) 'ফি-জিজ' প্রণয়ন করেন। আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক বিশুদ্ধ গণিত চর্চাতে অবদান রাখেন। তিনি গ্রীক বিজ্ঞানী টলেমীর Tetrabiblos গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। এ সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইয়াকুব বিন তারেক মিশরীয় আরব ইহুদী মাশাআল্লাহ্ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলিম গণিত চর্চার বিষয় ভারতীয় ও গ্রীক অনুবাদের মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিলো। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার মুসলিম আমলে আরবী অনুবাদের ফলেই ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায় এবং ইউরোপে প্রচার লাভ করে। H. A. Salmon তাঁর 'Rise and fall of the Arab Dominion' গ্রন্থে বলেন ঃ The Arab were the first to introduce Greek writers to the notice of the world. They kindled the lamp of learning which illumunated the dark pages of history and it may be safely assumed that were it not for the Arabs, it would have seen long before Europe, the present centre of civilisation and progress would have been irradiated by the bright light of knowledge. শুধু তাই নয়, ভারতীয় বিজ্ঞান ও আরবদের অনুবাদের কল্যাণে ইউরোপের হাতে পৌঁছেছিলো।

জ্যামিতির গ্রীক জনক ইউক্লিড খৃষ্টপূর্ব তিনশত বছর পূর্বে যে খ্যাতির অধিকারী ছিলেন সে সময় তা ম্লান হয়ে পড়েছিলো। আজ গণিতের ইতিহাস ইউক্লিডের উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ সেই ইউক্লিডকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে আধুনিক সভ্যতার লাইম লাইটে নিয়ে আসেন মুসলিম অনুবাদকরা। খলীফা হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮০৯)। রাজত্বকালে আল্ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইউক্লিড জ্যামিতির প্রথম ৬টি খণ্ড আরবীতে অনুবাদ করেন। মামুনের রাজত্বকাল (৮১৩-৮৩৩) এ কাজ সমাপ্ত হয়।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণিতশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাত ধরেই বিশুদ্ধ গণিত চর্চায় মুসলমানরা এগিয়ে আসেন। মুসলিম গণিতজ্ঞদের মধ্যে প্রায় সবাই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন এবং এ বিষয়ে তাদের অনেকগুলো রচনাও রয়েছে।

আল-মামুনের আমলে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় অনেক উন্নতি অর্জিত হয়। বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির স্থাপিত হয়। এ সময় পদার্থবিদ আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বিষুবরেখা ও আয়ন মণ্ডলের সংযোগস্থল (Equinox) চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া (Apparitions of the comets) প্রভৃতি সৌরজগৎ সংক্রান্ত অনেক তথ্য নির্ণীত হয়। আবু আলী ইয়াহিয়া (ম. ৮৩১ খৃ.) হারুন ইবনে আলী (মৃ. ৯০০ খৃ.), ওমার ইবনে ফাররু খান আত্তাবারী (মৃ. ৮১৫ খৃ.), তদীয় পুত্র মোহাম্মদ আবু বকর, আহমদ ইবনে মোহাম্মদ নাহাওয়ান্দী (মৃ. ৮৩৫ খৃ.), আল মারওয়ারোজী, আল আস্তারলবী আবুল খায়রাত (মৃ. ৮৩৫ খৃ.) আল ফারগানী এ সময়কার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ছিলেন।

আল ফারগানী ইউরোপীয়ানদের কল্যাণে যিনি 'আল্ ফ্রাগানাস' নামেই বেশী পরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন। গণিতের এ শাখায় তাঁর অবদান সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর প্রণীত Elements of Astronomy গ্রন্থটি প্রাচ্যে নিকট অতীত পর্যন্ত ক্লাসিক গ্রন্থের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলো। Gerand of Cremona এবং জোহানেস দ্য লুনা-হিস প্যালেনসিস কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগে Regiomontanous এ অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন এবং ১৪৯৩ সালে Melanchthon the great উক্ত অনুবাদ এর উপর ভিত্তি করে নিউরেমবার্গ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৫৪৬ সালে Anatole কর্তৃক এটি পুনঃ অনূদিত হয়ে

প্যারিস থেকে বের হয়। এর পরও অনেক ভাষায় অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আল্ ফারগানীর 'জামে এলমুন নুজুম ওয়াল হরকাত আল সামায়িয়া' (Book on celestral motions and the complete science of the stars) নামক গ্রন্থটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আজও পরিচিত। আস্তারলব (astrolabe) সম্বন্ধে তাঁর দুটি গ্রন্থ যথাক্রমে 'আল কমিল ফিল আস্তারলব' এবং 'ফি সানাত আল আস্তারলব বিল হান্দাসা' (জ্যামিতির সাহায্যে আস্তারলব প্রণয়ন) এর আরবী অনুলিপি আজও প্যারিস ও বার্লিনে বর্তমান আছে।

আল ফারগানী পরবর্তী এবং সমকালে গণিতে মুসলিম সমৃদ্ধ যুগ শুরু হয় বলা যায়। বিশেষ করে এ সময়ে আল খারেজমীর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রীক ও ভারতীয় গাণিতিক চিন্তাধারার অনুসৃতির বিপরীতে মুসলিম চিন্তাধারার নতুন যুগ-সংযোজন ঘটে। কালের পাতায় সংযুক্ত হয় নবতর অধ্যায়। সায়্যিদ আমীর আলী লিখেছেন ঃ 'উচ্চতর গণিতের প্রত্যেকটি শাখাই মুসলিম প্রতিভার চিহ্ন বহন করে। গ্রীকরা বীজগণিত আবিষ্কার করেছে বলে বলা হয়, কিন্তু যেমন ওলসনার যথার্থই বলেছেন, গ্রীকদের বীজগণিত সীমাবদ্ধ ছিল "গবলেট খেলার জন্য' আমোদের উপকরণ হিসাবে। মুসলমানরা উচ্চতর উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করে আর এইরূপে এর একটি অজ্ঞাতপূর্ব মূল্য সৃষ্টি হয়। আল-মামুনের সময়ে মুসলমানরা দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণ আবিষ্কার করে আর অনতিকালের মধ্যে দ্বিঘাত সমীকরণ আর দ্বিপদ উপপাদ্য সৃষ্টি করে। বীজগণিত, জ্যামিতি আর পাটীগণিতই নয়, মুসলমনরা আলোকবিদ্যা আর যন্ত্রবিদ্যারও অসাধারণ উন্নতি সাধন করে। তাঁরা গোলাকাকার ত্রিকোণোমিতি আবিষ্কার করে। তাঁরাই সর্বপ্রথম জ্যামিতিতে বীজগণিতের প্রয়োগ করে, স্পর্শক আবিষ্কার করে আর ত্রিকোণোমিতির হিসাবে জ্যা-এর পরিবর্তে 'সাইন' এর ব্যবহার প্রবর্তন করে। গাণিতিক ভূগোলেও তাদের উন্নতি সাধন কম উল্লেখযোগ্য নয়।' Draper তাঁর History of the Intellectual Development of Europe গ্রন্থে লিখেন ঃ "Not one of the purely mathematical, mixed or practical sciences was omitted by the Arabs"

আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল্ খারেজমী (মৃ. ৮৪৭ খৃ.) গণিত শাস্ত্রের একজন কালজয়ী প্রতিভা। ভারত এবং গ্রীক বীজগণিতের সীমিত চর্চা বাদ দিলে বীজগণিতের যে অবস্থা ছিলো তাতে বিশ্বের তেমন কোনো মনযোগ ছিলোনা। খারেজমীই সর্বপ্রথম বীজগণিতকে অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন করে

তোলেন। এ জন্য তাঁকে আধুনিক বীজগণিতের জনক বলা হয়। তাঁর অসামান্য প্রতিভা সম্পর্কে Sarton লিখেন ঃ 'The gratest Mathematician of the time, and if one takes all circumstances into account, one of the greatest of all time was Al-Khwarizami.'

পারস্যের খিভা প্রদেশের খারিজমে আল খারিজমী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। তিনি খলীফা মামুনের লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরীয়ান ছিলেন।

গণিতের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় খারিজমীর অবদান রয়েছে। তবে বীজগণিতই তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর একাধিক গ্রন্থ রেফারেন্সের মর্যাদা লাভ করেছে। উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, খগোল তালিকা, ডায়াল প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধ গণিতে (Arithmetic) তিনি 'কিতাবুল হিন্দ' 'আল জাম্ ওয়াত্ তাফরীক' গ্রন্থ রচনা করে যে প্রভাব বিস্তার করেন তা ইউরোপীয় ভাষায় এগুলোর বহুবার অনূদিত হওয়ার ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। Robert of chester এবং Adilard এই দুই জন খারিজমীর গণিত বিষয়ক গ্রন্থগুলির ল্যাটিন অনুবাদক হিসাবে খ্যাতির অধিকারী হয়ে রয়েছেন। রবার্ট খারিজমীর শ্রেষ্ঠ অবদান 'ইলমুল জাবের ওয়াল মুকাবেলা' ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ১৯১৫ সালে Karpinski নিউইয়র্ক থেকে তা পুনঃ প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালে রোম থেকে Trattalid Arithmetica গ্রন্থাবলীতে Prince Boncompegni কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয় গণিত পুস্তক 'আজ জাম ওয়াত্ তাফরিক'- যার নাম দাঁড়ায় 'Algoritmi denumero Indorum' ইউরোপীয় ভাষার কবলে পড়ে আরো অনেক মুসলিম বিজ্ঞানীদের মতো, আল-খারিজমীর নামও হয়ে দাঁড়ায় আলগোরিথমী (Algoritmi) বীজগণিতের অন্যতম যে অংশ লগারিদম (Logarithm) আজ আমরা দেখতে পাই তা আল খারিজমী নাম থেকেই উদ্ভূত; এবং Agorism, Augrim শব্দগুলোরও একই ব্যাপার।

আল খারিজমী এই গ্রন্থে সংখ্যার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির অনুসরণ করে তিনি বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত সংখ্যা লিখন প্রণালী আবিষ্কার করেন। প্রখ্যাত গবেষক লেখক এম. আকবর আলী জানিয়েছেনঃ 'আরবদের সংখ্যা লিখন প্রণালী দেখে মনে হয় তাঁরা এই লিখন প্রণালী যেখানেই শিখে থাকুন না কেনো সংখ্যার গঠন প্রণালী তাঁদের নিজস্ব ও

মৌলিক। অন্যগুলির কথা বাদ দিলেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ যে অঙ্ক সংখ্যা লিখার মধ্যে 'শূন্য' ব্যবহার করবার নিয়ম পদ্ধতির আবিষ্কারক এবং সর্বপ্রথম ব্যবহারকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণই দেখা যায় না। অনেকের মতে, আরবরাই 'শূন্য' এর ও আবিষ্কারক। তাঁদের কাছ থেকেই ভারতবর্ষে ও 'শূন্য'র আমদানী হয়।... 'শূন্য' ব্যবহার করবার এবং অঙ্কের সংখ্যা লিখার মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে সংখ্যা লিখন প্রণালী যে জবরজঙ্গ গোছের ছিলো সে অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়... শূন্য আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই এবাকাস ব্যবহৃত হত। রোমের বৈজ্ঞানিক যুগ থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্রই এই অর্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংখ্যা-লিখার নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। মধ্যযুগেও যে ইউরোপ বর্তমানের সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ছিলো এমন মনে করবার কোনো কারণ নাই। রোম সভ্যতা নির্বাপিত হওয়ার পরে এবাকাস এর কথাও ইউরোপ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। দশম শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গারবার্ট পুনরায় এই অর্ধ-বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলন করেন, তাঁর সাথে স্পেনের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্যতম অংশবিশেষের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে। তবে Zero বা 'শূন্য' সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান একেবারেই শূন্য ছিলো। ইউরোপে শূন্যর প্রচলন দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। দ্বাদশ শতাব্দীতেই এর পূর্ণ ব্যবহার করে সংখ্যা লিখন প্রণালী আরম্ভ হয়। এ প্রথাকে আরবদের উৎপত্তি হিসাবে 'আল্ গরিথম' (Algorithm) বলা হোত। আল খারেজমীর সময় থেকেই যে শূন্যের ব্যবহার চলে আসছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতাব্দীতে ইউসুফ প্রণীত মাফাতিহুল উলুম ('বিজ্ঞান কুঞ্জী') গ্রন্থে।"

এলমুল জাবের ওয়াল মুকাবেলা' খারিজমী প্রণীত বীজ গণিতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম 'আল জাবের' হতেই ইউরোপীয় অনুবাদের ফলে Algebra নামের উৎপত্তি হয়। এটি ল্যাটিনে Ludus algebra almucgrabalaeque, Gbeba Mutabila ইত্যাদি নামে, ষোড়শ শতকে Algebra and almachabel ইংরেজী নামে, ১৮৩১ খৃ. F. Rosen- 'Algebra of Mohammed Bin Musa নামে অনুবাদ করেন। অন্য অনেক অনুবাদের মধ্যে Smith 'The scince of reduction and cancellation' নামে, Cajori করেছেন Restoration and Reduction ইত্যাদি নামে। তার গ্রন্থটিকে সব বিষয়েই বীজগণিতের সর্বপ্রথম ও মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

খারিজমীর পূর্বে গ্রীক বিজ্ঞানী ডফেন্ট এবং ভারতবর্ষে বীজগণিতের যে সীমিত চর্চা ছিলো তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছেন। ভারত ও গ্রীক প্রভাবের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর মৌলিকতার সিঁড়ি। Cajori Bossault, Cardan, Wallis প্রমুখ তা স্বীকার করেছেন। আল খারিজমী তাঁর রচনায় বীজগণিতের সমস্ত সূত্র, নানা প্রকার গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান খুব সুশৃংখলভাবে তুলে ধরেছেন। পাঁচ ভাগে বিভক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগে আলোচিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের (quadratic equation) সমাধানের নিয়ম। কোনো প্রমাণ না দিয়ে তিনি এ সমীকরণকে ৬ ভাগে বিভক্ত করেছেন (1) $ax=bx$, (2) $ax^2=c$, (3) $ax^2+bx=c$, (4) $ax^2+c=bx$, (5) $ax^2=bx+c$, (6) $ax+c=bx^2$। এ প্রকার সমীকরণের দুটি সমাধান হয় বলে তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন। গ্রীকরা শুধু একটি মাত্র সমাধান হয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, যখন দুটি root ই positive তখন তিনি মাত্র যে root টি radical এর negative value থেকে উদ্ভূত সেটিই গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে-বৈজ্ঞানিক সমীকরণগুলোর জ্যামিতিক প্রমাণ এবং তৃতীয় ভাগে- $(x\pm a)$ এবং $(x\pm b)$ -এর গুণফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ ভাগে উল্লেখ করেছেন- যে সকল অঙ্কে অজ্ঞাত সংখ্যা, তার বর্গ, বর্গমূল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলির যোগ, বিয়োগ, বর্গমূল বের করার নিয়মসমূহ এবং এ সব থেকেই $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ এর $\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ এই সূত্রের উদ্ভাবন, আর পঞ্চম তথা শেষ পরিচ্ছেদে তিনি কতগুলো সমস্যার সমাধান করেছেন। আল খারিজমীর একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলোই জ্যামিতিক অঙ্কনের মাধ্যমেই সমাধান দিয়েছেন। চিত্র ও বর্গের সাহায্যে এই আলোচনা তাঁর অগাধ প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। ভারতীয় বীজগণিত-খারিজমীর ভিত্তি বলে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেন এই পদ্ধতি তাদের জবাবের জন্য যথেষ্ট। ভারতীয় বীজগণিতের সকল কাজ সংখ্যা নিয়ে, জ্যামিতিক অংকনের নাম-গন্ধও তাতে পাওয়া যায় না। ভারত এবং আরব গণিতের মূল পার্থক্য ধরিয়ে দিয়ে Roder বলেছেন ঃ "The Hindus were more analytical then the Arabs, less pure geometers; they had in addition the idea of double sign; they transfer more easily a term from one side of an equation to the other, method with them is thus beginning to generalise. It must however, be recognised that as regards exposition their language, pompous and encumbered by its verse form, has not

the clearness, exactness and scientific simplicity of that of the Arabs.'

জ্যামিতিকে বীজ গণিতের সমস্যা সমাধানে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, বীজগণিতকে, এমনকি শুদ্ধ গণিতকে ও জ্যামিতির সমস্যা সমাধানের জন্য টেনে নেয়া হয়েছে। প্রাচীন গাণিতিকরা পাটীগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতিকে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গণিত বিজ্ঞানে জাতিভেদ প্রচলন করেছিলেন-আর এ থেকে খারিজমী প্রমুখ বিজ্ঞানী গণিতকে মুক্ত করেন। Encyclopadia of Islam লিখেছে- In the use of Arithmetic and Algebra in Geometry and vice versa, the solution of Algebraic problems with the aid of Geometry, the Arabs far outstripped the Greeks as well as the Indians. To the Arabs is due the honour of having recognised and emphasised as an obstacle the strict distinction between arithmetical (discontinuous) and geometrical (continuous) magaitude which had so severely impeded the fruitful development of Mathematics among the Greeks."

এ ছাড়া আল খারিজমী পরিমিতি (menusration) এবং পরিমিতি হিসাবে ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্ত, পিরামিড প্রভৃতির আয়তন, পরিধি ইত্যাদি নিরূপণের প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। তাঁর মতে, বৃত্তের ব্যাসকে (Diameter) ৩ $\frac{১}{৭}$ দিয়ে গুণ করলে পরিধি পাওয়া যাবে; বৃত্তের পরিধির অর্ধেককে ব্যাসের অর্ধেক দিয়ে গুণ করলেই বৃত্তের আয়তন (area) পাওয়া যাবে কেননা প্রত্যেক সমবাহু ও সমান কোণ বিশিষ্ট বহুভূজই যথা ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, পঞ্চভূজ প্রভৃতির আয়তন, সেই বহুভূজেরই মধ্যবৃত্তের ব্যাসের অর্ধেককে পরিধির অর্ধেক দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যায়। যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসকে বর্গ করে তা থেকে $\frac{১}{৭}$ অংশ এবং $\frac{১}{৭}$ অংশের $\frac{১}{২}$ বাদ দেয়া যায় তাহলেও একই ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বৃত্তের আয়তন হলো ঃ

$$\text{আয়তন} = n(\text{ব্যাস})^{২} = \frac{২২}{৭\times৪}(\text{ব্যাস})^{২} = (১ - \frac{১}{৭} - \frac{১}{২}\times\frac{১}{৭})(\text{ব্যাস})^{২}$$

শুদ্ধ জ্যামিতির সমতল ও বৃত্ত অংকন সম্পর্কে খারিজমীর গ্রন্থ ইউরোপের কোনো কোনো লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে। জ্যামিতিকে তিনি কতো সহজসাধ্য করে তুলেছিলেন তা জানা যায় John Bossut এর কথায়। তিনি A General History of Mathematies (1803) গ্রন্থে লিখেনঃ Practial Geometry and Astronomy owe the Arabs eternal gratitude for havbing given to Trigonometrical calculation the simple and the commodious forms which it has at preasent. They reduced the theory of the resolution of triangles, both rectilinear and spherical, to a small number of easy propositions and by the substitution of sines which they introduced instead of the chords of the double ares employed before, they made abridgements in calculations, of inestimable value to those who had a great mumber of triangles to resolve these discoveries are embodied chiefly to a geometrician and astronomer of the name Muhammad Ben Musa, the author of a work still extant, entitled of 'plane and spherical figures".

মৌলিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আল খারিজমীর পর সবচেয়ে বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসা আল্ মাহানী। আর্কিমিডিসের প্রবর্তিত গোলক (Sphere) সম্পর্কিত গবেষণা তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট ছিলো। গোলককে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করা নিয়ে যে পদ্ধতি ও প্রথার প্রচলন তিনি করেন তা অভিনবত্বের দাবীদার। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো অগাধ। গোলক বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়েই যে বীজগাণিতিক ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের উদ্ভব হয়, তিনি তার সমাধানে ত্রিকোণোমিতির চিহ্ন, ত্রিমাত্রিক কোণের সাইন ব্যবহার করেন। আল মাহানী কনিক্ এর সাহায্যে ত্রৈমাত্রিক সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি এ সমস্যাটি এমন গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন যে, $x^3+a^2b=cx^2$ এই সমীকরণটি আল মাহানী সমীকরণ (Al-Mahanis equation) নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তখনকার অঙ্ক শাস্ত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের (Cubic equation) সম্পাদ্যে ত্রিকোণমিতির সাহায্য নেয়া ধারণাতীত ছিলো বলে মনে করা হয়।

ইউক্লিডের জ্যামিতির ভাষ্য রচনা ছাড়াও মাহানী আর্কিমিডিসের মতবাদকে বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক কে, আলী লিখেছেন ঃ 'আল মাহানী আধুনিক বীজগণিতের আবিষ্কর্তা। তিনি ত্রিকোণমিতি জ্যোতির্বিদ্যা জ্যামিতি ও ঘনসমীকরণ সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। সমগ্র অন্তর্বর্তী বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বীজগণিতের ব্যবহার পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ এবং গ্রহ ও নক্ষত্রের সংযোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে মূসা ভ্রাতৃত্রয় এক বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আবুল কাসেম আহমদ, আবু জাফর মোহাম্মদ এবং হাসান ইবনে মূসা বিন শাকীর-এই তিন ভাই বাল্যকালেই পিতাকে হারান; খলীফা আল্ মামুন তাদের লালন পালন ও শিক্ষার ভার নেন। মামুনের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিশাল কর্মযজ্ঞে এক সময় এই তিন ভাই জড়িত হয়ে পড়েন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, রচিত সকল গ্রন্থ-গবেষণা তিন ভাই অথবা যে কোনো দুই ভাই এর নামেই পাওয়া যায়। আবু জাফর মোহাম্মদই প্রতিভার বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর হাসান ইবনে মূসা ছিলেন গণিতবিদ হিসাবে শ্রেষ্ঠ; আহমদ ছিলেন যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে পারদর্শী।

দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার কেন্দ্রস্থল গ্রীনউইচ যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন ভ্রাতৃত্রয় লোহিত সাগরের তীরে নির্ভুলভাবে ডিগ্রি মেপে পৃথিবীর প্রকৃত আকার ও আয়তন নির্ণয় করেন। পৃথিবীর গোল হওয়ার টলেমীর ধারণা এই তিন ভাই প্রথম কাজে লাগান। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (The obliquity of the Ecliptic) সম্পর্কে আলোচনা তাঁরাই প্রথম করেন। চক্রবাল থেকে চন্দ্রের তুঙ্গত্বের হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ (variation of the lunar altitude), অপভু (Apogee), অনুভূ (Perigee) প্রভৃতি কয়েকটি নতুন আবিষ্কারের ফলে তাঁদের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এছাড়া জ্যামিতি, কনিক, পরিমিতি প্রভৃতি বিষয়ে তারা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সমতলভূমি ও গোলক খণ্ডের পরিমাণ সম্বন্ধীয় তাঁদের পুস্তকগুলি জিরার্ড 'Liber Trium Eratrum' নামে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের হাতে আধুনিক বলবিজ্ঞান (mechanics) বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। জ্যামিতিতে কোণকে দিখণ্ডিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন ইউক্লিড, কিন্তু কোণকে তিন খণ্ড করার জটিল নিয়ম আলোচনা

করেন তাঁরাই। Conchoid ব্যবহার করে কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে তাঁরাই প্রথম পথ প্রদর্শক। বাহুর পরিমাণ দিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটি তাঁদের আবিষ্কার। ভ্রাতৃত্রয়ের অন্যান্য গ্রন্থবলীর মধ্যে ফারাস্তুন (The book on the balance), গোলক পরিমাপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-The book on the measurement of the sphere, দুটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যেকার সমানুপাত নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ- The book on the determination of mean proportionals between two given quantities, শুদ্ধ জ্যামিতি সম্পর্কে The Book of the science of the mensuration of plane and spherical figure অন্যতম।

আবুল হাসান সাবেত ইবনে কোরা (জ. ৮২৬/৩৬-৯০১ খৃ.) মেসোপটেমিয়ার হাররানে জন্ম গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে প্রথিতযশা হলেও দর্শন ও অঙ্কে তাঁর অবদান রয়েছে, বিশেষ করে জ্যামিতিতে তাঁর অপূর্ব প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিকরূপে অভিহিত করা হয়। ইসহাক ইবনে হোনায়েন (মৃ. ৯১০ খৃ.) ইউক্লিড জ্যামিতির যে আরবী অনুবাদ করেন, তিনি তা সংশোধন করে মূল্যবান উপক্রমিকা যোগ করেন। এছাড়া জ্যামিতির অনেক মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তিনি পুস্তক প্রণয়ন করেন। Almagest, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কনিক, Magic square, Amicable Numbers সম্পর্কেও তাঁর রচনা আছে। মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে তিনি প্রথম ম্যাজিক স্কোয়ার নিয়ে আলোচনা করেন।

খারিজমী বীজগণিতের প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য যেমন জ্যামিতি ব্যবহার করেছেন, ঠিক তার উল্টো সাবেত বিন কোরা বীজ গাণিতিক সমস্যাসমূহ জ্যামিতিতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। আল মাহানীর মতো তিনিও তৃতীয় মাত্রা সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা করেন। তাঁর বীজ গণিতের যে অংশ Paris National Libary -তে সংরক্ষিত আছে, তার একটি পরিচ্ছেদে ত্রিমাত্রিক সমীকরণের আলোচনা রয়েছে। তদীয় সমাধানের একটি হলো ঃ $x^3+6\ x=20$ বা $x^3+px=q$ ধরনের এমন দুটো ঘন নাও যে তাদের ধারের আয়তক্ষেত্র হয় ২ (বা $\frac{১}{৩}$ P) এবং তাদের ঘন এর পার্থক্য হয় ২০ (বা q) । তাহলে x হবে দুই ঘন এর ধারের পার্থক্যের সমান।

অঙ্কশাস্ত্রের Calculas শাখা প্রচলনকারীদের প্রবেষ্টকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। Paraboloid-এর ঘনফল নির্ণয়ে তিনি আধুনিক Calculas-এর পথ প্রদর্শন করেন। A micable numbers সম্বন্ধে পূর্ব প্রচলিত ধারণা উন্নত করে তিনি নিজস্ব মৌলিক থিওরী প্রবর্তন করেন এবং এ অনুসারে আবিষ্কার করেন এই থিওরীটি-

যদি P-3.2-1, $q=3.2^{n-1}-1$, $r=9.2^{2n-1}-1$ (n একটি অখণ্ড সংখ্যা) তিনটি মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে $2^x pq$, $2^n r$ amicable number হবে। যদি n=2 হয় তাহলে p=১১, q= ৫, r=৬১ এবং $2^n pq=220$, $2^n r=$২৮৪

আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মারওয়াজী জ্যোতির্বিজ্ঞান অঙ্ক ও ত্রিকোণমিতি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অঙ্কে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্যের জন্য আরব স্কলারগণ তাঁকে 'হাবাশ আল হাসিব' নামে অভিহিত করতেন। ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞা আলোচনা পরবর্তী মুসলিম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাইন (sine) কোসাইন (cosine) এর উদ্ভব হয় নমন (gnomon) এর আলোচনায়; এই নমনকে ১২ ভাগে ভাগ করে সেই অনুসারে ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞার পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো। আল্ মারওয়াজী কিন্তু ১২ ভাগের পরিবর্তে একে ৬০ ভাগে ভাগ করেন, ফলে কোট্যানজেন্ট এর সূত্র দাঁড়ায় ঃ $\text{Cot}\alpha = \frac{\text{Cos}\alpha}{\sin\alpha} 12$ এর সঠিক ফরমূলা হলো ঃ $\text{Cot}\alpha = \frac{\text{Cos}\alpha}{\text{Sin}\alpha} \%$ এই হিসাবে সূর্যের তুঙ্গত্ব (altitude of the sun) নির্ধারিত হয় ঃ $-\sin(90-\alpha) = \frac{\cot\alpha 60}{(\sqrt{12^2+\cot^2\alpha})}$ ফরমূলার সাহায্যে ।

তাঁর এই মতামত গৃহীত হয়নি তবুও গণিতের ইতিহাস এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাছাড়া ট্যানজেন্ট (tangent) এবং কোট্যানজেন্ট (co-tangent) এর একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটি ত্রিকোণমিতির তালিকা হিসাবে সর্বপ্রথম। তিনিই কোসেকান্ট, সেকান্ট এর প্রচলন করেন।

দশম শতাব্দীতে আবু আল্ বাত্তানী আস সাবী (জন্ম, ২৪৪ হি/৮৫৮ খৃ-মৃত্যু ৩১ হি./৯২৯ খৃ.) গণিত ও ত্রিকোণমিতির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে অবস্থান করছিলেন। প্রধানত জ্যোতির্বিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি এম, আকবর আলীর ভাষায়- 'জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল বাত্তানীর দান খুবই উচ্চ শ্রেণীর। প্রধানত এই জন্যই জনৈক খ্যাতনামা ইউরোপীয় দার্শনিক তাঁকে 'মুসলিম টলেমী' নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুত গ্রীক বিজ্ঞানে টলেমীর স্থান, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আল্ বাত্তানীই অধিকার করেছেন। টলেমীর প্রতিভার চেয়ে আল্ বাত্তানীর প্রতিভা কোনো অংশে কমত নয়ই, বরং সঠিক গণনা, নির্ভুল পরিমাপ ইত্যাদির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, অনেক সময়ে উচ্চস্তরের বলে মনে হয়।'

ইউরোপীয় বিকৃতির ফলস্বরূপ আল বাত্তানী সেখানে Albatenius, Albategnius প্রভৃতি নামে পরিচিত। টলেমীর অনেকগুলো মতবাদকে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তালিকা 'ফিজিজ' প্রণয়ন, সৌর অয়নমণ্ডলের গতি, চান্দ্র মাসের সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক (Sidereal) এবং গ্রীষ্ম মণ্ডল সংক্রান্ত (Tropical) বৎসরের দৈর্ঘ্য, চান্দ্রিক বিশৃংখলতা (Lunar anomalies), চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, ঋতুর সঠিক সময় নির্ণয়, Parallax ইত্যাদি বিষয়ের নূতনতম অবদান বাত্তানীর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার বিশেষত্ব।

অংক শাস্ত্রের ইতিহাসে আল্ বাত্তানীকে যা অমরতা দান করেছে, তা হলো- ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। ত্রিকোণমিতির যে একটা পূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য আছে তা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন, তাঁর পূর্বে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে ত্রিকোণমিতির কথা ভাবা হতো না। ত্রিকোণমিতির Sine, cosine, tangent, cotangent ইত্যাদি সাংকেতিক নিয়মগুলোকে প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে তাঁর পূর্বে কেউই সক্ষম হননি। তিনিই প্রথম এসব সংকেতের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। তাঁর উদ্ভাবিত সূত্রের একটি হলো- কোনো কোণের সাইন জানা থাকলে তার ট্যানজেন্ট বের করা বা ট্যানজেন্ট জানা থাকলে সাইন বের করে অতি সহজেই নিষ্পন্ন হতে পারে। বর্তমান প্রতীক ব্যবহারে এই সূত্রটি হলো ঃ

$$\sin\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{(1+\tan^2\alpha)}} \text{ এবং } \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{(1+\tan^2\alpha)}}$$

ত্রিভুজের বাহুর সাথে কোণের ত্রিকোণমিতিক সম্বন্ধ ও আল বাত্তানী উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই নিয়মটি হলো ঃ

cos a+ cos b cos c+ sin b sin c cos A.

যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রীকরা জ্যামিতির সাহায্যে সম্পন্ন করতেন তিনি সেগুলো বীজগণিতের সাহায্যে সম্পন্ন করেন। তিনি অতি বেশ সহজেই $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=D$ থেকে θ এর মান নির্ণয় করেন- অবশ্য ত্রিকোণমিতিক সূত্র- $\sin\theta = \frac{D}{\sqrt{1+D^2}}$ এর সাহায্যে। তাঁর পূর্বে কেউ এ পন্থা ব্যবহার করেনি। তাঁর সব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়না। প্রাপ্তব্য গ্রন্থের মধ্যে 'মারফাতে মাতালী আল বুরুজ' 'রিসালা ফি তাহকীক আকদার' 'আজ্‌জিজ্‌,' 'মাকালাত আরবা লি বাতমিয়াস' অন্যতম।

ত্রিকোণমিতিতে আল বাত্তানীর উত্তরাধিকার ছিলেন খোরাসানে জন্ম গ্রহণকারী বিজ্ঞানী আবুল ওয়াফা (জ. ৯৩৯/৪০-মৃ.৯৯৭/৯৮ খৃ.)। অংক শাস্ত্রের সকল শাখায় তিনি কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতিতে তাঁর দান অতুলনীয়। বাত্তানীর হাতে অস্ফুট ত্রিকোণমিতি তাঁর হাতে সম্পূর্ণ স্ফুরণের গতি লাভ করে। দুই কোণের Sine এর সমষ্টি যে Sine ও Cosine দ্বারা নির্ণয় করা যায় তা প্রথম আবুল ওয়াফাই উদ্ভাবন করেন। বর্তমান ত্রিকোণমিতির প্রাথমিক সূত্র Sin (A+B)= Sin A Cos B+Cos A Sin B আবুল ওয়াফার পূর্ব পর্যন্ত কেউ জানত না, এমনকি ষোড়শ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী Copernicus পর্যন্ত এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞা ও নতুন ব্যাখ্যা প্রদান; সাইন এর তালিকা প্রস্তুত করার নতুন উপায় আবিষ্কার; দুই কোণের সমষ্টির সাইন, কোণের অর্ধাংশের সাইনের বর্গের সাথে কোসাইনের সম্বন্ধ, কোণের সাইনের সঙ্গে সেই কোণের অর্ধেকের সাইনের ও কোসাইনের সম্বন্ধ তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ত্রিকোণমিতির প্রচলিত ৬টি সংজ্ঞার পরস্পর সর্ম্পক সম্পূর্ণভাবে তিনি প্রচলন করেন, এই সম্বন্ধের উপরেই বর্তমান সূত্রগুলি প্রবর্তিত হয়েছে।

জ্যামিতি আলোচনায় তিনি উচ্চতম চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইউক্লিড, খারিজমীর জ্যামিতি ও বীজগণিতের ভাষ্য প্রণয়ন, ডাওফেন্টের প্রামাণ্য অনুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। উল্লেখ্য তিনিই সর্বশেষ কোনো গ্রীক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ

করেন। তাঁর রচনাবলীর অসংখ্য রচনার মধ্যে যে কটি বেঁচে আছে তন্মধ্যে 'কিতাবুল কামিল,' 'কিতাবুল হান্দাসা,' 'মানাজিল ফিল হিসাব,' 'কিতাবুল মাদখিল' (Introduction of arithmetic) অন্যতম।

দশম শতকের শেষ পাদে গণিত প্রতিভা আবু কামিল আল মিশরী আবির্ভূত হন। জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর রয়েছে। জ্যামিতিক প্রতিপদ্য ও উপপাদ্যের সমাধানে সমীকরণের প্রয়োগ তাঁর নিজস্ব। History of Mathematiec-এ Smith লিখেন ঃ No writer of his time showed more genius than he is the treatment of equations and their application to the solution of geometric problems. শুদ্ধ অংক ও বীজগণিতের উপর তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীর যে ব্যবহার তা তিনিই আবিষ্কার করেন। বীজগণিতের দ্বিমাত্রা সমীকরণের উভয় প্রকার সমাধানের ব্যবহার তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

একাদশ শতাব্দীতে ও গণিত শাস্ত্রে মুসলিম আধিপত্যের যুগ অব্যাহত থাকে। এ সময় পাশ্চাত্যে গণিতের প্রাথমিক চর্চা শুরু হয়। চীন ও ভারতে যে কাজ হচ্ছিলো তা তেমন ধর্তব্য ছিলো না। জর্জ সারটন সুন্দর তুলনা করেছেন ঃ 'It is almost like passing from the shade to the open Sun and from a sleepy world into one tremendously active,' প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের স্পেন এবং মধ্যবর্তী মিশর-এই তিন ভূখণ্ডে গণিত চর্চার প্রসারিত তৎপরতা দেখা যায় এই শতাব্দীতে। গণিত বিজ্ঞানে তত্ত্বীয় (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) দুটি ধারারও সৃষ্টি হয় এ সময়।

ইরাকের বিজ্ঞানী আবু বকর মোহাম্মদ আল কারখী (মৃ. ১০১৯ হতে ১০২৯ খৃ. এর মধ্যে) অংক শাস্ত্রবিদ হিসাবে স্বনামধন্য ছিলেন। তাঁর জীবনী ও পুরো রচনাবলীর তেমন কোনো হদিস পাওয়া যায় না। Brockelman তার 'Geschihte Der Arabichen Litterature' গ্রন্থে কারখীর রচিত ৪টি গণিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তা হলো 'আল কাফী ফিল হিসাব,' 'কিতাবুল ফাখ্‌রী, 'ইনবাত আল মিয়া আল খাফিয়া' এবং 'আল বদি ফিল্ হিসাব'। প্রথমোক্ত গ্রন্থ ১৮৭৮ খৃ. জার্মান পন্থি A Hochchiem তিন খণ্ডে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বের করেন আর দ্বিতীয়টি ১৮৫৩ সালে Woepke কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় অন্য দুই গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

'আল কাফী ফিল হিসাব' গ্রন্থে অংক শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম ভগ্নাংশের গুণ, নতুন নিয়ম উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রণালী, Quarter, Square, বর্গমূল নির্ণয় প্রণালী, সমতল ভূমির পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক আলোকপাত স্থান পেয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অনেক নিয়ম এখনও প্রচলিত। তাঁর Quarter Square-এর সূত্র-

$$(\frac{a+b}{2})^2 - (\frac{a-b}{2}) = ab$$

বর্গমূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবিত সূত্র-

যখন $m=a^2+r$, তখন $\sqrt{m}=\frac{a+r}{(2a+1)}$;

যখন $r=$ অথবা $<a$ তখন $\sqrt{m}= \frac{a+r}{2a}$

যখন $r< (2a+1)$, তখন $\sqrt{(a^2+r)}\sim\frac{a+r}{(2a+1)}$

Arithmetical Progression, Geometrical Progrssion সম্বন্ধে আল কারখী সূত্রবদ্ধ নিয়ম আবিষ্কার করেন। Summation of power series বা একই শক্তির ক্রমিক সংখ্যা রাশির যোগফল নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনি শুধু আরবদের মধ্যেই সর্বপ্রথম নন, সবখানেই সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর নির্ণীত ফল এখনও সঠিক বলে বিবেচিত। বর্তমান লিখন অনুসারে এ নিয়ম হলো ঃ

$$1^3+ 2^3+ 3^3......=(1+2+3.......)^2$$

$$1^2+2^2+3^2+n^2=(1+2+3... ...) \frac{2x+1}{3}$$

'কিতাবুল ফাখরী' বীজগণিতের এক অমূল্য সংযোজন। খারিজমীর 'হিসাবুল জাবির মুকাবালা'র খ্যাতির চাপে এই গ্রন্থ চাপা পড়ে যায়। কোনোক্রমে এই গ্রন্থটি যদি সেই সময়ে অনুবাদ হতে পারতো তাহলে ইউরোপীয়রা 'এ্যালজেব্রার' নাম এর পরিবর্তে বীজগণিত হিসাবে 'ফাখরী' নাম প্রবর্তনের খুব সম্ভাবনা ছিলো। বীজগণিতের সাধারণ বিষয়াদী আলোচনা ছাড়াও তিনি পূর্বতনদের মতো বীজগণিত সমাধানে শুধু জ্যামিতির ব্যবহারের সীমাবদ্ধ থাকেননি। শুদ্ধ অংকশাস্ত্রের সাহায্যও নিয়েছেন। বর্তমান চিহ্নসমূহ ব্যবহার করলে তাঁর Quadratic Equation এর সমাধান রূপ হবে-

$$ax^2+bx=c$$

$$x = [\sqrt{(\frac{b}{2})2 + ac - \frac{b}{2}}] \div a$$

বীজগণিতে অনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলোর শক্তি (powers of the unknown quantity) বৃদ্ধির সাথে সাথে অংকের সমাধান জটিল থেকে জটিলতর হয়ে থাকে। তিনি এই জটিলতর সমস্যাগুলির সহজ সুন্দর সমাধান করেন। তাঁর কৃত সবগুলো সমস্যা ও সমাধান প্রামাণ্য এবং আধুনিক বীজগণিতে প্রচলিত। তিনি প্রত্যেকটি দ্বিমাত্রিক সমীকরণের দুটি সমাধান বের করেন। উর্ধতন শক্তির সমীকরণগুলিকে দ্বিমাত্রিক সমীকরণে পরিণত করাও তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ডাওফন্ডের নামে প্রচলিত সমীকরণের সমাধান ছাড়াও তিনি আরো ২৫টি সমস্যার আবিষ্কার ও সমাধান বের করেন।

আল্ কারখীর সমসাময়িক আবুল জুদ মোহাম্মদ ইবনুল লাইছুস্ সানী জ্যামিতি আলোচনায় বিখ্যাত ছিলেন। বহুভুজের মধ্যে তিনি সুষম সপ্তভুজের (Regular Heptagon) বাহুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং প্রথম সমীকরণটির সমাধান পেশ করেন। Conics এর সাহায্যে তিনি কোণকে ত্রিখণ্ডিত করার সমাধান করেন; Parabola এবং সমবাহু হাই পারবোলার (Equilatcrat Hyperbla) ছেদন দ্বারাই এ সমস্যাটির সমাধান হয়। বীজগণিত সম্পর্কেও যে তাঁর প্রতিভার দান ছিলো তা বুঝা যায় গণিতবিদ ওমর খৈয়ামের আলোচনা থেকে। তাঁর রচনা সম্পর্কে তেমন কিছু অবগত হওয়া যায়না। Brockelmann তাঁর দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আবুল জুদ ১০০৯ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।

হামিদ ইবনে খিদর্ আল খুজান্দী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বীজগণিতে ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের (cubic equation) মতবাদ তাঁকে অমর করে রেখেছে। এই মতবাদ এখন স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গৃহীত। তিনি প্রথম দেখিয়েছেন মূলদ সংখ্যার (rational numbers) প্রকল্প (hyphothesis) প্রকল্প অনুসারে দুটি ত্রৈমাত্রিক সংখ্যার যোগফল অন্য একটি ত্রৈমাত্রিক হতে পারেনা। $x^3+y^3=z^3$ এই অনির্দিষ্ট ত্রৈমাত্রিক তিনটি সংখ্যার সম্মিলনীতে উদ্ভূত সমীকরণে সংখ্যাগুলির নির্দেশ হওয়া সম্ভব নয়। $x^3+y^3=z^3$ এর কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। তিনি ত্রিকোণমিতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন।

আলী ইবনে আহমদ আবুল হাসান আন্না'সবী আল খোরাসানী অংক শাস্ত্র আলোচনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ভগ্নাংশের ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। মনে করা হয়, বর্তমানে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট প্রণালীর তিনিই উদগাতা ছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আবু রায়হান আল বিরুনী (৯৭৩-১০৫০ খৃ.) পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় তাঁর মৌলিক অবদানের পরশ লেগেছে। দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ, খনিজতত্ত্ববিদ, ভৌগলিক, জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও অবদান সুবিদিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান 'কানুনে মাসউদী' ১১ খণ্ডে রচিত একটি বিশ্বকোষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপক আলোচনা ছাড়াও ত্রিকোণমিতি এতে আলোচিত হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে অংক শাস্ত্রের কি অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিলো 'কানুনে মাসউদী' তার পরিচয়বাহী নিদর্শন। এই গ্রন্থ ছাড়াও শুদ্ধ অংক শাস্ত্রে 'কিতাবুত তাফহিম'-এর নাম করা যায়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুল হিন্দ' ও 'আছরারুল বাকিয়া' ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ে অভিনবরূপে তিনি গণিতের ব্যবহার করেন। তাঁর রচনা সংখ্যা শতাধিক (১১৪)।

'কানুনে মাসউদী'-তে ত্রিকোণমিতির অধ্যায়টি দেখলেই বুঝা যায় কতো বড় বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ তিনি সাধন করেছিলেন। তিনি প্রথমত ০° ডিগ্রী থেকে ৯০° সাইনের মূল্য নির্ধারণ করে একটি sine table তৈরী করেন। তাঁর পূর্ববর্তী তালিকাগুলো হতে এর পার্থক্য হলো, তিনি কেবল প্রত্যেক ডিগ্রির সাইন-ই নির্ধারণ করেননি, প্রতিটি ডিগ্রীর অংশেরও সাইন নির্ধারণ করেছেন। কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার সমস্যার সম্মুখীন তিনিও হয়েছিলেন। এর গাণিতিক সমাধান অসম্ভব জেনেই তিনি চেষ্টা করে ১২টি যান্ত্রিক (mechanical) উপায় নির্ধারণ করেন যাতে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এভাবে তিনি 1^{0} ডিগ্রীর চাপের যে পরিমাণ নির্ধারণ করেন তা দশমিকের দশম স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। এ পরিমাণটি হলো ঃ $1g2^{i}$- 49^{ii}-51^{iii}-48^{iv} আর বর্তমানে বিশুদ্ধ বলে স্থিরিকৃত পরিমাণ হলো ঃ $1g2^{i}$-49^{ii}-51^{iii}-48^{iv}-0^{v}-25^{vi}-27^{vii}

শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম গণনায় আল বিরুনীর প্রবর্তিত নিয়ম এক বিস্ময়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেক বৈপ্লবিক কৃতিত্ব ইউরোপীয় চৌর্যবৃত্তির কবলে পড়ে তাদেরই আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আল বিরুনীর প্রবর্তিত এর নিয়মটি

তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁর এ আবিষ্কার বর্তমানে 'The formula of Interpolation' নামে নিউটনের উদ্ভাচন বলে চালানো হচ্ছে। অথচ নিউটনের জন্মের বহু পূর্বে আল বিরুনী এ আবিষ্কারই করেননি শুধু, এক ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইন তালিকা তৈরী করেন। তিনি তাঁর সাইন তালিকা এত সূক্ষ্মভাবে গণনা করেছেন যে এতে ভুলের পরিমাণ $\frac{১}{১০}$ এর চেয়েও কম এবং তাঁর সূত্রানুযায়ী নির্ণীত মূল্যে $\frac{৩}{১০}$ এরও কম ভুল হয়। বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানেও এর চেয়ে সূক্ষ্মতর গণনা হয়নি এবং কোনো বৈজ্ঞানিক গণনাতেই আঙ্কিক বিশুদ্ধ গণনা লওয়া হয়না।

সমতলিক মণ্ডলাকার ত্রিভূজের সমাধানের জন্য তিনি সূত্র উদ্ভাবন ও সেগুলি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। এতে সর্বপ্রথম ফলমূলা $\frac{SinA}{a} = \frac{SinB}{b}$ অনেক পরিশ্রম করে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তাঁর এই কাজের প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ নাসির উদ্দিন তুসীর কর্মে। আল বিরুনীর বেশ কিছু উদ্ভাবিত ফরমূলা নাসির উদ্দীন তুসীর আবিষ্কার বলে চালানো হয়। ত্রিভূজের ৬টি কৌণিক সম্বন্ধের ৪টি গ্রীকরা আবিষ্কার করে, বাকী ২টি আবিষ্কার করেন আল বিরুনী। তা হলো ঃ

CosA = Cosa Sin B

cosc = CotA Cot B

আল বিরুনীর বিরাট পাণ্ডিত্যের অনেকখানিই বহু শতাব্দী যাবত আধুনিক বিশ্বের নজরে কুয়াশা সৃষ্টি করেছিলো। প্রফেসর সাখাও এবং Prof Ramsay Wright-এর অনুবাদ প্রকাশের পর চতুর্দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই তাঁর কার্যাবলীর আলোচনা হচ্ছে। ইউরোপে International Congress of Orientalist ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে প্যারীতে ২১তম অধিবেশনে তাঁর জন্ম সহস্র বার্ষিকী পালন করে।

মিশরের আহমদ ইবনে ইউনুছ (মৃ. ১০০৯ খৃ.) জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর 'আল জীজ্উল কাবীর'

মিশরের বৈজ্ঞানিক গৌরব গাঁথার পরিচয় বহন করে। এই গ্রন্থের মূল্যমান বুঝা যায়, ফার্সীতে ওমর খৈয়াম, মঙ্গোলীয় ভাষায় নাসির উদ্দীন তুসী, চীনা ভাষায় চো চিউ কিং-এর অনুবাদ এর ফলে। টলেমীর খ্যাতিও ম্লান করে দেয় এই গ্রন্থটি। A Great Muslim Astrologer গ্রন্থে Haroun M Leon লিখেন ঃ This masterpiece of Ibn Yunus soon displaced the work of that ancient Astronomer and Geographer Ptolemeaus (Ptolemy) Who was also a native of Egypt. It was reproduced among the Persians by the astronomer poet Omar Khyyam (1079): among the Greaks in the syntax of Chrysococea; among the Mongols by Nasiruddin Tusi, the director of the Astrononical observatory at Maragha is the Zij-al-khani; and among the Chinese in the Astronomy of Co-Cheon-king in 1280 and thus what is attributed to the ancient civilisation of China is only a borrowed light from an Islamic fire, the first kindling where of arose from a spark emitted from the intellectual furnace of the great Cairo University.

ত্রিকোণমিতিতে তিনি উন্নতি লাভ করেছিলেন। গণিতের আইন অনুযায়ী লগারিদম ব্যবহারের পূর্বে ত্রিকোণমিতির পরিমাপকে নানা পন্থায় বের করার চেষ্টা হতো। ইবনে ইউনুস নতুনভাবে এ সমস্যার সমাধান করেন। লগারিদম প্রচলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তাঁর প্রবর্তিত ফরমূলাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলো। এই ফরমূলাকে বর্তমানে prosthapherical Formulae বলে। গোলীয় ত্রিকোণমিতিতে এ সূত্র তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। ত্রিকোণমিতির সমস্যাবলী সমাধানের পূর্বেকার লম্বা জটিল ষষ্ঠিক ভগ্নাংশের গুণনের জায়গায় শুধু যোগ করেই এই ফরমূলা অনুসারে সব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাঁর সূত্র মতে,

$$\text{Cosa Cos}\beta = \frac{1}{2}\{\text{Ca}(\alpha-\beta) + \text{Cos}(\alpha+\beta)\}$$

এবং $\text{Sin } 1^0 = \frac{2}{3}, \frac{8}{9} \text{ Sin } (\frac{90}{8} + \frac{2}{3} \cdot \frac{16}{15} \text{ Sin } (\frac{15}{16})^0$

ইবনে ইউনুস পৃথিবীর বহুভাষায় অনূদিত হয়েছেন। তাঁর ৪টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

পাশ্চাত্যে আল হাজেন (Al hazen) নামে সুপরিচিত হাসান ইবনুল হাইছাম বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। চশমা আবিষ্কারের জনক হলেও তিনি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ও গণিত শাস্ত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন। ইরাকের বসরাতে তিনি ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৯ খৃ. মতান্তরে ১০৪৪ খৃ. মৃত্যু বরণ করেন।

ইবনুল হাইছাম অন্যান্য বিষয় ছাড়া, অংকে ৪১টি এবং জ্যামিতিতে ২৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। শুদ্ধ অংক শাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি কনিক্স, বীজগণিত, গণিতবিদ্যা, তরল পদার্থ বিজ্ঞানে অবদান তাঁকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। পদার্থ বিদ্যার সাথে উচ্চমানের গণিতের এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। ইবনুল হাইছাম তাই উভয়টি একত্রে আলোচনা করেন। 'কিতাবুল মুনজিরে' তিনি যেভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির ব্যবহার করেছেন তাঁর পূর্বে কেউই তেমনটি করেননি। জ্যামিতিক সমস্যায় গোলাকৃতি প্রতিফলক থেকে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম এবং বস্তু ও তার প্রতিকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্যাও তার জ্যামিতিক সমাধান যেমন, একটি বৃত্ত নেয়া হোক যার কেন্দ্র বিন্দু হলো o আর ব্যাসার্ধ হলো R, এই বৃত্তের একই সমতলে রয়েছে দুটো বিন্দু A ও B, এখন এ বৃত্তে এমন একটা M বিন্দু বের করতে হবে যেখানে A থেকে আলো এসে বৃত্ত থেকে প্রতিফলিত হয়ে B বিন্দু দিয়ে যাবে। অন্যভাবে সমস্যা হলো কতগুলো বিশিষ্ট অবস্থায় একটি গোলাকৃতি লেন্সের ফোকাস বের করা। সমস্যাটি AL-Hazen's problem নামে বিজ্ঞান জগতে পরিচিত। এ সমাধানটি বিজ্ঞানীদের কাছে বেশী জটিলরূপে পরিচিত। তা সত্ত্বেও এটি কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো Prof. Marcus Bakar ১৮৮১ খৃ. American Jourrnal of Mathematics -এ প্রকাশিত প্রবন্ধে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইবনুল হাইছাম ত্রিকোণমিতিতে বেশ উপাদেয় অবদান রেখেছেন। কিবলা নির্ণয় করবার বিষয়ে তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'মাকালাতু মুখ্‌তাছর ফি সামতোল কিবলা' গ্রন্থে তিনি ত্রিকোণমিতির কোটেনজেন্ট সম্বন্ধে একটি থিওরেম উদ্ভাবন করেন-

$$\mathrm{Cot}\propto = \frac{\mathrm{Sin}a_1 \ \mathrm{Cos}\ (A_2-\lambda_1) - \mathrm{Cos}\varphi_1 \ \tan\varphi_2}{\mathrm{Sin}\ (A_2-A_2)}$$

তেমনি 'কওলা ফি ইসতেখারাজ খাত্তা নিসফুন নাহার বেজুল্লে ওয়াহেদ' গ্রন্থে একটি ছায়া থেকে মধ্যরেখা নির্ণয় করা, দৃষ্ট ছায়া থেকে সূর্যের উচ্চতা বের করে নিতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তার ত্রিকোণমিতিক সমাধান তিনি বের করেছেন এভাবে-

$$\mathrm{Cos}A = \frac{\mathrm{Sin}\lambda\ \mathrm{Sin}\varphi\ \mathrm{Sin}\eta\xi}{\mathrm{Cos}\lambda\ \mathrm{Cos}\varphi}$$

ইবনুল হাইছাম ২শ' এর কাছাকাছি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হিসাবে ইউরোপের বহু ভাষায় তিনি অনূদিত হয়েছেন। ল্যাটিন, হিব্রু, স্প্যানিশ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় তাঁর প্রায় ২৫টি গ্রন্থ। বিশ্বের খ্যাতনামা মিউজিয়াম লাইব্রেরীসমূহে রক্ষিত আছে মূল গ্রন্থের অর্ধশতাধিক পাণ্ডুলিপি।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনে অনেক জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ইউনুস সাফফার (মৃ. ১০৩৫ খৃ.), যারকালী (১০২৯-১০৮৭ খৃ.), ইবনুস সামাহ (মৃ. ১০৩৫), ইবনে আবির রিজাল (ল্যাটিনে Albohazen, Alboacen, Aben Ragel প্রভৃতি বিকৃত নামে পরিচিত, মৃ. ১০৪০), জাবির বিন আফলাহ আবুল কাসেম বিন ফানাস, আহমদ বিন ওমার, ওমার বিন আহমদ, আল ফতেহ প্রমুখ অন্যতম।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে মূলত মুসলিম পতনের যুগ শুরু হয়। ইউরোপের জাগরণ এ সময় হতে নতুন সভ্যতার বারতা ঘোষণা করে। তবুও এ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত কিছু গণিতবিদ-কালের পাতায় যাঁদের স্থান অক্ষয়।

পারস্য বংশোদ্ভূত ওমর বিন ইবরাহীম আল খৈয়াম (মৃ. ১১২৩) কবি হিসাবে তো বটে বিজ্ঞানী হিসাবেও আশ্চর্য সফল ছিলেন। জ্যোতির্বিদা, গণিত, দর্শনসহ অনেক বিষয়ে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে জ্যোতির্বিদ্যা ও বীজগণিতে তিনি অমূল্য অবদান রেখেছেন। বীজগণিত বিষয়ক তাঁর গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায়ে এবং মোটামুটি ৬টি বিষয় বিন্যাসে সমাপ্ত; তা হলো- ১. বীজগণিতের সংজ্ঞাসমূহের ব্যাখ্যাসহ ভূমিকা। ২. সরল ও যৌগিক সমীকরণসহ যে সকল সমীকরণ সমাধানের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোর তালিকা। ৩. প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের আঙ্কিক ও জ্যামিতিক সমাধান। ৪. ভগ্নাংশীয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা, আর ৫. বিজ্ঞানী আবুল জুদের

কার্যাবলী আলোচনা। খৈয়ামের 'আল জাবর ওয়াল মুকাবালা' নাম এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি লিডেন, প্যারিস ও ইন্ডিয়া লাইব্রেরীতে বর্তমান রয়েছে।

ওমর খৈয়াম ২১টি সরল সমীকরণ, ১৪টি ত্রিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ, ২৪টি ত্রিরাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ (Three terms including an interval of any fore successive degree), এবং ২৮টি চতুর্রাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ অর্থাৎ মোট ৮৮টি সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২টি বাদে ৮৬টি সমীকরণের সমাধান তাঁর নিয়মে করা যেতে পারে। বাকী দু'টির জন্য ইবনুল হাইছামের auxiliary proposition-এর দরকার; উল্লেখ্য, এসব সমীকরণের মাত্র ৬টি পূর্বতন বিজ্ঞানীগণ আলোকপাত করেছেন।

তাঁর ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন মসিয়েঁ উপেক তাঁর L'Algebra d'Omar গ্রন্থে।

বীজগণিতের একটি বিশেষ শাখা হলো Binomial theorem. দুটি সংখ্যায় যোগফল যে কোনো শক্তিমাত্রায় উন্নত হলে সংখ্যাসমূহের গুণক নির্ধারণ করার এটি সহজ পন্থা। অংকের পরিভাষায় একে বলা হয় (a+b), n ; n যে কোনো সংখ্যা হোক না কেনো কোনো বড় ধরনের ঝুঁকি ও ঝামেলার আশ্রয় না নিয়ে a ও b এর গুণক বের করা। গ্রীক বিজ্ঞানী ইউক্লিড এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ দ্বিশক্তির আলোচনা করেছেন। এর বেশী তিনি মাথা ঘামাননি। ওমর খৈয়াম সর্বপ্রথম এ নিয়ে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। তিনি উক্ত গুণক নির্ধারণ করার ফরমূলা বের করেন। বর্তমানে Binomial theorem-এর আবিষ্কর্তা হিসাবে বিজ্ঞানী নিউটনের নাম চালানো হয়, কিন্তু প্রধান আবিষ্কারক ওমর খৈয়ামের নাম আরো অনেক মুসলিম বিজ্ঞানীর মতো ভাগ্য বরণ করে। 'আল জিজ' 'মুসকিলাতে হিসাব' প্রভৃতি তাঁর গণিত বিষয়ক গ্রন্থ।

বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরীয়ান বর্ষপঞ্জি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য রূপ পেয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে আধুনিক ও নিখুঁত ক্যালেণ্ডার প্রণয়ন করেছেন ওমর খৈয়াম। হিট্টির সপ্রশংস ভাষা- 'The researches of Umar al-khayyam and his collaborators resulted in the production of the calendar named after his patron at-Tarikh al-Jalali, which is even more accurate than the Gregorian Calendar. The Later leads to an error of one

day in 3330 years, whereas al-Khayyam's apparently leads to an error of one day in 5000 years.

ওমরের সমকালে দ্বাদশ শতাব্দীর গণিত আলোচকদের মধ্যে আরো রয়েছেন ফাজারী (মৃ. ১১২২ খৃ.), মনসুর আল খাজিনি, হাকিম লুকরী, মোহাম্মদ কাজীন, নাজিব ওস্তি, মামুর বায়হাকী, ইবনে কুশাক, আবদুল বাকী, খারাকী (মৃ. ১১৩৮/৩৯ খৃ.), আবদুল মালেক সিরাজী, ইবনুদ্ দাহহান (মৃ. ১১৯১ খৃ.), আদনান আল আইনজাবরী (মৃ. ১১৫৩ খৃ.)

মুসলিম স্পেনের আবুস্ সালাত (জ. ১০৬৭ খৃ.) গণিতে 'রিসালা ফিল আমল্ বিল আস্তারলব' রচনা করেন। এতে তিনি আস্তারলব ছাড়াও Mechanics এবং Hydrostatics নিয়ে ও আলোকপাত করেন। জাবির বিন আফলাহ (মৃ.১১৪০-৫০ খৃ. এর মধ্যে) ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে টলেমীর মতবাদকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেন। তিনি টলেমীর উদ্ভাবিত বহুদিনের শ্রদ্ধায় নিষ্পেষিত 'rule of six quantities'-এর বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতার ত্রুটি ঘোষণা করেন এবং একে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেন। তার পরিবর্তে তিনি rule of four quantities প্রচলন করেন। ত্রিকোণমিতির ভাষায় একে বলা যেতে পারে যে, যদি PD এবং QQ, A বিন্দুতে ছেদকারী দুটি বৃহৎ বৃত্তের চাপ হয় এবং PQ ও $P_1.Q_1$, QQ-এর লম্বতে অঙ্কিত বৃহৎ বৃত্তের চাপ হয় তাহলে Sin AP: Sin PQ=Sin AP_1: Sin P_1Q_1 এ থেকেই তিনি গোলীয় সমকোণী ত্রিভুজের ত্রিকোণমিতিক সূত্রসমূহ আবিষ্কার করেন, যা তাকে গণিতে অমর করে রেখেছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানে মুসলিম প্রাধান্য কমতে থাকে, তবুও কোনো কোনো মুসলিম বিজ্ঞানী মাঝে মাঝে ফুলকির মতো জ্বলে উঠেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফখরুদ্দীন আল রাজী অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতি লাভ করলেও গণিত বিষয়েও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। কামাল উদ্দীন ইবনে ইউনুস Theory of numbers আলোচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর (মৃ. ১২৪২ খৃ.) এ অবদানই শ্রেষ্ঠতম অংকবিদ হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শরফউদ্দীন তুসী (মৃ. ১২১৩) ইবনুল লুবিদি (জ. ১২১০-মৃ. ১২৬৭) গণিত বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন।

নাসির উদ্দীন তুসী (জ. ১২০১ খৃ.) বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় নিজ প্রতিভার ছাপ অঙ্কন

করেন। গণিতে প্রণীত তাঁর গ্রন্থগুলো হচ্ছে- মুতাওয়াসিতাত বায়নাল হান্দাসা ওয়াল হাইয়া (the middle books between geometry and astronomy) জামিউল হিসাব বিত্ তাখতো ওয়াত্তোরাব (summary of the whole of computation with table and earth), কিতাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালা, কাওয়ায়েদুল হান্দাসা, তাহরিরুল উসুল অন্যতম।

ত্রিকোণমিতিকে নূতন রূপ ও প্রতিষ্ঠা দান নাসির উদ্দীন তুসীর অন্যতম প্রধান অবদান। তাঁর হাতেই ত্রিকোণমিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বিষয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ 'কিতাবু শাকলোল কাত্তার'। জ্যামিতিতে তাঁর যে উদ্ভাবন তা ইউক্লিডের পূজ্য মতবাদকে দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর একটি মতবাদ বর্তমানে Non-Euolidean Geometry নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের গতিতজ্ঞ সাকেরী (Saccheri) এই মতবাদ উদ্ভাবনের কর্তা হিসাবে পরিচিত হলেও নাসির উদ্দীনই এর প্রথম আবিষ্কারক।

Spherical trigonometry এর সঙ্গে এবং plane trigonometry-এর দিকেও তিনি আকৃষ্ট হন। সাইন সম্বন্ধ যে plane Trigonometry তেও খাটে তা তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। Spherical trigonometry র সূত্র ষষ্ঠক তিনি স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করেন, ফলে টলেমীর জবরজঙ্গ প্রথা থেকে অংকবিদরা রেহাই পান। টলেমীর স্থানে বর্তমানে নাসির উদ্দীনের সরল পন্থাগুলোই অনুসৃত হয়। তাঁর 'পরিপূরক সংখ্যা' নিয়মটি সাধারণভাবে কোণ ও বাহুর সম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়-

$$\frac{Sina}{SinA} = \frac{Snb}{SinB} = \frac{Sinc}{SinC}$$

তাঁর অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ 'তিনি পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রমাণ দিয়া মারাঘায় গ্রহণ, সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সেই যুগের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আকর ষোলটি গণিত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।'

পতন যুগে আরো অনেক গণিত প্রতিভা জন্ম লাভ করেন। পারস্যের নৃপতি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উলুগ বেগ, তাঁর সহকারী জামসিদ বিন মাসুদ আল ফাসরী (মৃ. ১৪৩৬), স্পেনের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ গাণিতিক আলী বিন মুহাম্মদ আল কালাসাদী (মৃ. ১৫৮৬,) কনস্টান্টিনোপালের মুহাম্মদ বিন মারূফ, বাহাউদ্দীন আমিলী গণিতে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

এই রিচনায় প্রধানত মৌলিক গণিতবিদদের নাম ও সংক্ষেপ কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম যুগ থেকে অন্তর্বর্তী সময়ে আরো বহু বিজ্ঞানী ও গণিত প্রতিভার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। গণিতের শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞানে শত শত মুসলিম মনীষীর জীবন ও কার্যাবলী যুক্ত হয়েছে। তাঁদের সর্বোত পরিচয় এখানে দেয়া হয়নি বিষয়ভুক্তির কারণে। মুসলিম গবেষকদের দানে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিজেই আলাদা ফর্মে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রধান মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই কম বেশী এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার নজির স্থাপন করেছেন সগৌরবে। স্পেনে মুসলমানদের পতন পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞ বিশেষ করে মুসলিম জ্ঞানবত্তার পরিচয়বাহী লক্ষ লক্ষ পুস্তক পুড়িয়ে, নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হলে, মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের লাইব্রেরীগুলির একই অবস্থা না হলে হয়তো মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। মূল জ্ঞান-ভাণ্ডার ধ্বংস সাধনের পরও বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত গবেষণার পরিণতিতে মুসলমানদের যে বিশাল অবদান আজ পরিলক্ষিত হয় তা যে বহুগুণ বর্ধিত হতো, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। যেটুকু জানা যাচ্ছে তাতে আজ কট্টর প্রাচ্যবিদরা ও মুসলিম সভ্যতাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে কসুর করছেন না, অথচ এক সময় তারা মুসলিম যুগকে অন্ধকার যুগ বলে নাক সিঁটকিয়ে নিজেদের হীনমন্যতাকে বার বার বাড়িয়ে তুলত। আজ ইউরোপ স্বীকার করতে বাধ্য যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রকৃত নির্মাতা আরবরাই। গণিতের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে মুসলিম অবদানের স্পর্শ লাগেনি। John William Draper তাঁর A History of the Intellectual Development of Europe (1875) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ Not one of the purely mathematical, mixed or practical sciences was omitted by the Arabs.

গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে আরো রয়েছেন- আল কিন্দি (মৃ. ৮৭৪ খৃ.), সনদ ইবনে আলী (মৃ. ৮৬৪ খৃ.) আল হাজ্জাজ, আল্ জুরজানী, অনুবাদক হোনায়েন ইবনে ইসহাক (৮১০-৮৭৩ খৃ.), ইসহাক বিন হোনায়েন (মৃ. ৯১০ খৃ.), আল আরজানি (মৃ. ৮৫২ খৃ.), আল হিমসি (মৃ. ৮৮৩), আল ফজল (মৃ. ৮১৫), আহমদ ইবনে ইউসুফ (মৃ. ৯১২), আল্ ফারাবী, আল নাইরেজী (মৃ. ৯২৩), আল খাজিন (মৃ. ৯৭১), আল খাসিব, ইবনুল আদামী, ইবনুল আমাজুর (জ. ৮৫৫), আবু ওসমান, আবু যাইদ, আল ইমরানী (মৃ. ৯৫৫), আবুল ফতেহ, আবদুর রহমান সুফী (৯০৩-৯৮৬), আবুল কাসেম (মৃ. ৯৮৫), আল সাগানী, আল কোয়াবিসী, আল কুহী (৯৫১-১০২৪), আল সিজ্জি,

আবুল ফজল জাফর, শরফউদ্দৌলা (মৃ. ৯৮৯) আল হামদানী, আবু আবদুল্লাহ, আবুল ফারাজ, আল মাজরিতি আবু নাসের, আন নাসাভী, ইবনে সীনা, কুশিয়ার ইবনে লাব্বান আল কিরমানী (৯৭৬-১০৬৬), ইবনুস সামাহ (মৃ. ১০৩৫) ইবনে সাইদ (১০২৯-১০৭০ খৃ.) ইবনুল কারনিব, সিনান বিন আল ফতেহ প্রমুখসহ আরো অনেকে।

আগেই বলা হয়েছে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার স্বীকৃতি আগের যে কোনো সময়ের চাইতে সমকালে বেশী হচ্ছে, যদিও অসংখ্য আবিষ্কার এখনো অন্য নামে চলছে যথারীতি। ১৯৭১ সালে International congress of Astronomers-এ International Astronomical Union কর্তৃক চন্দ্র পৃষ্ঠের তিনটি Craters বা আগ্নেয়গিরির মুখের নামকরা রয়েছে তিন জন বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে। তাঁরা হলেন ঃ আল বিরুনী, ইবনে সীনা ও ওমর খৈয়াম। এরও পূর্বে ১৯৩৫ সালে চাঁদের ১৩টি 'Lunar formation' ১৩ জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে নামকরণ করা হয়েছিলো, তারা হলেন ঃ আবদুর রহমান সুফী, উলুগ বেগ, মাশা'আল্লাহ, ফারগানী, বাত্তানী, সাবিত বিন কুরা, ইবনুল হাইছাম, আল যারকালী, জাবির বিন আফলাহ, নাসির আল দীন, আল বিতরুজী, আবু আল ফিদা ও খলীফা মামুন।

মুসলমানদের ভূ-বিজ্ঞান চর্চা

"জুগরাফিয়া বা 'জিগরাফিয়া' (Djughrafiya or Djighrafiya) কথাটি পুরাকালে ভূ-বিদ্যার সাথে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতোনা। বরং খৃষ্টপূর্ব (৭০-১৩০)-এর মারিনুস এবং (৯০-১৬৮)-এর টলেমীর ভূগোল সংক্রান্ত গ্রন্থাদিকেই বুঝানো হতো। 'জুগরাফিয়া' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'সুরাতুল আরদ' বা পৃথিবীর আকৃতি-প্রকৃতি।

প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবেত্তা মাসউদী (মৃ. ৯৫৬) এর মতে, 'কাতউল আরদ' বা ভূমি জরিপ। ১৩৪৭ ঈসায়ী সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত 'রাসাইলু ইখওয়ানুস সাফা' গ্রন্থে এ শব্দটিকে 'পৃথিবীর মানচিত্র' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রধানতঃ ভূ-বিদ্যা বলতে এই অর্থেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে ভূগোল বিদ্যা বলতে পৃথিবী সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনাই বুঝানো হয়। ডব্লিউ জিমারম্যান বলেন ঃ 'পৃথিবীর জলস্থল, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা, অরণ্য-জলবায়ু, দেশ-দেশান্তরের মানুষ, মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ভাগ্য কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়াই ভূগোলের মর্মকথা।' এই পরিধি ক্রম প্রসারমান। তাই ভূ-বিজ্ঞান আজ হয়ে উঠেছে আকাশ, সমুদ্র, কৃষি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কিত এক বিজ্ঞান।

জাহেলীয়া যুগে আরবদের ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল বেশ সীমিত।

তখনকার আরবদের ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস ছিল প্রাচীন ব্যাবীলনীয় সভ্যতা, প্রাচীন আরবী কবিতা এই ইহুদী-খৃষ্টান ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম তথা ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর এই ধারণায় যুক্ত হয় সম্পূর্ণ এক নতুন মাত্রা নতুন দর্শন ও ধারণা। অসংখ্য বিজ্ঞান ও জ্ঞান গবেষণার আধার পবিত্র কুরআনে ভূগোল চর্চায় এক নতুন চিন্তাধারা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তা বুঝে উঠার পূর্বেই যে তাগিদে মুসলমানরা ভূগোল চর্চায় মনযোগী হন সে সম্পর্কে যুরজী যায়দান লিখেন ঃ 'পবিত্র হজ্জ পালন, মসজিদের কিবলা নির্ধারণ এবং নামাজের সময় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের ভূগোল গবেষণার মূল প্রেরণা ছিলো।'

পবিত্র কুরআনে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের আহবান জানানো হয়েছে অনেকবার। বিশেষ করে খোদাদ্রোহী অধ্যুষিত জনপদের অবস্থা দেখার কথা বলা হয়েছে। সূরা ইউনুসের ১০৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা কি পৃথিবীপৃষ্ঠ ভ্রমণ করে দেখেনি, যেখানে তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম ঘটেছিলো।' কুরআনে কারীমে বহু শহর নগরের আনুপুংখ বর্ণনা রয়েছে যেমন তেমনি তার অধিবাসীদের সম্পর্কেও রয়েছে আলোচনা। যেমন জুলকরনাইন সম্পর্কিত কাহিনী ভৌগলিকদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পৃথিবী বক্ষে পাহাড় পর্বত এবং বিভিন্ন প্রকার ভূমির সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনে বিস্ময়কর সব তথ্য দেয়া হয়েছে যা শত বছরের বিজ্ঞান গবেষণায়ও জানা সম্ভব নয়। সূরা নাহলের ১৫ নং স্তবকে বলা হচ্ছে, 'এবং তিনিই পৃথিবীপৃষ্ঠে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন যাতে উহা (পৃথিবী) তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়।' পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'তুমি কি দেখনি, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন তারপর তাদের একত্রিত করেন, অতঃপর দেখান উহা হতে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, আর আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা।' (সূরা নূর ঃ ৪৩) সূরা নামলের ৬০ আয়াতে বলা হচ্ছে- 'আকাশ হতে পানি বর্ষণের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি। এসব উদ্যানের গাছপালাসমূহ উদগমনে তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই।'

সমুদ্র এবং পানি সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের আশ্চর্য আশ্চর্য বর্ণনা রয়েছে, সমুদ্র এখনো হাজারো রহস্যের আধার। যে সমুদ্র সম্পর্কে মানুষ আজ জানছে তার সম্পর্কে হাজার বছর আগে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন ঘোষণা করেছে, তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা উহা হতে তাজা মৎস আহরণ করতে পার, আর যাতে উদ্ধার করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা অলংকারস্বরূপ পরিধান কর।' (নাহল ঃ ১৪) ঋতু পরিবর্তন, দিন রাত্রির পরিক্রম ও চন্দ্র সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে কৌতুহল উদ্দীপক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বিবরণ রয়েছে। সূরা ইয়াসীনে বলা হচ্ছে- 'সূর্য সন্তরণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। ইহা মহা পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং চন্দ্রের জন্যও আমি নির্দিষ্ট নিজস্ব কক্ষপথ ঠিক করে দিয়েছি। অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র, পুরানো খর্জুর বিথীর আকার ধারণ করে। সূর্যের জন্য কভু সম্ভব নয় সে চন্দ্রের নাগাল পাবে আর রজনীরও সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করার। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে ভাসমান বিচরণশীল রয়েছে।' অন্যত্র বলা হয়েছে- 'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যেন তা থেকে

তোমরা জলে ও স্থলে অন্ধকারে দিক নির্ণয় করতে পার। চিন্তাশীল জ্ঞানীদের জন্য আমি এ আয়াত বর্ণনা করছি।' (সূরা আনয়াম ঃ ৯৭)

এ রকম আরো অনেক বর্ণনায় ভূ-বিষয়ক গবেষণার নির্দেশনা রয়েছে। প্রধানত এই মাল মসলার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের ভূগোল চর্চার মোড় পরিবর্তিত হয়। মুসলমানরা গ্রীক বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন এবং তাদের উপর গ্রীক প্রভাব ছিল। বলা হয়, গ্রীক প্রভাবেই মুসলমানদের বিজ্ঞানসম্মত ভূগোল চর্চার সূত্রপাত হয়। ইউরোপ এবং কোন কোন মুসলিম গবেষকও তা উল্লেখ করেন পাশ্চাত্য লেখকদের অনুসরণে। কিন্তু কুরআনের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই মুসলমানদের বিজ্ঞানসম্মত ভূগোল চর্চার প্রধান নিয়ামক ছিল। দিন-রাতের পরিবর্তন পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে চাঁদের পরিভ্রমণ, পৃথিবী গোল হওয়ার ধারণা এবং মানুষের উপর এগুলোর নানা প্রভাব সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি মুসলমানরা আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীর ব্যাস এবং চন্দ্র ও সূর্য হতে এর দূরত্ব তারাই নির্ণয় করেছেন যা গ্রীক রোম ও পারসিক ভৌগলিকদের কাছে অজানা ছিলো। কুরআনে গ্রীক, ব্যাবীলনীয় ও রোমকদের অজানা অনেক ভৌগলিক তথ্য রয়েছে। যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধ ভূগোল চর্চায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা নতুন পথ প্রদর্শন করেন। মহানবীর (সা) বাণী ছিল তাদের চলার আরেক পাথেয়।

গ্রীকরা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের হাতেই প্রকৃত মর্যাদা পেয়েছিল। আদর্শগতভাবে গ্রীকরা ইসলামী বিশ্বাসের সাথে ছিল সামঞ্জস্যহীন। কিন্তু জ্ঞানের বিষয়ে ইসলামের যে উদারতা তার কারণে গ্রীক মনীষীদের কদর যথাযর্থই লালিত্য পেয়েছিল মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা যদি গ্রীক বিজ্ঞান-সাহিত্য অনুবাদে নিয়োজিত না হত তাহলে গ্রীক সভ্যতার অনেক কিছু হারিয়ে যেত আধুনিক ইতিহাসের পাতা হতে- একথা অনেকেই স্বীকার করেন। ভূগোল বিদ্যার পথিকৃৎ ক্রাউডিয়াস টলেমীসহ আরো অনেকের রচনাবলী বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করে আরবীতে অনুবাদের মাধ্যমে ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রীক প্রজ্ঞা মুসলমানদের হস্তগত হয়। আরবীতে অনূদিত টলেমীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে Almagest (আল মাদজিসতী) Tetrabiblon (আল মাকালাত আল আরবা) Apparitions of fixed stars (কিতাবুল আনওয়া) ইত্যাদি আর আল মরীনুসের গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে Timaeus প্লেটের Meteorology (আল আতহীরুল উলুয়িয়্যাহ) Decaelo (আস সামা ওয়ালা আলাম) ইত্যাদি।

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও বাগদাদ মুসলিম জাহানের রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর পরই মুসলমানরা প্রধানত ভূ-বিদ্যায় ব্যাপক গবেষণার ব্রত গ্রহণ করেন। দিগ্বীজয়ী মুসলমানরা শত শত বর্গ মাইলের দেশসমূহের অজানা অচেনা

পথ ধরে চলতে গিয়ে এবং ইসলামের আদর্শ প্রচারের জন্য ব্যাপক দেশে তাদের ভূ-বিদ্যা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাতে হয়। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, স্পেনের, বিজিত অঞ্চলসমূহে মুসলমানরা বহু নতুন ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। প্রাচীন বহু অমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অনুবাদ খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের সাফল্যের পেছনে বিরাট অবদান রাখে। আরবীয় যুগে গ্রীকদের বহু ভূগোল গ্রন্থ মুসলিম বিজ্ঞানীরা আরবীতে অনুবাদ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ বিন মুসা আল খারিজমী (মৃ. ৮৪৭ খৃ.) আল কিন্দি (মৃ. ৮৭৪ খৃ.) সাবিত বিন কুরা (মৃ. ৯০১ খৃ.)। টলেমীর বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ ব্যাপক আরবী অনুবাদ এবং নতুন টীকা ভাষ্য সংযোজনের পর নিজস্ব মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে।

আল খারিজমী (মৃ. ৮৪৭) বিখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন এবং তাঁর রচনায় আরবীতে ভূ-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ স্থাপন করে। 'সুরাতুল আরদ' নবম শতকের প্রথমার্ধে রচিত তাঁর অনন্য কীর্তি। খলীফা আল মামুনের আমলে (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) যে সকল মনীষী পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অংকন করেন তাদের মধ্যে খারিজমী অন্যতম। খলীফার উৎসাহে তিনি পৃথিবীর একটি পরিমাপও তৈরী করেছিলেন। তার গ্রন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক মিনবস্কি বলেন 'ইউরোপীয়রা তাদের বিজ্ঞান চর্চার প্রথমদিকে এর সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি। তার পরে আল ফারগানী (মৃ. ৮৬০) আল বাত্তানী (মৃ. ৯২৯) ইবনে ইউনুস (মৃ. ১০০০) অক্ষরেখা দ্রাঘিমা ও ভূ-মণ্ডল বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। খারিজমীর নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের একটি দল ফোরাত নদীর উপরে পামিরের নিকটবর্তী সিনজিরার প্রান্তরে পরিমাপ কার্য চালান। তার হিসাব মতে পৃথিবীর পরিধি ২০ হাজার ৪০০ মাইল এবং ব্যাস ৬৫০০ মাইল। এই পরিমাপ কার্যে খারিজমীর নিজস্ব উদ্ভাবিত জীজ ব্যবহৃত হয়।

ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দি (মৃ. ৮৭৪) দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে ভূগোল চর্চায়ও খ্যাতি লাভ করেন। এই বিষয়ে তার মূল্যবান দুটি গবেষণা কর্ম রয়েছে। তা হলো 'রসমুল মামুর মিনাল আরদ' এবং 'রিসালাতুন ফিল বিহার ওয়াল মদ ওয়াল জাযর'। গ্রীক ভাষার পণ্ডিত এ আরব বিজ্ঞানী এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্বান সমাজ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা তার গ্রন্থে বিবৃত করেন। কিন্দির সুযোগ্য উত্তরসূরী আহমদ বিন মুহম্মদ আত তায়ীর আস সারাকসী (মৃ. ৮৯৯) ও দুটি মূল্যবান ভূগোল গ্রন্থের রচয়িতা। তা হলো যথাক্রমে 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' ও 'রিসালাতু ফিল বাহার মীয়াহ ওয়াল জাবল'। গাণিতিক ও প্রাকৃতিক ভূগোলের গবেষকদের মধ্যে আরো রয়েছেন আল ফাজারী (৮ম শতক), আল ফারগানী (মৃ. ৮৫১) জাফর বিন মুহম্মদ বলখী (মৃ. ৮৮৬) অন্যতম। আরবদের প্রথম দিকের ভূগোল গ্রন্থগুলি ছিল সাধারণত পথ বৃত্তান্ত।

মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম ভূগোল বিষয়ক পূণার্ঙ্গ গ্রন্থ্ রচনা করেন পারস্যের বিখ্যাত ভৌগলিক ইবনে খুরদাদবীহ। আরবী ভূগোল গ্রন্থের প্রকৃত রূপরেখা ও পদ্ধতির প্রথম নির্মাতা ছিলেন বলে তাকে মুসলিম ভূগোলবিদদের 'জনক' বলা হয়। তার 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ্। এতে আরবের প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথ জাপান, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বর্ণনা রয়েছে। গ্রন্থের প্রথম খসড়া প্রস্তুত হয় ৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খসড়া ৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটিকে পরবর্তীতে যারা প্রামাণ্য ভিত্তি হিসাবে নিয়েছেন তন্মধ্যে ইবনুল ফকীহ ইবনে হাওকাল আল মুকাদ্দেসী অন্যতম।

বিখ্যাত পর্যটক ও ভৌগলিক ইবনে ওয়াদী আল ইয়াকুবী (মৃ. ২৭৮ হি.) আর্মেনিয়া ও খোরাসানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি ভারত ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণ করেন। ৮৯১ খৃ. প্রকাশিত তার 'কিতাবুল বুলদান'-এ অনেক ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা স্থান পায়। ৯৮২ খৃ. পরবর্তী বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব কর্মকর্তা কুদামা তার 'আল্ খারাজ' গ্রন্থ্ রচনা করেন। এতে সাম্রাজ্যের প্রদেশ বিভাগ, ডাক বিভাগের সংগঠন এবং প্রত্যেক জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আলোচিত হয়েছে। মুহম্মদ ইবনুল ফকীহ, খৃষ্টীয় নবম শতকের খ্যাতিমান ভূগোলবেত্তা ছিলেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল বুলদানে' ভারত, আরব, চীন, মিশর, পাশ্চাত্য দেশসমূহ, ফিলিস্তিন, রোম, পারস্য, বসরা, দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের ভৌগলিক বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইস্পাহানের ইবনে রুনতাহ 'আল্ আলাক আন্ নাসীফা' (রচনাকাল ৯০৩-১৩ খৃ.) নামক বিবরণমূলক গাণিতিক ও জনতাত্ত্বিক ভূগোলের রচয়িতা। বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে এইগুলো ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিশ্বকোষ হিসাবে পরিগণিত হত।

যায়েদ আল বলখী (মৃ. ৩২২ হি.) ছিলেন মুসলিম মানচিত্র নির্মাতাদের অন্যতম। সাসানীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত এই মনীষীর বিখ্যাত রচনা 'সুরাতুল আকালীম' এবং 'মাসালিক ওয়াল মামালিক (৯২১ খৃ.)।

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মুকাদ্দেসী (মৃ. ৩৭৫ হি.) সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ছিলেন। সুদীর্ঘ ২০ বছর ভ্রমণ করে তিনি পৃথিবীর বহু নির্ভুল উপাত্ত সংগ্রহ করেন। তাঁর সংক্ষেপ সার ৯৮৫ খৃ. রচিত 'আহসানুত্ তাকাসীম ফী সারিফাতিল আকালীম' গ্রন্থ্। সমকালে এবং পরবর্তীতে অনেক ভূগোল বিশেষজ্ঞ এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করতেন। পাশ্চাত্যেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম জাহানকে তিনি ১৪টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের পৃথক মানচিত্র তৈরী করেন। এই সময়েই ইয়েমেনী ভৌগলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হাসান বিন আহমদ

আল হামদানী তাঁর 'আল ইকলীল' ও 'সীফাতে জজীরাতুল আরব' গ্রন্থ্ দ্বয়ের জন্য বিশিষ্টতা লাভ করেন।

আব্বাসীয় যুগের শেষভাগে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগলিক ইয়াকুত বিন আবদুল্লাহ আল হামাভী (জ. ১১৭৯ খৃ.) আভির্ভূত হয়েছিলেন। এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী হামাভী ১২২৮ খৃ. 'মুজমাউল বুলদান' রচনা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিবরণ ও বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য এতে বর্ণক্রম অনুসারে সজ্জিত হয় বলে এটি একটি বিশ্বকোষ হিসাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত। তার অন্য গ্রন্থের নাম 'মুজামুল উদাবা'। ড. আর এ নিকলসন লিখেছেন : 'A store house of geograhpical information the value of which it would be impossible to overestimate.'

আল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খৃ.) বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভূগোলবিদ। তাঁর অমর সৃষ্টি 'কিতাবুল হিন্দ' আধুনিক যুগেও একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রীক, ইরান ও ভারতের ভৌগলিক জ্ঞানের তিনি সুপণ্ডিত। তিনিই সর্বপ্রথম গোলাকার মানচিত্র তৈরী করে 'কিতাবুত্ তাফহীম' গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করেন।

মুসলিম স্পেনের অনন্য প্রতিভা আল ইদ্রিসী (জ. ১০৯৯ খৃ.) পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ভূগোলবিদ ছিলেন। রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'কিতাবুর রোজারী' লিপিবদ্ধ করেন। তিনি একটি খ-গোলক (Galestial sphere) তৈরী করেছিলেন এবং একটি গোলকে জ্ঞাত জগতের অবস্থান নির্দেশ করেছিলেন। ইদ্রিসী নিঃসন্দেহে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানচিত্র নির্মাতা। তিনি প্রায় ৭০টি মানচিত্র নির্মাণ করেন এবং এতে পৃথিবীর অক্ষাংশ পরম্পরায় ৭টি আবহাওয়া বিভাগ দেখান। রৌপ্যপাত্রেও তিনি একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

মুসলিম ভূগোলবিদদের মধ্যে আরো যারা খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে আল মাসউদী, ফাজারী, ফারগানী (মৃ. ৮৫১), ইবনুল হায়েক (মৃ. ৩৩৪ হি.) ইবনে ফাজলান, আবু ইসহাক ফারিসী, কাযবিনী, আল বকরী, (মৃ. ৪৮৭ হি.) আবু হামিদ আল গ্রানাডী (মৃ. ৫৬৪ হি.), ইবনে যুবাইর (মৃ. ৬১১ হি.), আল হারাবী (মৃ. ৬১১ হি.), আব্দুল লতিফ বাগদাদী (মৃ. ৬২৯ হি.), বুরহানুদ্দীন আল ফাজারী (মৃ. ৭২৯ হি.), ইয়াহিয়া বিন জীয়ান, নাসির উদ্দীন সুয়ুদী (মৃ. ৮০৩ হি.), ইসহাক খতীব (মৃ. ৮৩৩ হি.), সিরাজুদ্দীন আল ওয়াদী (মৃ. ৮৬১ হি.), আবদুল লতিফ আল কাদাসী (মৃ. ৮৫৬ হি.), তাজউদ্দীন হোসাইন (মৃ. ৮৭৫ হি.), তকীউদ্দীন আল বদরী (মৃ. ৮৮৭ হি.), আবু হামিদ আল কাদাসী (মৃ. ৮৮৮ হি.), শামসুদ্দীন সুয়ূতি (মৃ. ৮৮০ হি.) অন্যতম।

এছাড়া আরো রয়েছেন, আল মাজিনী (১০৮০-১১৬৯ খৃ.), ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খৃ.), ইমামুদ্দীন আল হানাফী (মৃ. ৯২০ হি.), মুহিউদ্দীন নাঈমী (মৃ. ৯২৭ হি.), আবু মুহম্মদ আবদারী (মৃ. ৬৮৮ হি.), আল ফালাবী (মৃ. ৮২০ খৃ.), আবুল ফাতাহ্ ইসকান্দারী (মৃ. ১১৬৫ খৃ.), আবুল ফিদা (মৃ. ১৩৩১ খৃ.) ইবনু সাঈদ (মৃ. ১২৭৪ খৃ.), আবু হামিদ আন্দালুসী (মৃ. ১১৬২ খৃ.), আল মাকয়িজী (১৪৪২ খৃ.), ইবনে খালদুন (১৪০৬ খৃ.), ইবনে আলী মারাকেলী (১২৬২ খৃ.), ইবনে ইবারী (১২৮৬), ইবনে মাজেদ (১৪৯৮), সাদী আল রঈস (১৫৬২) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূ-বিদ্যায় এঁদের রয়েছে রচনা, গবেষণা এবং গ্রন্থাবলী। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানকেও তারা প্রভাবিত করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতাকে মুসলমান বিজ্ঞানীরা পথ দেখালেও ইতিহাসের গৌরবকে ধারণ করা ছাড়া বর্তমানে মুসলমানদের তেমন বড় বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক উত্তরাধিকার বলতে গেলে নেই।
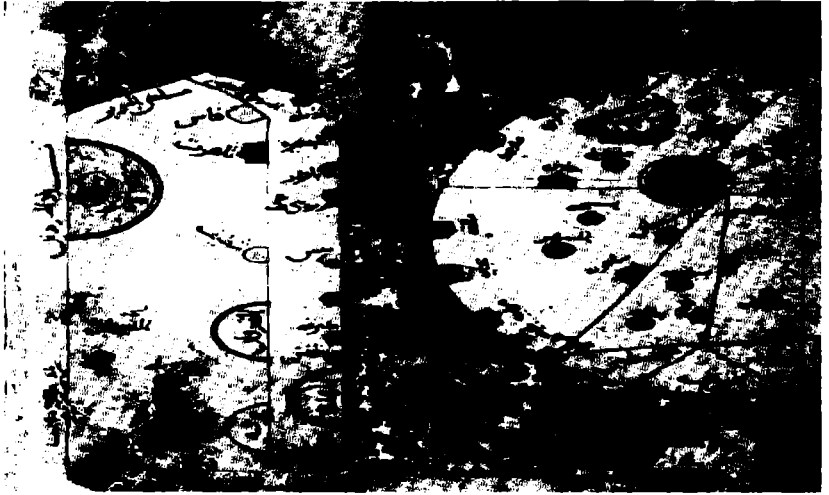
দশম শতকের আল ইসতাখরী অঙ্কিত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলের মানচিত্র। এর ডানে স্পেন, মধ্যকার বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কর্ডোভা এবং নিচে কালো বৃত্তে সিসিলি। বামে উত্তর আফ্রিকা নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ভৌগলিক আল কাযবিনী অঙ্কিত একটি মানচিত্র।
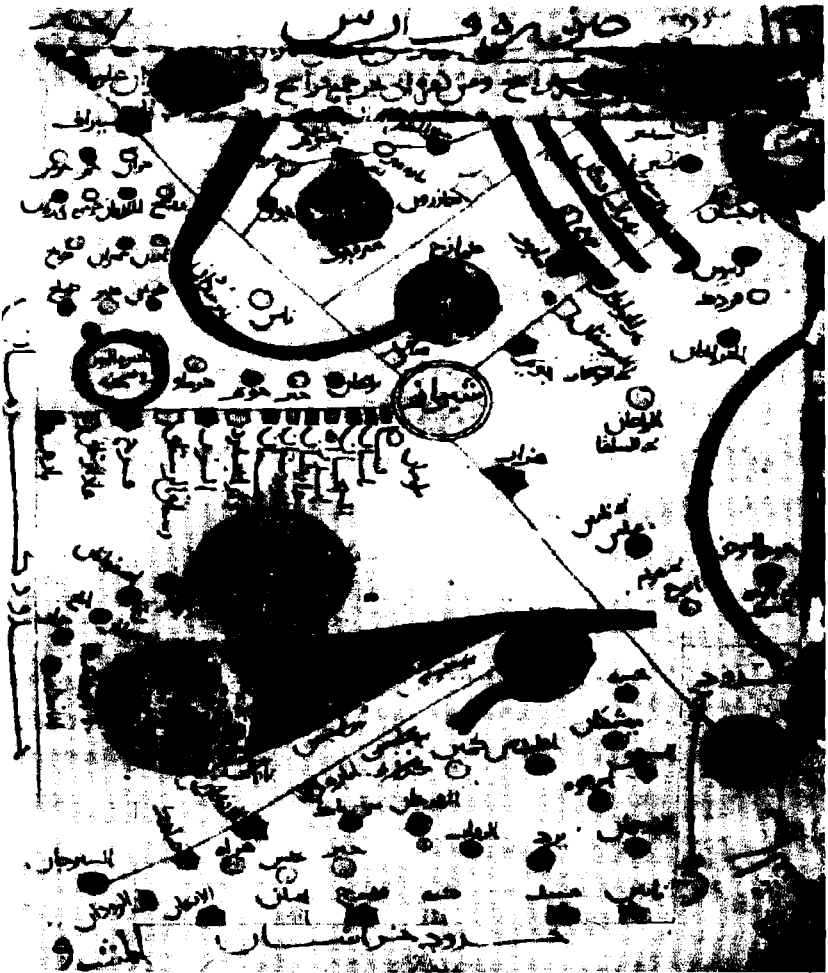
আল ইসতাখরী অঙ্কিত এ মানচিত্রে ইরানের সিরাজ নগরী। তৎসংলগ্ন শহর ও রাস্তার নির্দেশনা এতে রয়েছে।

দর্শনে মুসলমানদের দান

বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অগ্রগতির যে সকল শাখায় মুসলিম জাতির সচল ও স্বর্ণালী পদচারণা ঘটেছিলো তন্মধ্যে 'দর্শন' অন্যতম। ইসলামের যৌক্তিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা পৃথিবীর তাবৎ দর্শন চিন্তার মধ্যে অন্যতম স্থানের অধিকারী। গ্রীক দর্শনের উত্তরাধিকার এবং দর্শন চিন্তায় নতুন প্রাণের সঞ্চার -এই ছিলো এক কথায় মুসলিম দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মানুষের হাজার হাজার বছর ধরে দর্শন চিন্তার ইতিহাস থাকলেও এ চর্চা মানুষের মনের খবর নিতো না। আধ্যাত্মিক ও আত্মা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি দর্শনে উপেক্ষিত হয়েছে। Ralph Waldo Emerson তাঁর 'The Over-Soul' গ্রন্থে সত্যিই বলেছেন ঃ "The Philosophy of six thousand years has not searahed the Chambers and magazines of the soul. In its experiments there has always remained in the last analysis, a residium it could not resolve. Man is a stream whose source is hidden. Our being is descending into us from we know not whence" ছয় হাজার বছরের দর্শন মানুষের আত্মার নিভৃত কক্ষ ও গোপন প্রকোষ্ঠের সন্ধান নিতে পারেনি। দর্শনের নিরীক্ষা সত্ত্বেও চরম বিশ্লেষণে যে সমস্যা থেকে গেছে দর্শন তারও সমাধান করতে পারেনি। মানুষ এক গোপন উৎস হতে উৎসারিত স্রোত বিশেষ। আমাদের সত্তা আমাদেরই ভিতরে কোনো নিগূঢ় সূত্র হতে যে অন্তর্লীন তা অপরিজ্ঞাত।'

ইসলামের আবির্ভাব-পূর্ব আরবে দর্শন চর্চার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। কিন্তু অন্যদের অবস্থা তখন কেমন ছিলো। খৃষ্ট সমাজে দর্শন চর্চা প্রচলিত ছিলো তখন, তবে তা ছিলো রাহুগ্রস্থ। যুক্তি চর্চার এ পরিমণ্ডলে ঢুকে গিয়েছিলো অযৌক্তিক পৌত্তলিকতার সুস্পষ্ট ছাপ। ইহুদীদের পথও ছিলো একই। গৌতম বুদ্ধের বাণী নানা দার্শনিক জটিলতায় নিপিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। Prof. J.J Lane এর ভাষায় ঃ "It was not in Christendom alone that what is popularly misnamed philosophy had done its worst; the evil culminating in idolatry. The so called philosophy,

which had developed itself afresh as Spinozism, had already over powered the earlier revelations in the East. The results in the Semetic races of Central and Eastern Asia were most corrupt systems of idolatry, so that between these and Christondom, to which may be added the northen tribes of Europe, the known world in the days of Mohammad, represented one vast scene of idolatrous abominations, and we have since discorvered, the then unknown world was in the same condition... Even some of the Jewish tribes failed to escape the general contagion" 'যাকে লৌকিক ভাষায় দর্শন বলা যায়, সেই দর্শন কেবল খৃষ্ট জগতের সর্বনাশ করে পৌত্তলিকতায় রূপান্তরিত হয়নি, সেই তথাকথিত দর্শন যা নূতনভাবে স্পিনোজার মতবাদে পর্যবসিত হয়েছিলো- তা ইতোমধ্যে প্রাচ্যের সমস্ত ঐশীবাণীকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলেছিলো। ফলে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার সামীয় জাতির মধ্যে জঘন্য পৌত্তলিকতার উদ্ভব হয়েছিলো। এই সব জাতি এবং খৃষ্টজগত ও ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের সম্প্রদায়গুলি মুহাম্মদ এর সময় তৎকালীন পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা ও দুর্নীতির এক বিশাল দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো। পরবর্তীতে আমরা আরো জেনেছি যে, জগতের অন্যান্য অজ্ঞাত অঞ্চলের অবস্থাও অনুরূপ ছিলো। এমনকি ইহুদী সম্প্রদায়ও এই বিষ বাষ্পের হাত থেকে রেহাই পায়নি।'

দর্শনের মূল সূতিকাগার গ্রীক দেশের মৌলিক চিন্তাবিদগণের রচনা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে ছিলো। কোনো কোনো গ্রন্থের একটি মাত্র দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট ছিলো। দর্শন শাস্ত্রের এমন সঙ্গীন কালেই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ফলে অন্যান্য অধিবিদ্যার মতো দর্শনও রক্ষা পায়।

পবিত্র কুরআন থেকেই মুসলমানরা দর্শন চর্চার প্রেরণা লাভ করে। কুরআনে যেমন আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার কথা অসংখ্য বার উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে অনেক স্থানে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার কথাও জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে তাকদীরের অমোঘতার বাণী অন্যদিকে বলা হচ্ছে মানুষের নিজের কৃতকর্মের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথা। এভাবে যুক্তিবাদী মানুষের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়া হয়েছে। আরব দর্শনের বীজ এভাবেই অঙ্কুরিত হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিধি চিন্তা আরব দর্শনের মূলকথা।

ইসলামী দর্শনের সংক্ষেপ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভুর অভিপ্রায় ও বিধান মুতাবিক জীবন পরিচালনা করার জন্য বিশ্ব প্রকৃতির চর্চা করা।" এ প্রসঙ্গে P.K. Hitti লিখেছেন ঃ 'আরবদের কাছে দর্শন ছিলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ছেড়ে নিরূপণ সাপেক্ষ বস্তুর যথাযথরূপ বিশ্লেষণের সত্যিকার জ্ঞান।'

আরব দর্শন মদীনার স্কুলে জন্মলাভ করে। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর, মানুষ নিজের যুক্তির কী রকম ব্যবহার করে তা দিয়েই তার বিচার হবে- এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণা, নবী মুহাম্মদ (সা) নিজেই এ শিক্ষা দান করেছেন। এই ধারণা সাহাবায়ে কিরামের (রা) হাতে আরো স্পষ্টরূপ লাভ করে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনে পরিণত হয়। তারপর অব্যাহত ভাবে এই দর্শন দামেস্ক, কুফা, বসরা ও বাগদাদে উদার নৈতিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করে এবং আব্বাসীয় শাসনামলে তা উজ্জ্বল জ্যোতিঃমালা বিচ্ছুরিত করে। ইসলামে সৃষ্টি হয় একাধিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের। সুফীবাদ, মুতাযিলা মতবাদ, আশয়ারী মজহাব প্রভৃতি ইসলামের দার্শনিক চিন্তাধারার ফসল।

প্রথম যুগে হযরত আলী (রা.)কে কেন্দ্র করে মদীনার চিন্তাশীল মনীষীগণ দর্শন আলোচনা আরম্ভ করেন। [স্মর্তব্য যে, রাসূলের (সা.) যুগে এবং খুলাফা রাশেদার যুগে দর্শন সম্পর্কে স্বাধীন অনুসন্ধান, সৈয়দ আমীর আলীর মতে, স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কোনো প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া হতো না। এর কারণ অতি সহজ যে, তখন ছিলো ইসলাম ধর্মের গঠনের যুগ, বিজয়ের এবং বাস্তবায়নের যুগ] হযরত আলীর (রা.) নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর উমাইয়া শাসন শুরু হয়। এই সময় জ্ঞান চর্চার চেয়ে দেশ বিজয় কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধিতে বেশী মনোযোগ দেয়া হয়। মহানবীর (সা.) বংশধর ইমাম জাফর আল-সাদিক (রা.)-এর আবির্ভাবে মদীনায় জ্ঞান-চর্চা নতুনভাবে প্রাণ লাভ করে। আমীর আলী লিখেছেন ঃ 'তিনি পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক এবং কয়েকটি বিদেশী ভাষায় জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন আর সর্বদা খৃষ্টান, ইহুদী আর জরথুস্ত্রীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আর তাদের সাথে প্রায়ই আধ্যাত্মিক আলোচনায় লিপ্ত থাকতেন; সর্বোপরি মতামতের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার আর যুক্তিবাদী হওয়াতে তিনি মদীনার স্কুলকে এক দার্শনিক চরিত্র দান করেন।'

মুসলিম দর্শন চিন্তা আব্বাসীয় আমলে পরিণতি লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে বৃহৎ অবদান তার সময়কাল আব্বাসীয় পিরিয়ডকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ আব্বাসীয় শাসক আবু জাফর আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.), হারুন-আর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯) এবং আল মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) আমল ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো মামুনের সময়। তাঁর শাসন কালকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতি হয়েছিলো বলে ইসলামের ইতিহাসে 'অগাষ্টান যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়।

মনসুরের আমলে (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) গ্রীক, সংস্কৃত ও পাহলবী ভাষায় গ্রন্থাদি ব্যাপকভাবে আরবীতে অনুবাদ শুরু হয়। এরিষ্টটল, টলেমী, ইউক্লিড প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। মামুনের আমলে (৮১৩-৮৩৩) এই তৎপরতা বৃহদাকার ধারণ করে। গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত মামুন বিভিন্নভাবে প্রচুর প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করেন রাষ্ট্রীয় পরিপোষকতায়। 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করে তিনি অসংখ্য গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করান। তাঁর নিযুক্ত অনুবাদকদের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন- ইয়াহিয়া বিন তারিক, হুনায়ন বিন ইসহাক (৮০৯-৭৩ খৃ.), ইসহাক বিন হুনায়ন, থাবিত বিন কোরা, কুস্তা বিন লুকা (৯২৩ খৃ.) প্রমুখ।

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে স্পষ্টতই দুটি ধারা লক্ষণীয়। একটি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত, অন্যটি গ্রীক দর্শন দ্বারা। প্রথমতঃ দলে রয়েছেন হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইমাম জাফর সাদিক, রাযী, ইমাম গাজালী প্রমুখ। অন্য দলে রয়েছেন- আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, ইবনে তুফাইল প্রমুখ দার্শনিক বিজ্ঞানী। দার্শনিকদের মধ্যে আরো খ্যাতিমানরা হচ্ছেন- ইবনে বাজা, ইয়াহিয়া আন্ নাহবী, আবুল ফারাজ আল মুফাস্সির, আবু সুলায়মান আল্ সাজযী, থাবিত বিন কোরা, মুহাম্মদ আল মুকাদ্দেসী, ইউসুফ বিন মুহাম্মদ নিশাপুরী, আহমদ ইবনে সাহা আল বল্খী, হাসান ইবনে সাহল ইবনে মুহারিব আল্ কূমী, আহমদ ইবনে তাইয়িব আল্ সারাখসী, তালহা ইবনে মুহাম্মদ আল্ নফসী আবু হামিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল সাফযারী, ঈসা ইবনে আলী, আল ওয়াজীব, আহমদ ইবনে মাসকুয়া, ইয়াহিয়া ইবনে আদী আল যুমাইরী, আবুল হাসান আল আমরী অন্যতম।

মুসলমানরা গ্রীকদের কাছে চিরঋণী। আবার একথা ভুললেও চলবে না যে, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার মুসলমানদের কারণে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিলো। Emanuel Deutsch লিখেছেন- They alon of all the

Shemites came to Europe as kings. Whither the Phonecians had come as tradesmen and the Jews as fugitives or captives; came to Europe to hold up, together with these fugitives, the light of humanity,-they alon, while darkness lay around, to raise the wisdom and knowledge of Hellas from the dead, to teach philosophy, medicine, astronomy, and the golden art of song to the West as to the East, to stand at the cradle of modern scince... 'সকল সেমেটিক জাতির মধ্যে তাঁরাই (আরবরা) কেবল ইউরোপে রাজার বেশে এসেছিলেন, যেখানে ফিনিশীয়রা এসেছিলো বাণিজ্য ব্যাপদেশে এবং ইহুদীরা পলাতক অথবা বন্দী হিসাবে। তারা এই সকল পলাতকদের সাথে ইউরোপে এসে মানব জাতির সামনে আলোকবর্তিকা ধরেছিলেন; যখন চতুর্দিকে ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিলো, সেই সময় গ্রীসের জ্ঞান বিজ্ঞানকে চির বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করে উহাকে পুনরুজ্জীবন দিয়েছিলেন। তারা দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের দোলনায় দোলা দিয়েছিলেন'।

মুসলমানদের মধ্যে গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব এবং তাদের গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদের কারণে এক বড় সংখ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের হাজার বছরের অবদানকে অবলীলায় এই বলে মুছে দিতে চান যে, আরব জাতি সব কিছুই গ্রীকদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রীক সভ্যতাই তারা জগতকে দান করেছেন। Draper, Lenpool প্রমুখ এসকল অভিযোগ অমূলক এবং একেবারে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছেন অবশ্য। জাষ্টিলিয়ানের শাসনকালের শুরু থেকেই গ্রীক দর্শন নেষ্টোরিয়ানদের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। কিন্তু মুসলিম দার্শনিকগণ এই গ্রীক দর্শন ও চিন্তাধারার বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করা পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ইহা কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রখ্যাত গবেষক এম আকবর আলী লিখেছেন ঃ 'গ্রীক বিজ্ঞানের নাম গন্ধও যখন বিলুপ্ত প্রায়, তখনই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব ও পূর্বেকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বিজ্ঞান জগতে বিধাতার এক আশীর্বাদই বলতে হবে। মুসলমানদের পূর্বে বিজ্ঞান ছিলো অন্ধকারে নিমজ্জমান প্রায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনেকগুলিই অধুনা লুপ্ত।... আরবী অনুবাদগুলিই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র

সাক্ষ্য। মোটকথা, গ্রীক বিজ্ঞানের এতো উন্নতির সাক্ষ্য হিসাবে রয়েছে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অনুবাদ কার্য এবং তারই উপর নির্ভর করে ইউরোপের বর্তমান বৈজ্ঞানিক অভিযান।'

মুসলিম খ্যাতিমান দার্শনিকদের নাম আলোচনায় যাঁর নাম আগে আসে তিনি আবু ইয়াকুব ইসহাক আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩ খৃ.)। খলীফা মামুনের দরবারে এরিষ্টটল গ্রন্থের অনুবাদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর পিতা কুফার শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ এবং গ্রীকসহ বিদেশী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত হন। রাষ্ট্রীয় অনুবাদক হিসাবে নিযুক্তি লাভের পর তিনি 'Theology of Aristotle' (এরিষ্টটলের ধর্মতত্ত্ব) অনুবাদ করেন। অনেক ভাষা ও বিচিত্র বিষয়ে পণ্ডিত কিন্দি প্রথম আরব দার্শনিক, যিনি এরিষ্টটল দ্বারা আমূল প্রভাবিত ছিলেন। চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ এমনকি রাজস্ব প্রশাসক হিসাবেও তিনি রাজ দরবারে কাজ করেন। এ অসাধারণ প্রতিভা গণিতবিদ, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। মাতৃভাষা আরবী ছাড়াও পাহলবী, সংস্কৃত, গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, 'ষোড়শ শতক পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রথম বার জনের মধ্যে আল্ কিন্দি অন্যতম।' তিনি অনধিক ৩৬৯টি গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন। কোনো কোনো গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ এখনো প্রচলিত আছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে Analytica Categories, Apology of Aristotle, Almagistia of Ptolony, The Elements of Euclid, Theology of Aristotle FmÄ History of Aristotle অন্যতম। আল্লামা শিবলী লিখেন, কিন্দি গ্রীক দার্শনিকদের ভুল ভ্রান্তি নির্দেশ করে কিছু গ্রন্থ্ লিখেছেন। তর্কশাস্ত্রের উপর তাঁর লেখাগুলো অনেকদিন ধরে মুসলিম জাহানে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিলো। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হাসনুভিয়া, নফতুবিয়া, সালমুভিয়া, আহমদ ইবনু তায়্যেব প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

দর্শন চর্চার প্রথম দিকেই আল কিন্দি গ্রীক দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো, গ্রীক দর্শনের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য বিধান। তাই কুরআন, এরিষ্টটলীয় দর্শন, নিও প্লেটোনিকবাদ এবং নিও পেথাগোরীয়ানিজম ছিলো তাঁর দার্শনিক আলোচনার মূল ভিত্তি। তিনি গণিত শাস্ত্রকে দর্শনের 'ভূমিকাস্বরূপ' গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ বৈপ্লবিক মতবাদ সম্পর্কে এম. এন. রায় লিখেন ঃ 'এ তাঁরই শিক্ষা যে, দর্শনকে দাঁড়াতে হবে গণিত শাস্ত্রের উপর ভিত লাভ

করে, অর্থাৎ মনগড়া কল্পনা হলে চলবে না। মানুষের মনন প্রণালীকে ফলপ্রসূ হতে হলে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও বাস্তব ঘটনাবলী সমর্থিত যে সূক্ষ্ম যৌক্তিকতা, তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। আল্ কিন্দির প্রশংসা না করে পারা যায় না, কারণ আধুনিক দার্শনিক ফ্রন্সিস বেকন আর ডেকার্ডের সাত'শ বছর আগে এসে তিনি যেভাবে এই মতবাদ প্রচার করে গেলেন তাতে যেনো এদেঁরই কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠে।'

দর্শনের অনেক সমস্যা উপস্থাপন করে আল্ কিন্দি আরবীয় চিন্তাধারাকে দর্শনের দিকে চালিত করেন। এরিষ্টটলকে তিনিই প্রথম মুসলিম জাহানে পরিচিত করান। ইসলামের দার্শনিক মতবাদ তথা 'ফালাসিফা'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তিনি। মুসলিম দার্শনিকদের পথ প্রদর্শক আল কিন্দির দার্শনিক চিন্তাধারা Thomas Aquinas-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরবর্তী সকল পর্যায় এবং ধর্মতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিলো। Roger Bacon এবং Cardanus তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

আল কিন্দির দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে অন্যতম হলো, পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। কিন্তু আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় নন। তিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে কাজ করেন। তাঁর সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। বস্তুর প্রকৃতি ও আল্লাহ এই দুয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইহার অবস্থান। এই 'মনীষা' হতেই মানবাত্মার সৃষ্টি। মানবাত্মা যদিও দেহের সাথে যুক্ত কিন্তু ইহার অস্তিত্ব দেহ নিরপেক্ষ। কিন্দির মতে, মানবাত্মা চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হলো-

১. Potential Intelligence (প্রচ্ছন্ন বুদ্ধি)

২. Active Intelligence (সক্রিয় বুদ্ধি)

৩. Acquired Intelligence (সংগৃহীত জ্ঞান)

৪. Agent Intellect (জ্ঞানের শক্তি)

এদের প্রথম তিনটি মানবাত্মার অপরিহার্য অংশ এবং শেষেরটি বহির্জগত হতে মানবাত্মায় প্রবেশ করে। এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর নিকট থেকে ইহা মানবদেহে প্রবেশ করে। জ্ঞানের শক্তি মানুষের দেহে ক্রিয়াশীল হলেও ইহা দেহ হতে স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। আত্মার সক্রিয় ও নিষ্ক্রীয় মনীষা সম্পর্কে এই হলো আলকিন্দির মতবাদ।

কিন্দি যুক্তিকে জ্ঞানের উৎস মনে করলেও 'ওহীর' সত্যে বিশ্বাস করতেন। যুক্তি ও ওহী পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক-এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি উভয় বিষয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ সম্পর্কে তিনি

নিও প্লেটোনিক মতবাদের অনুসারী। আল্লাহ্ সবকিছু করেন, তিনি নিজেই সব কারণের কর্তা। কাজেই যুক্তির উচিত সব কিছুর মূলে যে আল্লাহ, তাকে স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ্ নিজের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীতে দূত পাঠান। মোটকথা আল্লাহ্ সবকিছুর প্রথম ও চূড়ান্ত কারণ-এটাই কিন্দির সমর্থিত মতবাদ।

আল-কিন্দির উত্তরাধিকার হিসাবে যিনি পরবর্তী শতকে মুসলিম দর্শনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন তিনি হলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত ট্রান্স অক্সিয়ানার 'ফারাব' নামক জায়গায় জন্মগ্রহণকারী আবু নসর আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খৃ.)। বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় তাঁর সমান পদচারণা ছিলো। পদার্থবিদ, গণিতবিদ, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন বিশ্বের প্রায় সবগুলো ভাষাই তিনি জানতেন। প্রায় ৭০টি ভাষায় তাঁর দখল ছিলো। সুদীর্ঘ ৪০ বছর তিনি বাগদাদ এবং দামেস্কে অধ্যাপনা করেন। দামেস্কে খলীফা মুয়াবিয়ার (রা.) পাশেই তাঁর সমাধি রয়েছে।

এরিষ্টটলের ভাষ্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে ধী-শক্তিসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আল ফারাবীর পরিচয়। তাঁর রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ৫০ টি গ্রন্থ্ এরিষ্টটলের টীকা ভাষ্যের উপর রচিত। এরিষ্টটলের যুক্তিবাদকে তিনি পুনরুদ্ধার করে নিজস্ব মন্তব্য দান করেন এবং ইসলামী মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এ গুলির প্রয়োগ করেন। তিনি ইসলামের সাথে এরিষ্টটল ও প্লেটোর দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যায় অগাধ অধিকারের জন্য ফারাবীকে 'দ্বিতীয় এরিষ্টটল' (Second Aristotle) নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচিত বিশ্বকোষ Encyclopaedia of Science (এহইয়া উল উলূম)-এ সমস্ত বিজ্ঞানের উপর আলোচনা রয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত এরিষ্টটলের 'Organon' এর ভাষ্য রজার বেকন এবং আলবার্টাস মেগনাম কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য বহু শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে সাদরে গৃহীত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিদ আল-ফারাবী ছিলেন মুসলিম যুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর যুক্তিবিদ্যা কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাই বিশ্লেষণ ছিলোনা, এতে ব্যাকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য এবং Theory of Knowledge সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ফারাবীর মতে, যুক্তিবিদ্যা এমন একটি বিষয়, যা জানা জ্ঞান হতে অজানা জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়। যুক্তিবিদ্যা নির্ভুল ধারণা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, গোপন বাস্তবতাকে উন্মোচন করে, সন্দেহ নিরসন করে এবং কোনো একটি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করে।

আল ফারাবী একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। তিনি কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, প্রচলিত দার্শনিক মতাদর্শে কুরআনের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে, সকল বিজ্ঞানই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের সাহায্যেই আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারি। যুক্তিবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে দর্শন চর্চা এবং যুক্তিবাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে জানাই দর্শনের লক্ষ্য। আল্লাহ্ সম্বন্ধে ফারাবীর ধারণা হলো-আল্লাহ্ এক অপরিহার্য সত্তা। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। তিনি সংজ্ঞা বহির্ভূত এবং অতুলনীয়। তিনি দয়ালু, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, সকল জ্ঞানের আধার। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য দুই-ই, কখনো আমাদের জ্ঞানের বাইরে আবার কখনো জ্ঞান দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায়। কিন্তু যুক্তিসম্মত দৃষ্টির অভাবে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারিনা। সৃষ্টিশীল জ্ঞান দ্বারাই আমরা আল্লাহ্‌কে জানতে পারি। আল্লাহ্ সম্পর্কে জানাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। আল্লাহ্‌কে জানা-ই দর্শনের লক্ষ্য। যেহেতু তিনিই সকল কিছুর কারণ, তাই তাঁকে উপলব্ধি ও জানতে পারলেই সবকিছু জানা ও ব্যাখ্যা করা যায়।

ফারাবী একজন শ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন। সুফী দর্শন সম্পর্কে তিনি বলেন, পার্থিব বস্তু এবং এ সকল বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের বাইরেও আর একটি বিশেষ বিষয় আছে যা প্রেম এবং যার মাধ্যমে মানুষ ও সকল প্রাণীই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। আল্লাহ নিজেই প্রেমের আধার এবং এই প্রেম হতেই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা। যে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য উদগ্রীব সে-ই প্রেমিক এবং এই প্রেম মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্মিলন ঘটায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ফারাবীর মতবাদ খুবই রুচিসম্মত। তিনি বলেন, একমাত্র রাষ্ট্রেই নৈতিকতা পূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং রাষ্ট্রের ভালোমন্দ শাসকের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র কেবল এই জগতেই নয় ভবিষ্যতেও মানব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।' প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ফারাবীর প্রভাব পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের প্রভাবিত করে।

বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ ইবনে মিসকাওয়াহ (মৃ. ১০৩০ খৃ.) মানবাত্মারস্বরূপ বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। প্রথমেই তিনি মানবাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে, মানবাত্মা এমনই এক সত্ত্বা যা ইন্দ্রিয়িক (Sensible) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual) সত্তার ধারণাবলীকে জড়ীয় আকারবিহীন হিসাবেই জানতে পারে। আত্মার এ স্বরূপের কারণেই আত্মার জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা।

প্লেটোর মতো ইবনে মিসকাওয়াহ্ মনে করেন, আত্মা তিনটি পৃথক অংশের সমবায়ে গঠিত। তাহলো প্রজ্ঞাংশ (rational), অন্নাংশ (appetitive) এবং বীর্যাংশ (passionate part)-এর প্রথমটি মস্তিষ্কে, দ্বিতীয়টি যকৃত আর তৃতীয় অংশটি হৃদপিণ্ডে অবস্থিত। এই তিনটির দ্বারা অর্জিত সদ্‌গুণের সমন্বয় থেকেই ন্যায়পরায়ণতার (Justice) উদ্ভব ঘটে।

আবু আলী হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭) শুধু ইসলাম নয় পৃথিবীর ইতিহাসেও একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, জ্যামিতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে তিনি বেশী সুপরিচিত। ইউরোপে Avicen নামে পরিচিত তিনি বুখারার কাছেই আফসানা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই দর্শন, জ্যামিতি, ধর্মতত্ত্ব, আইন ও চিকিৎসা বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র সতের বছর বয়সেই সামানীয় সুলতান নিজের চিকিৎসক হিসাবে ইবনে সীনাকে ডেকে পাঠান। নিজের ভাগ্য এবং নিয়তির তালাশে তিনি বহু জনপদে ও রাজদরবারে চাকুরী করেন। ১০৩৭ সালে এই মহান দার্শনিক বিজ্ঞানী হামাদানে ইন্তিকাল করেন।

যে দর্শন কিন্দি ও ফারাবীর হাতে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয় তা ইবনে সীনার হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঐতিহাসিক রেজা-ই করীম লিখেন ঃ 'গ্রীক দর্শনের সহিত ইসলামের সমন্বয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত আরব-দার্শনিক আল কিন্দি, এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন তুর্কি দার্শনিক আল-ফারাবী এবং ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করে পারসীয় দার্শনিক ইবনে সীনার হাতে।'

আল ফারাবীর দার্শনিক শিষ্য ইবনে সীনা খ্যাতিমান এরিষ্টটল প্রভাবিত শেষ দার্শনিক ছিলেন। তাঁর 'কিতাব আল সিফা' ১৮ খণ্ডে বিভক্ত এক বৃহৎ দর্শন বিশ্বকোষ, মধ্যযুগে এটি ইউরোপে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হতো। মুসলিম বিশ্বে আজও এটি এক মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদায় অভিষিক্ত। 'নাজাত' 'দানেশনামা' তাঁর অন্যান্য দর্শন গ্রন্থের অন্যতম। 'লিফা' এবং 'নাজাত' গ্রন্থদ্বয় এখনো অক্ষত আছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা প্রায় ১২৫টি।

ইবনে সীনা প্রাচীন মতবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে নতুনভাবে সাজিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিলো, দর্শন ধর্ম হতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। দর্শনের কাজ যুক্তির সাথে ঈমানের সমন্বয় সাধন নয়; যুক্তির সাহায্যে জীবনের সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা করা। তাঁর পরবর্তী সকল দার্শনিকই এই মতবাদের অনুসারী ছিলেন।

ইবনে সীনার মতে, আল্লাহ অপরিহার্য সত্তা। তিনি কাল, সীমা ও গতির

ঊর্ধ্বে। তিনি আত্মার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ The Healing মনস্তত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের উদ্ভব। ইবনে সীনার চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন দেহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তেমনি তাঁর দর্শন আবর্তিত হতে দেখা যায় আত্মাকে কেন্দ্র করে।

তিনি ছিলেন দেহ মনে একনিষ্ঠ দ্বৈতবাদী (dualist) দার্শনিক। তাঁর মতে, দেহের সাথে আত্মার কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নাই। নক্ষত্ররাজির প্রভাবে এবং আদিম উপাদানসমূহের যৌথ সংযোগ দ্বারা দেহ গঠিত। নিতান্ত আপতিকভাবে (accedentaly)-ই আত্মা দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়; আর এ কারণেই দেহের সাথে তার সম্পর্ককে অনিবার্য বা আবশ্যিক অবহিত করা যায়না। এই চিন্তা ধারার কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে আকস্মিকবাদী দার্শনিক হিসাবে ভূষিত করেছেন। তিনি আত্মার বিকাশের জন্য তিনটি পৃথক স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ

১. উদ্ভিদ আত্মা (vegetable soul)

২. জীবাত্মা (animal soul)

৩. এবং মানবাত্মা (human soul)

মানব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্লেটোর দর্শন যা আরব দার্শনিকরা গ্রহণ করেছিলেন ইবনে সীনা তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। প্লেটোর সূত্র-আত্মা গোড়ার দিকে সর্বোত্তম সত্তার নৈকট্যে উচ্চস্তরে বিদ্যমান ছিলো। অন্যায় করার ফলে তা পৃথিবীতে পতিত হয়ে পাপের শাস্তিস্বরূপ জড় দেহের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু ইবনে সীনার মতে, আত্মাসমূহ অনন্তকাল হতেই তৈরী হয়ে আছে।' মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তিনি ইসলামী মতই অনুসরণ করেন।

এরিষ্টটলীয় দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্বজগত সম্পর্কীয় প্রশ্নে গ্রীক দর্শনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেখানে গ্রীক দর্শন বলে যে, জগত চিরন্তন, কিন্তু ইহার গতিধারা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ইবনে সীনার মতে, এই বিশ্ব অনন্ত এবং তার আদি কারণ আল্লাহর সৃষ্টি। ডারউইনের অনেক আগেই তিনি বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা দেন। ইবনে সীনার মতে, প্রস্তর->উদ্ভিদ-> প্রাণী-> মানুষ-> এই হলো বিবর্তনের পর্যায়। এ ছাড়া সম্পূর্ণ কোনো পর্যায় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

ইবনে সীনাকে বলা হতো 'দার্শনিকদের যুবরাজ'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু শতাব্দী যাবত তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিলো। পাশ্চাত্যে জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant), রজার বেকন (Roger Bacon), স্পিনিজা (Spinoza) এবং টমাস

(St. Thomas) প্রমুখকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। মুসলিম জাহানে তাঁর মতো প্রতিভা খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন ঃ "নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন, আর গোঁড়ামী ও আত্মস্বার্থবাদ যদি ও তাঁর বিরোধিতা করেছিলো, তবুও তিনি তাঁর পরবর্তী যুগের চিন্তার উপর অক্ষয় চিহ্ন রেখে গেছেন।... তিনি এরিষ্টটলের দর্শনকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করেন, আর এরিষ্টটলের অসম্পূর্ণ মনস্তত্বে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যেকার শূন্যতাকে তিনি পূরণ করেন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ মহাশূন্যের জ্ঞান বিষয়ক মতবাদ দ্বারা। আরবীয় দার্শনিকদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্বনিখিলের একত্ব সম্পর্কে পৃথিবীকে এমনএকটি কল্পনা দান করা। যা কেবল মনকেই নয়, ধর্মীয় বোধকেও সন্তুষ্ট করবে।'

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাজালী (১০৫৮-১১১১ খৃ.) মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ দার্শনিক। ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তিনি। এই মৌলিক চিন্তাবিদ পারস্যের 'তুস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জুরজান, নিশাপুর, হারামাইন শরীফ, প্রভৃতি স্থানে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি সেলজুক তুর্কীর গুণী মন্ত্রী নিযামুল মুলকের অনুরোধে নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। বিশ্বের বহু প্রাণকেন্দ্র তিনি পরিদর্শন করেন। জীবদ্দশাতেই অপরিসীম খ্যাতি ও গুণপনার অধিকারী এই মহান দার্শনিক মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। চারশ' অধিক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা, এখনো পর্যন্ত বহু ভাষায় তাঁর গ্রন্থসমূহের বহু সংস্করণ হচ্ছে।

অন্য কোনো মতবাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলাম ধর্মকে বিজ্ঞান ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনিই প্রথম উপস্থাপন করেন। এই সম্পর্কে তাঁর প্রধান রচনা 'এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন' (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন), কিমিয়ায়ে সা'আদত, তাহাফাত্ উল্ ফালসিয়া, অন্যতম। জইনউদ্দীন ইরাকীর মতে, 'এহইয়ায়ে উলূম' মুসলিম জাহানে শ্রেষ্ঠ রচনা। নথবী বলেন, কুরআনের প্রায় পরবর্তী স্থানই এই 'এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীনের'।

আল গাজালী মনে করতেন, ওহীর মাধ্যমেই কেবল সত্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তিনি প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, দার্শনিক মতবাদ ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তি হতে পারেনা। কুরআন সুন্নাহর বাইরের যে জ্ঞান তা পরিত্যাজ্য। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় এই নতুন মতবাদ সমসাময়িক অনেকের কাছে গোঁড়া মনে হলেও এটা স্বীকার্য যে, তাঁর বিরাট শক্তিশালী কলম গ্রীক দর্শনের প্রভাব থেকে ইসলামকে মুক্তি দিয়েছে।

'তাহাফাত উল ফালাসিফা' গ্রন্থে গাজালী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কিছু মতামতকে দার্শনিক পদ্ধতিতে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকদের প্রতি তিনি বলেন যে, যুক্তি দ্বারা অনিবার্য বাস্তবতাকে (আল্লাহ) বিচার করা যায় না। গাজালীর মতে, এরিষ্টটল মতবাদ তথা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত মতবাদকে ভিত্তি করে বিশ্বাসীদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। এই মতবাদ খণ্ডনের পূর্বে তিনি বিশদ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর মতে, গণিতের প্রয়োগ ইহার নিজস্ব সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা হলে তা সঠিক জ্ঞান দিতে ব্যর্থ হবে। দার্শনিকদের অধিবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলো বিশ্বের চিরন্তনতা সম্পর্কে কোনো মতবাদ তিনি গ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁদের নৈতিক ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন। এরিষ্টটলীয় যুক্তি পদ্ধতিকে তিনি (logical method) গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, বিশ্ব সসীম ও অসীম দুই'ই হতে পারে না। সময় অনন্ত হলে পরিধিও অনন্ত হবে।

গাজালীর মতে, জ্ঞানকে যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতায় পথে পাওয়া না যায় আর যদি তাকে অখণ্ডনীয় নিয়ম দিয়ে বাঁধা না যায়, তাহলে সে জ্ঞান কখনও গাণিতিক সম্পূর্ণতা লাভ করে না। তাঁর ধারণা সন্দেহাতীত প্রত্যয় লাভ করা যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sense-preception) এবং বাধ্যতামূলক সত্য (necessary truth) তথা হেতুবাদের সাহায্যে। গাজালীর হেতুবাদ বা কারণতত্ত্ব (Causality) তাঁর সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রগামী ছিলো। এম. এন. রায় লিখেন ঃ গাজালীর মতবাদ ছিলো তাঁর সময়ের বহু অগ্রবর্তী। প্রয়োগ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যেরূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন তা কখনো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। যান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে কিংবা তার শৈশব অবস্থার জন্যে বস্তুর প্রকৃতিকে অংক শাস্ত্রের মতো নির্ভুল করে জানতে পারা যায়নি। অথচ দার্শনিকেরা তাই চেয়েছিলেন। ...বাস্তব উপকরণের অভাবে এই আরব চিন্তা নায়কের নভোচারী মনের বলিষ্ঠ পক্ষপুটকে ছেঁটে খাট করে দিলো, অন্যদিকে শ্রেণী স্বার্থের প্রতি মানুষের অনুরাগ কান্টের প্রমাণ অভিসারী (critical) প্রতিভাকে করলো অভিভূত।"

আধুনিক সংশয়বাদের জন্মদাতা Hume-এর সাতশত বছর আগেই তিনি হেতুবাদকে অগ্রাহ্য করেন। ফরাসী ভাব বিশারদ রেনাঁন (Renan) বলতেন, হিউমের সাতশ' বছর পূর্বেই এই দার্শনিকের কথার উপর তিনি একটিও নতুন কথা বলতে পারেননি। গাজালী বলেন ঃ কার্যকারণ ঘটনার নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর ইচ্ছাই সবকিছুর একমাত্র কারণ। তিনি একটি হতে আরেকটিতে রূপান্তরিত করেন না। তিনি হয় সৃষ্টি করেন নয় ধ্বংস করেন।

সাধারণ দার্শনিক মতবাদ হলো আত্মা অমর। কিন্তু গাজালী বলেন দেহ ও আত্মা দুই-ই অমর। জন্মের সময় যদি দেহ ও আত্মার সংযোগ হয় তবে উহা সম্ভব যে, শেষ বিচারের দিন আত্মা ও নূতন দেহের পুনর্মিলন হবে। প্রত্যেক আত্মাই তার উপযোগী দেহ লাভ করবে। তিনি সূফী দর্শন নিয়েও আলোকপাত করেন।

মিঃ ডানকান ম্যাকডোনাল্ড (Mecdonald) গাজালীর প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'গাজালী যুক্তি ও ভক্তির সংমিশ্রণে বাস্তবভিত্তিক ইসলামিক জীবনবোধের দিকে মুসলমানদের আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে সূফীবাদ সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। যুক্তির দুর্বোধ্যতা দূর করে তিনি দর্শনকে সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন। গ্রীক দর্শনের প্রভাবমুক্ত করে ইসলামী ভাবধারা পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে উদঘাটন করেন এবং এসব কারণেই তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' তথা ইসলামী চিন্তাধারায় অকাট্য দলীল উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে ইমাম গাজালীর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Sadia Gaon (882-942) হতে Mimonides পর্যন্ত সকল ইহুদী দার্শনিক, Jahuda Halvi (B-1086), Hasdai Crescas (1340-1410), Raymunt Martin (B-1285) প্রমুখের উপর গাজালীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। স্পেনিশ চিন্তাবিদ Miguel Asin Palacious তাঁর গ্রন্থ 'La Espiritualidad Da Al-Gazel su Simtido Eristiano' শীর্ষক গ্রন্থে পাশ্চাত্যে গাজালীর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের খৃষ্টান চিন্তাবিদ সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) গাজালীর দর্শন দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'Summa Gentiles' এবং 'Summa Thelogica' গ্রন্থদ্বয়ে, দার্শনিক ডেকার্তের Discours le Method' গ্রন্থে ফরাসী দার্শনিক ব্রেইজ পাসকেল (১৬২৩-১৬৬২) হিউম, লাইবনিজ, দান্তে প্রমুখ গাজালীর দর্শনের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। আর প্রাচ্যে সেই আল্লামা রুমী হতে ইকবাল পর্যন্ত অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। শেখ সাদী, সিরাজী, হাফিজ, ফরিদুদ্দীন আত্তার, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মওদূদী প্রমুখ চিন্তাবিদ এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। গাজালীর সমালোচকদের মধ্যে তারতুসী (মৃ.১১২৬), আল মাজারী (১১৪১ খৃ.) ইবনে জাওযী (১২০০ খ.), ইবনে তাইমিয়া (১৩২৮ খৃ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া (মৃ. ১১৩০ খৃ.)। ইবনে সীনার মৃত্যুর পর দর্শন চর্চা প্রায় লুপ্ত হলে এই বহুমুখী

প্রতিভার অধিকারী দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অনেকগুলো রচনার মধ্যে 'তাদবীরুল মুয়াহিদ' নামক দর্শন গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত হিব্রু সংস্করণ পাওয়া গেছে। ইবনে বাজ্জা নামে তিনি সমধিক খ্যাতিমান।

ইবনে বাজ্জার শিষ্য আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক বিন তোফায়েল আল কায়সী (মৃ. ১১৮৫ খৃ.) গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসক, গাণিতিক ও কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। গ্রানাডার মুয়াহিদ বংশের রাজসভায় সভ্য ছিলেন ইবনে তোফায়েল। মরমী ভাবধারা ছিলো তাঁর দর্শন চিন্তার বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে, যিকরে মত্ততা (ecstasy) হচ্ছে সত্য জ্ঞান লাভের একটি উপায়। তাঁর হাই-বিন ইয়াকজান' একটি মৌলিক দার্শনিক কাহিনী। এই গ্রন্থের ভাবধারা রহস্যবাদী। এতে বাইরের শিক্ষার সাহায্য ছাড়াও মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও বোধ শক্তির ক্রমবিকাশের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। ইবনে বাজ্জা ও জাবির যখন টলেমীর নানা ভ্রান্ত মতের সংশোধন শুরু করেছিলেন তখন তিনি তাতে সহায়তা করেন।

মধ্যযুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে শতাব্দীর পর শতাব্দী আলো বিতরণ করেছেন প্রখ্যাত দার্শনিক, আইনবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৯)। ইউরোপে তিনি Averroes নামে সুপরিচিত। কর্ডোবার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৫৯ হতে ১১৭০ খৃ. পর্যন্ত সেভিল এবং ১১৮২ খৃ. পর্যন্ত কর্ডোভার কাজীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। সম্রাট ইয়াকুব আল মনসুরের এক সময় সমাদর লাভ করেন। নিজের দার্শনিক মতবাদের কারণে গোঁড়া মুসলিম, খৃষ্টান ও ইহুদীদের চাপের মুখে সম্রাট 'ইলিসানা' নামক স্থানে নির্বাসন দেন তাঁকে। তাঁর দর্শন গ্রন্থ সমূহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় তারপর বেশীদিন আর তিনি বাঁচেননি। সে বছরই মৃত্যু বরণ করেন।

ইবনে রুশদ্ আরব জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা নায়কদের অন্যতম এবং পৃথিবীর যে কোনো বিখ্যাত দার্শনিকদের সাথে তাঁর তুলনা হতে পারে। এরিষ্টটলের যে ভাষ্য তিনি করেন তা ছিলো সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত ও সুগভীর। আল গাজালীর 'তুহফাতুল ফালসিফা' এর জবাবে তিনি 'তুহফাতুত্ তাহাফুত' লিখেন। তাঁর রচিত ৬৭টি গ্রন্থের মধ্যে ২৮টি ছিলো দর্শন বিষয়ক। তিনি 'কিতাবুল ফালাসিফাহ' এবং 'ফাসনুল্ মাকালী ফি মুয়াফিকাতিল্ হিকমত্ ওয়াশ্শারীয়াহ' গ্রন্থে ব্যাপকভাবে তদীয় উপপাদ্যসমূহ আলোচনা করেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর ব্যাখ্যা,

ফারাবীর যুক্তিশাস্ত্রের সমালোচনা, ইবনে সীনার সূত্রের আলোচনা গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইবনে রুশদের মতে, দর্শন ও প্রত্যাদিষ্ঠ ধর্ম উভয়ই চিরন্তন সত্য প্রচার করে এবং দর্শন ও কুরআনে বিবৃত সত্যের বিরোধিতা অচিন্তনীয়। আমীর আলী উল্লেখ করেন, তিনি মনে করতেন যে, মানব জাতির মধ্যে ধর্ম ও দর্শন কর্তৃক বিঘোষিত চিরন্তন সত্যগুলিকে প্রচার করার জন্য নবীসুলভ ওহীর প্রয়োজন আছে; ধর্ম নিজেই চিরন্তন সত্যগুলিকে বিজ্ঞানের দ্বারা অন্বেষণের কাজ পরিচালনা করে, ধর্ম মানুষের সাধারণের বোধগম্য উপায়ে সত্য-শিক্ষা দান করে, কেবল দর্শন শাস্ত্রই ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্যিকার ধর্মমতকে চিনে বের করতে সক্ষম; কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা কেবল আক্ষরিক অর্থই বুঝতে পারে। নিয়তির প্রশ্নে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার কর্মের সর্বেসর্বা কর্তাও নয়, আবার এক অপরিবর্তনীয় পূর্ব-নির্দেশ দ্বারাও আবদ্ধ নয়।"

ইবনে রুশদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিলো সব রকমের মানবিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করতেন, খোলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থাই আদর্শ শাসন ব্যবস্থা, যাতে প্লেটোর স্বপ্ন রূপ লাভ করেছিলো। যিনি যুদ্ধ, দর্শন আর বিজ্ঞানে নারী জাতিকে পুরুষদের সমান মনে করতেন। তিনি দাবী করেছেন পুরুষদের মতো সমান মর্যাদা, একই শিক্ষা দিলে নারীরা যে কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হতে পারে। এই দাবীর সমর্থনে তিনি সঙ্গীতে নারীদের প্রাধান্য উল্লেখ করেছেন।

জগতের চিরন্তনতা, খোদায়ী সত্তার উপলব্ধির প্রকৃতি, আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তির সর্বজনীনতা ও পুনর্জাগরণের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতবাদ গোঁড়া ধার্মিকদের সাথে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তিনি আন্তরিকভাবেই ইসলামের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আধুনিক জীবনীকার E. Renan তদীয় 'Averroes et Averroism' গ্রন্থে লিখেন ঃ There is nothing to prevent our supposing that Ibn-Rushd was a sincere believer in Islam, especially when we consider how little irrational and super natural element in the essential dogmas of this religion is and how closely this religion approaches the purest Deism" ইবনে রুশদ আন্তরিকভাবেই ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন। এরকম মনে করার বিরুদ্ধে কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে আমরা যখন বিবেচনা করি যে, এই ধর্মের অপরিহার্য বিশ্বাসের বস্তুগুলির ভিতরকার অতিপ্রাকৃত

উপাদানগুলি কতোই সামান্য আর এ ধর্ম অত্যন্ত, বিশুদ্ধ একত্ববাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।'

দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ হিসাবে স্পেনের আবু ইমরান মূসা ইবনে মায়মুন (১১৩৫-১২০৪ খৃ.) বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁর 'দালালাত্ উল্ হাইরীন' গ্রন্থে মুসলিম প্রভাবিত এরিষ্টটলের মতবাদের সাথে ইহুদী ধর্ম শাস্ত্রের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। হিব্রু ও ল্যাটিন অনুবাদে তাঁর গ্রন্থাবলী ইহুদী ও খৃষ্টান গুণীদের প্রভাবিত করেছিলো।

সূফীবাদ ইসলামের মরমী দর্শনরূপে পরিচিত। মহানবীর (সা) ইন্তিকালের দুইশত বছরের মধ্যে 'সূফী' শব্দটি প্রচলিত হয়। প্রথমদিকে দার্শনিক তত্ত্ব, আল্লাহ তত্ত্ব, আত্মা বা আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো উদ্দেশ্য বলতে 'সূফী' বোঝাতো না। কিন্তু পরে আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম, ভালোবাসা ও ভক্তিকে সূফীবাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাপসী রাবেয়া বসরী (৭১৩-৮০১ খৃ.) প্রথম হতে এ ধারণার সূত্রপাত। মিসরের প্রখ্যাত সূফী যুন্নুন (মৃ. ৮৬০ খৃ.) প্রথম সূফীবাদকে বিধিবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেন। তারপর বায়েজিদ বোস্তামী (মৃ. ৮৭৫ খৃ.) মনসুর হল্লাজ (৮৫৪-৯২২ খৃ.) প্রমুখ এই মতোবাদের কঠোর সমর্থক ছিলেন। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় সূফী দর্শনকে বহুদিন মুসলমান আলেমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ইমাম গাজালী (মৃ. ১১১১ খৃ.) এই মতবাদকে পরিশীলিত ও সুসংবদ্ধ করার আগ পর্যন্ত সূফীবাদ ইসলামী সমাজে অস্পষ্ট সম্পর্ক দর্শন ছিলো। তাঁর আলোচনা এবং অনুসরণে তা বৈধতা পায়। তবে সূফী মতবাদকে যিনি সর্ববাদী ভিত্তি প্রদান করেন তিনি হলেন স্পেনের প্রখ্যাত যুক্তিবাদী সূফী ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪৩ খৃ.)। তার জীবনীকার লিখেন ঃ 'ইবনুল আরাবী সূফী মতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।'

ইবনুল আরাবীর দার্শনিক মতবাদের মূল বিষয় হলো- (১) ওয়াহ্দাতুল ওজুদ তত্ত্ব (২) লগস্ বা প্রজ্ঞাতত্ত্ব (৩) জ্ঞানতত্ত্ব এবং (৪) ধর্মতত্ত্ব।

মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল ফতুহাতুল মক্কীয়া' সুবৃহৎ ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, এই গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরই তিনি অলৌকিকভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন। 'ফুসুস্ উল হিকাম' তাঁর অবশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ। আরবীর সমগ্র ও দার্শনিক চিন্তায় মূল কথা হলো 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ'-যার অর্থ সত্তার ঐক্য। ঐক্যনীতি, অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মূল সত্তা হচ্ছে আল্লাহ। তিনিই একমাত্র পরম সত্তা, যিনি বিশ্ব মাঝে ব্যাপ্ত আছেন। বিশ্বজগত তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ মাত্র।'

'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদকে সাধারণভাবে সর্বেশ্বরবাদ' বলা হয়। কারণ এতে আল্লাহ ও বিশ্বে যেনো কোনো ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগতই যেনো আল্লাহ এবং আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত। পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজার মতবাদ সর্বেশ্বরবাদের চূড়ান্ত নির্দশন, যদিও আরাবীর দৃষ্টি-ভঙ্গি তাঁর থেকে ভিন্ন ধরনের। তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং অবদান সম্পর্কে জীবনীকার লিখছেন ঃ "এই মূল্যবান গ্রন্থে তিনি আল্লাহ তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মা তত্ত্ব, ওজন তত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, পূর্ণ মনের তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, পাপ-পুণ্য, বেহেশত-দোযখ, শাস্তি-পুরস্কার তত্ত্ব, কুরআনের উৎপত্তি তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সূফী ভাবধারায় নিমজ্জিত এই শায়খুল আকবর কুরআনের শব্দের ও নবীর হাদীসের অনেক নতুন ব্যাখা দান করে ইসলামের প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিমুখ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে অজ্ঞানতার গাঢ় অমানিশা দূর করে দর্শন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ সুগম করেন।"

ফার্সী সাহিত্যের মহাকবি ও সাধক, সৃজনশীল দার্শনিক মতবাদের জনক জালালুদ্দীন রূমী (১২০৭-১২৭৩ খৃ.) পারস্যের খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে আল্ গাজালী, ইবনুল আরাবী এবং রূমী এই তিন জন শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক হিসাবে খ্যাত।

রূমীর দর্শন চিন্তার-শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'মসনবী'। আবদুল মওদুদ লিখেন ঃ তাঁর মসনবী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র, সূফী তত্ত্বের মধ্যমণি' রূমীর অনুবাদক A.R. Nicholson তাঁর Rumi : Poet and Mystic (1950) গ্রন্থে বলেন, রুমী সর্বকালের সর্বোত্তম মরমী কবি। রূমীর সূফী দর্শনগুলো হলো– আত্মাতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ ও প্রাণপ্রবাহ, প্রেমতত্ত্ব, মানব ইচ্ছার, স্বাধীনতা, আদর্শ মানব, আল্লাহ সর্বধরেশ্ববাদ বা ওয়াহদাতুশ্‌শহুদ। 'ফী হিমা ফীহি' তাঁর অন্য দার্শনিক গ্রন্থ।

মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভিতরকার শাশ্বত ঐক্য রূমীর দর্শনের মূলকথা। তাঁর মতে, জড় জগত আত্মা হতে ভিন্ন, কিন্তু তা মিথ্যা বা মায়া নয়। জড়বস্তু, জীব ও মানুষ সকলেই আত্মার ক্রমবিকাশের পর্যায় মাত্র। মানবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একই, কিন্তু সৃষ্টি প্রবাহে উভয়ে পৃথক হয়ে পড়েছে। 'সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে রূমীর মতো হলো- আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আত্মপ্রকাশের বাসনা মনে উদয় হওয়ায়, আল্লাহ একটি দর্পণ সৃষ্টি করেন যার সম্মুখভাগ আত্মা এবং পশ্চাৎ ভাগ জড়জগৎ। রূমীর 'বিবর্তন বাদ' মূলত পূর্ববর্তী মুসলিম দার্শনিকদের মতামতের সাথে কুরআন,

হাদীস এবং নিজের মননশীল ভাবধারার প্রকাশ। 'প্রেম' সম্পর্কে রুমীর মতবাদ প্লেটো এবং ইবনে সীনার প্রায় অনুরূপ।

চতুর্দশ শতক থেকে উনিশ শতক অন্তর্বর্তী সময়কালটি মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার জন্য খুবই খারাপ সময়। মুসলিম বিজ্ঞান ও দার্শনিক চেতনা ইউরোপে ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্যের হাতেই সমর্পিত হয়। টয়েনবী সত্যিই বলেন ঃ "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে।"

প্রত্যেক জাতির উত্থান যুগের ইতিহাস যেমন আছে তেমনি আছে পতন যুগের। এই বিশাল সময়টা পর করে মুসলমানরা আবার জেগে উঠার এই প্রত্যাশা সবার। এই ঘুম ডাঙানি ডাকই দিয়েছেন উনিশ শতকের খ্যাতিমান কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল।

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) পাকিস্তানের শিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পারস্য দর্শন' সম্পর্কে গবেষণার জন্য জার্মানীর মিউনিখ ইউনিভার্সিটি হতে ডক্টরেট লাভ করেন।

পাশ্চাত্য দর্শন এবং ইসলামী দর্শনের বোঝাপড়া ছিলো তাঁর দার্শনিক চিন্তার অন্যতম বিষয়। The Reconstruction of Religions Thought in Islam বক্তৃতামালা, 'রুমুয-ই বেখুদী,' আসরারে খুদী' পায়ামে মশরিক'- প্রভৃতি ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারার ফসল। পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত মুসলিম সমাজকে ইসলামের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে অবহিত করারই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। ১৯২৮ সালে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখিত বক্তৃতামালা সম্পর্কে লিখেন ঃ The Audience for there lectures are those Muslims who are influenced by western philosophy and are desirous of interpreting Islamic Philosophy in terms to western philosophy.If there are certain defects in the old ideas, they should be removed. My job in this matter is constructive and creative, but in doing so I have kept the best traditions of Islamic Philosophy foremost in my mind.

একজন বিচক্ষণ দার্শনিক হিসাবে ইকবাল, সমসাময়িক কিছু দার্শনিক মতবাদকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন। ইসলামকে তিনি আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, 'বস্তুবাদের চেয়ে দুঃখজনক ভুল এই যে, এই মতবাদে সসীম চেতনা নিজ লক্ষ্যবস্তুকেই নিঃশোষিত করে দেয়'। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ হলো- 'বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবিকাশবাদ মানব জীবনে

আশা ও উদ্যম আনার পরিবর্তে এনেছে হতাশা ও উদ্বেগ'। নাস্তিক্যপুষ্ঠ সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করে তিনি লিখেন, 'ঘৃণা, সন্ধিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি। মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ পথ রুদ্ধ করে ভয়। অথচ এ সব গুণাগুণই এ শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য। ইকবাল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকেও অস্বীকার করেন।

ইকবাল বড় মাপের একজন দার্শনিক হয়েও ধর্মকে দর্শনের উপর স্থান দেন। কারণ তাঁর বিবেচনায় দর্শন সত্তাকে যেনো দূর থেকে দেখতে আগ্রহী কিন্তু ধর্ম চায় সত্তার সাথে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ। এই ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য তিনি নিজের চিন্তাকে বহু ঊর্ধ্বে তোলার সাধনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসব পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল দর্শনের মূল সুর উপস্থাপিত হয়েছে 'খুদী' তথা আপন শক্তির নবায়নকে কেন্দ্র করে। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ "ইকবাল দর্শনের মূল সুর হলো-আত্মশক্তির উদ্বোধন। তিনি সর্বত্রই 'খুদী' তথা আত্মশক্তির বিকাশের সবক দিয়েছেন। তাঁর কাছে যে কর্ম আত্মশক্তির জন্য ফলপ্রসূ, তা-ই ভালো, আর যা ক্ষতিকর তা মন্দ। সমাজের জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে মানুষের মেধা ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটবে-এটাই তাঁর খুদী দর্শন।"

মুসলিম সম্প্রদায়ের অনবতির মূলে তিনি গ্রীক দর্শনের প্রতি অত্যাধিক অনুরুক্ততাকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ দু'টি। তা হলো– ১. প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে এবং বৈষয়িক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবহেলা। ২. আধ্যাত্মিক বীর্য ও পুনরুজ্জীবনের অভাব। ইকবালের মতে, এই দুই নষ্টের মূলে রয়েছে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা। তাঁর বক্তব্য হলো, 'গ্রীক দর্শন মুসলিম চিন্তা নায়কদের মননসীমা অনেকখানি প্রসারিত করেছিলো সত্যি, কিন্তু মোটের উপর তা কুরআনের মর্মের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি অনেকখানি ঝাপসা করে তুলেছিলো।' এই কারণে ইকবাল কুরআন ব্যাখ্যায় একটি দর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যাতে ধর্ম ও দর্শনের বোঝাপড়ায় ইসলামের সত্যিকার মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি না ঘটে যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সাধারণ ধারণা যে, ইসলাম একটি গোঁড়া ধর্ম, ইহা সকল স্বাধীন চিন্তাকে নিরুৎসাহিত করে এবং ইসলামের নিজস্ব কোনো দর্শন নেই। কিন্তু তাদের এই দাবী যে গড়পড়তা এবং অজ্ঞানতা প্রসূত, তা উক্ত আলোচনায় দেখানো হয়েছে। তাছাড়া কলুষমুক্ত মন নিয়ে যদি ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং

ধর্মীয় মজহাবসমূহের উৎপত্তি ও অগ্রগতি পরীক্ষা করা হয় তাহলে দেখা যাবে এ সকল দার্শনিক চিন্তাধারার উৎস হলো ইসলাম।

ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক মজহাবসমূহের উৎপত্তির কারণ হিসাবে Shahrastani তাঁর 'Muslim Schism and its Sects' গ্রন্থে চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। তা হলো–

১. ইচ্ছার স্বাধীনতা ঃ ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা– এই প্রশ্ন মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে এবং এই বিরোধ ধর্মতত্ত্বভিত্তিক নানা মজহাবের সৃষ্টি করে।

২. আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী ঃ আল্লাহর গুণাবলী আছে কিনা আর থাকলে তা তাঁর সত্তার সাথে একীভূত না পৃথক এই চিন্তা।

৩. যুক্তি ও প্রত্যাদেশের বিরোধ ঃ যুক্তি না প্রত্যাদেশ-কোনটি সত্যের প্রকৃত নির্ণায়ক, এ প্রশ্ন বিভিন্ন মজহাব উৎপত্তির কারণ।

৪. বিশ্বাস ও কর্মের সীমারেখার প্রশ্ন ঃ মানুষের কার্যাবলী তার বিশ্বাসের অঙ্গ না পরস্পর পৃথক– এই প্রশ্ন মানুষের মনে চিন্তার জন্ম দেয়।

এ সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় গড়ে উঠে তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায় হলো ঃ

ক. জাবরিয়া ও কাদরিয়া ঃ স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্ঠবাদের বিতর্ক হতে এই মতবাদের জন্ম। জাহম বিন সাফওয়ান (মৃ. ৭৪৫ খৃ.) জাবরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মতে, মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নাই, মন ও কর্মের স্বাধীনতা নাই, সে যন্ত্রের মতো কাজ করে, তাই কৃতকর্মের জন্য সে দায়ী নয়। জাবরিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাদরিয়া জন্মলাভ করে। ইমাম হাসান আল বসরী, মা'বাদ আল জুহানী (মৃ. ৬৯৯ খৃ.) এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস-এই দলের মূল ভিত্তি।

খ. মুতাযিলা সম্প্রদায় ঃ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত যুক্তিবাদী মাজহাব এটি। হাসান বসরীর শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা (৬৯৯-৭৪৯ খৃ.) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। খলীফা মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) আমলে এটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত শক্তিশালী মতবাদে পরিণত হয়। তারা বিশ্বাস করত আল্লাহর একত্ববাদ ও চিরন্তন অস্তিত্বে কিন্তু আল্লাহর সিফাত এ নয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতায় তারা গুরুত্বারোপ করে। মুতাযিলাদের মতে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, তাই ইহা চিরন্তন নয়। মানুষের নিজের সৎ ও অসৎ কর্মের জন্য সে নিজের দায়ী

থাকবে। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে তাদের মত হলো, পৃথিবী সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই। ইহা প্রাথমিক অবস্থায় নিশ্চল ছিলো কিন্তু আল্লাহ্ পরে এতে গতির সঞ্চার করেন।

গ. আশয়ারী মতবাদ ঃ মুতাযিলিদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা হতে আশয়ারী মতবাদ রূপ লাভ করে। আবুল হাসান আল-আশয়ারী (৮৭৩-৯৩৫ খৃ.) ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। তাদের কয়েকটি মতামত হলো– আল্লাহর গুণাবলী শাশ্বত। তাঁর গুণাবলী তদীয় সত্তার অভিন্ন নয়। মানুষের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নাই, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ঘটতে পারেনা। তাদের মতে, কুরআন সৃষ্টি নয়, শাশ্বত কিন্তু ইহা লিখন ও আবৃত্তি সৃষ্ট। যুক্তি নয় ওহীর জ্ঞানই মানব জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। তারা মহানবীর সুপারিশকে মুক্তির কারণ হিসাবে বর্ণনা করেন। মুতাযিলারা মিরাজকে আত্মিক সফর বিশ্বাস করত কিন্তু আশয়ারীরা এটিকে সশরীরে ঘটেছে বলে বিশ্বাস করত। আবু বাকের বাকুইলানী, ইমাম রাযী, শাহরিস্থানী, আল-গাজালী এই মতবাদের উন্নয়ন এবং প্রসারে ব্যাপক চেষ্টা করেছেন। ফলে অন্যান্য মতবাদের তুলনায় আশয়ারী মতবাদ অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন ধরেছিলো।

উপরোক্ত বর্ণনায় মুসলিম জাতির দার্শনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা যায় তা এক ব্যাপক জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। শত শত মুসলিম দার্শনিকদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক মনীষীর আলোচনার মাধ্যমে এই প্রতীয়মান হয় যে দর্শন চর্চায় ইসলামী জগতের অবদান সুদূর প্রসারী। Briffault তাঁর Making of Humanity গ্রন্থে তাই লিখেন– It was not science only which brought Europe bake to life Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life...

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিম জাতির মৌলিক অবদান স্বীকৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখার মতো ইতিহাস শাস্ত্রের এক সুশীল রূপদান এবং প্রায়োগিক সমাজ বিজ্ঞানের রূপকার হিসাবে মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-চর্চার প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ এবং মহানবীর (সা.) অশেষ অনুপ্রেরণায় মুসলমানরা ইতিহাস লিখনে এগিয়ে আসে এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও পরিপূর্ণ রূপদানে সফল হয়। ঐতিহাসিক কে. আলী লিখেন ঃ 'মুসলমানরাই ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ।'

পবিত্র কুরআন একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইতিহাসের অসংখ্য উপাদান এতে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার মূল কারণ। ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই মানব জীবন সতত প্রবাহমান, তাই কুরআন বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরেছে মানবজাতির কাছে। এক্ষেত্রে কুরআন নিজেই ইতিহাসের অন্যতম উৎস। প্রফেসর আবদুল হামিদ সিদ্দিকী "The Islamic Concept of History (1981) গ্রন্থে বলেন ঃ The Holy Quran is not a book of history, but it is divine verdict of History. The superb style in which the Holy Quran has discussed the different phases of the lives of various nations- their rise, development and decline, as well as the causes underlying their changes- has no parallel in the historical records of the world." এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে রয়েছে, সৃষ্টির সূচনার ইতিহাস, বিভিন্ন যুগে মানব জাতি, নবী ও সংস্কারকদের ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম, আইয়ামে জাহেলিয়ার ইতিহাস। এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশুদ্ধতা কুরআনের মাধ্যমে নির্ভরতা লাভ করেছে। কেননা আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআনের বিশুদ্ধতা তর্কের উর্ধ্বে। ড. মরিস বুকাই বলেছেন ঃ Thanks to its undisputed athenticity, the Quran holds a place among the books of revelation, shared neither by the old nor new testament.

ইতিহাস রচনার সনাতন পদ্ধতিতে কুরআন এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যোগ করেছে। শুধু মানুষ, জনপদ, ধৃষ্টতা ও মহানুভবতার ইতিহাস নয়; এক আধ্যাত্মিক

এবং শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত কুরআনের ইতিহাস সংশ্লিষ্টতার অন্যতম লক্ষ্য। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং তার দিকে মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করেছে। ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী লিখেছেন ঃ 'ইতিহাস সম্পর্কে কুরআনের ধারণার ভিত্তি মানব প্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধির উপায়।... কুরআনের পাতায় পাতায় ইতিহাস সম্পর্কে উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কুরআন এমন কোন আইন-কানুন উদ্ভাবন করেনি যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে ধরে নেয়া যায়। তা শুধু দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানব প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য পতনশীল সব সমাজের ইতিহাসেই প্রকাশ পেয়ে থাকে আর মানব প্রকৃতির অপরাপর বৈশিষ্ট্য সমস্ত বর্ধিষ্ণু সমাজের ইতিহাসেই দেখা যায়। একই সময়ে রাসূলদের মুখ দিয়ে কুরআন এ-ও বলে যে কি কি নৈতিক শিক্ষা, বিশ্বাস এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে পরিষ্কার করে আইন-কানুনের সঙ্গে সন্নিবেশিত করে নিলে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াকে রোধ করা যায় এবং একটি সম্প্রদায়কে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করা যায়।'

এ সর্ম্পকে একটি বিশ্বকোষের ভাষায় উল্লেখ করা যায় - 'মুহাম্মদ (সা.) মানব ইতিহাস চর্চার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাস অতীত জাতিসমূহের বিরক্তিকর কাহিনী মাত্র যেমন নয়, তাহাদের কীর্তির গৌরব গাঁথাও নয় বরং তাহা মানুষের ব্যর্থতার এক নিদারুণ দুঃখজনক আখ্যান। পরিতাপের বিষয় এই যে, কোনও জাতিই তাহাদের পূর্ববর্তী পতিত জাতির ভুলগুলি হইতে কোনও শিক্ষাগ্রহণ করে নাই। আল্লাহর বিধানানুযায়ী কোনও জাতি যখন তাহাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও তাহাদের স্মৃতিসৌধগুলির নিদর্শন হইতে শিক্ষাগ্রহণে অবহেলা করে ও আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়, তখন ঐ জাতির পতন আসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইসলামী ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি হইতে একেবারেই ভিন্ন। ইসলামী ইতিহাস চর্চার পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু হইতেছে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য।'

কুরআনের এই অনুপ্রেরণা এবং মহানবীর (সা.) সুমহান জীবনী ও বাণীকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। প্রথম যুগে নবী (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর জীবনী সংগ্রহ দিয়ে এই কর্মকান্ড শুরু হলে তা পরে এক বিশাল কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়। সায়্যিদ আমির আলীর ভাষায় 'প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইতিহাসের প্রতিই নজর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আগের ধারণা সু-সম্প্রসারিত হয়। প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল আর নৃতত্ত্ব ইতিহাসের অন্তর্গত করা হয়, আর বড় বড় মনীষীগণ এই চিত্তাকর্ষক বিদ্যা চর্চার

মনোনিবেশ করেন। ইবন ইসহাকের সরল কাজ আর ইবনে খালদুনের বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বিরাট, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে বহুসংখ্যক লেখকের আবির্ভাব হয়। এদের পরিশ্রমের ফলে দেখা যায় ইসলামের প্রেরণায় আরব জাতির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের নমুনা।'

ইসলামী জগতে ইতিহাস রচনার দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারায় নবী (সা.) খোলাফায়ে রাশেদার জীবন-কর্ম ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-কর্ম আলোচনা প্রধান্য উপজীব্য। আর অন্য ধারায় রয়েছে অমুসলিমদের ইতিহাস। জাহেলিয়া যুগ হতে আরম্ভ করে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি রোম ও পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যের ইতিহাস ছিল এর বিষয়বস্তু। অবশ্য হিজরী প্রথম শতাব্দীতে এই প্রবণতা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীকালে এ দুটি ধারা মিলে এক সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দিকের প্রবণতার উদাহরণ যদি ধরা হয় ইবনে ইসহাক, জুহরী প্রমুখদের রচনা, তাহলে সমন্বয় ও সামগ্রিক ইতিহাসের রূপকার হিসাবে নাম করা যায়, ইবনুল আছির, খাল্লিকান, খালদুনের নাম ঐতিহাসিক রশীদুদ্দীনের রচিত ইতিহাসে যেমন রয়েছেন আম্বিয়া কেরাম, মহানবী (সা.) খলীফাগণের জীবন কর্ম, তেমনি স্থান পেয়েছে যাজক সম্প্রদায় তথা রোমান পারস্য, চীন, ভারত ও মঙ্গলীয় শাসকদের জীবন মূল্যায়ন। এই গ্রন্থটি একাধারে আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর জীবনী ও বাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাস চর্চার মানস গঠিত হয়। মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরাম ও লক্ষ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবন ও কর্ম সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ হিজরী প্রথম শতকেই এ বিস্ময়কর কাজ শুরু হয়। এই কর্মের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে 'মাগাযী'সমূহ এবং পরবর্তীতে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডঃ স্প্রেঙ্গার হাফেজ ইবনে হাজারে 'ইসাবা ফি আহওয়ালিস সাহাবা' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা লিখেন (১৮৫৩-৬৪ খৃঃ)। তাতে তিনি লিখেছেন 'দুনিয়ায় এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই, যারা মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজালে'র বিরাট তথ্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। আর এর বদৌলতে আজ পাঁচ লক্ষ লোকের বিবরণ জানা যেতে পারে।'

এতগুলো লোকের জীবনী যাচাই, বাছাই এবং প্রকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করা কত বড় কাজ তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে সব চিন্তাশীলদেরই। তাঁদের এ লেখা শুধু কাহিনী বা স্তুতির উপর নির্ভর করতো না। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তারা এখান থেকেই শিখেছিলেন। ঘটনার ও জীবনীর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইয়ে তাদের পদ্ধতি

ছিলো কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাপেক্ষ। কিন্তু ইসলাম তাদের এ শিক্ষা দিয়েছিলো। ইতোপূর্বে মহানবীর (সা.) জীবনী ও বাণী সংরক্ষণে তাঁদের যে অসাধারণ সাধনা তা থেকেই তাঁরা এর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। একটি বিশ্বকোষের মতে, মহানবীর (সা.) জীবনী সমীক্ষায় বিষয়টি কার্যত একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চার মর্যাদায় উন্নীত হয়। মুসলমানদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলির বস্তুনিষ্ঠা, পক্ষপাতহীনতা ও স্বাধীন রায়ের বিষয়গুলি মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ সুফল আর এই সুফল অর্জনে পরোক্ষ সহায়তা করে তাঁহার সর্বাধিক বিস্ময়কর অবদান পবিত্র কুরআন। ইতিহাসের ঘটনা তথা কালপঞ্জির বিষয়টি কুরআন চর্চার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি, কেননা কুরআন জীবনের সমীক্ষাযোগ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃংখলা, সঙ্গতি, বিধান ও পদ্ধতিকরণের শিক্ষা দেয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরসুরিগণ আধুনিক ইতিহাস লিখন ও ইতিহাসের বিজ্ঞান সম্মত চর্চার বুনিয়াদ রচনা করে।'

উপরোক্ত কারণে মুসলমানদের ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা চর্চায় অবদান প্রধানত দু'টি ক্ষেত্রে।

১. তথ্য নির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন।

২. এবং নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিচিত্র ধরনের তথ্য সংগ্রহ।

মুসলমানরা তাই ইতিহাসের যে বিশাল সংগ্রহ নির্মাণ করেছে তাতে, কল্পলোক কাহিনীর কোন স্থান নেই। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ তাই লিখেন ঃ 'ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এখানে পৌরাণিক কাহিনী বা কল্পলোকের কোন স্থান নেই। ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাজার বছর পরেও যাতে এর সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না ওঠে তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। এমন একটি সময় ছিল যখন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল বিচার বিবেচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুসলমানগণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন। প্রতিটি বিবরণের জন্য তাদেরকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হত। ঐতিহাসিক সাক্ষী প্রমাণের বিষয়টি ছিল এরকম কোন এক সময়ে হয়ত একটি ঘটনা ঘটে গেল। সমসাময়িক কোন বিশ্বাসযোগ্য কোন লোকের নিকট থেকে ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেল। এমতাবস্থায় তার দেয়া বর্ণনাকে যথার্থ বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের সময় এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হলে আনুক্রমিকভাবে দু'টি সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। আর তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে আনুক্রমিকভাবে তিনটি সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। ইতিহাস রচনার এ ধারাটি কেবলমাত্র নবী করীম (সা.)-এর জীবনী রচনার

মধ্যে সীমিত নয়। বরং যুগ যুগান্তর ধরে যে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কৌশলটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনকি নিছক রস-কৌতুক ও গল্প কাহিনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ আনুপূর্বিক বর্ণনাকারীর বিবরণ পাওয়া যাবে।'

মুসলিম ইতিহাস ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়

মহানবী (সা.) এবং তাঁর আসহাবগণের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, খলীফাদের পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের কার্যকলাপ জানবার ইচ্ছা, আরব মুসলিমদের ভাতা নির্ধারণের জন্য তাদের বংশ পরিচয় জানবার প্রয়োজনীয়তা, আরবী কবিতা ব্যাখ্যা করবার উৎসাহ, আরবদের আভিজাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অন্য জাতির পূর্ব পরিচয় জানার কৌতুহল প্রভৃতি মুসলমানদের ইতিহাস চর্চায় অনুপ্রাণিত করে। তবে, একেবারে প্রথমদিকে মহানবী (সা.)-ই ছিলেন আরব ইতিহাস রচনার প্রাণবিন্দু। মহানবীর যুদ্ধসমূহ চারিদিকে ব্যাপক আলোড়ন তুলে। এই আলোচনা এবং আলোড়ন 'মাগাযী' তথা যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনার সূত্রপাত করে। প্রথম যুগে নবী জীবনী বুঝাতে এই 'মাগাযী'-কেই বুঝাত। নিম্নে প্রথম যুগের কিছু রচনাকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পত্রস্থ হল ঃ

আবান বিন উসমান বিন আফ্ফান ঃ (মৃ. ৯৫ হি: হতে ১০৫ হি: এর মধ্যে, ৭১৩ হতে ৭৩৩ খৃ.) তিনি হাদীস বিশারদ ছিলেন। মাগাযী বর্ণনায় তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি হাদীস ও মাগাযী পঠন পাঠনের মধ্যে সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

উরওয়া ইবনে জুবাইর ঃ (মৃ. ৯৪ হি:/৭১২ খৃ.) একজন ফকীহ ও হাদীসবেত্তা ছিলেন। মাগাযী সম্পর্কে তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে তার নির্বাচিত ঘটনাসমূহ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাবারী, ওয়াকেদী, ইবনে সাইয়েদ ও ইবনে কাসীর প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তার মাগাযীর বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। মাগাযী ইতিহাস হলেও মহানবী (সা.) সীরাতের বিভিন্ন বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক উৎস হতে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে 'সনদ' কুরআনের আয়াত, কবিতার উদ্ধৃতি প্রদান করে ঘটনার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তার লেখায় হযরত আবু বকর (রা.) ও উমারের (রা.) যুগের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তবে তার বর্ণনা থেকে নিজস্ব চিন্তার কাঠামো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না।

শারাজীল বিন সা'দ ঃ (মৃ. ১২৩ হি. / ৭৪০ খৃ.) তার রচনায় সামগ্রিক মূল্যায়নে দৈন্যতা রয়েছে। তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মত পোষণ করেন। বদর উহুদে অংশ গ্রহণকারী এবং আবিসিনিয়া ও মদীনা হিজরতকারী সাহাবীদের তালিকা তিনি উল্লেখ করেছেন। মাগাযী পঠন ও বিস্তৃতির ইতিহাসে এসময় আবুদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযম (মৃ. ৭৪৭-৭৫২ খৃ.) আসিম বিন উমার বিন কাতাদা (মৃ. ৭৩৮ খৃ.) ভূমিকা রাখেন।

মুহাম্মদ বিন শিহাব আজ্‌জুহরী ঃ (মৃ. ১২৪ হি / ৭৪১ খৃ.) উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি বর্ণনাসমূহকে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক উপস্থাপন করেছেন। "সীরাত" আলোচনায় এক সুনির্দিষ্ট কাঠামো তিনিই প্রথম উপস্থিত করেন। প্রথম থেকে খুলাফা রাশেদার যুগ পর্যন্ত প্রধান ঘটনাসমূহ এবং তৎকালীন অভিজ্ঞতা তিনি সন-তারিখসহ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া জুহরীর নতুন নিয়মে রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গতিপথ সৃষ্টি করেছে। ড. আবদুল আজীজ আল দুরী জানিয়েছেন ঃ ইতিহাস লিখন এবং উহার গতিপথ নির্দেশ করতে আল-জুহরী এবং উরওয়া বিন আল জুবাইরের অবদান স্মরণীয়। সিরাত আলোচনার সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে অতীতের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে ইতিহাস সৃষ্টির জন্য নতুন পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ঃ (মৃ. ১১০ হি/ ৭২৮ খৃ.) ছিলেন ইয়েমেনবাসী ইহুদী কাহিনীকার ঐতিহাসিক। কাব উল আহবার উমরের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মুয়াবিয়ার (রা.) উপদেষ্টা পদ লাভ করেন। তাঁর একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইহুদী ও মুসলমানদের হাদীস ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর একজন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। তার "মাগাযী" আহলে কিতাবদের কাহিনী সংভুক্তির কারণে নতুন প্রেরণা ও পথদায়ী। "মুবতাদা" গ্রন্থটি রাসূলগণের ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ দিক দিয়ে তিনি বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রথম উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

মূসা বিন উকবা ঃ (মৃ. ১৪১ হি. / ৭৫৮ খৃ.) ইতিহাস চর্চায় মদীন কেন্দ্রের গোড়া পত্তন করেন জুহরী; আর তার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন মূসা বিন উকবা এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। মূসা বিন উকবা ছিলেন জুহরীর ছাত্র। সনদ বর্ণনায় বাড়াবাড়ি তার রীতি বিরুদ্ধ ছিল, তিনি তুলনামূলক মিশ্র রেওয়ায়েত এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণের চেয়ে লিখিত বিষয়বস্তু হতে অধিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ঃ (মৃ. ১৫১ হি./৭৬১ খৃ.) তাঁর রচিত প্রথম শ্রেণীর 'সীরাত' আমাদের কাছে অনেকটা পূর্ণাঙ্গভাবে পৌছেছে। তাঁর "আল মুবতাদা আল মাগাযী" প্রধানত দুইটি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম অংশ "মুবতাদা" এতে সৃষ্টির শুরু হতে মহানবীর (সা.) পূর্ব পর্যন্ত , আর "মাগাযী" অংশে রিসালতের ইতিহাস এবং যুদ্ধসমূহ অন্তর্ভুক্ত। তিনি এত বেশী উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে, এতে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সব বর্ণনার উৎস বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র নয়। তাঁর "তারীখুল খুলাফা" একটি বিশিষ্ট রচনা। ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থ A. Guillamme কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে ১৯৫৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদক শহীদ আখন্দ। এর তৃতীয় খণ্ড ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করে।

প্রথম যুগের আখ্‌বারী ঐতিহাসিকদের সব রচনায় সন্ধান পাওয়া যায় না। নিচে এ ধরনের আরো কয়েকজনের নাম আলোচিত হল সংক্ষেপে–

আবু মিখনাফ ঃ (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৪ খৃ.) ছিলেন কুফার আখবারী ঐতিহাসিক। 'কুলজী' সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি রিদ্দার ধর্মত্যাগী আন্দোলন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়, শুরা বা পরামর্শ পরিষদ, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ, উমাইয়া শাসন পতনের পূর্ববর্তী ঘটনা, খারেজীদের বিদ্রোহ প্রভৃতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ৩০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

আওয়ানা বিন আল হাকাম ঃ (খৃ. ১৪৮হি./৭৬৪ খৃ.) তিনিও কুফার একজন আখবারী। মুয়াবিয়া এবং উমাইয়া খেলাফতের ধারাবাহিক জীবনী ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর 'কিতাব' আত্ তারীখ গ্রন্থে হিজরী প্রথম শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

সাইফ বিন উমার ঃ (মৃ. ১৮০ হি./৭৯৬ খৃ.) ইরাকের আখবারী ঐতিহাসিকদের অন্যতম। তার প্রথম গ্রন্থে রিদ্দার যুদ্ধ এবং বিজয় অভিযান এবং শেষ গ্রন্থে ফিত্না বিশেষ করে উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ইরাকী দৃষ্টিভঙ্গির এবং তামীম গোত্রের সূত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

নসর বিন মজাহিম ঃ (মৃ. ২১২ হি./৮২৮ খৃ.) কুফার অধিবাসী ছিলেন। তার গ্রন্থসমূহে শিয়া সম্প্রদায় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রাধান্য পেয়েছে। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরো রয়েছেন আবু ইয়াকযান (মৃ. ১৯০/৮০৫) মুহাম্মদ বিন সায়িব আল কালবী (মৃ. ১৪৬ হি./৭৬৩ খৃ.), মুসাব আল যুবাইরী (মৃ. ২৩৩-৩৬ হি./৮৪৭-৫০ খৃ.), হায়সুম বিন আদী (মৃত্যু ২০৬ হি./৮১২ খৃ.) অন্যতম। হায়সুম বিন আদী রচিত তবকাতুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দেসীন; 'ফিতাব আত্ তারীখ আলা আল্ সিনীন; মূল্যবান গ্রন্থ।

ইতিহাস রচনার পরিণত যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকগুলো বড় প্রতিভা জন্ম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিচার এ সময়কার ইতিহাস গ্রন্থসমূহে রূপ লাভ করে। উমাইয়া যুগের পরে আব্বাসীয় শাসনামল (৭৫০-১২৫৮ খৃ.) ছিল সবদিক থেকেই মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। শাসক আবু জাফর আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫), আল মামুন (৮১৩-৮৩৩), আল মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২), মামুনের পিতা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯) প্রমুখের শাসনকালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে অন্যান্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মতো ইতিহাস ও স্বর্ণযুগে প্রবেশ লাভ করে সৃষ্টি হয় পরিণত ও স্মরণীয় ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গ্রন্থের। এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ঐতিহাসিক হলেন ঃ

আবু উবায়দা ঃ (১১০-২১১ হি./৭২৮-৮২৬ খৃ.) সমসাময়িক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে তার স্থান ছিল খুব উঁচুতে। জাহিয বলেন, 'পৃথিবীর বুকে তার সমসাময়িক কোন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী হিসাবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।' ইসলাম ও জাহেলিয়া যুগের ইতিহাস সম্পর্কে আবু উবায়দার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থে রচনা করেন। তার রচনার বৈশিষ্ট্য হলো, একই বিষয়বস্তু বা ঘটনার উপর তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রেওয়ায়েত একত্রিত করেছেন। তার 'আল আইয়াম' জাহেলিয়া যুগ সম্পর্কে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের প্রাথমিক উৎস বিবেচিত হয়েছে। অনারব মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– 'কিতাব আল মাওয়ালী' আর পারস্যবাসীদের নিয়ে লিখেছেন 'আখবার আল্ ফারস'। তিনি আরবদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

হিশাম বিন মুহাম্মদ আল কালবী ঃ (মৃ. ২০৪ হি / ৮১৯ খৃ.) তিনি কুফার অধিবাসী। তাঁর পিতা সায়িব আল কালবী (মৃ. ১৪৬ হি.) একজন বিশিষ্ট কুলজীবিদ ছিলেন। কুলজী চর্চায় তার পিতারই উন্নত সংস্করণ ছিলেন তিনি। তার 'জামহারা আল নসব' যার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। কালবী একশত উনত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে মাত্র ৩টি গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। তার বাণীর নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষিত।

মুহাম্মদ ইবনে উমার আল্ ওয়াকেদী ঃ (১৩০-২০৮ হি / ৭৪৮-৮২৩) হিজরী দ্বিতীয় শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগের যুদ্ধ নিয়ে তার 'আল্ মাগাযী' ইবনে ইসহাক থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তারিখ উল্লেখ এর উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ওয়াকেদী ইসলামের ইতিহাসকে

দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ও লিখনী শক্তি ছিল বিস্ময়কর। আবু খুদাফা বলেছেন, তার নিকট গ্রন্থাবলীর ছয়শত আলমারী ছিল। মুরতাদদের নিয়ে তিনি লিখেন 'কিতাবুর রোদ্দাদ'। 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে চার খলিফা হতে শুরু করে ৭৯৫ খৃ. পর্যন্ত ইতিহাসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। ওয়াকেদীর 'কিতাবুল তাবকাত' কুফা ও বসরার মুহাদ্দিসদের নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ।

আবদুল মালেক ইবনে হিশাম ঃ (মৃ. ২১৮ হি.) বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন, পরে মিসরে গমন এবং ইমাম শাফেয়ী এর সাথে সাক্ষাত করেন। ইবনে ইসহাকের বৃহৎ প্রামাণ্য জীবনীকে সংক্ষেপণ, সংশোধন করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' নামক এই গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মাদায়েনী ঃ ৯১৩৫-২২৫ হি./ ৭৫৮-৮৩৯ খৃ.) ইসলামের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক। মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে খুটি-নাটি তথ্য সংগ্রহ তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। বসরা মাদায়েন সফরের পর বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ২০৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল– ১. মহানবীর (সা.) জীবনের ঘটনাবলী ২. কুরাইশদের বর্ণনা ৩. সমভ্রান্ত পুরুষ ও নারীদের বৈবাহিক বিবরণ ৪. আবু রকর (রা.) হতে মুতাসিম পর্যন্ত শাসকদের বিবরণ ৫. ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ৬. আরব জাতির বর্ণনা ৭. ইসলামের বিজয় কাহিনী অন্যতম। তার রচনাবলী পরবর্তী লেখকদের জন্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

মুহাম্মদ ইবনে সাদ যুহরী ঃ (১৬৮-২৩০ হি / ৭৮২-৮৪৪ খৃ.) ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর সেক্রেটারী ছিলেন। বসরার অধিবাসী হলে ও বাগদাদেই বসবাস করতেন। তার রচিত অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে 'তবকাতে ইবনে সাদ' বিখ্যাত। আল্লামা শিবলীর মতে, এই গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। জালাল উদ্দীন সূয়ুতী এটি সম্পাদনা করে নাম দেন- "আনজাজাল ওয়াদাল মুসাক্কা মিন তাবাকাতে ইবনে সাদেন"। বিশ্বখ্যাত এই আকর গ্রন্থটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় একজন বিদ্যোৎসাহী জার্মান সম্রাটের হস্তক্ষেপে। সম্রাট তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে Prof. EL Sachav কে নিযুক্ত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে কনষ্টান্টিনোপল, মিশর ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান থেকে এই গ্রন্থের বহু রকম কপি সংগ্রহ করা হয়। অবশেষে Joseph Horovitg, Julius

Lippert, K.V. Zetterstein ও Carl Brocielman প্রমুখ প্রাচ্য-বিদের সহায়তায় প্রফেসর সাখভ্ গ্রন্থটি সম্পাদনাও প্রকাশ করেন।

মুসলিম ইতিহাসের সমৃদ্ধি ও স্বর্ণযুগ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানের ইতিহাস চর্চা এক আলোকসঞ্চারী দিগন্তে প্রবেশ করে। উপকরণের বিশুদ্ধতা, প্রাজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় এই সময় ইতিহাস রচনায় বেশ কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন। কোন ধরাবাঁধা গণ্ডীর মধ্যে এই প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ করা যাবেনা। সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুবিন্যস্তভাবে জাতির ইতিহাস তারা আলোচনায় সংভুক্ত করেছিলেন। পরীক্ষা ও ঐতিহাসিক নিরীক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তারা গ্রহণ করেছিলেন উপাদান উপকরণ।

আহমদ বিন ইয়াহিয়া আল বালাজুরী ঃ (মৃ. ২৭৯ হি/ ৮৯২ খৃ.) ছিলেন পারস্যের একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। ঐতিহাসিক জ্ঞানের সন্ধানে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। বাগদাদ ছিল তাঁর সাধনা ও অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাস রচনার ব্যাপক পটভূমিতে তিনি প্রথম পদক্ষেপ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন। বালাজুরী তার সুবিখ্যাত 'ফুতাহুল বুলদান' এবং 'আনসাব আল আশরাফ, গ্রন্থদ্বয়ে ইসলামের প্রত্যেক শহর নগরের ধারাবাহিক বিজয় ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তিনি বিজয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ, পরিভ্রমণকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং সহজলব্ধ রেওয়ায়েত হতে উপকরণ গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত 'আনসাব আল আশরাফ' ইসলামের ইতিহাসের উপর এক মূল্যবান সংযোজন। রচনাশৈলী এবং উপকরণের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত অথচ অনন্য গ্রন্থ। এতে তিনি আরব জাতির চিন্তাধারার অগ্রগতি এবং তাদের খবরের সংযুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবা ঃ (মৃ. ২৮০ হি./ ৮৮৩ খৃ.) এই সময়ের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি দিনওয়ারের কাযী ছিলেন। তার অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে 'কিতাবুল মা'আরিফ' একটি ইতিহাস গ্রন্থ। বিশ্ব ইতিহাস লেখার একটি প্রয়াস এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়। সৃষ্টির শুরু হতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের যুগ পর্যন্ত তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি নিজে বিশ্বাস করেন যে, এই গ্রন্থ এমন তথ্য সমৃদ্ধ যে, উহা প্রাচীন ঐতিহাসিক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। কে. আলী লিখেছেন ঃ এই গ্রন্থটিকে সংবাদের ভাণ্ডার বলা যায়।'

আহমদ আল দিনওয়ারী ঃ (মৃ. ২৮২ হি./ ৮৯১ খৃ.) একজন বহুমুখী প্রতিভাধর পণ্ডিত ছিলেন। গণিত, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু বই লিখেছেন। কুরআনের উপর তার ১৩ খণ্ডের একটি রচনা রয়েছে। তার 'আল আখবার উত্ তিওয়াল' বিশ্ব ইতিহাস আলোচনায় এক অনন্য সৃষ্টি। ঘটনা বর্ণনায় চমৎকার ধারাবাহিকতা এই গ্রন্থে রয়েছে। ইসলামী যুগে ইরান ও ইরানের ঘটনাবলী তার আলোচনায় প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান লাভ করেছে।

আল্ ইয়াকুবী ঃ (মৃ. ২৮৪ হি. / ৮৯৮ খৃ.) ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিক হিসাবে সুবিখ্যাত। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ এবং দেশের সার্বজনীন সংস্কৃতি এবং বাস্তব কার্যাবলীর বিষয়সমূহ একত্রিত করেছেন। ইয়াকুবী যৌবনের বেশীর ভাগ সময় দেশ ভ্রমণ এবং ভৌগলিক-ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সংগ্রহে অতিবাহিত করেন। আরবী ভাষায় তার 'আল-বুলদান' ভৌগলিক ইতিহাসে প্রথম নজির। পদ্ধতি এবং উপকরণের দিক দিয়ে এটি একটি যথেষ্ট প্রভাশালী রচনা। ৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে শিয়াদের নির্ভুল হাদিসগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তার রচনাবলী অধ্যাপক Houtsama কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় দুই খন্ডে।

ইয়াকুবীর ইতিহাসে কেবল প্রাচীন আরব, নবীদের কাহিনী, ইরানের কাহিনী, ইসলামী যুগের ইতিহাসই কেবল বিবৃত হয়নি, অন্যান্য প্রাচীন জাতি এ্যাসিরিয়, ব্যাবিলনীয়, হিন্দু, গ্রীক, রোমান, মিশরীয়, বার্বার, আবিসিনীয়, কাফ্রী, তুর্কী এবং চীনাদের সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। আরব ঐতিহাসিক আবদুল আজিজ দূরী বলেন : তিনি বিশ্ব ইতিহাসের পূর্ণ আকৃতির রূপ দান করেছেন। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মূলধন নিয়ে তাঁর এই প্রকারের ইতিহাস রচনা সাংস্কৃতিক দিক হতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গ্রন্থে যে সব উপকরণ পরিবেশিত হয়েছে সেগুলো মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বিজিত অঞ্চলের মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাবের উপর আলোকপাত করে। তাঁর লেখায় ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ প্রতিভাত হয়েছে।

দশম শতকের মধ্যভাবে হামজা আল ইস্পাহানী যে সমালোচনামূলক ইতিহাস লিখেছিলেন, তা সহজেই ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মিশকাওয়া নামক আরেকজন পারসিক ঐতিহাসিক বুয়াইয়া সুলতান আদুদ উদ দৌলাহর রাজদরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রেজা-ই-করীম লিখেন : 'মিশকাওয়াহ্ দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিদ হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাবারী এবং মাসুদীর সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন।' হামাদানী নামক একজন ঐতিহাসিক হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ আর চতুর্থ শতকের প্রথমভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেন। সাইয়িদ আমীর

আলীর ভাষায়– 'তিনি পৃথিবীকে দক্ষিণ আরবের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস দান করেছেন, যাতে সেখানকার উপজাতিগুলোর বর্ণনা, অসংখ্য ধ্বংসাবশেষের বিবরণ, শিলালিপিগুলোর ব্যাখ্যা আর য়ামনের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত ও ভৌগলিক বিবরণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।'

হিজরী তৃতীয় শতকের শেষদিকে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ধারাও গড়ে উঠে। এঁদের মধ্যে ইবনে আরদ আল হাকীমের (মৃ. ২৫৭ হি./ ৮৭০ খৃ.) মিশর বিজয়ের ইতিহাস, বাহশালের (মৃ. ২৮৮ হি./ ৯০০ খৃ.) ওয়াসিতের ইতিহাস এবং তাইফুরের (মৃ. ২৮০ হি./ ৮৯৩ খৃ.) বাগদাদের ইতিহাস স্মরণযোগ্য।

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জরীর আত্ তাবারী ঃ (মৃ. ৩১০ হি./ ৯২৩ খৃ.) মুসলিম ইতিহাসবিদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পারস্যের তাবারিস্তানে ৮৩৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণের পর বাগদাদে বসবাস করতেন। তার হাতে ইতিহাস এক চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান সাধক দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে সুদীর্ঘ ৪০ বছর লিখেছেন। আরবদের 'লিভী' নামে পরিচিত তার সম্পর্কে বলা হয় 'ইসলামের ইতিহাসের জনক এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম।' 'তারীখুর রাসূল ওয়াল মূলক' এবং 'তাফসীরে তাবারী'-এই দু'টি গ্রন্থের জন্য তিনি চির অমরতা লাভ করেছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির শুরু থেকে ৯১৫ খৃ. পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। তাবারীর অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থটি হতে মূল গ্রন্থটি দশগুণ বড় ছিল মনে করা হয়। তার সারা জীবনের রচনাবলীকে সংগ্রহ করে Leyden edition-এ মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

তাবারীর রচনার বৈশিষ্ট্য হলো- ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ, নির্ভুলতা এবং প্রজ্ঞার জন্য এই গ্রন্থটি ঐতিহাসিক এবং আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত। তার ইতিহাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এতে প্রত্যেক ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী এবং সমসাময়িক সুধীদের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। জর্জ সার্টনের মতে, 'এই এক ব্যাপক এবং নির্ভুল ইতিহাস। ইতোপূর্বে আরবী ভাষায় এমন ইতিহাস আর রচিত হয়নি।'

আবুল ফারাজ ইস্পাহানী ঃ (৮৯৭-৯৬৭ খৃ.) 'কিতাবুল আগানী' শীর্ষক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি আরবের সকল কবি, সঙ্গীতবিদদের জীবনী ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন আরব সভ্যতার এই মূল্যবান রচনাকে ইবনে খালদুন 'আরবদের দলীল' অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন।

আবুল হাসান আলী আল মাসউদী ঃ (৯১২-৯৫৭ খৃ.) একজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক-ভৌগলিক ছিলেন। সাহাবা আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা.) বংশধর বিধায় 'মাসউদী' নামে সুপরিচিত। উত্তর-আরবীয় বংশধর হলেও তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আর্মেনিয়া, ভারত, মুলতান, ইরান, সিংহল, জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার, ওমান ও চীন সফর করেন। মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করতে করতে কস্পিয়ান সাগরে পৌছেন এবং কিছুকাল তাইবেরিয়াস ও এন্টিয়কে বসবাস করেন। বসরা থেকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুরুযুজ জাহাব' (সোনার ময়দান) প্রকাশিত হয়। এরপর প্রাচীন কায়রো গমন করেন এবং সেখান হতে প্রকাশ পায় 'কিতাবুত্ তানবীহ' এবং 'মিরাতুয যামান'। শেষোক্ত গ্রন্থটি এক বিশাল পটভূমিতে রচিত। ভিয়েনার পাঠাগারে ৩০ (ত্রিশ) খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি সংরক্ষিত আছে। সৃষ্টির সূচনা হতে ৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইতিহাসের বিস্তৃত বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন দেশ, জাতির ভ্রমণে প্রাপ্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা এতে সন্নিবেশ ঘটেছে। তরঙ্গরাজি, সামুদ্রিক ভুজঙ্গ এবং পারস্য উপসাগরে মুক্তা আহরণের অনুসন্ধানী বিবরণ এতে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনা বিশেষ করে জরোষ্ট্রীয়ান ও সাবিয়ানদের সম্পর্কে তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার শেষ গ্রন্থ 'কিতাবুত তানবীহ ওয়াল আশরাফ' (A Book of Admonition and Recention). ইতিহাস নিরীক্ষণ শাস্ত্রে অবদানের জন্য মাসউদীকে 'Herodotus of the Arabs' বলা হয়।

মাসউদীর পরবর্তী আরো কয়েকজন ঐতিহাসিক জন্মলাভ করেন। তন্মধ্যে গজনীর সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালের বর্ণনা সম্বলিত 'কিতাবুল ইয়ামানী' রচনা করেন উতবী (মৃ. ১০৩৬ খৃ.), 'তারীখুল হুকমা' রচনা করেন ইবনুল কিফতী। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন, খাতিব (মৃ. ১০৭১ খৃ.), ইমাদুদ্ দীন (১২০১ খৃ.), জওযীর পৌত্র ইউছুফ, ইবনে আবী উসাইবিয়া (১২৭০ খৃ.)।

মুসলিম স্পেনের কর্ডোবায় জন্মগ্রহণকারী-ঐতিহাসিক আবু বকর বিন উমার বা ইবনুল কুতিয়া (মৃ. ৯৭৭ খৃ.) কর্তৃক লিখিত 'তারিখে ইফ্‌তিতাহ্ আল্ আন্দালুস' স্পেনে মুসলিম বিজয় হতে তৃতীয় আবদুর রহমানের (৯২৯-৬১ খৃ.) রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাস এতে রয়েছে। আবু মারওয়ান হাইয়ান ইবনে খালফ্ (৯৮৭-১০৭৬ খৃ.) বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তার প্রাপ্ত গ্রন্থটির নাম– 'অল মুকতাবিস ফি তারীখ রিজুলুল আন্দালুস'। মুয়াহিদ যুগের উপর মরক্কোর আবদুল ওয়াহিদ আল্ মারাকাশী লিখিত 'আল মুজীব ফি তাখলিসে আখবার ওয়াল মাগরিব' (১২২৪ খৃ.) অত্যন্ত মূল্যবান ইতিহাস। বিখ্যাত পর্যটক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজী

(৯৬২-১০১৩ খৃ.) লিখিত 'তারীখুল উলামাউল্ আন্দালুস' গ্রন্থটি স্পেনের আরব পন্ডিতদের জীবন চরিত সংকলন। পরে এই গ্রন্থটি ইবনে বশকুয়াল (১১০৮-৮৩ খৃ.) এবং ইবনুল আবরার (১১৯৯-১২৬০ খৃ.) কর্তৃক পরিবর্ধিত হয়। লিসান উদ্দীন ইবনুল খাতিব (১৩১৩-৭৪ খৃ.) গ্রানাডার যে বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন তা সবিশেষ মূল্যবান। স্পেনে জন্মলাভ কারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরো রয়েছেন, ইবনুল আহমর, আবদুল ওয়াহিদ বিন মা'মার, মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ উল্লেখযোগ্য। ইবনে সাঈদ (১০২৯-১০৭০ খৃ.) টলেডোর বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে তার খ্যাতি সর্বাধিক। তার 'কিতাবুত তারিখ বি-তাবকাতুল উসাস' নামক বিশ্ব ইতিহাসটি খুবই যুগান্তকারী রচনা। নিজে বিজ্ঞানী হওয়ায় ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকে ও সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানে উন্নতির মূলে ৮টি সভ্যতার অবদান রয়েছে। তা হলো, হিন্দু পারসী, ব্যালভিয়ান, গ্রীক, ল্যাটিন, মিসরী, মুসলিম ও ইয়াহুদী। তাঁর মতে মুসলিম ও গ্রীকদের অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইবনে সাঈদের বিশ্ব ইতিহাসটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়। পাদ্রী লুই চেকোর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভাষ্যসহ গ্রন্থটি বৈরূত থেকে প্রকাশ করেন। 'আমবারুল লুকামা' তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ্।

ইবনুল আসীর ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক। তিনি মেসোপটোমিয়ার মসুলের বাসিন্দা ছিলেন। পুরো নাম ইজ্জুদ্দীন ইবনুল আসীর। তিনি তাবারীর রচনাকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং অগ্রসরমান কাহিনী পরবর্তী ১২৩১ খৃ. পর্যন্ত প্রসারিত করেন। 'আল্ কামিল' নামক এই বিখ্যাত গ্রন্থের ক্রুসেড সংক্রান্ত অধ্যায় তার মৌলিক রচনা। ইবনে খালদুনের মতে, এটি বিশ্বের এ জাতীয় মূল্যবান শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর অন্যতম। মহানবীর (সা.) ৭৫০০ জন সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে তার স্মরণীয় রচনা 'উসদুল গাবা' বিশ্ব বিখ্যাত। ইবনুল আসীরের সমসাময়িক সিব্‌ত বিন আল জাওযী পৃথিবীর প্রারম্ভ হতে শুরু করে ১২৫৬ খৃ. পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে রচনা করেন- 'সিরাত উত্ জামান ফি তারীখ্‌উল আইয়াম'।

ইবনে খাল্লিকান আব্বাসীয় আমলের শেষের দিকে আবির্ভূত হন। তিনি সিরিয়ার প্রধান বিচারক ছিলেন। খ্যাতনামা মুসলমানদের জীবনী নিয়ে এক বিখ্যাত গ্রন্থ্ রচনা করেই তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পূর্বে ইয়াকুত মুসলিম জ্ঞান-সাধকদের নিয়ে এবং ইবনুল আসাকীর ৮০ (আশি) খণ্ডে রচনা করেন দামিস্ক সংক্রান্ত প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী।

আবদুর রহমান ইব্‌নে জাওযী (৫০৮ হি. / ১১১৪ খৃ. - ৫৯৭ হি./ ১২০০ খৃ.) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জাওযী ঐতিহাসিক

হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত। আবু নঈম ইস্পাহানীর বিখ্যাত গ্রন্থ চারখণ্ডে রচিত 'হুলিয়ায়ে আউলিয়া'-কে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ঐতিহাসিক সমালোচনাসহ তিনি লিখেন 'সিফাতুস ছফওয়া'। এছাড়া ইসলামের প্রথম যুগ থেকে ৫৭৪ হি./ ১১৭৮ খৃ. পর্যন্ত ইতিহাস ও জীবনীর এক বিশাল আয়োজন দশ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল মুনতজেম ফি তারিখুল মুলুক ওয়াল উমম্ ' রচনা করেন। প্রথমে সন উল্লেখ করে অতঃপর ঐ বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ তিনি বর্ণনা করেছেন; আবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সময়ে উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন তাদের জীবনী আলোচনা উক্ত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই সামগ্রিক ইতিহাসের শেষ ৫ খণ্ড ভারতের দাইরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত। জওযীর আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম 'তালকীহ' ফুহুম আহলিল্ আসার ফি উয়ুন আত্ তারিখ ওয়াস্ সিয়র'- এক সংক্ষিপ্ত তথ্যভাণ্ডার এবং ঐতিহাসিক স্মারকলিপির মর্যাদা লাভ করেছে।

ইবনে খালদুন ঃ ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী

ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে স্পেনীয় মনীষী 'সমাজ বিজ্ঞান' নামক নতুন বিজ্ঞান এবং ধারণার জন্ম দেন তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল হাজরামী (জন্ম. ৭৩২ হি./ ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ) তিনি তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে সকল শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর জীবন ছিল নানা ঘাত-অভিঘাতে পরিপূর্ণ। নানা রাজন্যবর্গের সংস্পর্শে এবং নানা জায়গা ভ্রমণ করেন; তবে চতুর্দশ শতকে আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে যে সকল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তিনি সেগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।

সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে একসময় তাঁর বিতৃষ্ণা দেখা দেয় এবং ইবনে সালামার নির্জন দুর্গে জ্ঞান-সাধনায় লিপ্ত হন। ১৩৭৪ হতে ১৩৭৮ খৃ. পর্যন্ত এই চার বছর তিনি উত্তর আফ্রিকার উক্ত দুর্গে গবেষণায় রত থাকেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম 'সমাজ বিজ্ঞান' নামক নতুন বিদ্যার ধারণা উদ্ভাবন করেন। ১৩৮০ খৃ. তিউনিসের জাইতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি তাঁর বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম খন্ড 'আল মুকাদ্দিমা' রচনা করেন। এটি ছিল এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিশ্বের সকল দেশের পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই রচনাটির শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিনবত্বের প্রশংসা করেছেন। মুকাদ্দিমা (prolegomena) তাঁর তিন খণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

খালদুনের তিন খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থটির নাম- 'কিতাব আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়াম আল আরাবী ওয়াল আজমী ওয়াল

বারবার ওয়ামন আশরাহুম সি খোয়াই আল সুলতান আল আকবর'। গ্রন্থে তিনটি খণ্ডের পরিচিতি হলো ঃ

১. আল মুকাদ্দিমা। অর্থাৎ উপক্রমিকা, এতে সমাজ, সমাজের উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য, যেমন সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ, পেশা, বিজ্ঞান ও তার মূল কারণসমূহ আলোচিত হয়েছে।

২. আরব জাতির ইতিহাস ঃ এই খণ্ডে আরব জাতির বংশ ও প্রশাসনিক ইতিহাস এবং সমসাময়িককালে সে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, সমসাময়িক যুগের জাতি মনীষী, এবং বিভিন্ন জাতির রাজত্ব- যেমন : পোনতিয়েন, সিরীয়, পারসিক, ইহুদী, কীবতি, গ্রীক, রোমান, তুর্কী ও ফরাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. বারবার জাতি এবং সংশ্লিষ্ট গোত্রের ইতিহাস : বারবার গোত্রের উৎপত্তি, বিস্তার, রাজত্বে এবং উত্তর আফ্রিকায় রাজত্বকারী- তাদের বিভিন্ন বংশের বিবরণ।

ইবনে খালদুনের এই বিশাল গ্রন্থটি আবার সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মুকাদ্দিমা' সম্পূর্ণ স্থান পেয়েছে। এতে সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাস দিয়ে শুরু। এটি প্রথম খণ্ডসহ চারটি খন্ড জুড়ে বিস্তৃত। তৃতীয় খণ্ডাংশটিতে লেখকের জীবনকাল পর্যন্ত বারবার জাতির ইতিহাস- যেটি ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে পরিব্যাপ্ত।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, সকল গুরুত্ব ও মূল্য সত্ত্বেও তাঁর এই, রচনাবলী উনিশ শতক পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। মাঝে মাঝে মুকাদ্দিমা অংশের বাছাই করা রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ রচনা বহু শতক যাবত প্রকাশিত হয়নি। ইবনে খালদুনের মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পর্কিত ইতিহাস ১৮৪১ খৃ. নোয়েল ভারগার কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। রয়্যাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ১৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি থেকে কোয়াট্রি মেয়রের সম্পাদনায় ১৮৫৮ সালে প্যারিসে মুকাদ্দিমা'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। একই সালে শেখ নাসের আল হুরানী কর্তৃক কায়রোতে মুকাদ্দিমা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে বৈরূত থেকে 'মুকাদ্দিমা' প্রকাশিত হয়। কায়রোর সরকারী মুদ্রণ বিভাগ খালদুনের পুরো গ্রন্থটি সাত খণ্ডে প্রকাশ করে। ১৮৬৮ তে শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের বহুদেশে বহু ভাষায় তার গ্রন্থ অনূদিত হতে থাকে।

তাঁর 'মুকাদ্দিমার' হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বর্লিন, লিডেন, ফ্লোরেন্স, লেনিনগ্রাড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মিলান, মিউনিখ, ভিয়েনা, আল আজহার, ফেজস্থ কোরানীয়া মসজিদ, অক্সফোর্ড, তুরিনজেন, তিউনিস ও আলজিয়াসে সংরক্ষিত রয়েছে।

ইবনে খালদুনের আরেকটি রচনা হচ্ছে তাঁর আত্মজীবনী 'আল তারিফ'। সুদীর্ঘ আকারে আত্ম জীবনী রচনায় তিনিই প্রথম স্বাক্ষর রাখেন। এতে নিজের সম্পর্কে এমন তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন যা সাধারণত আত্মজীবনীতে করা হয়না। তিনি নিজেকে ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করতেন এবং যথার্থই তিনি তা-ই ছিলেন।

ইতিহাস কোন নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। শুধু রাজা বাদশাহ'র কাহিনী ও বিভিন্ন বংশের উত্থান-পতন নয়; বরং ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে মানব সমাজের অগ্রগতির ছন্দ ধরা পড়ে এবং সমাজ বিবর্তনের ধারার ব্যাপারটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে ফুটে উঠে। এ তথ্য ইবনে খালদুন এমন সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক সার্থক বিশ্লেষণের উপর এমন অনবদ্য ব্যাখ্যাকার আর দেখা যায়না। ইতিহাসকে তিনি গবেষণা উপযোগী এক বিজ্ঞান বলেই মনে করতেন। শুধু এই বৈশিষ্ট্য গুণে তিনি বাকী সকল মুসলিম ঐতিহাসিককে অতিক্রম করে গেছেন। P.K. Hitti তাঁর History of Arabs গ্রন্থে বলেন : By the consensus of all critical opinion Ibn Khaldun was the greatest historical philosopher Islam produced and one of the all times.

ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন ধারণা সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন ঃ 'এই বিশ্বের ইতিহাসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক এবং সম্ভব ও অসম্ভবকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর। এজন্য মানব জাতিকে সমাজের দিকে তাকাতে হবে। কোন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হলে তার যে অবস্থাসমূহ বৈশিষ্ট্যসহ চিহ্নিত, সময়ে সময়ে যে সব ঘটনা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যে সব অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা, এই তিনটি অবস্থাকে পৃথক করতে হবে। এরপর একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে নিতে পারব এবং এভাবেই সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে আমরা নিঃসন্দেহে উপনীত হব সঠিক প্রমাণের জন্য।' এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি সমাজ সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার জীবনীকার আখতার উল আলম লিখেছেন ঃ 'নিজের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের আলোকেই তিনি মানব সমাজ এবং তার সমূহ বৈশিষ্ট্যকে একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করেন। সমাজকে তিনি মানুষের যাযাবর জীবনযাত্রা থেকে রাষ্ট্র ও দেশের পত্তনের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অবস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায় পুংখানুপুংখভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ

করার চেষ্টা চালান। এই গবেষণায় তিনি মানব সমাজের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, নব্য ও পুরাতন যুগ, উত্থান ও পতন সকল অবস্থার দিকে সমান নজর দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইবনে খালদুন সমাজের সুপরিসর ভিত্তির উপর ইতিহাসকে দাঁড় করিয়ে গেছেন; তাঁর পূর্ববর্তী আর কেউ ইতিহাসকে এভাবে গ্রহণ করেন নাই।'

সমাজতত্ত্ব আলোচনায় ইবনে খালদুন পুরো বিষয়টিকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। তাহলো-

১. সাধারণ মানব সমাজ, তার প্রকারভেদ এবং বিশ্বে তার ভূমিকা।

২. যাযাবর সমাজ, উপজাতি ও জাতির উদ্ভব।

৩. রাষ্ট্র, খেলাফত, সার্বভৌমত্ব ও শাসকের কার্যাবলী।

৪. সভ্য সমাজ, দেশ, শহর ও নগরী।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও জীবিকা অর্জনের উপায়।

৬. বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং সে সব আরম্ভের পদ্ধতি।

শুধুমাত্র এ বিষয়গুলো দেখলেই বুঝা যায় তিনি কত গভীরভাবে সমাজকে নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি সমাজের উৎপত্তির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য তিনটি-

১. মানুষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

২. মানুষ সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে সুস্থ সমাজ জীবন যাপনের অভিলাষী এবং

৩. জীবন ধারণের জন্য তারা দলবদ্ধভাবে থাকতে আগ্রহী।

সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন : মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব থেকেই সমাজের সৃষ্টি হয়। আর সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে এবং অন্যায়ভাবে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের দমনের নিশ্চিত প্রয়োজন দেখা যায়- এ প্রয়োজনের ফল হিসাবেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।' সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মতামত ছিল মৌলিক চিন্তা-ধারার ফসল। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অনুপ্রেরণা আসে গোষ্ঠী সংহতি থেকে। এই সংহতিতে তিনি 'আসাবিয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'আসাবিয়া' অর্থ 'জাতি সমষ্টি বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা।' এ সম্পর্কে তিনি ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র বা সরকার তিন প্রকার - ধর্মভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক এবং দার্শনিকদের আদর্শ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক আয়ু বেশী হলে চার পুরুষ আর এ চার

পুরুষ পরিবর্তনের পর পাঁচটি পর্ব অতিক্রম করে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। এ সংশ্লিষ্ট বর্ণনায় তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক কারণ এর অন্যতম। Prof. Rosenthoal বলেন : 'ইবনে খালদুন হচ্ছেন মধ্যযুগের প্রথম চিন্তানায়ক যিনি রাষ্ট্রনীতিতে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংগঠিত যে কোন সমাজের সার্বিক জীবনে অর্থনীতির গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি করেন।'

ইতিহাস-দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইবনে খালদুনের এই গভীর চিন্তাধারা ছিল তাঁর যুগের চাইতে কয়েক শতাব্দী অগ্রগামী। তাই আধুনিক কালের সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলি, ভিকো, গীবন, মন্টেস্কো এ্যাডম স্মিথ, অগাষ্ট কোঁতে, টিটকানো ক্লাসিও, নোথালিয়েল স্মিড প্রমুখকে, তাঁর সম্পর্কে উচ্চ মন্তব্য করতে দেখা যাচ্ছে। এদের কয়েকজন তো খালদুন চিন্তায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। R. A. Nicholson-এর ভাষায়- His intellectual descendants are the great medieval and modern historians of Europe- Machiavelli and Vico and Gibbon.

Arnold Joseph Toynbee-এর মন্তব্য- Thucydides, Machiavelli and Clarendon are brilliant representatives of brilliant times and places. Ibn Khaldun is the sole point of light in his quarter of the firmament. এর সাথে Dr. Buddha Prakash -এর স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করা যায় - Ibn Khaldun flashed like a solitary star in a pervassive pall of darkness. He is the father of sociology, the scientific method of human studies and the originator of the philosophy of history.'

আল বিরুনী ঃ সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতা

উক্ত আলোচনায় আরেকটি নাম উল্লেখের দাবী খুব যুক্তিসংগত। তিনি হচ্ছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক এবং পরিব্রাজক আবু রায়হান আল বিরুনী (জন্ম ৩৬১ হি./ ৯৭৩ খৃ.)। বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় তাঁর অবিশ্বাস্য বিচরণ ছিল। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলো নতুন ধরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করেছে।

'আল আসরারুল বাকিয়া আনাল কুরুনিল খালিয়া' পুরাকালের বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাস। এতে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। এম. আকবর আলী জানিয়েছেন- 'সমস্ত গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গণনায় ভরপুর। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি গ্রন্থের সংখ্যা

অতীব বিরল। মধ্য এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত বা অধুনা বিলুপ্ত বর্ষ গণনা পদ্ধতি, পর্বাদি, ধর্ম-কর্মের নিয়মকানুন ইত্যাদির এমনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আল বিরুনী ছাড়া অন্য কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। কোন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করলেও এর চেয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আল বিরুনী যে সমস্ত উৎস থেকে অধুনা বিলুপ্ত বিষয়গুলোর উদ্ধার সাধন করেছিলেন সে সমস্ত উৎস বর্তমানে যে কোন লেখকের আয়ত্বের বাইরে। সে হিসেবে এর মৌলিকত্ব যে চিরকালের জন্য অবিনশ্বর রয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।'

ভারতের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা 'কিতাবুল হিন্দ'। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এ রকম বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সর্বপ্রথম। আল বিরুনীই সর্বপ্রথম Scientific Indologist. ড. সুনীতি কুমারের মতে সর্বপ্রথম কেবল নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তিনি বলেন : "Al-Biruni is distinguised as one of the greatest scholars of medieval time, a polymath who was equally at home in mathematics and theology, astronomy and philosophy, chemistry and chronology, history and ethnography, and medicine and cosmography and whose special preeminence was that he was the first of scientific Indologists and one of the greatest of all time." আজ ভারতের যে কোন ধরনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় 'কিতাবুল হিন্দ' একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আল বিরুনীর শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে এ একটি গ্রন্থই তাঁর অমরত্ব এবং প্রজ্ঞার পরিচয় হিসাবে যথেষ্ট। ইতিহাসকে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইবনে খালদুন আর তাঁরও পূর্বে প্রায় তিনশত বছর পূর্বে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন খারিজমের সন্তান আল বিরুনী।

বিশিষ্ট কয়েকজন ঐতিহাসিক

আমাদের আলোচিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় এবং বৈশ্বিক পটভূমিতে পরিচিত। এঁরা অধিকাংশই মূলধারার ঐতিহাসিক, অবশ্য আঞ্চলিক ঐতিহাসিকদের নাম ও রচনা এর মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অবকাশে উপ-মহাদেশ তথা এশিয়া অঞ্চলের খ্যাতিমান মধ্যযুগের কয়েকজন

ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা হবে। এঁদের মর্যাদা আধুনিক ইতিহাসের ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাদের অবদান যে কোন দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কম নয়। দেশের বা অঞ্চলের অধিবাসী নয়, অথচ আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের কারণে কোন কোন রচনা ইতিহাসের উৎস হিসাবে গণ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব পর্যটক মুহাম্মদ ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খৃ.) -এর রচিত চার খণ্ডে প্রকাশিত 'রিহলা' এর নাম উল্লেখ করা যায়। বিশ্বভ্রমণ কাহিনী হলে ও এই ধরনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত। ইতিহাসের পদ্ধতিতে শৃংখলিত রচনা না হলেও এসব রচনায় জড়িয়ে থাকে সমসাময়িক আঞ্চলিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

ইতিহাসে ব্যাপক কাজ করেছেন অথচ খ্যাতি লাভ করেননি, এমন একজন ঐতিহাসিক হলেন মীনহাজ সিরাজ আল্ জোরজানী (১১৯৩-১২৬৫)। তাঁর পূর্ব পুরুষ জোরজান হতে গজনীতে আগমন করেন; সম্ভবত লাহোরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪৫ খৃ. সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১২৫১ খৃ. সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ তাকে দিল্লীর প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

মীনহাজ সিরাজের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাত-ই-নাসিরী' ১২৬০ খৃ. রচনা সমাপ্ত হয়। তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে ইন্তিকাল করেন। ২৩ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে আদম থেকে আরম্ভ করে মুসলিম জাহানের সকল ঘটনা ও মালিক-সুলতানদের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচনা, প্রত্যেক রাজ বংশের উপর পূর্ণ আলোকপাত এবং তাদের কীর্তিসমূহ তুলে ধরাই এই রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক খণ্ডের বিয়ষবস্তু হলো, ১. আদম থেকে মুহাম্মদ (সা.) ২. খোলাফায়ে রাশেদা ও আশারায়ে মুবাশ্শারাহ, ৩. উমাইয়া বংশের ইতিহাস, ৪. আব্বাসীয়া বংশ, ৫. আজম দেশে প্রবর্তিত পাঁচটি রাজবংশের বর্ণনা, দাদন, কিয়ানিয়া, সাসানিয়া, আকাসিরা সহ ইরানের নৃপতিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৬. তোব্বাহ এবং ইয়েমেনের মালিকদের ইতিহাস, ৭. মুসলিম তাহিরী বংশের ইতিহাস, ৮. সিজিস্তানের সাফারিয়া বংশের ইতিহাস, ৯. সামানি বংশের ইতিহাস, ১০. ইরাকের দিয়ালমাহ্ মালিকদের বর্ণনা, ১১. সবুক্তগীন প্রতিষ্ঠিত ইয়েমেনিয়া ও মাহমুদিয়া রাজবংশ, ১২. সলজুক রাজবংশের ইতিহাস, ১৩. সুলতান সনজরের অনুচরদের শাসনকাল, ১৪. সিজিস্তান ও নিমরোজ মালিকদের বর্ণনা, ১৫. শামের কুর্দী মালিকদের বিবরণ, ১৬. খারিজমের শাহী রাজবংশ, ১৭. শনসবী রাজবংশ ও ঘোরের

মালিকদের ইতিহাস, ১৮. তুকারিস্তান ও কামিয়ানের বর্ণনা, ১৯. গজনীর সুলতানদের বর্ণনা, ২০. ভারতে মুইজ্জু সুলতানদের বর্ণনা, ২১. শাম্‌সুদ্দীন ইলতুৎমিশ বংশের বর্ণনা, ২২. ভারতের শামসিয়া মালিকদের বর্ণনা ২৩. তুর্কী অভ্যুত্থান ও চেঙ্গিস খান প্রভৃতির বিবরণ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বিশাল গ্রন্থটি লেখা হলেও এর প্রকাশনা আলো দেখে কয়েকশত বছর পর। গ্রন্থটির হস্তলিখিত ও বিভিন্ন নকলের পাণ্ডুলিপি সেন্ট পিটাসবার্গ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগার, হায়লিবারী কলেজ ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ছিল। ১৮৬৪ সালে W.N Lees কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কয়েকটি খণ্ড কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে মেজর H.G. Raverty কর্তৃক ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মূল ফার্সী থেকে গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে ১৮৮১ খৃ. প্রকাশ করা হয়। আফগান পণ্ডিত আবদুল হাই হাবিবী কান্দাহারী ১৯৬৫ সালে পুনর্বার এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, 'তবকাতে নাসিরী'র বাংলাদেশ সম্পর্কিত ইতিহাসের শেষের দিকের ৩টি খণ্ড অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। বাংলা একাডেমী ১৯৮৩ সালে সেটি প্রকাশ করে।

খাজা হাসান নিযামীর 'তাজউল মাসির' ১২২৮/২৯ খৃ. রচিত হয়। ১২৯২ থেকে ১২২৮ খৃ. পর্যন্ত ভারতবর্ষে সংঘটিত ঘটনাবলী এতে মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় রচিত হয় জিয়াউদ্দীন বারানীর 'তারীখে ফিরোজশাহী'। ১৩৪৮ সালে ইস্‌মী রচনা করেন, 'ফতহুস্‌ সালাতীন'।

ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ্‌ সিরহিন্দি ১৪৩৪ সালে 'তারিখে মোবারক শাহী' রচনা করেন। মোগল আমলে রচিত হয় নিযাম উদ্দীন বলখীর 'তবকাতে আকবরী' আবদুল কাদির বাদাউনীর 'মুনতাখাবুত তওয়ারীখ', মোহাম্মদ কাশিম বিন হিন্দু খান ফিরিশতার 'তারীখে ফিরিশতা' উল্লেখযোগ্য। ফিরিশতার রচনার বিশিষ্টতা পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত। আরেকটি নির্ভরযোগ্য রচনা হাজী দবীরের (মৃ. ১৬১১) আরবীতে রচিত 'জাফর লি ওয়ালিহি'। আবুল ফজলের 'আকবর নামা' 'আইন-ই আকবরী', আব্বাস খান শেরওয়ানীর 'তারিখে শেরশাহী' মীর্জা নাথনের 'বাহারিস্থানে গায়েবী', গোলাম হোসেন সলীমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' (১৭৬৮) প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যযুগের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসকে ধারণ করেছে।

ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের যে প্রচেষ্টার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হলো তা থেকে মুসলিম জাতির ইতিহাস চর্চার ব্যাপকতা বুঝা যাবে। এই বৃহৎ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইতিহাস লেখার কোন নিছক প্রচেষ্টা ছিল না। বিশ্ব ইতিহাস রচনার এ সমস্ত প্রচেষ্টার বড় অংশই ছিলো মৌলিক প্রচেষ্টা। ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ উন্মোচন করেছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপ্ত বিভিন্ন শাখা প্রশাখার। 'রিজাল' তথা লক্ষ-লক্ষ সাহাবার জীবনেতিহাসের যে উজ্জ্বল দর্পণ তাঁরা আমাদের কাছে উপস্থাপন করে গেছেন তা পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়না। সাম্প্রতিক শতবর্ষের ইতিহাসের তথ্য খুঁজতে যেখানে আমাদের অতল সমুদ্রে ডুব দিতে হয়, সেখানে হাজার বছর পূর্বে এই সকল মনীষীগণের অক্লান্ত সাধনায় অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে আমরা জানতে পারছি নবী এবং সাহাবী উলামাগণের নিখুত জীবনের সব খুঁটিনাটি তথ্যাবলী। এজন্য একজন ঐতিহাসিক লিখেন ঃ "প্রাচীন যুগেও ইতিহাস রচনার প্রয়াস ছিল। তবে সে যুগের ইতিহাসের ঘটনাবলী ছিল অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস রচনা শুরু করেন।... বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল আরব ইতিহাসবিদদের সাধনা।"

তিনি আরো লিখেছেন ঃ "মুসলমান পণ্ডিতগণ ইতিহাস বিজ্ঞানের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমান যুগে আমাদের নিকট এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বর্তমান যুগে মৌলিক গবেষণার দ্বার প্রায় বন্ধ। কিন্তু যে যুগে কোন পুস্তক ও পরামর্শ করার মত মনীষীর সাক্ষাত মিলিত না, সেই যুগে গ্রন্থের পর গ্রন্থ লেখার কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।" মুসলমানদের এই অসাধারণ জ্ঞান সাধনা স্মরণ করেই Sedillot মন্তব্য করেছেন ঃ The vast literature, which existed during that period, the multifarious productions of genius, the precious inventions, all of which attest a marvellous activity of intellect, justify the opinion that the Arabs were our masters in every thing, They furnished us, on the one hand, inestimable materials for the history of the Middle Ages, with travels, with the happy idea of biographical dictionaries........."

সমর বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

বিনা কারণে যুদ্ধ নয়– এটা ইসলামের মৌলিক নীতি। ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্ম প্রচার এবং মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই শুধু ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। এ বিষয়ে ইসলামের বাণী খুব স্পষ্ট। অন্যের সাথে শত্রুতা অপরিহার্য হয়ে পড়লে মুসলিম আইনের বিধান হলো তাদের সাথে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা। কেউ কেউ মনে করেন, কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি মীমাংসার তিনটি বিকল্প উপায় ইসলামে আছে। তা হলো ঃ ইসলাম গ্রহণ করা, জিযিয়া কর প্রদান করা এবং যুদ্ধ। কিন্তু এটা ধারণা মাত্র। ইসলামের বিজয় অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে এই তিনটি নীতি ছাড়াও মহানবী (সা)-কে আমরা দেখেছি অনেকগুলো চুক্তি, সন্ধি সম্পাদন করতে, যা তাঁর উত্তরসূরীরাও অবলম্বন করেছেন।

হুদায়বিয়া সন্ধিতে আপাত অপমানকর কিছু ধারা ছিল, কিন্তু শান্তির স্বার্থে বিশ্বনবী (সা) তা মেনে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধিগুলো পরীক্ষা করে দেখলে, এর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমরা বুঝতে পারি। তা হলো, স্বাধীনভাবে ধর্মমত প্রচার এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালনের অধিকার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি শর্তই কেবল ইসলামী যুদ্ধ নীতির মূল কথা নয়। নৃশংসতা, হত্যাযজ্ঞ এবং যুদ্ধ যদি শুধু জিঘাংসার কারণে হয়ে থাকে তাহলে তার পরিণতি হবে বেদনাদায়ক, অকল্পনীয়। মানবিকতা ও শান্তি বিবর্জিত যুদ্ধনীতির অনুমতি ইসলাম দেয়নি। এ কারণে আমরা দেখেছি ইসলামের বিজয় ক্ষণস্থায়ী হয়নি। যেখানেই ইসলামের বাণী পৌঁছেছে সেখানকার জনগোষ্ঠী ইসলামকে শান্তির আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মুসলিম সমর নীতির যে ধারণা গড়ে দিয়েছেন মহানবী (সা) তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অসামান্য দলীল। বর্তমান ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আধিপত্যবাদের দুনিয়ায় বড় শক্তিগুলো টিকে রয়েছে শুধু সামরিক শক্তিবলে। তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র স্বার্থ, আদর্শের বালাই নেই সেখানে। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা কোন ন্যায়নীতির তোয়াক্কা করে না। জেনেভা কনভেনশনের যে নীতির কথা বলা হয় অহরহ, তা সাম্প্রতিক

আফগান যুদ্ধে (২০০১ খৃ.) এবং ইরাকে নগ্ন মার্কিন হামলায় (২০০৩) প্রতিক্ষণে লঙ্ঘিত হয়েছে ও হচ্ছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই পরিত্যক্ত জেনেভা নীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারা মহনবী (সা)-এর যুদ্ধ বিষয়ক নীতিমালা থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অসংখ্য মুসলিম কনসেপ্ট গৃহীত হয়েছে। দেখা যাবে, একটি শতাব্দীও পার হয়নি এ সব উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা আবিষ্কারের। অথচ দেড় হাজার বছর আগেই ইসলাম তার শাশ্বত বাণীর মাঝে এ সকল নীতি ঘোষণা করেছে।

ইসলামের সমর নীতির বৈশিষ্ট্য

১. সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য ধর্ম ও নৈতিকতা কঠোরভাবে পালন করবে। মদ্যপান, ব্যভিচার ও লুটতরাজ একেবারে নিষিদ্ধ।

২. যুদ্ধক্ষেত্রে নামায ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ত্যাগ করা যাবে না।

৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গাণীমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্র পাবে। রাষ্ট্রের অসহায়দের জন্য এ অর্থ জাতীয় সম্পদে পরিগণিত হবে।

৪. অন্যায় প্রতিহত করা এবং আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হবে।

৫. যুদ্ধে প্রথম আক্রমণ করা যাবে না।

৬. 'আল্লাহু আকবার'ই হবে মুসলিম মুজাহিদদের রণহুংকার

৭. যুদ্ধে অসহায় বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, রুগ্নব্যক্তি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অসামরিক ব্যক্তিদের আঘাত করা যাবেনা।

৮. জীবজন্তু, পশুপাখী, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ীর ওপর হস্তক্ষেপ নয়।

৯. রাষ্ট্রদূত হত্যা করা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী ঘোষিত হয়।

১০. শত্রু হোক, সৈন্য হোক আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দেয়া হবে।

১১. যুদ্ধ চলাকালীন অথবা যুদ্ধের পূর্বে বা পরে শত্রুর পক্ষ শান্তি প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হবে।

১২. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা হবে।

এই নীতিগুলো ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য যুদ্ধে বাস্তবায়িত হয়। অনেক অমুসলিম সমালোচকরাও মুসলিম যুদ্ধের নীতিমালার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ক্রুসেড যুদ্ধে বীরবাহু সালাহ উদ্দীনের প্রাণের শত্রু রিচার্ডের প্রতি তিনি যে মমত্ববোধ দেখিয়েছেন, তা রূপকথাকেও হার মানায়। তারও বহু পূর্বে মহানবী (সা) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষিত

বন্দীদের দশ জন করে মুসলিম নিরক্ষরকে জ্ঞান দানের পরিবর্তে মুক্তির ব্যবস্থা করে তিনি নতুন পথের দ্বার উন্মোচন করেছেন। যুদ্ধের সকল ক্ষেত্রেই মহানবী (সা) ছিলেন একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শের নমুনা। যে কোন অর্থেই তিনি বিশ্ব বিজয়ী জেনারেলদের মুকুটমণি হবার দাবীদার। যুদ্ধের স্থান নির্বাচন, মনোবল, ব্যক্তিগত বীরত্ব, রণকৌশল এবং যুদ্ধ পরবর্তী ব্যবহারে এমন নিপুণ দৃঢ়চেতা আবার মমতাপূর্ণ সিপাহসালার পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

মেজর জেনারেল আকবর খান লিখেন ঃ 'মরুভূমির কঠিন ও কষ্টকর জীবনে তিনি আবাস ও সফর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবার, যুদ্ধ ও সন্ধি সবকিছুরই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। প্রকৃতিদত্ত যোগ্যতাও অভিজ্ঞাতার এটাই ছিল সমন্বয় যে, তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে ও সর্বাধিক সফল জেনারেল এবং সর্বোত্তম শাসক প্রমাণিত হন। প্রতিরক্ষা রাজনীতিতে তিনি যে সব কৌশলের মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে তিনি যে রণনৈপুণ্যের প্রমাণ দেন সাড়ে তেরো শতাব্দী কালের সকল উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও দুনিয়া এর চেয়ে আগে বাড়তে পারেনি।'

মহানবী (সা) অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ২৭টি যুদ্ধে নিজে সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের সামরিক সংগঠন

মহানবী (সা)-এর আমলে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ রেজিষ্ট্রী বইয়ে নিজেদের নাম লিখাতেন। (বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়/১৪০) মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শত্রুদের হতবুদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, স্বল্প সময়ের নোটিশে মূল বাহিনীর সাথে সৈন্যদের যোগ দেয়ার জন্য। কৌশল হিসেবে আঁকাবাঁকা পথ ধরে তিনি মদীনা হতে যাত্রা শুরু করেন এবং বিভিন্ন সেনাদল মূল বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে, ফলে মুসলিম বাহিনী বিশালাকার ধারণ করে।

সুশৃংখল বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। নবী (সা)-এর জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ এবং জন্তুদের দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি নিজে উপস্থিত থাকতেন এবং বিজয়দের পুরস্কার বিতরণ করতেন। মদীনায় 'মসজিদে আস্ সাবাক' বা দৌড়ের মস্জিদ আজো সে স্মৃতি বহন করছে। তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার মতো প্রশিক্ষণের উপর তিনি সার্বক্ষণিক গুরুত্বারোপ করতেন। এছাড়া, পাথর নিক্ষেপ, কুস্তি এবং সাঁতার শিক্ষায় তিনি উৎসাহ দিতেন।

মহানবী (সা)-এর একটি পরামর্শক পরিষদ ছিল। অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা ছিল এ সকল অফিসারদের যোগ্যতার মাপকাঠি। সামরিক গোয়েন্দাকে তিনি যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে নিয়েছিলেন। শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহ এবং গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গোয়েন্দাগিরির বিকল্প নেই। শান্তির জন্য সন্ধি এবং কূটনীতিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে জিহাদের গুরুত্ব এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন। উৎসাহ ও প্রচারমূলক কবিতা প্রচারের জন্য তিনি কবিদের নিয়োগ করতেন। মুসলিম মুজাহিদদের সহসিকতা ও বীরত্বের যে সকল হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে তা আজো জীবন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় 'Mosscomes' শব্দটি রণকৌশলের সার সংক্ষেপ রূপে চিহ্নিত। এই শব্দের পরিপূর্ণ পরিচয় হলো ঃ

M -	movement	অর্থাৎ	কৌশলপূর্ণ গতিবিধি,
O -	offensive	অর্থাৎ	আক্রমণাত্মক,
S -	surprise	অর্থাৎ	অতর্কিত আক্রমণ,
S -	security	অর্থাৎ	নিরাপত্তা,
C -	co-operation	অর্থাৎ	সহযোগিতা,
O -	objective	অর্থাৎ	লক্ষ্য,
M -	mass	অর্থাৎ	জনশক্তি,
E -	economy of force	অর্থাৎ	সেনাশক্তির মিতব্যয়,
S -	simplicity	অর্থাৎ	সারল্য।

মাহমুদ গানদুয নামে এক তুর্কী জেনারেল তার পুস্তকে মহানবী (সা)-এর সমর কৌশলের সাথে আধুনিক সমর কৌশলের একটি সূক্ষ্ম ও তুলনামূলক বিবরণ দিয়েছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন, তথাকথিত এই 'Mosscomes'-এর যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে মহানবীর রণনীতিতে।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে (৬৩২-৬৬১ খৃ.) সামরিক ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আলী (রা)-এর শাসনকালে মুসলিম জাহানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার। হযরত উমার (রা) সামরিক বাহিনীর যথাযথ পারশ্রমিক নির্ধারণ ও বণ্টনের ভার 'দীওয়ানের' উপর অর্পণ করেন। আরব যোদ্ধা ও তাদের মাওয়ালীরা প্রত্যেকে তিন থেকে চারশত দীনার লাভ করতো, শহীদ পরিবারকে মাথাপিছু একশত দিরহাম দেয়া হতো।

এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্য ৯টি সামরিক বিভাগ তথা জুন্দ-এ বিভক্ত ছিল। মদীনা, কূফা, বসরা, মওসিল, ফুস্তাত, মিশর, দামিশ্ক, হিমস্ এবং প্যালেস্টাইন- এই নয়টি ঘাঁটির প্রত্যেকটিতে ৪ হাজার অশ্ব এবং ৩৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা প্রস্তুত থাকতো। এ ছাড়া সমৃদ্ধশালী নগরী বন্দর, উপকূল এবং সীমান্ত এলাকায় ছোট ছোট সামরিক ঘাঁটি ছিল।

সৈন্যদের চার মাসের বেশী স্বজন হতে দূরে অবস্থান করতে হতো না। ব্যাপক চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকতো। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ, স্কাউট প্রভৃতি শ্রেণীর সৈন্য ছিল। প্রতি দশ জনের মধ্যে 'আমীরুল আশরাহ' নামে একজন নেতা নির্বাচিত করে দেয়া হতো। প্রতি একশত জনের উপরে থাকতো একজন লেফটেন্যান্ট বা 'আল কায়েদ'। এভাবে প্রতি দশজন আল কায়েদের উপর থাকত একজন সেনাধ্যক্ষ বা 'আল–আমীর'।

এ সময়েই মুসলিম বাহিনী এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। রোমান, পারস্য সাম্রাজ্যের জাঁকজমককে এই দুর্ধর্ষ বাহিনী নিমিষে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়।

উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খৃ.) মুসলিম সামরিক সংগঠন নতুন নতুন অভিধায় সমৃদ্ধ হয়। অনেক ধরনের ইউনিটে এই শক্তির সম্প্রসারণ ঘটে। বিশেষ করে নৌবাহিনীর কথা বলতেই হয়। উমাইয়া যুগ প্রধানত যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগরূপে চিহ্নিত। হাজ্জাজের সময় কূফা ও বসরায় সামরিক কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা হয়। দশ, একশত, এক হাজার সংখ্যার সৈন্য নিয়ে এক একটি ইউনিট গঠিত হতো। একশত সৈন্যের দশটি ইউনিট নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'কুরদুস' ইউনিটসমূহ।

উমাইয়াদের প্রথমদিকে স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং তাদের জন্য বছরে ব্যয় হতো ৬ কোটি দিরহাম। সর্বশেষ উমাইয়া খলীফার আমলে সৈন্যসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ১২ হাজার হয়।

আব্বাসীয় আমল (৭৫০-১২৫৮ খৃ.) সামরিক দিকের চাইতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অধিক নিবেদিত ছিল। এ সময় সঠিক অর্থে কোন সুসংগঠিত বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিল না। সৈন্যদল ছিল অস্থায়ী. যুদ্ধের সময়ই তাদের ডাকা হতো। বেদুইন, কৃষক ও শহরবাসীদের মধ্য হতে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হতো। রাজকীয় দেহরক্ষীরা উন্নত পরিচ্ছদ ও ভাতা লাভ করতো। খলীফা আল মুতাওয়াক্কীলই (৮৪৭-৮৬১ খৃ.) প্রথম তরবারী ব্যবহারের জন্য কোমরবন্ধের

প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক তীরন্দাজ বাহিনীর সাথে কিছুসংখ্যক সৈন্য থাকত, যারা শত্রুসৈন্যের প্রতি গরম তেল নিক্ষেপ করতো।

ইসলামের ইতিহাসের এই কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও উপমহাদেশের শত শত বছরের মুসলিম শাসনে মুসলিম সামরিক সংগঠনে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। মুসলিম স্পেনে (৭১২-১৪৯২ খৃ.) চারটি পদ্ধতিতে সংগৃহীত হত সৈন্য। ১. স্থায়ী সৈন্য, ২. সামরিক জায়গীরদারদের দ্বারা গঠিত নিয়মিত সৈন্য, ৩. অনিয়মিত সৈন্য, ৪. প্রয়োজনের সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। প্রথমদিকে সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে দেয়া হতো জায়গীর। দেশীয় আরব, হিমারীয় মুদারীয়, বার্বার ও নও মুসলিমদের মাঝে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার অভাবের ফলে শাসকরা বিদেশী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

প্রথম আবদুর রহমানের আমলে ছিল (৭৫৬-৭৮৮ খৃ.) ৪০ হাজার বার্বার সৈন্য। প্রথম হাকাম (৭৯৬-৮২২ খৃ.) সংগ্রহ করেছিলেন ৫০ হাজার মামলুক সৈন্য। দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৫২ খৃ.) কর্ডোবার নাগরিকদের বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খৃ.)-এর দেড় লক্ষ সৈন্য ছিল। তিনি সেনাবাহিনীতে আরব প্রভাব খর্ব করতে স্লাভ বাহিনী গঠন করেন।

মুসলিম স্পেনের সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে বিভিন্ন প্লাটুন, কোর ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল। আমীর, রায়াহ, কায়েদ, নকীব, আরিফ, নাজির, সাহিবুল আরজ ইত্যাদি ছিল বিভিন্ন সৈন্যসংখ্যার দলের নাম। আর মোগল সম্রাট আকবর তার লম্বা শাসনকালে যে সংস্কার কর্ম করেছিলেন তন্মধ্যে সৈন্য সংগঠনের উপর কৃত 'মনসবদারী প্রথা' ইতিহাস-বিখ্যাত।

মুসলিম সেনাবাহিনীর যুদ্ধ উপকরণ

মহানবী (সা)-এর সময় থেকে যুদ্ধে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতো তন্মধ্যে তীর, ধনুক, বর্শা-বল্লম, তলোয়ার, মানজানিক বা পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র, ঢাকনাযুক্ত এবং চালানো উপযোগী বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রও ব্যবহৃত হতো। যেমন– উহুদ যুদ্ধের সময় ওয়াহশী অনেক দূর থেকে অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করে নবীজীর পিতৃব্য হযরত হামযাকে শহীদ করেছিল। ঢাকনাযুক্ত যে গাড়ির কথা বলা হলো, সেগুলো দেয়াল ধ্বংস বা ভেঙে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হতো। সৈন্যরা ঢাকনাযুক্ত গাড়ীর মধ্যে থেকে খনন কার্য চালাতো এবং গাড়ীর ঢাকনা তাদেরকে

শত্রুসেনাদের তীর, বর্শা ও পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদ রাখতো। অভিনব পদ্ধতিতে পরিখা খনন এবং শত্রুর প্রতি পাথরের কৃত্রিম বস্তু নিক্ষেপ, শত্রুপথ লক্ষ্য করে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালপালা নিক্ষেপ করে পথ কন্টবণকীর্ণ করা তখনকার অন্যতম যুদ্ধ কৌশল হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল।

মুসলমানদের প্রাথমিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল একেবারেই সাধারণ। পরে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত অস্ত্রই তাদের মওজুদকে সমৃদ্ধ করে। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে মুসলিম বাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুর্ধর্ষ বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহর প্রতি প্রশ্নহীন নির্ভরশীলতা, দক্ষতা এবং শৃংখলার কঠোর অনুশীলনের কারণে অল্পসংখ্যক সেনাদল বিশাল বিশাল রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন যুদ্ধাস্ত্রের উদ্ভাবন এবং পুরানো যুদ্ধাস্ত্রের উন্নয়নে ও মুসলিম সমরবিদরা এগিয়ে এসেছেন। খিলাফতের শেষভাগে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ অবরোধকারী যন্ত্রসহ সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার শিখে ফেলে। রসদ সংগ্রহ, যানবাহন, তাঁবু স্থাপন কাজে তারা অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে। আত্মরক্ষার অভিনব কৌশল তাদের হাতে আবিষ্কৃত হয়। মুসলিম সমরাস্ত্র উন্নয়নে উমাইয়া যুগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে অন্যান্য অস্ত্র ছাড়াও দুর্গ অবরোধকালে ক্ষেপণাস্ত্রের সফল ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। আর নৌ শক্তির কথা একটু পরেই আলোচিত হবে।

গ্রীকরা যুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রাচীন সারথি। গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস ট্রয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাঠের বহু সমরাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। উমাইয়া আমলে খালিদ বিন ইয়াযিদ মুসলিম জাহানে প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে। তিনি গ্রীক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে জেনেছিলেন এবং মুসলিম সমরাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি উমাইয়া আমল থেকেই হয়।

৭১০-৭১২ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের সিন্ধু উপকূলে মুহম্মদ বিন কাসিম প্রথম আরব অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে তিনি কাষ্ঠনির্মিত উন্নতমানের অস্ত্র ব্যবহার করেন। অবরুদ্ধ দুর্গ প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য তিনি 'মিনজানিক' নামক এক প্রকার কামান ব্যবহার করেন। কাষ্ঠনির্মিত এই অস্ত্র থেকে দ্রুতবেগে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হতো। ফলে যতো শক্তিশালীই হোক, কোন দুর্গ প্রাচীর এই আক্রমণের সামনে টিকতে পারতো না।

সিন্ধুরাজ দাহিরের দেবল আক্রমণের সময় মিনজানিকের মাধ্যমে দুর্গের কয়েকদিক ভেঙ্গে ফেললে দেখা গেল দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করছে না। ইত্যবসরে এক পালাতক ব্রাহ্মণ এসে জানালো, হিন্দুদের বিশ্বাস যে মন্দির-শীর্ষে

পতাকা যতক্ষণ উড্ডীন থাকবে, ততক্ষণ কেউ দুর্গের পতন ঘটাতে পারবে না। স্বয়ং দেবতা নাকি দুর্গ রক্ষা করবেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের রহস্য জানতে পেরে মুহাম্মাদ বিন কাসিম দুর্গের মধ্যবর্তী সর্ববৃহৎ মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়াটি মিনজানিকের আঘাতে গুড়িয়ে দেন। ফলে দুর্গবাসীরা অচিরে আত্মসমর্পণ করে। উল্লেখ্য, মনে করা হয় যে উক্ত 'মিনজানিকই' আধুনিক কামানের আদি জনক।

আরবরা 'দব্বাবা' নামক আরেকটি সমরাস্ত্র আবিষ্কার করেন। একে টেনে নিতে পাঁচ ছয়শত লোকের দরকার পড়তো। নিচের দিকে অসংখ্য চাকা লাগানো এই বিশাল যন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো কৃত্রিম কাঠের দুর্গ। এর সম্মুখ ভাগ এমন শক্ত কাঠের নির্মিত ছিল যে, কোন আঘাতেই এটা ভাঙা যেতো না। একদল সুদক্ষ সৈন্য এর কাঠের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো। শত্রু দুর্গের প্রাচীরের উচ্চতার চেয়ে এর উচ্চতা হতো অনেক বেশী। দববাবাকে শত্রু দুর্গের প্রাচীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আরব সৈন্যরা এই কৃত্রিম দুর্গের শিখরে উঠে শত্রু দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্গ দখল করে নিতো। এই কৃত্রিম দুর্গ টেনে নিয়ে যাবার সময় সৈন্যরা রহস্য করে বলতো, তারা 'আরূম' বিয়ের কনে নিয়ে যাচ্ছে।

আব্বাসীয় শাসনামলে যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার জন্য সৈন্যবাহিনীর সাথে কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার থাকত। এ রূপ একজন প্রকৌশলী ছিলেন ইবনে সাবির আল মানজানিকী। খলীফা আন্ নাসিরের সময়ে তিনি যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ লিখে যান। খলীফা হারুন-অর-রশীদই (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) প্রথম যুদ্ধে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন।

মুসলিম নৌবাহিনী

মহানবী (সা)-এর যুগে মক্কার নির্যাতিত মুসলিম মুহাজির আবিসিনিয়ায় নৌযাত্রা, আশারীদের নৌপথে ইয়েমেন হতে মদীনা হয়ে জারে যাত্রা এবং তামীম আদ্ দায়রী এর দুঃসাহসিক অভিযান ছাড়া নৌ যুদ্ধের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ইবনুল আসাকির রচিত 'হিস্ট্রি অব দামাস্কাস' গ্রন্থে।

অষ্টম হিজরীতে আশার গোত্রের এক সাহাবীকে নবী (সা) এক বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি একটি নৌকার সাহায্যে আকাবায় পৌছান। সেখানে যায়িদ বিন হারিসার বাহিনীর বালকাতে আগমন এবং সেখানে বাইজান্টাইন বাহিনী ও তাদের আরব মিত্রদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সংবাদ পান। তিনি কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছান এবং মুসলিম বাহিনীর পক্ষে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হন।

নবম হিজরীতে আরেকটি ঘটনা ঘটে। মহনবী (সা) ৩০০ সৈন্যের একটি দলকে আলকামা ইবনে মুজাজ্জিজ-এর অধীনে রবিউল আখির মাসে মক্কার সমুদ্র উপকূলে প্রেরণ করেন। সুয়াইরা বন্দরের অধিবাসীরা কিছুসংখ্যক নিগ্রোকে কয়েকটি নৌকায় দেখতে পায়। আলকামা তার দলবলসহ একটি দ্বীপে অবতরণ করেন। তখন দস্যুরা পালিয়ে যায়।

মহানবী (সা) একটি শক্তিশালী মুসলিম নৌবাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরবর্তীতে সাগরবক্ষে সত্যি সত্যিই মুসলমানরা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করে।

মিশর ও সিরিয়া বিজয়, রোমানদের যুদ্ধ জাহাজ ও সমুদ্র যুদ্ধ দেখে মুসলিম জাহানের প্রতিরক্ষার স্বার্থে তারা নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে। এজন্য এগিয়ে আসেন হযরত উমার (রা)-এর অধীনে বাহরাইনের শাসনকর্তা আ'লা ইবনে আল হাযরামী। পারস্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলো বিজয়ের জন্য তিনি নৌযানে সৈন্য পরিচালনা করেন কিন্তু তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়। খলীফা উমারের (রা) অনুমতি না নিয়ে এ দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি অপসারিত হন এবং এ ধরনের অভিযানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে হযরত মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান-এর প্রস্তাবে তাঁরই নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। ২৮ হিজরীতে মুসলিম নৌ অভিযান পরিচালনায় প্রথম বেছে নেন সাইপ্রাস দ্বীপ। প্রথম আক্রমণে ৭২০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সাইপ্রাসবাসীরা সন্ধিতে উপনীত হতে বাধ্য হয়। এ সাফল্যের ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলিম নৌবাহিনী পুনর্গঠিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের নৌশক্তি রোমানদেরও ছাড়িয়ে যায়।

নৌ-যুদ্ধে অসংখ্য রোমান নৌ-সেনা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এদের মধ্যে সাধারণ যোদ্ধা, জাহাজ মিস্ত্রি, কাপ্তান ও ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, এদের কাছ থেকেই মুসলিম নৌ-সেনারা নৌ-যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা লাভ করে। বন্দীদের কাজ দেয়া হয়েছিলো জাহাজ নির্মাণ করা, নৌ-সেনা তৈরী করা, রণপোতগুলোকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করে তার ওপর মুসলিম জওয়ানদের আরোহণ শিক্ষা দেয়া। এর ফলে অতি সহজে মুসলমানরা নৌ-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে আর সাগরের বুকে তাদের দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৌ-বহরকে মুসলমানরা বলতো 'উস্তুল' আর ভূমধ্যসাগরে ছিলো তাদের নৌ-ঘাঁটি। সিরিয়া, আফ্রিকা এবং স্পেনে স্থাপিত হয়েছিলো বড় বড় 'দারুস্ সানাআ'

বহুল ব্যবহারে 'তারসানা' ছিলো এই কারখানাগুলোর নাম। সমকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ 'তারসানা' নির্মিত হয়েছিলো উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে (৬৮৫-৭০৫ খৃ.) তিউনিসে। ভূমধ্য সাগর ও সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো দ্বীপকে মুসলিম শাসনাধীনে রাখাই ছিল এই তারসানা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। তিউনিসের পোতাশ্রয়ে নৌ-যুদ্ধের যন্ত্রাংশ তৈরী ও মহড়া অনুষ্ঠিত হতো। কিছু দিনের মধ্যেই তিউনিস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌ-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যিয়াদাতুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আগলাবের আমলে 'সাকালিয়া' বিজয়ের মাধ্যমে ভূমধ্য সাগরের সকল উপকূলবর্তী এলাকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম নৌ শক্তিকে মুকাবিলা করার মতো আর কোন শক্তিই তখন ছিলোনা। নৌবাহিনী প্রধান আসাদ ইবনে ফুরাদ ভূমধ্যসাগরে রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেন। সমকালীন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নৌ শক্তির ওপর এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানরা আরো বহু রণপোত কারখানা স্থাপন করে। শুধুমাত্র আন্ নাসিরের আমলে স্পেনে বিরাটকায় ২০০টি রণপোত বিদ্যমান ছিলো। সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখেন ঃ আরবরা ৩০৩ হিজরীতে ভূমধ্যসাগরের কিনারায় একটি পাহাড় খুড়ে এক বড় জাহাজ ঘাঁটি তৈরী করে, যেখানে দুইশত যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রাখা যেতো। এই জাহাজ ঘাঁটির নাম ছিল 'শীনি' এবং এর এক একটি জাহাজ এতবড় ছিল যে, তাকে চালানোর জন্য ১৪৩টি দাঁড় টানতে হতো। এর প্রত্যেকটিতে ছিল গোলাঘর। উল্লেখ্য গোলাঘর বলতে কামানের গোলা-বারুদ রাখার স্থানকে বুঝানো হতো।

সোনালী যুগে সাগরবক্ষে মুসলিম নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ভূমধ্যসাগরের গোটা উপকূল ভাগ বিশেষ করে মীওরাকা, মানওরকা, ইয়াবিসা, সারদানিয়া, সাকালিয়া, কওসারা, মাল্টা, ক্রীট, সাইপ্রাস প্রভৃতি এলাকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলের নৌপথসমূহ হিন্দুস্তানের উপকূল ঘেঁষে চীন, জাভা, সুমাত্রা ও মালয় প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এইসব নৌপথে ইসলামের ঝাণ্ডাই শুধু উড়তো না, বরং এর বদৌলতে জাভা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের পবিত্র আহবানও পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম সওদাগরেরা জাহাজ যোগে চীন ও ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্যদ্রব্য পশ্চিম দেশে পৌঁছে দিতেন। এই বাণিজ্য কাফেলাগুলোর উপকূলে অবতরণ ও অবস্থানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশসহ বহুবিখ্যাত উপকূলীয় অঞ্চলে কালক্রমে ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পায়।

আজকের দিনে পাশ্চাত্য নৌ-বহরের যে অধিকার সাগর-বুকে মুসলমানদের অবস্থান ছিলো তার চেয়ে সুদৃঢ়। আবদুল ওয়াহেদ সিন্ধি লিখেন ঃ ইবনে হুসাইন বংশের আমলে মুসলিম নৌবহর খৃষ্টান নৌ-বহরের ওপর এমনভাবে হামলা করতো, যেমন বাজপাখি তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সমগ্র সমুদ্র এলাকায় মুসলমানদের প্রভুত্ব কায়েম ছিলো। যুদ্ধ ও শান্তি সবসময়ই সাগরময় মুসলিম রণতরীর আনাগোনা লেগে থাকতো। কিন্তু খৃষ্টানদের একটি তখ্‌তাও ভূমধ্যসাগরে খুঁজে.পাওয়া যেতো না। তখন মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে কোন যুদ্ধ জাহাজ এ এলাকায় প্রবেশ করতে পারতো না। কিন্তু বাষ্পযুগ শুরু হওয়ার লগ্নে মুসলিম প্রশাসনে দীর্ঘদিনের অযোগ্যতা ও আরামপ্রিয়তা তাদের এই আধিপত্যকে খর্ব করে দেয়।

মুসলিম রণপোত কারখানা

আধুনিক রণপোত শিল্পের গোড়াপত্তন আরবদের হাতেই হয়। রোমকদের কাছ থেকে তারা জাহাজ চালনা ও নির্মাণ শিখলেও তারা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জাহাজ আবিষ্কার ও নৌ-বিদ্যায় নতুন নতুন পথ প্রদর্শন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষ্য, 'আরবরাই এই শিল্পে নতুনত্ব আনয়ন করেন। নতুন মডেল ও কৌশল আবিষ্কার করেন। তারাই সর্বপ্রথম নৌ-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দপ্তরের নাম ছিল 'দীওয়ানুল উস্তুল'। এই দপ্তরের অধীনে অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁরা রণতরীর নতুন নতুন মডেল ও নক্‌শা তৈরী করতেন।'

মুসলমানরা সর্বপ্রথম রণপোত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মিশরের 'ফুস্তাত' নামক স্থানে। ফাতেমীয়রা এটাকে 'মাকাসে' স্থানান্তর করে এর শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি দান করেন। এ সময় দু'ধরনের জাহাজ নির্মিত হতো। প্রথম প্রকার ছিল যুদ্ধ জাহাজ– একে আরবীতে বলা হতো 'উস্তুল'। আর অন্যগুলো বাণিজ্য জাহাজ– যার আরবী নাম 'নীলী'। নিম্নে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

শূনা ঃ এগুলো বিশালকায় জাহাজ। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে এতে থাকতো কিল্লা ও মিনার।

হারাকা ঃ এগুলোতে থাকতো 'মিনজানিক' কামান-যদ্দারা শত্রুদের উপর বিস্ফোরক, পাথর নিক্ষেপ করা হতো।

তারাদা ঃ ছোট ধরনের দ্রুতগামী নৌযান।

উশারিয়াত্ ঃ নীল নদে টহল দানের উপযোগী নৌযান।

শালানদিয়াত্ ঃ খবরাখবর পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত হতো।

মিস্তাহাত্ ঃ সাধারণ যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতো।

যুদ্ধ জাহাজগুলো ছিলো জঙ্গী ধরনের। এখানে যে সকল রণসম্ভার মওজুদ থাকতো তন্মধ্যে যিরাহ (লৌহবর্ম), খোদ (শিরস্ত্রাণ), ঢাল, নেযা, কামান, লৌহ জিঞ্জির, মিনজানিক, সিন্দুকে পাথর বিস্ফোরক, গরম চুন অন্যতম। নব আবিষ্কৃত সকল যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ জাহাজগুলো সজ্জিত করা হতো। জাহাজগুলো চারিদিকে মুড়ে দেয়া হতো চামড়া ও পশমী কাপড় দিয়ে, অদাহ্য বস্তুও এখানে ব্যবহৃত হতো, যাতে কোন আক্রমণে আগুন ধরে না যায়। শত্রুর নজর এড়াতে নিষ্প্রদীপ মহড়া এবং জাহাজের ওপর চড়িয়ে দেয়া হতো নীল রংয়ের কাপড়। রণতরীর চারপাশে লোহার নেযা ও লম্বা সূঁচালো লৌহদণ্ড স্থাপন করা হতো।

স্পেন, আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া, তিউনিস প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত রণপোত কারখানা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শৌর্যের পরিচয় বহন করতো। এখানে জাহাজ নির্মাণের যেসব কৌশল মুসলমানরা আবিষ্কার করে তা ইউরোপের সমরবিদরা লুফে নেয় এবং পরবর্তীতে নিজেদের কাজে লাগায়।

মুসলিম নৌ-বন্দর ঃ মুসলিম অধিকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নৌ-বন্দরগুলোর পরিচিতি দিলেই তাদের পরিব্যাপ্ত আধিপত্যের বিশালতা অনুভব করা যায়।

জার ঃ লোহিত সাগরের উপকূলে বর্তমান য়াম্বু বন্দরের নিকটে অবস্থিত ছিল। মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রথম দলটি এখানেই অবতরণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রথম রাজধানী মদীনার নৌবন্দর ছিল এটি। এখান থেকে বাণিজ্য তরীগুলো হাবশা, মিশর, এডেন, হিন্দুস্তান ও চীন পর্যন্ত যাতায়াত করতো। এ স্থানটি মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিলো।

উবাল্লা ঃ প্রাক-ইসলামী পারস্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর ছিলো। এটি দখলের ফলেই মুসলমানরা পূর্ণরূপে পারস্য সাম্রাজ্য অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়। ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত এই বন্দরের কেন্দ্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিলো।

বসরা ঃ হযরত উমারের (রা) নির্দেশে এই বন্দরটি 'কারনা' ও 'শাতিল আরবের' মধ্যস্থলে নির্মিত হয়। অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং উবাল্লার গুরুত্ব ম্লান করে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সিন্ধু বিজয়ের পর এক রওনক আরো বৃদ্ধি পায়।

সীরাফ ঃ বসরার অদূরে পারস্য উপসাগরে স্থাপিত অন্যতম জৌলুশপূর্ণ নৌবন্দর ছিলো সীরাফ।

এডেন ঃ ইয়েমেন উপকূলে অবস্থিত সুপ্রাচীন নৌবন্দর। হিজরী চতুর্থ শতকে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

সুহার ঃ আম্মানের রাজধানী ও নদী বন্দর। হিজরী চতুর্থ শতকে এই বন্দরটি স্বীয় ঔজ্জ্বল্য, বৈভবের প্রাচুর্য ও বর্ণাঢ্য বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সানা'র চেয়েও উন্নত ছিলো।

জেদ্দা ঃ জাহিলী যুগে মক্কার প্রধান নৌবন্দর, পরে আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাচ্যের হজ্জ যাত্রীদের বন্দরে পরিণত হয়।

শহর কুলযুম ঃ লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত সওদাগরী শহর ও বন্দর।

ঈলা ঃ বর্তমান নাম আকাবা। সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নৌবন্দর। এখানে সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্য তরী যাতায়াত করতো।

মাসীনা ঃ সিসিলির সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ও সামরিক বন্দর। এখানেই সিসিলির সর্ববৃহৎ রণপোত কারখানা স্থাপিত হয়েছিলো।

পালামো ঃ সিসিলির রাজধানী, রণপোত কারখানা ও বিশাল নৌবন্দরের জন্য বিখ্যাত। হাজার হাজার শ্রমিক মিস্ত্রি এখানে কাজ করতো।

মারীয়া ঃ স্পেনের সর্ববৃহৎ নৌবন্দর, বাণিজ্য ও রণপোত কেন্দ্র–স্বীয় বিশালত্ব ও যাতায়াত সুবিধার জন্য এটিকে স্পেনে প্রাচ্যের সিংহদ্বার বলা হতো। উন্নত মানের রেশমী কাপড় উৎপাদনের জন্যও এর খ্যাতি ছিলো।

বিজায়া ঃ আলজেরিয়া ও তিউনিসের মাঝে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকা ও মরক্কোর সর্বাধিক পরিচিত নৌবন্দর। ৪৫৭ হিজরীতে এর আবাদ হয়।

সাবৃতা ঃ মরক্কোর বিখ্যাত নৌবন্দর ও তৎকালীন পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম পোতাশ্রয় ছিল। স্পেনের উল্টোদিকে আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত।

মাহদীয়া ঃ ওবাইদুল্লাহ আল মাহদী ৩০০ হিজরীতে আফ্রিকার উপকূলে এটি নির্মাণ করেন। উপকূলের পাথর কেটে এটি নির্মিত হয়েছিলো।

তিউনিস ঃ এই সুপ্রাচীন বন্দরটি মুসলমানদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলো। বলতে গেলে এখান থেকেই মুসলিম নৌশক্তি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনা হয়। এই বন্দরটি অতি সুরক্ষিত এবং অপার্থিব শক্তি মহিমায় মতি। এখানে জাহাজ ভিড়ার পর নিরাপদ হয়ে যেতো ঝড়-তুফানের আশংকা থাকতো না।

শহর রশিদ ঃ এই বন্দরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো নীল নদের পানি সাগরে পতিত হওয়ার দরুন সাগরের জাহাজ অতি সহজেই নীল নদে প্রবেশ করতে পারতো।

শহর কাওস ঃ মামলুক আমলের সমৃদ্ধ বন্দর ও উপকূলীয় বৃহৎ শহর। মিশরের 'বন্দর সাঈদ' নামে খ্যাত।

দামিয়াত ঃ মিশরের সুবৃহৎ নৌ বন্দর ছিলো। এর এক প্রান্ত নীল নদের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত ছিলো। এখানে নৌ যুদ্ধের মহড়া অনুষ্ঠিত হতো।

আলেকজান্দ্রিয়া ঃ মিশরের সুবিখ্যাত পুরোনো বন্দর। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আমলে গ্রীকদের নির্মিত এই বন্দরের খ্যাতি আজো অম্লান।

মুসলিম বাতিঘর

সমুদ্রে নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হলো বাতিঘর। প্রাচীন ও প্রথম বাতিঘরটি নির্মিত হয় আলেকজান্দ্রিয়ায় দু'হাজার বছর আগে। এরপর সমুদ্রের স্থানে স্থানে বিভিন্ন বাতিঘর নির্মিত হয়। মুসলিম স্বর্ণযুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বাতিঘর তারা নির্মাণ করেন। সাধারণত জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে এসব বাতিঘর নির্মিত হতো।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন বাতিঘর রোয়ান উত্তরাধিকার মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বাতিঘরটি মুসলমানেরা অতি সযত্নে রক্ষা করেছেন। এটি ২৭৫ ফুট উঁচু। মুসলিম আমলে এটিতে আতশদান জ্বালিয়ে রাখা হতো। এভাবে পারস্য উপসাগরেও বড় বড় খুঁটি পুঁতে এরূপ নিদর্শন তৈরী করা হয়। মুসলমানদের নৌ-উন্নয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন গমন পথে তারা নির্মাণ করেন অনেক আলোকস্তম্ভ। এসব বাতিঘরে কিছু লোক অবস্থান করতো। রাতের বেলা আলো জ্বালিয়ে রাখা এবং কোন কারণে তা নিভে গেলে তা পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া ছিলো তাদের কাজ।

পানিপথ আবিষ্কারে মুসলিম নাবিকদের ভূমিকা

সাগরের বুকে মুসলমান নাবিকদের পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য ১৪৯৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। মুসলিম শক্তির এই দোর্দণ্ড প্রতাপ এড়াতে গিয়ে ইউরোপ নতুন পথের সন্ধানে বের হয়। তখন ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের এমনই প্রতাপশালী অবস্থান ছিলো যে, ইউরোপীয় জাহাজগুলো খুব সন্ত্রস্ত ও সতর্কাবস্থায় বিচরণ করতো।

তুর্কী মুসলমানদের এই আধিপত্যের দরুনই ভূমধ্যসাগরে তাদের মুকাবিলার ভয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পানিপথে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ একটি নতুন জলপথের সন্ধানে উদগ্রীব হয়েছিল। এরূপে ভূমধ্য সাগরকে এড়িয়ে ইউরোপ নতুন পানিপথ আবিষ্কারের জন্য কলম্বাস (১৪৯২ খৃ.) ও ভাস্কো-দা-গামাকে (১৪৯৮ খৃ.) প্রেরণ করে। ফলে ভারতের নতুন পানিপথ ও আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। বিশ্ব জানে এই দুই ইউরোপীয় নাবিকের অমর কীর্তি। কিন্তু এদের পথপ্রদর্শক হিসাবে ভূমিকা রেখেছিলেন মুসলমান নাবিকরা– এটা অনেকেরই অজানা। শুধু তাই নয়, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বেই আরব মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন– এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। রাশিয়ান পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন ঃ It was the Arabs and not the Europians who first discovered America and that the Arabs had reached America after arriving in Indonesia. যাক, স্বতন্ত্র নিবন্ধে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁবার নতুন জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন বলা হয়। তাঁর এই আবিষ্কারে মুসলিম নাবিকদের যে ভূমিকা তা কোন অংশে খাটো তো নয়ই বরং তা ভাস্কোর পুরো কৃতিত্বে বড় ভাগ বসাবার দাবীদার। এই পানিপথ আবিষ্কারে স্পেনীয় মুসলিম নাবিক ইবনে মজিদ ছিলেন তার একমাত্র অবলম্বন। 'হিজরী চতুর্থ শতকের শুরুতে মাদাগাস্কারে একটি আরব বসতি ছিল। এই উপকূলেই ১০ হিজরী শতকে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আরব নাবিকদের দেখা পেয়েছিলেন। তারা পর্তুগীজ নাবিকদের ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বলে দিয়েছিলেন। এসব উপকূলে ওমানের আরবদের এমন প্রভাব ছিলো যে, এগুলো ওমান রাজ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিলো। জাঞ্জিবার দীর্ঘকাল ওমানের অধীনে ছিলো। পরে ইউরোপীয়রা তা আবিষ্কার করে নেয়।" (ইবনে মজিদ ঃ প্যারিস সংস্করণ দ্রষ্টব্য)

Encyclopaedia of Islam-এ উল্লেখ করা হয়েছে, বিখ্যাত মুসলিম নৌ বিজ্ঞানী ও অসীম সাহসী নাবিক আহমদ ইবনে মজিদ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ভাস্কো-দা-গামাকে নিয়ে আফ্রিকা ঘুরে পানিপথে ভারত যাত্রা করেন। ভাস্কো ইতোপূর্বে ইবনে মজিদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ, তাঁর অভিজ্ঞতা, পথ নির্দেশনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর ভাস্কো-দা-গামা পুরোপুরি নির্ভরশীল

ছিলেন। বিশেষ করে সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনায় ইবনে মজিদের যন্ত্রপাতি ছিলো অত্যন্ত উন্নত। তার উন্নত যন্ত্রপাতি, নিখুঁত মানচিত্র ও এর ব্যবহার, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দেখে ভাস্কো বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন।

ইবনে মজিদ ছিলেন ইউরোপের সামুদ্রিক অভিযানের প্রথম বড় পথপ্রদর্শক। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার ছিলো কালের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি সারা জীবন সমুদ্র যাত্রাতেই কাটিয়েছেন। এসব অভিজ্ঞতা তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তৎকালে 'সমুদ্রের সিংহ' নামে সুপরিচিত ইবনে মজিদের এই অভিজ্ঞতালব্ধ লেখাই ছিলো ইউরোপের মূলধন। এ প্রেক্ষিতে নূরুল হোসেন খোন্দকার লিখেন ঃ 'প্রকৃতপক্ষে ভূমধ্যসাগরে তুর্কীদের ভয়ে সোজা পথ বাদ দিয়ে আফ্রিকা ঘুরে পানিপথে ভারতে যাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে গামা ভারতীয় পানিপথ নয়, প্রথম আরব নাবিকদেরকেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং আরব নাবিকদেরই সম্পূর্ণ আশ্রয়ে তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। আবিষ্কারকই যদি বলতে হয়, তবে ভাস্কো-দা-গামা নয়।'

সমুদ্রে দিকনির্দেশক যন্ত্র হিসাবে কম্পাসের ব্যবহার সম্পর্কে তৎকালীন ইউরোপ কিছুই জানতো না। চীনের উদ্ভাবনী শক্তির সহায়তায় আরবরাই প্রথম কম্পাস আবিষ্কার করেন। Encyclopaedia Britanica-এর 'চুম্বক' অংশে এ বক্তব্যের স্বীকৃতি দেয়া আছে। এতে বলা হয়েছে, চুম্বক যন্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় এবং আরবদের প্রদত্ত বর্ণনা পড়ার পর বলা যায় যে, এটি চীনারা উদ্ভাবন করে সাধারণ গাণিতিক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতো। যেসব আরব নাবিক ষষ্ঠ খৃস্টাব্দে চীনে পৌঁছে ছিল, তারা চীনাদের কাছ থেকে যন্ত্রটি আনে এবং সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের কাজে এর ব্যবহার শুরু করে। তারা যন্ত্রটির প্রভূত উন্নতি সাধন করে। কিন্তু অন্যদের কাছে তা গোপন রাখে।

ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে চুম্বক কম্পাসের কথা জানতে পারে সম্ভবত ১৫'শ শতকের পরে। এর পূর্বে যে কম্পাসটি ব্যবহারের কথা বলা হয় তা ছিলো অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ মাপার যন্ত্র বিশেষ। ব্রিটানিকা লিখছে ঃ "ভাস্কো-দা-গামার সময় থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাবিকরা আরব নাবিকদের যন্ত্রপাতি এবং তাদের সমুদ্র বিষয়ক বই-পুস্তক থেকে তথ্যাবলী ব্যবহার করে আসছে।"

বস্তুতপক্ষে দূরবীক্ষণ ও নৌ কম্পাস যন্ত্র পৃথিবীতে প্রথম প্রচলন করেন আবুল হাসান। রজার বেকনকে (১২১৪-১২৯৪ খৃ.) আধুনিক ইউরোপের জনক বলা

হয়। বলা হয়, তিনি বারূদ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি যে বছর জন্মগ্রহণ করেন সে বছরই চেঙ্গিস খান চীন দখল করেন। চীনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র গুদামে তখন পাওয়া গিয়েছিলো বারূদের বিরাট সংগ্রহ। তাছাড়া যদি ধরে নেয়া হয় বেকন তা করেছেন, তাহলে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন মুসলিম স্পেনের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে।

আধুনিক পাশ্চাত্য মুসলমানদের বহু আবিষ্কারকে নিজেদের বলে চালিয়েছেন। সামরিক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য। অনেক আবিষ্কারের কথা পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে ফেলা হয়েছে লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ধ্বংস করে। অথচ হাজার বছর পূর্বেই বিজ্ঞানী জাবির বিন হাইয়ান যুদ্ধাস্ত্রের ওপর ৩০০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো ও পরবর্তীতে রচিত গ্রন্থাবলী যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানে মুখ উঁচু করে বলার মতো ইউরোপীয়দের সুযোগ অনেক কমে যেতো।

নৌ-শক্তিকে বলা যায় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। যখন থেকে মুসলিম নৌ-শক্তি তার জৌলুশ হারাতে থাকে, তখন থেকে তা হস্তগত করে পাশ্চাত্য। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো এক্ষেত্রেও তারা সাফল্য লাভ করে এবং আধুনিক নৌ ও যুদ্ধ বিদ্যায় উত্তরোত্তর এগিয়ে যায়। আর তাদের এই শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে পরাজিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আজ মুসলিম দেশগুলোর সামরিক শক্তি আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য নেই।

মুসলিম সামরিক কৌশল যুদ্ধ বিজ্ঞানে সূচনা করেছে নতুন অধ্যায়ের। মুসলমানদের সাথে সংঘটিত সকল বিখ্যাত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে তার সবটাতেই কোন না কোন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো। শুধুমাত্র গায়ের জোরে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্ধ পৃথিবী জয় করা অসম্ভব ছিল। বদর যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, তাবুক যুদ্ধ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পরিচালিত লোম খাড়া করা অভিযানসমূহ, সিন্ধু অভিযান, স্পেনে বিস্ময়কর অভিযান, সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, সুলতান সুলায়মান, সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানগুলো কোন অলৌকিক কর্মকাণ্ডের গুণে নয়- মুসলিম বাহিনীর নিখুঁত যুদ্ধ কৌশলের, শৃংখলা ও অসামান্য দৃঢ়তার বিজয় ছিলো। আধুনিক যুদ্ধ কৌশলে এসব অনুসৃত কৌশল কাজে লাগানো হয়, অথচ বলা হয় এগুলো নতুন উদ্ভাবিত কৌশল।

খন্দক তথা পরিখার যুদ্ধে (৬২৭ খৃ.) মহানবী (সা.) যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার সাড়ে তেরোশো বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তা অনুসরণ করা হয়, অথচ বলা হলো যে, নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি। মেজর জেনারেল আকবর খান আমাদের জানিয়েছেন, ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যালোচক দ্রুতগামী তাতারী অশ্বারোহী বাহিনীর তলোয়ার ও নেযাবাযী ও তোপগুলোকে সক্রিয় করার সেনাগিরিতে মোহিত ছিলো। এসব বাহিনীর অসংখ্য অশ্বারোহী থাকতো, সাথে অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র তো বটেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান কামানের গোলার সাহায্যে এন্টোরিপ ল্যাপ এবং নিমোরকে কয়েকদিনের ভেতর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, অশ্বারোহী বাহিনীর সংঘর্ষ হয় মুখোমুখি এবং জার্মান বাহিনী বিজয়ী হয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বিজয়ী বাহিনীকে রুখতে যে কোন সিদ্ধান্তকেই বড় মনে করা হবে না। এরপর পল্টন খন্দক তথা পরিখায় ঢুকে পড়ে, ফলে অশ্বারোহী বাহিনী বাধ্য হয়ে পেছনে ছুটে যায়। এভাবে খন্দক যুদ্ধের সফল নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হয়।
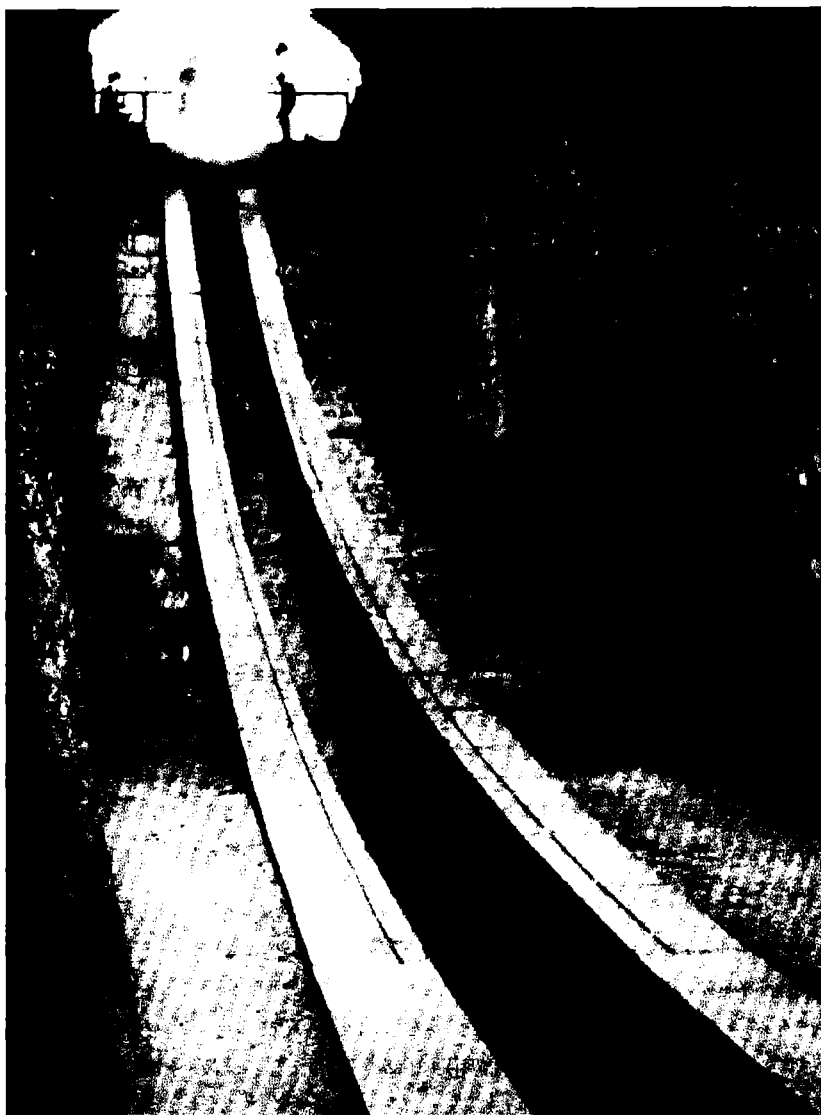
উলুঘ বেগ (মৃ. ১৪৪৯ খৃ.) কর্তৃক সমরকন্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পর্যবেক্ষণাগার।

মুসলিম মনীষীদের রাষ্ট্রচিন্তা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। দার্শনিক এরিষ্টোটলকে এ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে মুসলিম মনীষীরাও বহু চিন্তা ভাবনা করেছেন।

১০৫৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসান (ইরান) রাজ্যের তুস্ নগরে জন্মগ্রহণকারী ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল্ গাজালী ছিলেন মুসলিম চিন্তানায়কদের অন্যতম। তাঁকে "হুজ্জাতুল ইসলাম" বা ইসলামের দলীল নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব প্রচারক হিসাবে তিনি সর্বাগ্রে সমাদৃত।

বলা হয় আল-গাজালী খৃষ্টান চিন্তাবিদ অগাষ্টিনের "স্বর্গরাজ্য" দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, পার্থিব জীবন থেকে পারলৌকিক জীবন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাগতিক জীবনে যেমন যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদ মূল্যবান তেমনি পরজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাস মূল্যবান। তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শনে যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদকে বর্জন করে ঈমান বা বিশ্বাসের উপর সমধিক জোর দেন। আল্ গাজালীর মতে, কুরআন-হাদীসের শিক্ষাই পারত্রিক জীবনের পরিপূর্ণতা বিধানের মূল পুঁজি। তিনি পারলৌকিক জীবনের প্রশান্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিলেও পার্থিব জীবনকে একেবারে নিরর্থক ভাবেননি। বরং তাঁর মতে, ধর্মের নির্দেশানুযায়ী পার্থিব জীবন অতিবাহিত করাটাই সর্বোত্তম ব্যক্তি জীবন।

ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনে এদের যথার্থ সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন, ইহাই ছিল আল গাজালীর বক্তব্যের মূলতত্ত্ব। রাষ্ট্র দর্শন ও ন্যায়নীতির লক্ষ্য জনগণের মঙ্গল বিধান এবং রাষ্ট্র সেই লক্ষ্য অর্জনের উপাত্ত। অতএব রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়নীতির সুপ্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। এখানে রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে দু'ধরনের -

ন্যায়নীতি ও ধর্মতত্ত্ব মুতাবিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

রাষ্ট্র যুগপৎ ধর্মতত্ত্ব ও ন্যায়নীতির সংরক্ষণ ও অনুশীলন করবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মানুষ সর্বদা পারস্পরিক সহযোগিতা চায়

এবং সেই সহজাত সহযোগিতামূলক আচরণকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে।" আল গাজালী মানুষের বদস্বভাবের সম্বন্ধেও জানতেন। তাই তিনি সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার্থে প্রয়োজনে বল প্রয়োগে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের সাথে নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

রাষ্ট্রীয় সত্তাকে আল্ গাজালী জীবদেহের সাথে এবং শাসককে রাষ্ট্রের হৃদয়ের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, শাসক হবেন ধর্মপ্রাণ, সাহসী, জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ন্যায় ব্যক্তি। তিনি সর্বদা জ্ঞানী-গুণীজনদের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবেন। আল্-গাজালী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আদর্শ শাসক হিসাবে পেশ করতঃ তাঁর আদর্শ ও নীতি অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রনায়কদের পরামর্শ দিয়েছেন।

বস্তুতঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও শাসন ব্যবস্থায় আল্ গাজালীর মতবাদ এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও শাসকের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর অভিমত কালজয়ী। রাষ্ট্রীয় দর্শনে ধর্মতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সে ধারণা দান করে গিয়েছেন, তা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার জগতে এক মহামূল্য অবদান।

১৩৩২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তিউনিসে জন্মগ্রহণকারী ওয়ালী উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে খালেদুন অন্যতম। সমাজ বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইবনে খালেদুন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত। তাঁর রচিত 'আল-মুকাদ্দামা' বিশ্ব ইতিহাসের মুখবন্ধরূপে বিদিত। ৭৭৯ হিজরী সনে ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মাত্র পাঁচ মাসের পরিশ্রমে তিনি এ বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করনে। এ গ্রন্থ রচনার সাফল্যে তিনি নিজেও বিস্মিত হন।

মহামনীষী ইবনে খালেদুন তাঁর বিশ্বখ্যাত "কিতাবুল ই'বার" গ্রন্থের মুকাদ্দাসা বা মুখবন্ধে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ, শাসন ও উহার প্রকৃতি, সার্বভৌমত্বের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন, নাগরিকদের চরিত্র গঠন, সামাজিক ও ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব পাশ্চত্যের অনেক দার্শনিক চিন্তাবিদকে আকৃষ্ঠ করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইবনে খালেদুন ছিলেন এরিষ্টোটলের অনুসারী। তিনি তাঁর মুকাদ্দামায় রাষ্ট্রকে 'দৌলত' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের

আসল ভিত্তি হচ্ছে সংহতি বা 'আসাবিয়াহ'। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হতে এর শুরু হয়। তিনি তাঁর মুকাদ্দামার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেন, 'আসাবিয়ার' উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই হল সার্বভৌমত্ব অর্জন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীল আর এই পারস্পরিক নির্ভরতা হতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। এ পর্যায়ে তিনি সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁর কথা হল, গোত্রীয় শক্তি এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত আসাবিয়াত বা স্থায়ী শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বড়ই অদ্ভুত এবং নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির প্রকারভেদে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা সূচিত হয়। ইবনে খালেদুন মুকাদ্দামার তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রকে জোরদার করার ক্ষেত্রে আসাবিয়ার ভিত্তিতে ধর্মীয় শাসন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। কলহ রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয় এবং রাষ্ট্রের পতনকে ত্বরান্বিত করে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মত সার্বভৌমত্বেরও প্রকারভেদ রয়েছে। সেগুলি হল গৌরব, বিলাস এবং একচেটিয়াবাদ। রাষ্ট্রের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বৈশিষ্ট্যগুলিও বিকৃত রূপ ধারণ করে।

রাষ্ট্রে কলহ সৃষ্টির প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে পশুসুলভ প্রবৃত্তি বিরাজমান। এই প্রবৃত্তিই মানবসমাজে দ্বন্দ-কলহ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে আসাবিয়াত নষ্ট করে। ফলে রাষ্ট্রের পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা দূরীকরণের জন্য এমন শক্তিমান শাসকের প্রয়োজন যিনি ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে জনগণকে কলহ হতে বিরত রাখবেন। এই শক্তিই হল সার্বভৌমত্ব যা মানুষের মধ্যেকার সংহতি রক্ষায় অত্যাবশ্যক।

ইবনে খালেদুন রাষ্ট্রীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে রক্তের সম্পর্ককে প্রয়োজনীয় সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই সম্বন্ধ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এ প্রসঙ্গে তিনি আরব বেদুঈনদের রক্তজাত সম্বন্ধের কথা বলেছেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরব জাতীর গৌরবময় বীর্যবত্তার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, গভীর ও ঐক্যবদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়ক। তিনি আরো বলেন, এক্ষেত্রে প্রভাবশালী পরিবার বা বংশের অবদানও কাজ করে, যেমন আরবে ছিল কুরাইশ বংশের প্রভাব।

রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য নির্দেশ ইবনে খালেদুনের অন্যতম অবদান। তিনি এই দু'টিকে স্বতন্ত্র সংগঠন চিহ্নিত করে এদের নিবিড় সম্পর্কের কথাও বলেন।

রাষ্ট্রের আয়তন ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ইবনে খালেদুন আলোকপাত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের উত্থান, তারুণ্য, বিভেদ ও পতনরূপে রাষ্ট্রের আয়ুষ্কালে পরিমাপ করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের বয়সের স্তর সাধারণতঃ তিনটি এবং এর প্রত্যেকটি স্তরের বয়স ৪০ বছর। তিনি আরো বলেন, বিশেষ অবস্থা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই সাধারণতঃ ১২০ বছর অতিক্রম করেনা। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে দলীয় সংহতি প্রবল থাকে। এসময় জাতি স্বীয় শৌর্যবীর্য ও আদর্শের উম্মাদনায় উদ্ভূত রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল নগর সভ্যতায় গোত্রীয় সংহতি অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। আর তৃতীয় পর্যায়ে তারা হীনবল হয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। তখনই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অপর কোন সবল বা পরাধীন সম্প্রদায় সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা করতলগত করে।

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে আবু নাছের আল ফারাবী'র নাম স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্রাচ্যের দার্শনিকতা তাঁকে এরিষ্টোটলের পরেই স্থান দিয়ে 'মুয়াল্লিমে ছানি" বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতিভু নামে আখ্যায়িত করেন। প্রায় একশত গ্রন্থ প্রণেতা ফারাবী তাঁর "সিয়াসত" ও "আরা" নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। "সিয়াসত" গ্রন্থে তিনি মানুষ ও পশুর প্রভেদ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি কারণ, আদর্শ রাষ্ট্র প্রকার বিন্যাস এবং আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আর "আরা" নামক গ্রন্থে সাম্য, সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চুক্তিবাদের প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলেছেন।

ফারাবীর মতে, মানুষের সমষ্টিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের জন্ম। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই ইহার সৃষ্টি। সুখে থাকার জন্য মানুষ গড়ে তোলে সমবায়। গ্রাম, শহর, নগর, জনপদ, জাতি ও রাষ্ট্রই সেই সমবায় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। আর রাষ্ট্র হচ্ছে উহার পূর্ণাঙ্গ রূপ। তিনি দাবী করেন, বিবর্তনের মাধ্যমে সমবায় সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য হবে। নগর ও গ্রাম কালানুসারে জাতিতে রূপান্তরিত হবে, জাতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে সাম্রাজ্যের দাপটে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি পাবে।

এরিষ্টোটলের মত তিনি আপন জাতির মহিমা কীর্তন করেননি। তিনি তেমন সংকীর্ণমনা ছিলেন না। বরং তিনি দুনিয়া জুড়ে রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। মানব প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন ভিন্ন হতে পারে– এটা তিনিই বলেছেন। তবুও, মানুষের মধ্যে যে মিলনের সুর বিদ্যমান, তিনি তারই জয়গান গেয়েছেন।

ইতিহাসে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। রাষ্ট্রনায়কের যে আদর্শ তিনি নির্মাণ করেছেন উহা যথার্থই। আল ফারাবী বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্ ব্যতীত সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সৎসাহস ও জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে রাষ্ট্রনায়কের। তিনি সহজাত জ্ঞান ও অর্জিত বিদ্যার অধিকারী হবেন। সুস্থ-সবল দেহ, অতিভোজন, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তিনি বিরত থাকবেন। তিনি আমোদ বিলাস এবং মিথ্যাচারে প্রলুব্ধ হবেন না। রাষ্ট্রনায়ক হবেন শিক্ষানুরাগী, সত্যানুসন্ধানী ও উদারচিত্ত। তিনি স্বেচ্ছাচারকে ঘৃণা করবেন, সবসময়ই ন্যায়ানুগ থাকবেন এবং ক্ষমতার প্রতি নির্লোভ হবেন।

তবে তাঁর বর্ণিত রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী কারো মধ্যে পরিপূর্ণ পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারেও আল ফারাবীর উপলব্ধি ছিল। তাই তিনি সেইরূপ লোক পাওয়া না গেলে যার মধ্যে ঐ গুণাবলীর অধিকাংশ দৃষ্ট হয় তাকেই শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। যদি এরূপ লোকও পাওয়া না যায়, তবে এমন লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত, যিনি কোন আদর্শ নেতার সঙ্গলাভ করে কিছু গুণাধিকারী হয়েছেন। আর এরূপও যদি কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে পাঁচ সদস্যের বিশিষ্ট পরিষদের উপর ক্ষমতার ভার ন্যস্ত করতে হবে। তখন শাসন পরিষদ জনগণের অভাব অভিযোগ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল যথাযথ উপলব্ধি করে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

মুসলিম দুনিয়ার মনীষীদের মধ্যে চিরস্মরণীয় এবং শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয় এরূপ একটি নাম আবু আলী ইবনে সীনা। ৯৮০ ঈসায়ী সালের কোন এক মাসে উজবেকিস্তানের "আফসানা" নামক স্থান তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে মূলতঃ তিনি প্রসিদ্ধ হলেও রাষ্ট্রে ও দর্শনেও তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। পরন্তু তাঁর সময়কার রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিদেশী রাজদরবারে রাষ্ট্রদূত হিসাবে গমন করেন এবং দেশের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার পালন করেন। বহু প্রতিভাধর এই মহামনীষী পাশ্চাত্য জগতে "আভীসীনা" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্রের' ধারণা ইবনে সীনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। তিনি মনে করতেন শান্তি ও সম্পূর্ণতা অর্জনই মনুষ্য জীবনের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্য ও সুন্দরের প্রতিফলনই হবে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং ইহা সত্য ও সুন্দরের আদর্শে অনুপ্রাণিত

করে তুলবে সমাজ জীবনকে। ইবনে সীনা মানুষকে মনে করতেন রাজনৈতিক জীব। মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবণতাই রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই মানুষ জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে– এটাই ছিল ইবনে সীনার চিন্তাধারা। তবে গ্রীকদের মতবাদ হতে তাঁর চিন্তাধারা ছিল স্বতন্ত্র। প্লেটো ও এরিষ্টোটল সত্য ও আদর্শের পরিপূর্ণতার মধ্যে যুগের কোন চিন্তাবিদ ধর্ম ও দর্শনের কোন পার্থক্য দেখাননি। কিন্তু মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ হয়েও ইবনে সীনা তা করেন এবং বলেন যে, সমাজ জীবনে পূর্ণতা সাধনের জন্য যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই সম্মিলনী চিন্তাধারাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। যদিও মুসলিম মনীষা আল-ফারাবী, আল্-কিন্দি, ইবনে রুশদ ইত্যাদি ছিলেন এ মতবাদের দিশারী; তবুও ইবনে সীনাই ইহাতে সাফল্য আনয়নকারী ছিলেন। তাই ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টি বলেন ঃ "আল-কিন্দি, আল্-ফারাবী ইবনে রুশদের অবদানে যার সূচনা হয়েছিল ইবেন সীনার মধ্যে তা পরিপূর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে।"

আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান

অধুনা সভ্যতার প্রতিপান্বিত পাদপীঠ আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নাম আমরা এতোকাল ধরে জেনে এসেছি। এমনকি আমরা এটাও জানি ভাস্কো-ডা-গামা এই উপমহাদেশে প্রথম নোঙর করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান আবিষ্কৃত গবেষণায় এটা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সমস্ত পৃথিবী কাঁপানো নাবিকদের মুসলিম সাগর ও ভূ-বিজ্ঞানীরাই পথ দেখিয়েছিলেন। তাদেরই আবিষ্কৃত উপাত্ত ও গবেষণা জ্ঞান নিয়ে তারা ভূ-আবিষ্কারের গোটা কৃতিত্বটাই নিজেদের থলিতে ভরতে চেয়েছেন। আজ যুগান্তকারী প্রত্নতাত্ত্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা দ্বারা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যে কোন বিচারে এ সকল মহাদেশ আবিষ্কারে দুর্লভ কৃতিত্ব মুসলিম বিজ্ঞানীদের। এমনকি খোদ আমেরিকার বিজ্ঞানীরাই তা স্বীকার করেছেন এবং প্রফেসরদের অনুরোধ জানাচ্ছেন যেন আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে কলম্বাসের নাম ছাত্রদের বলা না হয়।

কলম্বাস আমেরিকা অভিযানে বেরুবার পূর্বে নানাভাবে মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিশালী ভাষা হিসাবে পরিচিত ছিল আরবী ভাষা। কলম্বাস জানতেন আরবরা সুদীর্ঘ ৫০০ বছর পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। পৃথিবীর বিশাল বিশাল শক্তিকে তাঁরা পরাভূত করে শাসন করেছেন শত শত বছর ধরে। বিস্তৃত ভূ-বিজয়ের তাগিদে সত্তাগত জ্ঞান প্রেরণার কারণে মুসলমানরা ভূ-মানচিত্র, পাহাড়সহ নদ-নদীর অবস্থান ও জলবায়ু সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ৭১১ থেকে ১৪৯২ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগালে মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিল। এ সময়কার বিকশিত বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করেছিল দারুণভাবে। আঁধারের বিয়াবনে নিমগ্ন অনগ্রসর ইউরোপকে সভ্য জাতি হিসাবে পরিণত করেন আরব মুসলমানরা।

আঁধারের পরিমণ্ডলে লুকিয়ে থাকা বিশ্বের মানচিত্র প্রথম প্রণয়ন করেন আরবরা– যা তাঁতীর ছেলে কলম্বাসকে নতুন জয়ের নেশায় বিভোর করে তোলে। মুসলমানদের লব্ধ জ্ঞানের ফলশ্রুতিতে রচিত অনেক আকর গ্রন্থ তার সিদ্ধান্তে প্রেরণা সৃষ্টি করে। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে বিরচিত মুসলমানদের গ্রন্থের বিরাট সম্ভার স্পেন ও পর্তুগালের লাইব্রেরীসমূহে সংরক্ষিত ছিলো। ক্যানারী

দ্বীপপুঞ্জ পাড়ি দেয়ার সময় কলম্বাসের কাছে যে দিকদর্শন যন্ত্রটা ছিলো সেটা আনুমানিক চারশো বছর পূর্বে আরব বণিকরা ব্যবহার করতো। এছাড়া তার সাথে ছিলো আরবদের আবিষ্কার করা বহু যন্ত্রপাতি। কথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারে আরো বিস্ময়কর তথ্য জানা গেছে। আমেরিকা আবিষ্কারে কলম্বাস শুধু মুসলমানদের নানাবিধ জ্ঞানের সহায়তা নিয়েছিলেন তা নয় বরং কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্বেই আরব মুসলমানরা আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছিলো। যা আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বের মানুষের ভৌগোলিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছে। খোদ আমেরিকার মিনেসটা ডাকোটা এবং উইসকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ঘোষণা করেছেন, কলম্বাস আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারক নন। এমনকি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে , যেন তারা শিক্ষার্থীদের কাছে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে কলম্বাসের নাম উল্লেখ না করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, মিউজিয়াম এবং রাশিয়ার কিছু বিজ্ঞানীও এ অভিমত রেখেছেন যে, আমেরিকার পূর্ব অধিবাসীরা ছিলো এশীয়, এমন কি তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিলো প্রাচ্যের । এ তথ্যের স্বপক্ষে তারা জোরালো প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরে রিওভী গ্রাণডোর তীরে প্রাপ্ত কিছু নরকঙ্কাল। যেগুলো আরবদের গঠনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

জার্মানীর নু'রেমবার্গে জন্মগ্রহণকারী নাবিক ও ভূগোলবেত্তা মার্টিন বেহাইম (১৪৩৬-১৫০৭) একটি ভূগোলক ১৪৯২ সালে পৃথিবীকে উপহার দেন। স্মর্তব্য, একই সালে স্পেনের মুসলমানদের পতন ঘটে। এ গোলকে লিখিত আছে ৭৩৪ খৃস্টাব্দে এনটিলিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং অপর্টো থেকে আগত এক ধর্মাধ্যক্ষ এখানে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করেন। বেহেইম ব্রাজিলসহ আরো কিছু দ্বীপ চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, ১৪১৪ সালে একজন স্পেনীয় পর্যটক এনটিলিয়া ভ্রমণ করেন। (The truth about Columbus : C Duff, London-1936)

উক্ত তথ্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কলম্বাসের পূর্বে উল্লিখিত স্থানগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিলো। কিন্তু এনটেলিয়া কোথায় ছিলো, কি তাঁর পরিচয়? তার পরিচয় দিতে গিয়ে একটি বিশ্বকোষ লিখেছে ঃ

Antilles, great chain of its west lndis comprising the Archipelago enclosing The Caribbean sea and G. of Mexico.

অর্থাৎ "এনটিলিয়াস হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপসমূহের শৃঙ্গল শ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ

মণ্ডিত সমুদ্রের অন্তর্গত, যা কেরিবিয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত"। উল্লেখ্য, কলম্বাস প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতেই পা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে মেক্সিকোর তীরে আবিষ্কৃত কঙ্কালগুলো আরবী গঠনের সাথে মিলে যায়। এমনকি কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছে সেখানে আরবীয় রীতিনীতির প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই বলা যায়, কলম্বাসের বহু পূর্বে সপ্তম শতকের মধ্যে মুসলমানরা ওখানে পৌঁছেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে 'ব্রাজিল ' শব্দটিও আরবী শব্দ থেকে উৎপন্ন এবং Antill অর্থের সাথে গভীর সম্পৃক্ত।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কয়েক শতাব্দী পূর্বে কিভাবে মুসলমানরা এ অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় বিখ্যাত ভৌগোলিক আল ইদ্রীসীর (খৃঃ ১১৮৪) ভ্রমণ বৃত্তান্তসহ আরো কিছু ঐতিহাসিক সূত্র থেকে। এতে দেখা যায়, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে অবস্থিত দ্বীপসমূহের অনেকগুলোতে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই মুসলমানরা পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রধানত সমুদ্রের সীমানা অন্বেষণ করতে গিয়েই তাদের জাহাজ প্রথম আমেরিকার উপকূলে ভিড়েছিল। রাশিয়ান পণ্ডিতদের বক্তব্য হলো– It was the Arabs and not the Europians who first discovered America and that the Arabs had reached America after arriving in Indonesia." অর্থাৎ ইউরোপীয়রা নয় বরং আরবীয়রা প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলো এবং আরবীয়রা ইন্দোনেশীয়ায় আসার পর আমেরিকায় পৌঁছে"।

আমেরিকার বিখ্যাত শহর ও বন্দর 'ক্যালিফোর্নিয়ার' নামও গৃহীত হয়েছে আরবী থেকে। বিশিষ্ট আরবী অভিধানজ্ঞ আমীর সাকির আরছালান বলেন- "The word California is drived from the Arabic 'Kaal-Manaremeaning' like the light house." অর্থাৎ কালিফোর্নিয়া নামটি আরবী শব্দ 'আল মানার' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হলো 'আলো-ঘরের সদৃশ'।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছে ছিল আরবের মুসলমানরা তা তথাকার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাংবাদিক Johannes Anderson স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডে মুসলমানদের শত বছরের পুরনো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর। নিউজিল্যান্ড থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান জার্নালে তিনি এর সপক্ষে অসংখ্য তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করেছেন। উল্লেখ্য, ইন্দোনেশীয়া থেকে আমেরিকা পৌঁছার জন্য নিউজিল্যান্ডের পাশ দিয়ে যেতে হয়। সম্ভবত এখানকার জল প্রবাহ পথ দিয়ে মুসলমানরা যাতায়াত পথে নিউজিল্যান্ডেও থেমেছিলো।

কলম্বাসের পূর্বেই মুসলমানদের আমেরিকা আগমনের কথা আমরা জানলাম। কিন্তু আমেরিকার মাটিতে কি মুসলমান আগমনের কোন নিদর্শন আছে? যার দ্বারা আরো বলিষ্ঠভাবে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরাই কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছিলো? হ্যাঁ, এরকম প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রামাণ্য জিনিস পাওয়া গেছে নিকট অতীতেও, যার কিছু নিদর্শনের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১৯৬৪ ও '৬৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর হেনর ও বামহফ এক রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে বলা হয়েছিল, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আরবীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত ইসলামের কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে নওদার পূর্বাঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকা ওয়াকরে একটা পাথরে 'মুহাম্মদ রাসূলাল্লাহ' এবং 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' আরবী অক্ষরে খোদিত লিপির উল্লেখ করা হয়। নওয়াদাতে ১৮'' পাথরে 'আল্লাহ' এবং অপরটিতে 'মুহাম্মদে' শব্দদ্বয় প্রস্তরগাত্রে অংকিত। মাউস ট্যাংকে পাওয়া যায় তেমনি ধরনের আরেকটি পাথর। যাতে লেখা আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু'। ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক বেরিফীল কেসলিটন রীবামাইন্ট কলেজের প্রত্নতত্ত্ববিদদের এক সেমিনারে কিছু তথ্য প্রমাণিত হচ্ছিল যে, কলম্বাসের কয়েক শত বছর পূর্বে আরব মুসলমানরা আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। হিজরী প্রথম শতকেই মুসলমানদের আমেরিকা আবিষ্কারের এই সংবাদ তারা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়।

আমেরিকার প্রাচীন ঝিনুক মুদ্রা, কিছু ফল ও নরকংকাল ইত্যাদিতে প্রাচীন চিহ্ন দেখে বিশেষজ্ঞরা এগুলো প্রাচ্য থেকে আনা বলে জানিয়েছেন। উত্তর আমেরিকার টেনেসি নদীর ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন তীরে প্রাপ্ত প্রথম যুগের কিছু ঝিনুক মুদ্রার নিদর্শন উদ্ধার করেছেন সি.বি. মূর। আমেরিকান প্রখ্যাত শঙ্খ বৈজ্ঞানিক ডঃ পিলসবারীর মতে, এগুলো পূর্বাঞ্চলের ঝিনুক মুদ্রার প্রকৃত নিদর্শন, কেননা ইতোপূর্বে এ ধরনের মুদ্রা দেখা যায়নি। এগুলো কিভাবে প্রাচ্য থেকে এখানে এলো সে সম্পর্কে গবেষক মিঃ আলমেস বলেন, ইউরোপীয়দের অভিযানের সময় আটলান্টিকের উপকূলীয় জাতিসমূহের মধ্যে ঝিনুক মুদ্রার প্রচলন ছিল। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মুদ্রাগুলো মুসলমানরাই আফ্রিকা থেকে এখানে এনেছিল যা কলম্বাসরা এসে দেখতে পেয়েছিলেন।

খোসা সাদা ও লাল রংয়ের এক ধরনের কলা পাওয়া যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাও আনা হয়েছিলো আফ্রিকা থেকে। কলম্বাস, সামসটিয়ান, ক্যাফোর্ট প্রমুখ বিখ্যাত অভিযাত্রীদের সমসাময়িক এবং তাদের মুখে অভিযানের বর্ণনা শ্রবণকারী পিটার মার্টার তার Seventh decade গ্রন্থে লিখেছেন- "It was originally brought from a part of Ethiopia called Guinea, where it

grows wild, as an native territory," পিটার মার্টারের মত অকেস্টার বর্ণনায়ও দেখা যায়, লাল রংয়ের কলা, কমলালেবু প্রভৃতি স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে নীত হয়েছিল। মিঃ ডাক The truth about Columbus গ্রন্থে একই মত ব্যক্ত করেন- যা চলতি প্রবন্ধের বক্তব্যকে আরো সুদৃঢ় করে।

টেক্সাস ও নিউ মরিসকোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পিকোস নদীর তীরবর্তী এবং রিওগ্রান্ডে প্রাপ্ত পুরনো কংকাল পরীক্ষা করে মিঃ হুটন লিখেছেন- The pecas pseudo Negroid skulls resemble most closely craniat of Negao groups coming from those parts of Africa, where Negroes commonly have some perceptible influence of white Hemitic blood.

এক হাজার বছরের পুরনো এই হাড়গুলোই তো স্পষ্ট প্রমাণ করছে আমেরিকায় আফ্রিকীয়রা কলম্বাসের বহু পূর্বে অবস্থান করছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার মেক্সিকোতে প্রাপ্ত কংকালগুলোও একই সাক্ষী বহন করছে।

আমেরিকার কিছু প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের উপর সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলোর ওপর প্রাচীন মিসরীয় প্রভাব বিদ্যমান। দক্ষিণ মেক্সিকোতেও অনুরূপ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। An old World Cabit in America, Ancient Egypt গ্রন্থে এ সম্পর্কেও বলা হয়েছে, এগুলো অষ্টম শতাব্দীতে উৎপন্ন নিদর্শন। ১৮৭০ সালে কেরেলিনা এবং হেউডে প্রায় দু'হাজার শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলো প্রধানত মানুষ ও জীবজন্তুর আঁকা প্রতিকৃতি। এদের পরিচ্ছদ সম্পর্কে পণ্ডিত জেফরী বলেন, "এদের পোশাক ভারতীয় বা ইউরোপীয় পোশাকের মতো নয় বরং মুসলমানদের মতো"। (Pre Columbian Arabs in America : M.D.W. Jeffreys)

উল্লেখ্য, কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানদের আমেরিকা আবিষ্কারের উক্ত তথ্যগুলো প্রায় সবই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত ও মন্তব্যকৃত। যদিও এ সমস্ত তথ্য চিত্রে নির্ভর করে এক প্রকার নিশ্চিতভাবে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে মুসলমানদের চিহ্নিত করা গেছে তবুও আরো ব্যাপক গবেষণা অপ্রয়োজনীয় নয়। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসা উচিত।

প্রত্নতত্ত্বে কুরআনে কারীমের অবদান

প্রত্নতত্ত্ব কি? দি অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিকশনারী' এর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, "প্রত্নতত্ত্ব এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের প্রাচীন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে, বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক কালের।" সুতরাং বুঝা যায় সু-প্রাচীনকালের দ্রব্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সীমানুযায়ী আধুনিক গবেষণায় তার কি ফল দাঁড়ায় তা অবগত হবার নামই প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান। তবে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে' প্রত্নতত্ত্বের একটু ভিন্ন পরিচয় দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "একথা অনেকটা স্বীকৃত যে, কোনো জাতির প্রাথমিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়কে প্রত্নতত্ত্বরূপে অভিহিত করা হয়।" যা হউক এ দুয়ের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ নেই।

আধুনিক কালেও কোনো জাতির প্রাথমিক সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা জানার জন্য এবং এর মাধ্যমে নিত্য নতুন তথ্য উদঘাটনের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয়। সেই জাতির সভ্যতা ও অগ্রগতির মান নির্ধারণ করা হয় তখনকার স্থাপত্য ও চারু-কারু শিল্পের অগ্রগতির বিচারে। সুরম্য ভবন ও মূর্তিকে কেন্দ্র করে সেসব সভ্যতার মানদণ্ড বিবেচিত হয়। সকল পূর্ববর্তী জাতির অতীত সভ্যতা নির্ণিত হয় ধরতে গেলে স্থাপত্যকেন্দ্রিক। সুতরাং তাদের নৈতিক আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাস কেমন ছিলো সেটা বাছ বিচার করা হয় না।

মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে প্রত্নতত্ত্বের কথা রয়েছে। কিন্তু তা এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। কুরআনে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার উদ্দেশ্য মূলতঃ এটাই যে, তা দ্বারা সমকালীন মানবজাতিকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিখাদ পরিণতি সম্বন্ধে মনযোগ আকর্ষণ করা। তবে তা তাদের বিচিত্র অট্টালিকা ও বিশাল অবাক করা মূর্তির জন্য নয়, বরং তারা কিভাবে জীবনযাপন করত তা অনুধাবন করার জন্য। মহাপ্রভুর মহাবিধান নতচিত্তে স্বীকার করে তারা কি তৎকালীন প্রেরিত নবীর প্রদর্শিত পথে চলত, না আল্লাহর সার্বভৌম আধিপত্য অস্বীকার করে জীবন যাপন করতো। তারা কি আসমানী বিধি বিধান মাথা পেতে নিতো, না মন যা চায় তাই করতো। যদি তারা আল্লাহর আধিপত্য নতমস্তকে মেনে নিয়ে থাকে তাহলে তারা যে সফলকাম হয়েছিলো এবং যদি শয়তানের দেখানো পথ অনুসরণ করে, তাহলে কি পরিণতি তাদের ঘটেছিলো- সেটাই মানবজাতিকে অবহিত করা কুরআনে প্রত্নতত্ত্বের উল্লেখের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও শেষোক্ত দল বড় কোনো সাম্রাজ্য সভ্যতার ধারক বাহক হয়েও থাকে।

আল-কুরআনের প্রত্নতত্ত্ব বিবেচনা ও বিশ্লেষণের মূল মানদণ্ড হচ্ছে অতীত কোনো জাতির ঈমান বা বিশ্বাস। শুধু তখনই কেনো, বর্তমানেও এ মাপকাঠিতে মানুষের সভ্যতার বিচার হবে। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং তদীয় বিধানের প্রতি চরম শ্রদ্ধা পোষণ করে তারাই সফলকাম, সত্য এবং সর্বাধুনিক প্রগতিশীল, জাতি পক্ষান্তরে পশ্চাৎপদ সত্য অস্বীকারকারীরা বিফল এবং অসভ্য গোষ্ঠি। আল্লাহ বলেন ঃ "ধন, ঐশ্বর্য, সন্তান-সন্ততি নিতান্ত জাগতিক শোভা ছাড়া কিছুই নয়, আসলে স্থায়ী সৎকর্মের পরিণামই তোমার প্রভুর কাছে উত্তম, আর এর প্রতিই বাঞ্ছিত আশা করা যেতে পারে।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৬)

সুতরাং আমরা দেখি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য আধুনিক তথা পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য-কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সংগতিহীন। এখানে মানুষের মনোযোগকে অতীতের ইতিহাসের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে মানুষ অতীতের জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা পেতে পারে। একথা কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ঃ "তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি এবং লক্ষ্য করেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম ঘটেছিলো? পৃথিবীতে তারা ছিলো এদের অপেক্ষায় সংখ্যায় বেশী এবং পরাক্রমে ও কীর্তিতে তারা ছিলো অধিক প্রবল। তারা যা উপার্জন করেছিলো, তা কি তাদের কোনো কাজে এসেছে?" (সূরা মুমিন ঃ ৮২) এ আয়াত মানুষকে এটাই নির্দেশ করতে বলে যে, অন্যায় ও অত্যাচারীদের পরিণাম কি ছিলো। অন্যত্র বলা হচ্ছে ঃ "কতো অত্যাচারী জনপদের বাসিন্দাদেরকে আমি নিশ্চিহ্ন করেছি। এসব জনপদের গৃহের ছাদসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। কতো কূপ এবং প্রাসাদ অকেজো হয়ে পড়েছিলো। তারা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করে না?" (সূরা হজ্জ ঃ ৪৫) কুরআনের আরেক আয়াতে আরো পরিষ্কার ঘোষণা হচ্ছে ঃ "কতো জনপদের যালিমদের আমি অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর পাকড়াও করেছি। আর প্রত্যাবর্তন আমার দিকেই হবে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৪৮) এভাবে কালামুল্লাহর অসংখ্য আয়াতে মানবজাতিকে উপদেশচ্ছলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যাতে তারা পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় ভ্রমণ করে এবং সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনসমূহ অবলোকন করে এজন্য যে, তারা যেনো সেইরূপ পরিণামের ভয়ে অতীত জাতির কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি না করে।

স্মর্তব্য যে, সীমালংঘন, দুশ্চরিত্র ও যুলুমের জন্য যে সমস্ত জাতি ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে তার প্রভূত দৃষ্টান্ত কুরআনের বহু স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী 'আমি কতো জাতিকে ধ্বংস করে

দিয়েছি'-এর চাক্ষুস প্রমাণ আজকের পৃথিবীতেও আছে। বিভিন্ন দেশে যাদের সৌভাগ্য হয়েছে তারা বহুকালের এসব নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখেছেন। নূহ (আ.) এর কিস্তি যা তাঁর কাওমকে সবংশে নিশ্চিহ্ন করার নিমিত্তে ঈমানদারদের আশ্রয় হিসেবে তৈরী করা হয়েছিলো, সেটি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান ইরাকের ভূভাগে নূহ (আ.)-এর জাতির বাসস্থান ছিলো। এরা অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের পরও জীবনকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলো এবং তদীয় নবীর অবাধ্য হয়েছিলো। এজন্য তারা নবীর অভিশাপ ও প্রকৃতির আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি। এদের দৃষ্টান্ত বর্ণনায় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন– "অতঃপর তারা তাকে (নূহ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তিনি এবং তাঁর সাথীরা যারা নৌকায় উঠেছিলো। (তারা ঈমান এনেছিলো) বিধায় আমি তাদের রক্ষা করি। আর যারা আমার স্পষ্ট নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাদের আমি নিমজ্জিত করি। বস্তুত তারা ছিলো আঁধারে নিমজ্জিত।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৪) একই দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর সূরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন "সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কি পরিণাম ঘটেছে।" (সূরা ইউনুস ঃ ৭৩) এভাবে কুরআনে ঘটনাগুলি বর্ণনা করার পর ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে এবং কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ কথার প্রতিধ্বনি করে কুরআনুল কারীম বলছে এতে নিশ্চয়ই নির্দশন রয়েছে কিন্তু উহাদের বেশীরভাগই অবিশ্বাসী।" (সূরা শু'আরা ঃ ১২১) হযরত নূহ (আ.)-এর পরে আসে' 'আদ জাতির কথা। তাদের প্রতি আল্লাহ হেদায়তের জন্য হযরত হূদ (আ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হিজায, ইয়েমেন এবং ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'আহকাফ নামক এলাকাই ছিলো 'আদ' জাতীর বাসস্থান। এখান থেকে তারা বিস্তৃত হয়ে ইয়েমেন এর পশ্চিম উপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিলো। হূদ (আ.)-কে প্রেরণের পূর্বে তারা বৃষ্টি, বাতাস, ঐশ্বর্য এবং রোগ-ব্যাধিকে প্রভু দেবতা বলে মান্য করতো। হূদ (আ.) যখন এক আল্লাহর দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বললো ঃ "হে হূদ! তুমি আমাদের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারনি। তাই তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাগণের পরিবর্তে তোমার ইলাহকে গ্রহণ করতে রাজী নই এবং আমরা তোমাকে ও বিশ্বাস করিনা" (সূরা হূদ ঃ ৫৩) তবু ও হূদ (আ.) তাদের অনেক বোঝালেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী কয়জন ছাড়া কেউই তাঁর দলভুক্ত হলোনা অতঃপর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কি হয়েছিলো সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহ বলছেন, "পরে তারা তাঁকে (হূদ আ.-কে)

প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমিও তাদের ধ্বংস করে দিলাম। এতে অবশ্যই (তোমাদের জন্য শিক্ষা) নির্দশন আছে; কিন্তু তাদের অনেকেই এটা বিশ্বাস করে না।" (সূরা শূ'আরা ঃ ১৩৯)

এ 'আদ' বংশের সূত্র ধরেই আসে সামূদ জাতি। তারা ও তদীয় নবীকে অস্বীকার করে ধ্বংসের পথ থেকে নিয়েছিলো। কুরআন বলে ঃ জেনে রেখো! সামূদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো এবং পরিণামে তারা ধ্বংস হয়েছিলো।" (সূরা হূদ ঃ ৬২-৬৬) বর্তমান মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী 'মাদায়েনে সালেহ' নামক একটা জায়গা আছে, এখানেই ছিলো সামূদ জাতির সদর বাসস্থান। এখনো সেখানে কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত বর্তমান আছে যা তারা পাহাড় খনন করে নির্মাণ করেছিলো। 'আদ' জাতির ধ্বংসের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে।

নবী মূসা (আ.)-এর আমলে ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিলো। মূসা (আ.) তাঁর জীবনের একটা বিরাট সময় তার পিছনে ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু তার দাম্ভিকতা ও ভণ্ড খোদায়ীত্ব দাবী এতই সীমালংঘন করেছিলো যে সবশেষে তার পরিণতি বড়ই মর্মান্তিক হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং ফেরাউন ও তার লোকেরা নবীকে অস্বীকার করেছিলো, তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়।" (সূরা ইউনুস ঃ ৭৫)

এভাবে জাতির পরে জাতি পৃথিবীতে উত্তরাধিকারীরূপে এসেছিলো। কিন্তু তন্মধ্যে যারা-ই আল্লাহর প্রেরিত নবীর প্রতি অনাস্থা দেখিয়েছিলো, পরিণতিতে একে একে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আর যারা আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো, তারা যুগে যুগে রক্ষা পেয়েছিলো। বস্তুতঃ খুব কম লোকই আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলো। কুরআনে মানুষকে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ব্যবসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে যাবার সময় পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে থাকবে। যেমন– "এরা তো সেই জনপদ দিয়ে চলাচল করে যার উপর অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো। তবে কি তারা উহা প্রত্যক্ষ করে না?" (সূরা ফুরকান ঃ ৪০)

কুরআনুল কারীমের এ সব আয়াতে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্বেকার জাতিসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন এবং অতীত গোষ্ঠিসমূহের মূল্যায়ন করতে হবে। স্থাপত্য শৈলী ও চিত্রকলা এবং জাগতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব বিচার করতে হবে এই আলোকে যে, তারা তখনকার নবীর শিক্ষানুসারে কতোটুকু পরিচালিত হয়েছিলো। তারা যদি নবীদের মত ও পথ অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে তবেই তাদের সভ্য এবং উচ্চ

সংস্কৃতিবান জাতি বলে বিবেচনা করা হবে। নচেৎ তাদের সভ্যতাকে অজ্ঞতার সভ্যতা বলা হবে, যদিও পার্থিব ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে তারা প্রবল উন্নত ছিলো। যেমন আল্লাহর এরশাদ ঃ "ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, হে আমার কাওম। মিসর কি আমার রাজ্য নয়? তোমরা কি দেখ না যে, এই নদী আমার পাদদেশে প্রবাহিত? আমি তো এ ব্যক্তি (হযরত মূসা) হতে শ্রেষ্ঠ, যে হীন এবং স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৫১-৫২)

এ সমস্ত উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ মানুষের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক দলীল এবং নির্দশনাদির কথা বলেছেন। সেগুলিতে বিভিন্ন জাতির অসামান্য পার্থিব অগ্রগতি এবং তাদের বিশাল রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাবল্যতার দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এটাও পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের কারণে তাদের সেসব সভ্যতার অগ্রগতি নিষ্ফল হয়ে গিয়েছিলো। সত্যের মানদণ্ডে পার্থিব উন্নতিও অগ্রগতি তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি, কারণ এতে সে সকল সৎকর্মই ওজনদার হয়, যেগুলি ঐশী আদেশে পালন করা হয়। পক্ষান্তরে মূর্খতা ও অজ্ঞতার মিথ্যা উল্লাস যা কিছু করা হয়েছে তা নিষ্ফল এবং নাস্তা নাবুদ হয়ে যায়। পবিত্র আল্ কুরআন এই তুলা দণ্ডেই প্রাচীন মানব সভ্যতাকে বিচার করে। যে জাতি সে সব শর্ত পূরণ করতে পেরেছিলো, তারাই উত্তম সংস্কৃতিবান, অগ্রগামী এবং সুসভ্য জাতি। তাদের সভ্যতাই আল্লাহর দৃষ্টিতে চলমান সকল কওমের জন্য অনুসরণীয়ও অনুকরণীয়। অপরদিকে যে সকল জাতি এ শর্ত পূরণ করতে পারেনি তারাই রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে অসভ্য অমার্জিত জাতি। তাদের সভ্যতা ছিলো নিতান্ত অজ্ঞতার শোভাযাত্রা। মানুষের অনুশীলন এবং শিক্ষার জন্য এ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকেই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই পরিচিতি ও শ্রেণী বিভক্তির রীতি অনুসৃত হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে প্রধানত ভর্ৎসনা ও সংশোধনের প্রয়োজনে। মূলতঃ এ ধারাতেই গবেষণা করা উচিত। পূর্ববর্তী জাতির সভ্যতা প্রমাণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাটি নিতান্তই অমূলক। কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে ঃ "আমি রাসূলগণের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিবৃত করি, যদ্দারা তোমার চিত্ত মজবুত হয়। এর মধ্যেই তোমার নিকট সত্য আছে আর বিশ্বাসীদের জন্য আছে উপদেশ ও সতর্কবাণী।" (সূরা হূদ ঃ ১২০) অন্যত্র "যা পূর্বে ঘটেছিলো তার খবরাদি এভাবে তোমার কাছে আমি বর্ণনা করি এবং আমি তোমাকে দান করেছি উপদেশ।" (সূরা ত্বা'হা ঃ ৯৯) একথা সংশয়হীন যে, কুরআন অবস্থার

পটভূমিতে মানুষের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেছে কিন্তু এর সার্থকতা হলো সর্বত্রই মূল বিষয়বস্তু সতর্কতা জ্ঞাপক যাতে মানব জাতির উপকার এবং ভুল পথ থেকে সরানোর কৌশল নেয়া হয়েছে। যাতে তারা পূর্ববর্তীদের আচরণের পুনরাবৃত্তি করে ধ্বংসের পথ বেছে না নেয়। এসব সতর্কতামূলক বাণী সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তবে কুরআনে শুধু জ্ঞানীরাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে বলে বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "এটাও কি তাদের হেদায়াত প্রদর্শন করলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে, তবুও কি তারা শুনবে না?" (সূরা সাজদা ঃ ২৬)

কুরআনে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে এ জন্য যাতে তারা জাগতিক আপাত আকর্ষণগুলো এবং জীবনের বস্তুগত আকর্ষণসমূহের চাকচিক্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এটা যে, জীবনের আনন্দ উপভোগের মধ্যে ও ক্ষমতার ব্যবহারের দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা। সে কি জীবনের আনন্দ উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে আল্লাহকেই অস্বীকার করে বসে? না একজন বিবেচক মানুষ হয়ে লোভ-লালসা ও বিপুল আকর্ষণ সত্ত্বেও আপন সৃষ্টিকর্তাকেও তাঁর বিধি-বিধানকে স্মরণে রাখে? এক আয়াতে এ কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। "পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলির শোভা বর্ধন করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে উহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা কাহাফ ঃ ৭)

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে নিয়ে কুরআনিক বিশ্লেষণ এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের স্থাপত্য শিল্প, চিত্রশিল্প এবং জড়মূর্তিগুলো হতে তাদের পার্থিব অগ্রগতি বিবেচনা করে যাবতীয় অনুশীলন সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং এদিক থেকেই তাদের অগ্রগতি ও সভ্যতা নির্ণয় করে থাকে। তাদের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, জীবনযাপন ইত্যাদি পদ্ধতির বিষয়ে তারা আদৌ বিবেচনা করেনা। তারা কি তৌহিদবাদী ছিলো নাকি বহু জড়বাদীর উপাসক ছিলো, তারা কি আল্লাহর নবীকে গ্রহণ করেছিলো না মিথ্যারোপ করেছিলো-এ সমস্ত বিষয় আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার কোনো বিষয় নয়। তাই দেখা যায় পবিত্র কালামুল্লাহ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এক সুদূর প্রসারী দিকদর্শন দান করেছে। সে উদ্দেশ্য ছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিতান্তই অমূলক ও প্রহসন মাত্র।

মুসলিম স্পেনের বিজ্ঞানী-শিল্পী ও সাহিত্যিক

মুসলমানদের হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বলতম কেন্দ্রছিল মুসলিম স্পেন। দীর্ঘ সাতশত বছর ধরে স্পেন মুসলমান অধীনে ছিল। ইউরোপের বুকে একমাত্র মুসলিম ভূখণ্ড ছিল বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ স্পেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় রেঁনেসার উন্মেষে অনবদ্য অবদান রেখেছে। মুসলিম স্পেন যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন তখন ইউরোপ অজ্ঞতা-বর্বরতায় প্রযুক্ত। লেনপুল উল্লেখ করেছেন ঃ "all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners" তখন গোটা ইউরোপ বর্বর অজ্ঞতা ও বুনো ব্যবহারে নিমজ্জিত ছিল।

ইউরোপ মুসলমানদের হাত হতে যখন স্পেন ছিনিয়ে নেয় তখন হতেই প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রেঁনেসাসের সূত্রপাত হয়। টয়েনবি লিখেন : "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করে।" কেননা, ক্রুসেডে অংশ গ্রহণকারীরা মুসলিম প্রাচ্যের উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং উদ্বুদ্ধ হয় উন্নততর জীবনধারা লাভের আশায়। ক্রুসেডের ফলেই প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্য লাভ করে চাক্ষুষ সম্যক উচ্চতর জ্ঞান এবং কালক্রমে প্রাচ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ও বাণিজ্যের প্রসারতার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

একথা তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, মুসলিম স্পেন একটা উন্নতর সভ্যতার পাদপীঠ ছিল। বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প সাধনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে তাঁরা এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাঁদের ছাড়া সভ্যতার ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা পথিকৃতের মর্যাদাবান।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম দুনিয়া সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন অনায়ন করে। বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপল, কর্ডোবায় মুসলিম উৎকর্ষতার চরম বিকাশ লাভ করে। তবে স্পেনের কর্ডোবা ছিল স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। কর্ডোবার সভ্যতা আর জ্ঞানশিখা

সমগ্র ইউরোপ গগণে রবি রশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হত। তদানীন্তন বিশ্বে বাগদাদ কনস্টান্টিনোপল ও কর্ডোবাই ছিল বিশ্বের সভ্যতার পীঠস্থান। কিন্তু কর্ডোবার সভ্যতা যেন সবাইকে অতিক্রম করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কর্ডোবার খ্যাতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত। প্রত্যেক নরপতিই ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানসেবক।

স্পেনের এই সোনালী অধ্যায় সৃষ্টিতে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তারা হলেন এখানকার বিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক কর্মীগণ। গোটা স্পেনই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার এক আদর্শভূমি। প্রত্যেক শাসকই ছিলেন জ্ঞানানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্পেন এমন এক স্বর্ণদ্বারে পরিণত হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশ থেকে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতো বিদ্বানমণ্ডলী। ফ্রান্স, ইটালী, গ্যালিসিয়া, আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি দূর দেশ হতে ছুটে আসতো বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত প্রবর কবি-সাহিত্যিকগণ। তাঁরা সকলেই এখানে সমাদরে অভ্যার্থিত এবং সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হতেন। এভাবে প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পেয়ে বহু বিখ্যাত কবি, বৈয়াকরণিক এবং ঐতিহাসিকরা কর্ডোবায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্পেনের প্রায় প্রত্যেক শাসকই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তন্মধ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান, হাকাম (২য়) এবং মনসুরের নাম বিশিষ্টতার দাবীদার। এঁরা ছিলেন মূলত মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগের পৃষ্ঠপোষক ও বোদ্ধা শাসক।

তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খৃষ্টাব্দ) এর সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্র এবং বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ কর্ডোবায় সমবেত হন। তাই তখন কর্ডোবাকে বলা হত 'পণ্ডিতপ্রসূ'। বিশিষ্টদের মধ্যে দার্শনিক ইবনে মাসারাহ (মৃ. ৯৩১) ঐতিহাসিক ইবনুল আহমর (মৃ. ৯৬৯), জ্যোতির্বিদ আহমদ বিন নসর (মৃত্যু ৯৪৪), মাসলামাহ বিন কাসিম (মৃ. ৯৬৪), চিকিৎসক আরিব বিন সাঈদ, ইয়াহিয়া বিন ইসহাক অন্যতম। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল জ্ঞানীরাই উপযুক্ত মর্যাদা পেতেন। গ্রীক পণ্ডিত নিকোলাস, ইহুদী পণ্ডিত হাসদাই তাঁর দরবারে সম্মানীত হন।

স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর রহমান নিজেই একজন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্য বোদ্ধা ছিলেন। তাঁর আসরের সাহিত্য পিপাসুদের মধ্যে কবি আবুল আল মুতাহাশ্‌শা, শাস্ত্রবিদ শেখ গাজী বিন কায়েস, আবু মূসা হাওয়ারী উল্লেখযোগ্য। আবদুর রহমানের পুত্র হিশাম ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। যে সকল পণ্ডিত হিশামের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঈসা বিন দীনার, আবদুল

মালিক বিন হাবীব, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, সাঈদ বিন হাসান এবং ইবন আবু হিন্দ অন্যতম। প্রথম হাকাম, দ্বিতীয় আব্দুর রহমান গ্রন্থাগার সংগঠনে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সময় কর্ডোবার উমাইয়া গ্রন্থাগার মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল।

তৃতীয় আবদুর রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকাম ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত শাসক। দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৯৭৬ খৃ.) নিঃসন্দেহে জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। স্পেনের সিংহাসনে এতবড় পণ্ডিত ও জ্ঞানানুরাগী আর কেউ আরোহণ করেননি। ইবনে খালেদুন লিখেছেন ঃ 'হাকাম সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম বদান্যতা। জোসেফ ম্যাকেভ বলেন ঃ হাকাম আন্দালূসীয় সভ্যতার পরিপূর্ণতা অনায়ন করে কর্ডোবা নগরীকে ইউরোপের বুকে একটি বাতিঘরে পরিণত করেন।

দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণকে তিনি যে কোন মূল্যে অগ্রাধিকার দিতেন। গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পূর্বেই তিনি তা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। কেউ কোন গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেছে একথা শুনলেই তিনি তার জন্য মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর অনুরোধ ও থাকত যে, পুস্তকের প্রথম কপিটিই যেন কর্ডোবায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাকাম কর্তৃক অনেক গ্রন্থকার পুরস্কৃত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। এভাবে তিনি চার লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

হাকামের বিশাল লাইব্রেরীতে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজি সংরক্ষিত ছিল। শুধু গ্রন্থের তালিকার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ৫০ খণ্ড পুস্তিকা। হাকাম সংগৃহীত প্রত্যেক গ্রন্থই পাঠ করতেন এবং অনেক গ্রন্থের পাশে নিজস্ব টীকা ভাষ্য লিখতেন। তাঁর পরবর্তী কালের মনীষীরা এসকল ভাষ্য খুবই মূল্যবান বলে বিবেচনা করতেন।

হাকাম গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন পুরোধা। তাঁর মত বই পাগল নৃপতি পৃথিবীর ইতিহাসে খুববেশী নেই। তাঁর নামে অসংখ্য গ্রন্থ উৎসর্গীত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থাগারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে খালেদুন লিখেছেন, আব্বাসীয় খলীফা আল্ নাসিরের গ্রন্থাগার ব্যতীত কোন গ্রন্থাগারের সাথে এর তুলনা হয়না। সমসাময়িক আরব পণ্ডিতরা এ দুর্লভ ও মূল্যবান সংগ্রহ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এর বিপুল সংগ্রহ স্থানান্তর করতে দীর্ঘ ৬ মাস লেগেছিল।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের পর খলীফা আল মনসুর (৯৭৬-১০০২ খৃ.) শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি যুদ্ধে যাবার সময়ও গ্রন্থাগার সাথে নিয়ে যেতেন। সাথে থাকতো কবিকুল। তাঁর দরবারে রীতিমত পণ্ডিতদের আসর বসত। তার বাসভবনে এত বিদ্বানমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটতো যে, একে বিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা হতো।

আল মনসুরের দরবারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, কবি ওবাদা বিন আবদুল্লাহ মাসুমী, আবদুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাঈদ বিন উসমানসহ আরো অনেকে। তবে মনসুরের সাথে কিছু বিশিষ্ট আলেমের মতবিরোধ হয় এবং ওলামাদের সমর্থন লাভের আশায় হাকাম সংগৃহীত কিছু মূল্যবান দর্শন গ্রন্থ তিনি পুড়ে ফেলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

শাহী গ্রন্থাগার ছাড়াও কর্ডোবায় ৭০টি বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। এছাড়া স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদে ছিল লাইব্রেরী। ব্যক্তিগত ও গণগ্রন্থাগার, প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সব মিলিয়ে গোটা স্পেন ছিল একটা বইয়ের বাজার। স্পেনে বই সংগ্রহের বিষয়টি মোটামুটিভাবে জাতীয় 'হবি' হিসেবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং কর্ডোবায় তা সামাজিক কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ইতিহাসবেত্তা ইবনে সাঈদ তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছিলেন যে, 'কর্ডোবা ছিল বইয়ের বাজারের সেরা শহর, কারণ এখানকার অধিবাসীরা গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে খুবই ভালবাসতেন।

এই সকল প্রামাণ্য তথ্য হতে আঁচ করা যায় মুসলিম স্পেন শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যে কতটুকু উন্নতি লাভ করেছিলো। এখানে জ্ঞানচর্চা এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ ঐতিহাসিক ডোজি তাঁর বিখ্যাত Spainish Islam গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, স্পেনের প্রতিটি নাগরিক লেখাপড়া জানত। অথচ সেই সময় সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতা ও মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল।

কবি ও কবিতা মুসলিম স্পেনের অত্যন্ত সমাদরের বস্তু ছিল। রাজদরবার হতে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা পর্যন্ত যত্রতত্র কবিতা ব্যবহার করত। ঐতিহাসিক লিখেছেন : "সাহিত্য সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিতা লোকের কথ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সর্বশ্রেণীর লোকই আরবীতে কবিতা রচনা করিত... এই সকল কবিতার আদর্শেই স্পেন, প্রোভেন্স ও ইতালীর চারণদের গীতিকাব্য অনুপ্রাণিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত বা কোন বিখ্যাত কবির কাব্য হইতে কণ্ঠস্থ কবিতাংশ উদ্বৃত করিতে না পারিলে কোন বক্তৃতা বা অভিনন্দন পত্রই

পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত না... খলীফা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষক ও মাঝি মাল্লা পর্যন্ত সকলেই কবিতা রচনা করিত। আন্দালুসিয়ার নগরাবলীর সৌন্দর্য, নদীর কল্‌কল্‌ শব্দ, নিস্তব্দ নক্ষত্র শোভিত সুন্দর রজনী, প্রেম ও মদের আনন্দ, প্রিয়জনের সঙ্গসুখ প্রভৃতিই ছিল তাঁদের আলোচ্য বিষয়... আন্দালুসিয়া কবির সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, কেবল তাদের নাম লিখতে গেলেই একখানা বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন।"

স্পেনের কবিরা রাজন্যবর্গের কাছে উচ্চ সম্মান পেতেন। রাজ দরবারের একটা অনুপম বিশেষত্ব ছিল যে, কাব্য ও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তা মুখরিত থাকত। গ্রন্থ রচয়িতা, সংকলক ও অনুবাদকরা আকর্ষণীয় সম্মানী পেতেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁর বিখ্যাত 'কিতাবুল আগানী' রচনা করে দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রায় বিভূষিত হন। তৎকালীন স্পেনের অন্যমত শ্রেষ্ঠ লেখক উবায়দা বিন আবদুল্লাহ হযরতের প্রশংসাসূচক কবিতা নিয়ে স্পেনীয় কবিদের একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের জন্য মনসুর তাকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করেন। তাছাড়া কবিদের জন্য তিনি তাঁর গৃহের দ্বার সবসময় খোলা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈয়দ বিন ওসমান খলীফার বিজয়াভিযানের প্রশংসা সূচক ১০০ ছত্রের একটি কবিতা তাঁকে উপহার দেন। আল মনসুর পরদিন কবিকে স্বর্ণসূত্র বিজড়িত ৩০০ দীনার পুরস্কার পাঠিয়ে দেন।

কবিদের মধ্যে উবায়দা বিন আবদুল্লাহ, আবদুল ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাঈদ বিন উসমান, সাঈদ বিন হাসান, ইবনে যায়দুন, ইবনে আহনাফ, ইবনে সায়ীদ, ইবনে আম্মার, ইবনুল খাতিব, ইবনুল লেবারণ, রোদ্দার আর বেকা, ইবনে লাব্বানা, ইবনে ইয়েমানী, আবু বকরসহ অনেকের নাম করা যায়।

কবি ইবনে যায়দুন, ইবনে আহনাফ ও ইবনে হাসান ছিলেন রোমান্টিক কবিতার শিরোমণি। ইবনে যায়দুনকে ইটালীর বিখ্যাত সনেট প্রবক্তা পের্ত্রাক-এর সাথে তুলনা করা হয়। ইবনে আহনাফের সঙ্গীত স্পেনীয় মুসলমানদের হাজার বছরের সংগ্রামে প্রেরণা দেয়। ইবনে সায়ীদের মদির কবিতা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খলদের মন্ত্রস্বরূপ ছিল। ইবনুল আম্মারের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান মু'তামিদ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

মুসলিম স্পেনের কবিও কবিতা সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই অজানা। বর্তমানে কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হচ্ছে। এ রকম অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে জানুয়ারী/১৯৯৫ সংখ্যা ইউনেস্কোর 'ক্যাটালোনিয়া' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়। জোসেফ পিয়ারো, 'The Arab Poets of Valencia' শিরোনামে এ প্রবন্ধ লিখেন। এই নিবন্ধ অবলম্বনে লিখিত এক পর্যালোচনায় সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন ঃ 'মুসলমানদের সময়কালে আরবী কবিতা লিখিত হয়েছে, বিচিত্র আরবী ছন্দে লোকগীতি রচিত হয়েছে, চারণ কবিরা অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরে ক্বাসিদা গেয়ে ফিরেছে। এগুলোর প্রভাব এতো প্রবল ছিল যে আধুনিক কবি লোর্কা আরবী ছন্দের ব্যঞ্জনায় এবং আরবী কাব্য কৌশলে ক্বাসিদা রচনা করেছেন। শুধুমাত্র তাই নয়, মুসলমানদের জীবন খেকে উদাহরণ গ্রহণ করে তাঁরা কবিতায় নতুন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করেছেন। চাঁদের উপমা এসেছে কবিতায়, রমযানের জন্য অপেক্ষায় মুসলমানদের জীবনে যে অসম্ভব আগ্রহ, সে আগ্রহকে তুলনা করেছেন প্রিয়ার আগমনের অপেক্ষার সঙ্গে। এখনকার দিনে যাদেরকে জিপসী বলে, তারাও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত গীত গায় সেসব গীতের সুর মূর্চ্ছনা ও প্রাচীন আরবী সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনা।'

স্পেনের কবিদের কবিতা নিয়ে তখন অনেক সংকলন হয়েছিল। জায়েনের আহমদ বিন ফররাজ 'বাগান' নামক এরকম একটি পুস্তিকা সংকলন করেন। ইহা ১০০ অধ্যায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ১০০টি কবিতা ছিল। আবু বকর বিন দায়দ আল ইস্পাহানীর 'পুষ্প' ছিল এই ধরনের সংকলন। তবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্বত্র বিদ্যামণ্ডলীর কাছে 'বাগান' ছিল অধিক সমাদৃত।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় মুসলিম স্পেনে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল। দর্শনে আবু সীনা বিন মাশাবাহ, আবু রুশদ (পাশ্চাত্যে Averroes) ইবনে জিব্রাইল, ইবনে বাজা, ইবনে জোহর, ইবনে তোফায়েল, ইবনে হাইছাম অগ্রগণ্য। মুসলিম দুনিয়ার জ্ঞানীদের এ একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। মুসলিম স্পেনের ক্ষেত্রে ও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইবনে বাজার (মৃ. ১১৩৮ খৃ.) পুরো নাম আবু বকর মুহম্মদ বিন ইয়াহিয়া, মুসলিম স্পেনের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। তিনি চিকিৎসক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন একইসাথে। মুসলিম জাহানের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ইবনে সীনার মৃত্যুর পর দর্শন চর্চা প্রায় বিলুপ্ত হলে তিনি ফারাবীর (৮৭০-৯৫০ খৃ.) শিষ্য হিসেবে দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন এবং রক্ষণশীল ধারায় এরিষ্টটলের নিও-প্লেটোনিক ব্যাখ্যা শুরু করেন। তাঁর অনেক মৌলিক গ্রন্থ আছে।

মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক বিন তোফায়েল (মৃ. ১১৮৫) গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। বহুমুখী প্রতিভা ইবনে তোফায়েল, তাঁর দর্শন চর্চা ছিল ইবনে বাজার সমপর্যায়ের। তাঁর মতে, জিকরে মত্ততা হলো শ্রেষ্ঠ ও সত্য জ্ঞান লাভের একটি উপায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'হাই-বিন ইয়াকজান।'

মুসলিম স্পেনের দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন ইউরোপে আভিরোজ পরিচিত মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খৃ.)। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে রুশদ, আইনজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ববিদ, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শী ছিলেন। দার্শনিক হিসাবে তাঁর প্রতিভা অন্যান্য প্রতিভাকে ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি এরিষ্টটলের কাজের উপর যে বিশাল ভাষ্য লিখেন তা ইউরোপের কাছে আজও বিস্ময়কর। হিব্রু ভাষায় তাঁর দর্শনের গ্রন্থ সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে ইবনে রুশদ কয়েক শতাব্দী ধরে আলোক রশ্মি বিকিরণ করেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরে রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) লিখেন ঃ "...আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূতদের এরিষ্টটলের প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত করে যিনি, ইউরোপীয় মানবতাকে অনুর্বর পাণ্ডিত্যাভিমান এবং ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামীর পক্ষাঘাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে অপরিমিত প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই সুধী শ্রেষ্ঠ এ্যাবেরোজ (ইবনে রুশদ)-এর কীর্তি ও অমর হয়ে রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আন্দালুসীয় সুলতানের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠপোষকতায় আরবের যে প্রধান যুক্তিবাদী বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকা রজার বেকনের বহু পরিচিত এই উক্তিতে সরবে বিঘোষিত হচ্ছে "প্রকৃতির দ্বার উদঘাটন করেছেন ইবনে রুশদ।"

ইবনে রুশদের কিছু মতবাদ ধর্মবেত্তা ও সাধারণ মুসলমানের সাথে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনকার যুগে তাঁকে ধর্ম বিরোধী, নাস্তিক, শয়তান বলে গালি দেয়া হয়েছে। ইসলাম ও দর্শনের সমন্বয়কারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা থাকলে ও তাঁকে ধর্ম বিরোধী চিন্তানায়ক বলা হয়। এ কারণে তিনি জীবৎকালে সব স্থান থেকে নিগৃহীত হন এবং সর্বশেষ আফ্রিকায় পালিয়ে যান। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ইমাম গাজালীর 'তুহফাতুল ফালাসিফা'র জওয়াবে রচিত 'তুহফাতুত্ তাহফুত', 'কিতাবুল ফালাসিফা' এবং 'ফাসলুল আকালী ফি মুয়াফিকাতিল হিকমাত ওয়াশ্ শারীয়াহ' উল্লেখযোগ্য।

স্পেনে মুসলিম শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীখ্যাত অনেক ঐতিহাসিক। এমনিতেই আরব শাসকরা ইতিহাস লিখনকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা শুরু করেন সেই সূত্রে তারাই হলেন যথার্থ ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ।

স্পেনের প্রত্যেক খলীফাই রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য ঐতিহাসিক নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেক শহর ও প্রদেশে ঐতিহাসিক নিযুক্ত ছিলেন। বাদাজোজের ইবনুল আফতাশ ও ইবনুল খাতিব। টলোডোতে ইবনুল আহমদ, কর্ডোবায় খাজরাজী, আল গাজ্জাল, আল হিজারী, মাক্কারী, আরাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছেন আল ফারাদী (জ. ৯৬২. খৃষ্টাব্দ), আত্ তুলাইতুলী (১০২৯-১০৭০ খৃ.) আল্ আব্বার (১১৯৯-১২৬০) ইবনে খাতিব (১৩১৩-১৩৭৪), ইবনে খালেদুন (১৩৩২-১৪০৬), মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, ওয়াহিদ বিন সামর, ইবনে কুতিয়া প্রমুখ। তবে মুসলিম স্পেনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে যিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং খ্যাতিমান তিনি হলেন ইবনে খালেদুন। তিনি ছিলেন আধুনিক ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস লেখেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ৩ খণ্ডে রচিত মুকাদ্দামা আরব জাতির ইতিহাস, বার্বারদের ইতিহাস বিখ্যাত। মুকাদ্দামায় ইবনে খালেদুন তাঁর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব রয়েছে এবং তিনি রাজ্যের উত্থান ও পতনের মূলে প্রধান কার্যকর কারণগুলো বিশ্লেষণ করেন। ইতিহাসের এই তত্ত্ব তাঁর জন্য বয়ে আনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

ইবনে খালেদুন তাঁর যুগের চাইতে অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন। মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ম্যাকিয়াভেলি, ভিকো এবং এডওয়ার্ড গীবন ছিলেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম। হিট্টি বলেন ঃ "ইবনে খালদুন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক ছিলেন।"

স্পেনে বেশ কয়জন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ভৌগলিক জন্মগ্রহণ করেন। কর্ডোভার আল বাকরী (জ. ১০৪০ খৃ.) একটি ভৌগলিক অভিধান রচনা করেন। মুহম্মদ বিন আবু বকর যুহরী ও আল মাযিনী ছিলেন গ্রানাডার দুই জন বিখ্যাত ভূগোলবিদ। সিউটার শ্রেষ্ঠ সন্তান আল ইদ্রিসী (১১০০-১১৬৫) সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ভূগোলবিদ। মুসলিম স্পেনের ভৌগলিকদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আল ইদ্রিসী একটি 'খ-গোলক' (Gelestial sphere) নির্মাণ করেছিলেন। তিনি একটি গোলকে জ্ঞাত জগতের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। এটা তাঁকে মানচিত্র প্রস্তুতকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। [N. Ahmed : Muslim Contribution to Geography] ইদ্রিসী নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ মানচিত্র নির্মাতা। তিনি প্রায় ৭০টি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। এতে তিনি পৃথিবীর অক্ষাংশ পরম্পরায় ৭টি আবহাওয়া বিভাগ দেখিয়েছেন। রৌপ্যপাত্রে ও তিনি পৃথিবীর একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন।

সাড়ে চার হাত ব্যাস এবং সাড়ে পাঁচ মণ ওজন বিশিষ্ট রূপার একটি ভূ-গোলক তৈরী করেন। এতে রাশিচক্রের অবস্থান। বিভিন্ন দেশ জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেন। বিখ্যাত এই মানচিত্রের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ১ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং পণ্য বোঝাই এটি বাণিজ্য জাহাজ লাভ করেন। তিনি সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে স্পেনের শল্য চিকিৎসক আবুল কাসেম যাহ্‌রাবী (৯৩৬-১০১৩ খৃ.) ল্যাটিনে আল বুকাসিস্ নামে পরিচিত। তাঁর রচিত মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থটি ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে সমাদৃত ছিল। ইউরোপে অস্ত্রপচার প্রবর্তনে এই গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। সেভিলে জন্মগ্রহণকারী ইবনে যুহর (১০৯০-১১৬২ খৃ.) ছিলেন স্পেনের কৃতি ও নামজাদা চিকিৎসক। তাঁর পরিবারের ছয় পুরুষ স্পেনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করেন। তাঁর রচিত ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে ৩টি এখনো পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'আত তাদবীর ফিল মুদাওয়াত আত্ তাদবীর' সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইবনে রুশদ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁকে গ্যালেনের পর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ বলে অভিনন্দিত করেন। মূসা বিন মায়মুন বা মাইমুনায় ভেস (১১৪৫ -১২০৪) আরব আমলের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইহুদী চিকিৎসক ছিলেন। 'আল ফুসুল ফিত্‌তীব' তাঁর জনপ্রিয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

দার্শনিক ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৯) একজন খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদ ছিলেন। খলীফা ইয়াকুব আল মনসুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। তাঁর 'তাফসীর ওয়া কুল্লীয়াত ফিত্‌তীব' আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার এক বিরাট বিশ্বকোষ। এছাড়া অরিব বিন সাইদুল খাবীর, উলেভার ইবনে ওয়াকিদ, দাউদ আল আগরিবী, সালাহুদ্দীন বিন ইউসুফ, আবু বকর বিন বাজ্জা, আবু সীনা, ইবনুল বায়তার, আবু বকর মুহম্মদ (১১১১-১১৯৯), আবু মুহম্মদ আবদুল্লাহ (১১৮২-১২০৬), মুজফ্‌ফর

আল বাহেলী (মৃ. ১১৫৪), সাইমুনাইডেস, ইয়াহিয়া বিন ইসহাক, ইসহাক বিন হাইছাম প্রমুখ চিকিৎসাবিদদের নাম উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে স্পেনীয় মুসলমানদের অবদান চির স্মরণীয়। তারাই প্রথম ইউরোপের বুকে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ উদ্দেশ্যে ১১৯৬ সালে সেভিলের প্রসিদ্ধ বুরুজ জিরাল্ড নির্মিত হয়। স্পেনীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে জাবির বিন আফলাহ, আহমদ বিন নসর, টলেডোর ইব্রাহীম আবু আহসান, হাসান আল মার্রাকুশী, ইবনে হেজরা, ইবনুল কাশিম, আবুল কাশিম জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নে কাজ করেছেন। তবে দুর্ভাগ্য, তাঁদের গ্রন্থাদি অনেকাংশে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

পারস্যে জন্মগ্রহণকারী এবং স্পেনে প্রতিষ্ঠিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আবু হাসান বিন নাফে ওরফে জিরাব ছিলেন সঙ্গীত শিল্পের অমর ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক লেনপুল ও ডোজি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্পেনের আরো অসংখ্য জ্ঞানী, শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন শাস্ত্রবিদ ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, ঈসা বিন দীনার, আবু ইব্রাহীম, ইবনে মুয়াবিয়া, সাঈদ বিন রাযিক, ব্যাকরণ ও ভাষাবিদদের মধ্যে- আলী আল কুতিয়াহ, আলী আল কুলী, আবু বকর জুবাইদী, ইব্রাহীম বিন নজর এবং গণিতবিদ আল জিবার।

স্পেনের মহিলা শিল্পী ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন কর্ডোবার মহিলা কবি ওয়াদাল্লাহ। ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্রে তিনি এতই বুৎপত্তি সম্পন্না ছিলেন যে, সারা বিশ্বের তিনি 'Sapho of Arabs' নামে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনে বিখ্যাত বক্তা ছিলেন কর্ডোবার রাজপুত্র আহমদ এর কন্যা আয়েশা। তাঁর বক্তৃতামালা কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। দার্শনিক লাবানা ছিলেন একজন স্পেনীয় মুসলিম রাজকন্যা। যোগ্যতা বলে তিনি খলীফার ব্যক্তিগত সচিব হয়েছিলেন। সেভিলের ইয়াকুব আল আনসারী দুহিতা ফাতেমা ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও শাস্ত্রবিদ।

এভাবে অসংখ্য অগণিত প্রতিভার স্পর্শে মুসলিম স্পেন ধন্য হয়েছিল। তার রাজধানী কর্ডোবার যশোগাঁথা দেখে সুদূর জার্মানীর এক মঠবাসী সন্নাসিনী মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, Cordova : The Jewel of the World.

পাশ্চাত্য সভ্যতার ঋণ

মানব সভ্যতার ইতিহাস অনেক পুরানো। পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশে মিসরীয়রাই সর্বপ্রথম অবদান রেখেছিল। তারা মানুষকে কৃষি কাজ, প্রাসাদ নির্মাণ এবং লিখতে শিখিয়েছিল। তারপর সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুক্ত হয় আরো অনেক জাতির নাম। সুমেরীর, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশীয়, আসারীয়, চ্যালডানীয়, পারসিক, গ্রীক, কার্থেজেনীয়, চীনা, ভারতীয়, রোমান এবং আরব সভ্যতার। এদেরই হাত ধরে জন্মলাভ করে বর্তমান আধুনিক তথা ইউরোপীয় সভ্যতা। সভ্যতার এই বিনির্মাণ পর্যায়ে উল্লেখিত সকল জাতিরই অবদান সম্পৃক্ত। কিন্তু কিছু জাতি এমন আছেন যারা মানব সভ্যতা বিকাশে অবিস্মরণীয় মৌলিক অবদান রেখেছেন। মিসর, গ্রীক ও আরব সভ্যতার এদের প্রধান প্রতিনিধি। বর্তমান ইউরোপীয় রেনেঁসার অংকুর উদ্গমে যারা সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন, জাগিয়ে তুলেছিলেন তাদের– তাঁরা হলেন মরুচারী আরব। তাই আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশে আরব সভ্যতার দান সর্বাধিক একথা বললে অত্যুক্তি করা হয়না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একটি সভ্যতার যখন জয় জয়কার তখন তার পূর্ব প্রতিনিধির অবস্থা সঙ্গীন থাকে। বিশিষ্ট পাশ্চাত্য লেখক আবদুর রহমান আয্যাম লিখেন ঃ সভ্যতা একটি মশালের মত। যা যুগে যুগে এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আর ও দেখা গেছে, কোন জাতি হয়ত এক সময় সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করেছে এবং পরবর্তীকালে তাদের গৌরব ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। আরব তথা ইসলামী সভ্যতার ব্যাপারে ও একথা পুরোপুরি সত্য। বর্তমান মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় নীরবতা অব্যাহত থাকলেও একসময় তাদের অবস্থা ছিল ঠিক উল্টো। অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডুকতার অন্ধকারে যখন পাশ্চাত্য হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ছিল তুঙ্গে। শরীর পরিষ্কার করাকে তারা পাপ মনে করতো। এগেড আলেকজান্ডার বলেন ঃ 'আমাদের পূর্ব পুরুষরা ভারাক্রান্ত মনে অতীতের দিকে তাকিয়ে তাদের চেহারায় কখনো পানি লাগাননি অথচ আমরা গোসলখানায় যাচ্ছি প্রায়ই।' সেন্ট এথানিসিয়াস সোৎসাহে বর্ণনা করেন, কিভাবে সেন্ট এন্টানি বার্ধক্যকাল পর্যন্ত তাঁর পা ধোয়ার পাপ করেননি। সিলভিয়া নামের এক কুমারী ষাট বছরের বৃদ্ধা হয়েও ধর্মীয় কারণে তাঁর আংগুল ছাড়া শরীরের আর কোন অংশ ধুতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। সেন্ট ইউফ্রেক্সিয়া

একশ ত্রিশজন কুমারীর একটা কনভেন্টে যোগদান করেন। এরা কোনদিন তাদের পা ধোয়নি এবং গোসলের কথা শুনলে তারা আৎকে উঠতো।

মুসলমানরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিরত, তখন খৃষ্টান ইউরোপ বিদ্যার্জনকে নির্যাতনের যোগ্য নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত করে, খৃষ্টের পুরোহিত যখন মুক্তচিন্তার যিশুকে গলাটিপে হত্যা করে, পুরোহিতরা যখন যুক্তিবাদের ভূতের ভয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে আগুনে পুড়িয়ে মারে, ইউরোপ যখন ভূত-প্রেত ছাড়াবার মন্ত্র ব্যবহার করে আর নেকড়া ও হাড় পূজা করে, তখন মুসলিম শাসনকর্তাদের অধীনে বিদ্যাচর্চা সমৃদ্ধি লাভ করে আর অভূতপূর্ব সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে। মুহম্মদ (সা.)-এর প্রতিনিধিরা সভ্যতার উৎকর্ষের কাজে আত্মনিয়োগ করেন আর মুক্তচিন্তা আর স্বাধীন অনুসন্ধানের কাজে সহায়তা করেন। বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন বলে কোন বস্তুই ছিলনা, আর শাসনকর্তাদের রাজনৈতিক আচার যাই থাকনা কেন, সকল ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রতি নিরপেক্ষতা আর পূর্ণ সহনশীলতার শ্রেষ্ঠতর উদাহরণ অন্য কোন ধর্মে আর মেলেনি। কোন জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার চিহ্ন হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞানের চর্চা, আর মুসলমানদের মধ্যে এ ছিল জনপ্রিয় পেশা।

তখনকার খৃষ্টান জগতে জ্ঞান চর্চার অবস্থা ছিল আরো তথৈবচ। কনস্টান্টাইন আর তাঁর গোঁড়া উত্তরাধিকারীদের অধীনে ইসক্লেপিয়নগুলো চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়; পৌত্তলিক সম্রাটদের উদারতায় স্থাপিত সাধারণ পাঠাগারগুলো তুলে দেয়া হয় অথবা ধ্বংস করে ফেলা হয়; বিদ্যাকে যাদু বলে অপবাদ দেয়া হত অথবা রাজদ্রোহ বলে শাস্তি দেয়া হত; দর্শন আর বিজ্ঞান বিলোপ করে দেয়া হয়। মানবিক বিদ্যার বিরুদ্ধে পুরোহিততন্ত্রের ঘৃণা প্রকাশ পায় 'অজ্ঞতাই ভক্তির প্রসূতি' এই যাজকীয় প্রবচনের মধ্যে। পৌরহিত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাতা পোপ গ্রেগরী রোম থেকে সমস্ত বিজ্ঞান চর্চার নির্বাসন দিয়ে আর অগাষ্টাস সিজার কর্তৃক প্যালেষ্টাইন পাঠাগার পুড়িয়ে দিয়ে ঐ জ্ঞান ও প্রগতি বিরোধী বিশ্বাস কার্যে পরিণত করেন। তিনি গ্রীস ও রোমের প্রাচীন লেখকদের লেখা অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি সাধুদের স্মৃতিচিহ্ন আর দেহাবশেষ পূজাসহ উপকথামূলক খৃষ্টধর্ম প্রবর্তন করেন, যা কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের প্রধান ধর্ম হিসাবে প্রচলিত রয়েছে।

এই অবস্থায় জ্ঞানের প্রতি ইসলামের সীমাহীন গুরুত্বারোপ ও অনুপ্রেরণা প্রদান। সহনশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গির সর্বোতভাবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিজ্ঞান চেতনা মুসলমানদের আলোড়িত করেছিল। ইসলামের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির মূলে এই শিক্ষাগুলো ক্রিয়া করেছিলো। কেউ কেউ বলেন,

এটা সম্ভব হয়েছিলো তরবারীর শক্তিতে। এটা বিভ্রান্তিকর। তাই যদি হতো অন্য একটি তরবারী তার শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। অথচ আমরা দেখি অনেক তরবারীর আঘাত সত্ত্বেও ইসলাম আজো পৃথিবীর বিবেকবান মুক্তিকামী মানুষের নিরাপদ ঠিকানা। বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রসেনানী, লেনিন ট্রটস্কির সহচর কমরেড এম. এন. রায় সুন্দর লিখেছেন ঃ 'আরবের উন্নতি এবং প্রসার একমাত্র তলোয়ারের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিলো– এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। তরবারী একটা জাতীয় জীবনের স্বীকৃত মতবাদ হয়তো বদলে দিতে পারে কিন্তু একথা খুবই সত্য, তা কোন দিনই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না...।

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জ্ঞানের প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের প্রথম বাণীটিই হলো– 'পড়'। কুরআনে অসংখ্য বার বলা হয়েছে, 'এই গ্রন্থে বিবেকবান, বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' শুধু তাই নয় পুরো কুরআন কারীমকেই আল্লাহ সূরা ইয়াসীনে 'বিজ্ঞানময়' বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহর দৃষ্টিতে জ্ঞানের অনুসন্ধানের গুরুত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা লেখালেখি হয়েছে। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে তার মৃত্যু নেই।' 'জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধানে সুদূর চীনেও যাও।' তাঁর এসকল বাণী আজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা সাদৃশ্য। পবিত্র কুরআন পাঠে জ্ঞান চর্চার প্রতি স্বাভাবিক যে স্পৃহা সৃষ্টি হয় তা তারই উৎসাহ এবং উৎকর্ষতার কারণেই। বলা হয়েছে, 'যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করেছে।'

পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে। একথা বললে হয়তো অনেক মুসলমান বিস্মিত হবেন যে, এর এক তৃতীয়াংশ আয়াত অর্থাৎ অন্ততপক্ষে ২২২২টি আয়াতই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পৃক্ত। আরও অন্তত দুই হাজার আয়াত পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কিত। এই মহাগ্রন্থে এমন একটিও উক্তি নেই যা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। ডক্টর মরিস বুকাইলী অভিমত রেখেছেন ঃ The Quran does not contain a single scientific statement that is unacceptable. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি আরো উল্লেখ করেন ঃ For Islam, religion and science have always been considered twin sisters. একজন গবেষকের ভাষ্য 'যে গ্রন্থের প্রথম শব্দেই পড়তে বলা হয়, যার দ্বিতীয় বাক্যটিই একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ইঙ্গিত দেয় সে গ্রন্থে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন কিছু থাকা সম্ভব কি? প্রকৃত সত্য হল, পবিত্র কুরআনে শত শত আয়াত আছে যা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক। মানুষের জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র UNI-

VERSE এর সৃষ্টি, দিন ও রাত্রির বর্ণনা থেকে শুরু করে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতিবিধি, Nuclear fission থেকে শুরু করে Space Exploration পর্যন্ত, এমনকি Anti-Matter ও Space time সম্পৃক্ত Theory of Relativity-র মত বিষয়াদি সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত অসংখ্য আয়াতে পাওয়া যায়।'

ইসলামের বৈজ্ঞানিক মানস সৃষ্টিতে জ্ঞান, তৎপ্রতি অনুসন্ধিৎসা, যুক্তি এবং চর্চার স্বাধীনতা এই চারটি বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনাতীত। মূলতঃ এখানেই মুসলিম সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়েছিল। আল্লামা আফজালুর রহমান লিখেন ঃ 'জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, যুক্তি ও স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচনকারী এই চারটি বিষয় ছিল তাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় দান, যারা প্রসন্নচিত্তে এটা গ্রহণ করে মানুষের কল্যাণে জ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগিয়েছিলেন। স্পেন, দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলীতে মুসলিমদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা এর কার্যকারিতা উপলব্ধি করেছিল।

মুসলমানদের আরেকটি চরিত্র তাদেরকে দ্রুত অগ্রগতির পথে সহায়তা করেছিল, তা ছিলো তাদের উদারতা এবং সহনশীলতা। এ কারণে বিজিতরা তাদের সহজেই মেনে নিতে পেরেছিল। যার ফলে মুসলমানরা যেখানেই গেছে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা অব্যাহত রেখেছে। বিদ্রোহ ও উৎপাত তাদের যখন তখন ব্যতিব্যস্ত করতো না। ঐতিহাসিক Dozy উল্লেখ করেন ঃ The state of the Christians under Islam was not the cause of much discontent it compared with the first. The Muslims were very tolerant, they did not harass anybody in matters of religion. For this the Christians were grateful to the Muslims they praised the tolerance and juslice of the Muslims, Conquerers and preferred the Muslims rule to that of the Germans and Franks. 'অতীতের সঙ্গে তুলনায় ইসলামের অধীনে খৃষ্টানদের অবস্থায় খুব একটা অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না। মুসলমানেরা ছিল খুবই সহনশীল, ধর্মের ব্যাপারে তারা কাউকেই হয়রানি করেনি। এর জন্য খৃষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ, তারা প্রশংসা করেছে মুসলিম বিজয়ীদের সহনশীলতা ও সুবিচারের এবং জার্মান ও ফ্রাঙ্কদের শাসনের চাইতে অধিকতর পছন্দ করেছে তারা মুসলিম শাসনকে।' এভাবে ঐতিহাসিক ফিনলে History of the Byzantine Empire এ লিখেন : 'যেখানেই আরবেরা খৃষ্টানদের কোন জাতিকে পরাজিত করেছে, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমাণ করে

দেয় যে, বিজিত জাতির জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে; অধিকাংশ খৃষ্টান সরকারসমূহের অবশ্য লজ্জার কথা যে বিজয়ী আরবদের শাসন প্রণালী থেকে তাদের শাসন প্রণালী ছিলো যথেষ্ট পীড়াদায়ক...।'

ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নৈতিকতা আর আধ্যাত্মবাদের উপর। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে প্রয়োজনবাদ। ইসলামে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষ নেই, নেই কোন দ্বন্দ্ব বিরোধ। তাই মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব ইসলামী সভ্যতার মূলতত্ত্ব। মুসলমানরা গ্রীক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলেও তাদের বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা গ্রীকরা সব গবেষণার চিন্তার কেন্দ্র বানিয়েছিলো মানুষকে। আর মুসলমানরা কুরআনের অনুপ্রেরণায় সমগ্র বিশ্বজগতকেই তাদের কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করে। এখানেই তাদের সাথে ও গ্রীকদের সাথে মৌলিক পার্থক্য। বিশ্বজগতের রহস্য তালাশের মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বস্রষ্টার সন্ধান ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে ইসলামের বিজ্ঞানচর্চা এই জিনিসটার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল ব্যক্ত করেছেন- 'আল কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ এবং বিশ্বের সঙ্গে যে মানুষের বিভিন্ন রকম সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দেয়া।' ইসলামকে একটা শিক্ষামূলক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে এই দিকটা উপলব্ধি করেই মহাকবি গ্যেটে একারম্যানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ দেখ এ শিক্ষা কখনো ব্যর্থ হয়না। আমাদের সব ব্যবস্থা নিয়েও আমরা তথা কোন মানুষই একে ছাড়িয়ে যেতে পারিনা।

সুতরাং ইসলামের বৈজ্ঞানিক ধারণা একত্ববাদকে নিয়েই গড়ে উঠেছে আগাগোড়া। এটা আধুনিক সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সুদূর প্রসারী অবদান রেখেছে। রেভারেন্ড সি, এফ এন্ড্রুস এর উক্তিটি খুব মূল্যবান ঃ 'প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জন্য ইসলাম যেসব আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে তার একটি হচ্ছে স্বর্গীয় একত্ববাদের ওপর গুরুত্বারোপ। কেননা মধ্যযুগে ৬০০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব এবং পশ্চিমের সবখানেই এ মতবাদ হিন্দুবাদ ও খৃষ্টবাদের অসংখ্য অর্ধ-দেবতা বা বীর পূজার ফলে চাপা পড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে যাবার অবস্থায় পৌছে যায়। ইউরোপ এবং ভারতের একত্ববাদ বিচ্যুত অবস্থায় সংশোধনের জন্যে এগিয়ে আসে ইসলাম। বস্তুত ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে ইসলাম যদি একত্ববাদের এ মহাসত্যকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে না ধরতো, তাহলে আজকের বুদ্ধিদীপ্তজগতে আল্লাহ সম্পর্কিত যে ধারণা বিরাজ করছে তা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।'

অন্যদিকে ইউরোপ ইসলামের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার লাভ করে ও বস্তুবাদ এবং প্রয়োজনবাদ নীতির কারণে একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এর অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে ধর্মকে তারা বিজ্ঞানের সাথে বিবেচনা করতে ভয় পায়। কেননা শত শত বছর ধরে তাদের যাজকতন্ত্র ও পৌরহিত্য নিয়ে জ্ঞানীদের যে হানাহানি, যে সকল অরাজকতার জন্ম দিয়েছিল তাতে তারা ধর্ম নিয়ে শংকিত। এই কারণে সভ্যতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেও পাশ্চাত্য বিপথগামী।

এই সময়ে জ্ঞানী ও খৃষ্টান পাদ্রীদের মাঝে দু:খজনক মতবিরোধ ও বৈরিতার কারণে ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের আন্দোলন বিপথগামী হয়ে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই ধর্ম বিরোধী ভাবধারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় প্রসারিত হয়ে সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা গড়ে উঠেছে ধর্ম ও ধর্মের সাথে জড়িত সবকিছুর প্রতি ঘৃণার উপর।' ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ধারণা ইসলামের সাথে তাদের পার্থক্য সূচিত করেছে। এটা ইসলামের বিশ্বাস ও আদর্শের পরিপন্থী। তাই 'খৃষ্টান পাদ্রীদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি এই বিরূপ ধারণা ইসলামের অনুসারীদের আদর্শের পরিপন্থী এবং উভয়ে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে।'

ধর্মীয় আদর্শ ও কুরআনের শিক্ষায় উদবোধিত হয়ে মুসলমানরা কি করেনি? একথা বিস্ময়কর শোনালেও সত্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা বা উপশাখা নেই যাতে ইসলাম অবদান রাখেনি। Nuclear Physics হতে শুরু করে Space Exploration পর্যন্ত প্রতিটি Branch of Science-এ ইসলামের সুস্পষ্ট অবদান আজ পাশ্চাত্য জগতে সর্বজন স্বীকৃত। ঐতিহাসিক ড্রেপার নি:সঙ্কোচে উল্লেখ করেছেন ঃ Not one of the purely mathematical, mixed or practical sciences was omitted by the Arabs. (A History of the Intellectual Development of Europe, Vol-1, London, Page-343) রেঁনেসার উদগাতা ও আরবরা। ড্রেপারের ভাষায়– Renaissance owes its birth to Islam.

বিজ্ঞান ও সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান, তাদের গবেষণা এবং আবিষ্কার খুলে দিয়েছিল সভ্যতার দ্বার। সেই সময়কার কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম করা যায়, যে সময়ে তাঁদের সমকক্ষ বিজ্ঞানী পাশ্চাত্যে একজনও ছিলেন না- জাবির বিন হাইয়ান, আল কিন্দি, খারেজমী, রাজী, সাবিত বিন কুররা, মূসা,

বাত্তানী, ফারাবী, মাসুদী, তাবারী, আলী বিন আব্বাস, ইবনুল হাইছাম, ইবনে নাফিস, আল বিরুনী, ইবনে সীনা, আবুল কালিম, আবুল ওয়াফা, আলী ইবনে ঈসা, গাজালী, জারকালী, ওমর খৈয়ামসহ আরো অনেকে। বিজ্ঞান গগণে এসব নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে মাত্র ৩৫০ বছরের ব্যবধানে ৭৫০ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এঁরাই সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের পাশ্চাত্য এদের কাছে সর্বোতভাবে ঋণী। কেনেথ এইচ, ক্রান্ডাল লিখেন ঃ সকলেই জানেন খৃষ্টান তথা পাশ্চাত্য জগত যখন অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত ছিল, তখন চীনের সীমানা থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন মুসলমানগণ... বিভিন্ন কৃষ্টির সমবায়ে নতুন যে ইসলামী সভ্যতার সূত্রপাত হয়, তা নবম, দশম ও একাদশ শতকে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে। মধ্যযুগে ইসলামের এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে পাশ্চাত্য জগত বহু কিছু গ্রহণ করেছে এবং এভাবেই পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে ইউরোপীয় রেনেঁসার সূত্রপাত ঘটেছে।'

রবার্ট ব্রিফল্ট The Making of Humanity গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন– 'সম্ভবতঃ আরববাসীদের দ্বারা প্রভাবিত না হলে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি অতিক্রম করে বর্তমান রূপ লাভ করতে সক্ষম হত না।'... ইউরোপের বিজ্ঞানের চরম উন্নতি বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রাচীন গ্রীকদের অক্লান্ত অনুসন্ধান ও উৎসাহ, নূতন শিক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কার... এই উৎসাহ ও পদ্ধতিসমূহ ইউরোপীয় ভূখণ্ডে আরববাসীদের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল।' ষ্টোনউড একই সুরে বলেছেন ঃ 'পার্শ্ববর্তী খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহের উপর ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবই ইউরোপীয় রেনেঁসার প্রকৃত কারণ।'

ঐতিহাসিক হিট্টির বাণী 'অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত আরবী ভাষাভাষী লোকেরা সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান আলোর দিশারী ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন এমনভাবে পুনর্জীবিত, সংযোজিত ও সম্প্রসারিত হয় যে, এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেঁসার উন্মেষ সম্ভবপর হয়।'

দ্বিতীয় পর্ব

প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলমান

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দান

শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষ কোনদিন মানুষ্যত্বের মনজিলে পৌঁছতে পারে না। শিক্ষার কারণে এবং প্রতিফলনে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষের অবস্থান সর্বশীর্ষে। শিক্ষার এই মহান ও গুরুত্ববহ ভূমিকার কারণে যুগে যুগে মনীষীরা এতদসম্পর্কীয় চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার বিকাশ ঘটিয়েছেন। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামের আগমন এবং তৎপরবর্তী যুগে শিক্ষা, সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলাম তথা মুসলিমদের স্মরণীয় অবদান নিয়ে আলোকপাত করবো।

দুনিয়ার শিক্ষা বিপ্লবের ইতিহাসে ইসলাম এ কারণে নিজের গৌরব প্রকাশ করতে পারে যে, যেহেতু ইসলামের বাণীর প্রথম শব্দটিই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আবার্তিত প্রভুর পয়লা নির্দেশই হলো- 'পড়ো'। এরশাদ হচ্ছে- "পড়ো তোমার রবের নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক টুকরা জমাট রক্ত থেকে। পড় এবং তোমার প্রভু বড় মেহেরবান- যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক্ব ঃ ১-৫)

পাঠ-পঠন-লিখন ইত্যাদি দিয়েই পবিত্র ইসলামের হাতে খড়ি হয়। শুধু তাই নয় ইসলামের মূল ভাষ্যকার বিশ্ব সভ্যতা ও মুক্তির বুনিয়াদি দলীল আল কুরআনের' শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা। মূল আরবী 'ক্বারা' হতে 'কুরআন ' শব্দের উদগম। ক্বারা অর্থ অধ্যয়ন। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা এখান থেকেই আঁচ করা যায়।

কুরআন শিক্ষা সম্বন্ধীয় এমন এক প্রভাবদায়ী যাদুকরী গ্রন্থ যা সবেমাত্র দু'দশক যেতে না যেতেই একটা বৃহৎ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী করে ফেলে। অথচ তখনকার গোটা আরবে ১৭/১৮ জন হাতে গোনা শিক্ষিত লোক ছিল। অত্যল্প এই সংখ্যা থেকেই বুঝা যাচ্ছে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা কতো বিধ্বস্ত ও দুরূহ ছিলো। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে কাব্য সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষার সমাদর ছিলো

আরবে খুব বেশী। সাথে সাথে অপর্যাপ্ত ও সুশৃংখল শিক্ষা যে তাদের সমাজে ছিলোনা তাও ইতিহাস আমাদের জানান দেয়। আরবদের সাহিত্য চর্চা খুবই উন্নত মানের ছিলো। কিন্তু এ চর্চা নেতৃস্থানীয় কিছু শিক্ষিতদের মাঝেই কেন্দ্রীভূত ছিলো। বিরাট জনগোষ্ঠী ছিলো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

ইসলাম আগমনের সাথে সথে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করলো। এক্ষেত্রে কুরআন হলো মূল নির্দেশক এবং আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন মূল প্রশিক্ষক। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (হাদীস) কুরআনের মূল থিম অনুযায়ী প্রিয়নবী (সা.) তাঁর অসংখ্য বাণীতে শিক্ষার গুরুত্ব উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র" যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার মৃত্যু নেই" জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অনুসন্ধান কর" তাঁর এ বাণীগুলো শিক্ষার ইতিহাসে করোজ্জল মূল্যমানের দাবীদার। তাঁর দেয়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জানার এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বিশ্ব স্রষ্টার মহিমা ও একক সার্বভৌমত্ব অনুসরণ এর মাধ্যমেই তাঁর শিক্ষা মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। মুসলমানরা পেরেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাদের অসাধারণ অবদান রাখতে। শিক্ষায় মুহাম্মদ (সা.)-এর কৃতিত্ব উপলব্ধি করে রবার্ট এল গুলিক জুনিয়র বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে হযরত মুহম্মদ (সা.) একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিশ্বমানবতার বৃহত্তর আত্মিক, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও সুখ সমৃদ্ধির সন্ধান দিয়েছে ... শিক্ষার সংকীর্ণ সংজ্ঞায়ও তাঁকে সকল যুগের সকল কালের শ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্বের অন্যতম বলে গণ্য করতে হয়; কারণ সৃজনশীলতার দিক হতে বিচার করা হলে যে শিক্ষক তার শিক্ষা দ্বারা মানুষের আচরণে শুভ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম তাকেই আমরা শিক্ষক সম্রাট নামে আখ্যায়িত করবো।

তাওহীদ পুনরুত্থান ও নৈতিক দিক মিলে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এ কারণে তা হতে পেরেছে আদর্শ ও মানুষের জন্য কল্যাণময়ী শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষায় নৈতিকতা ও ধর্মের পাত্তা না থাকায় আজকের শিক্ষা বিপদসংকুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করছে। কারণ একমাত্র নৈতিক চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মানবিকতা ও পাশবিকতার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। একথা উপলব্ধি করেই টাউনসেন্ড বলেন ঃ "আধুনিক যুগের সকল সমাজ সংস্কারের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অধিকতর দক্ষ ও সুশিক্ষক। আধুনিক সমাজ সংস্কারকদের উদার শিক্ষানীতি, যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ পাশ্চাত্য সমাজে অত্যাচার-অবিচার শাসন-শোষণ ও হানাহানির অবসান ঘটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার প্রভাবে ও প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ইতিহাসের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত জাহেল আরবরা পরিণত হয় এক সুসভ্য শিক্ষিত জাতিতে। শুধু তাই নয়, তাঁরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য শিক্ষার অনন্য মডেল হয়ে রয়েছেন আজ তকও। কুরআন, হাদীস, ইবাদত, আখলাক ছিল তাঁর শিক্ষার পাঠ্যক্রম। মসজিদ ছিলো তাঁর ব্যবহৃত প্রথম শিক্ষায়তন। মহানবী (সা.) জীবদ্দশায় মদীনায় ৯টি মসজিদ ছিলো। এখানে সমবেত হতো নিকটবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এর পদ্ধতি ছিলো উন্মুক্ত। যা হতে আজ কালকার বিশ্ব Open University-এর ধারণা লাভ করেছে। মহানবী (সা.) নিজে ছাড়াও অগ্রসর শিক্ষিত সাহাবারা এখানে শিক্ষাদানে রত থাকতেন। এদের একজন ছিলেন হযরত আলী (রা.) যাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আমীর আলী উল্লেখ করেছেন– "In the public mosque at Medina, Ali and his cousin Abdullah the son of Abbas, delivered weekly lectures on philosophy and logic, the traditons, history, rhetoric and law, whisht other dealt with other subjects. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক স্থাপিত মসজিদের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক খোদা বখ্‌শ লিখেন- For the muslims the mosque does not bear the some exclusive character as does a church for the christians. It is not merely a place of worship, The Muslim indeed, honours the mosque but he does not hesitate to use it for any laudable purpose.

মক্কা মদীনা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এবং দূরাঞ্চলের বহু জ্ঞানপিপাসু শিক্ষায়তনগুলোতে এসে ভীড় করতো। অন্যন্য বিষয়ের সাথে বৈষয়িক বিষয়াদীও এখানে শিক্ষা দেয়া হতো। হস্তলিপি, বংশ ইতিহাস, ঘোড়দৌড় ধর্মীয় বিধান, বিদেশী ভাষা এবং যুদ্ধ শিক্ষাও দেয়া হতো। বুখারীতে উল্লেখ আছে, মহানবীর (সা.) নির্দেশে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা.) ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর আদেশে তিনি সিরীয় ভাষাও শিখেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের মধ্যে একটি বিরাট দল শিক্ষকরূপে পরিচিতি পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক সাহাবীই ছিলেন পরবর্তী মানুষ ও জনগোষ্ঠীর জন্য এক এক জন আদর্শ শিক্ষক। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন উমর, যায়িদ বিন সাবিত ও হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন প্রথম কাতারের সুবিজ্ঞ ও পণ্ডিত। এছাড়া বিশজন দ্বিতীয় সারির এবং ত্রিশজন ছিলেন তৃতীয় সারির পণ্ডিত।

মহানবীর (সা.) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার বুনিয়াদ খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। প্রথম যুগের তুলনায় এ যুগে পরিকল্পিত উপায়ে

শিক্ষা শুরু হয় যদিও তা ছিল মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষার অন্তর্গত। এ সময়ে তাফসীরুল কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শাস্ত্র ও প্রাক ইসলামী কবিতা পাঠ স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষার ইতিহাসে আরেকটি দিক ছিলো। বন্দী ও জিম্মি শিক্ষিত লোকদের মুসলমান অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হতো। একদিকে যেমন এটি শিক্ষা বিস্তারের সুন্দর পন্থা অপরদিকে যথাযথ সম্মানজনক মানবাধিকার এতে হেফাজত থাকে।

চার খলীফার মধ্যে হযরত উমার (রা.) শিক্ষার প্রসারে কাজ শুরু করেন। ইসলামী শিক্ষার উপর পাঠ দান করার জন্য তিনি দামিশ্ক, বসরা, কুফা প্রভৃতি বিখ্যাত শহরে বিদ্বান শিক্ষকদের প্রেরণ করেন। সপ্তদশ হিজরীতে কুরআন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। প্রতি শুক্রবার এদের বক্তব্য শোনার জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদের অধিবাসীদের প্রতি খলীফার কড়া নির্দেশ থাকতো। মসজিদভিত্তিক এসব শিক্ষায়তনে জমায়েত হতো বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী। শুধু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অধীনে ছিলো ৪ হাজার শিক্ষার্থী। সিরিয়ার রাজধানী দামিশকে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োজিত থাকতেন। অভিভাবকদের উপর খলীফার নির্দেশ ছিল ছেলে মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে। হযরত উমারের (রা.) এ ধরনের একটা তাকিদের উল্লেখ করেছেন আমীর আলী- "you should make them learn well Known Proverbs, wise sayings and good poetry," ইবনুল কিয়াম উল্লেখ করেছেন, খলীফার এ নির্দেশ মতে প্রত্যেক পিতাই সন্তানদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন। হযরত উমার (রা.) বসরা ও কুফা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। কালক্রমে এ নগরীদ্বয় মুসলিম জাহানের উন্নত শিক্ষানগরীর মর্যাদা লাভ করে। ২৪ জন বদরীসহ সহস্রাধিক সাহাবীর জ্ঞানাস্পর্শে কুফা আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলো।

খলীফা হযরত আলী (রা.) নিজেই একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী ছিলেন। মহানবীর (সা.) কাছ থেকে 'জ্ঞান দ্বার' উপাধী প্রাপ্ত ছিলেন তিনি। হযরত আলী (রা.) নিজেই দর্শন, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, হাদীস, কাব্য ইত্যাদির উপর সাপ্তাহিক মজলিশে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর আমলে রাষ্ট্রের বিখ্যাত শিক্ষানগরীগুলোর ঔজ্জ্বল্য দেদীপ্যমান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো ধরতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক জাঁকঝমক বিহীন। তৎপরবর্তী উমাইয়া যুগে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে নতুন পদ্ধতির সূচনা লাভ করে।

পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদের সাথেই এসব স্কুল সংযুক্ত ছিল। উমাইয়া যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল পূর্বোক্ত বিষয়াবলী হতে আরো বিস্তৃত। হালাল-হারামের বিষয়াদী, আরবী ব্যাকরণ, ইসলামের বিজয় ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে পড়ানো হয়। এছাড়া দেশপ্রেম, সামরিক উৎসাহমূলক বক্তৃতা, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড়, শিক্ষা সফর, সাঁতার শিক্ষা দেয়া হতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টি উমাইয়া যুগের মূল শিক্ষার লক্ষ্য এভাবে তুলে ধরেন, "The ethical ideals of education were sabre jeor (obligation to the neighbours) muruah manliness generasity, hospitality, regard for women and up keeping of promises" অর্থাৎ "শিক্ষার নৈতিক আদর্শ ছিল ধৈর্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ, গৌরব, সদাশয়তা, আতিথেয়তা, নারী সমাজের প্রতি মর্যাদা এবং অঙ্গীকার প্রতিপূরণ।

উমাইয়া যুগের শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে 'Outlines of Islamic Culture' গ্রন্থের লেখক A. M. A. Shustery বলেন ঃ 'অবাধ বক্তব্য ছিলো শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনার জন্য শত শত ছাত্র এবং হাজার হাজার শ্রোতা উপস্থিত হতো। ভর্তির ব্যাপারে ছিলোনা কোন বাধ্যবাধকতা এবং সাধারণভাবেই কোন অর্থ দিতে হতো না।" উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুটো রূপ পাওয়া যায়। তার একটি হলো খলীফা বা অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষা, অপরটি সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষা। অভিজাতরা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত বিষয়ে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এর লক্ষ্য ছিল মর্যাদাবান, শাসন সংক্রান্ত প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কৌশল, সামরিক নৈপুণ্য শিখানোর মাধ্যমে শাসক সৃষ্টি করা। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) স্বীয় সন্তানকে শুদ্ধ আরবী, কাব্য এবং সাঁতার শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খলীফা আবদুল মালিক তাঁর গৃহশিক্ষক জালাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ছেলেকে সাঁতার ও স্বল্পকালীন ঘুম শিক্ষা দিতে তাঁকে আরো বলা হয়েছিল কিতাবুল্লাহ, উত্তম কবিতা, হালাল-হারামের জ্ঞান, ইসলামী বিজয়ের ইতিহাস, বিভিন্ন গোত্রাঞ্চল সফর- ইত্যাদি ছেলেকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। এ ধরনের গৃহশিক্ষকদের বলা হতো 'মুহাদ্দিছ'।

শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, অনুবাদ ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধেও আগ্রহ বাড়তে থাকে। খলীফারাও কমবেশী পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকেন। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা সংস্কৃতির যে পূর্ণ বিকাশ ঘটে তার বীজ উমাইয়া যুগে বপন করা হয়েছিল।

আব্বাসীয় খলীফাগণ রাজ্য শাসনের চেয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে বেশী মনোযোগ দেন। ফলে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক অধ্যায় সূচিত হয়। আব্বাসীয় যুগকে তাই ইসলামের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। নির্দিষ্ট কোন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম না হলেও বহু সংখ্যক নতুন বিদ্যায়তন স্থাপিত হয়। স্থাপিত হয় অগণিত মক্তব মাদ্রাসা। আব্বাসীয় আমলে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো। প্রাথমিক ও উচ্চ পর্যায়ের।

ইমাম গাজালীর মতে, ছয় বছর হতে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হত এবং তারা আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হত। মসজিদ, ব্যক্তিগত গৃহ এবং মক্তবগুলো ছিলো তাদের পড়ার স্থান। হিট্টি বলেন, 'এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মুখস্থ শক্তির উপর বিশেষ জোর দেয়া হতো।' কুরআন পাঠ ও ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, সুন্নাহ, প্রাথমিক গণিত এবং ভাবমূলক কবিতাই ছিলো তাদের শিক্ষার পাঠক্রম।

উচ্চ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো কুরআনের গবেষণামূলক আলোচনা, হাদীসে নববীর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ছন্দ, সাহিত্য। এছাড়া গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, বৃত্ত সম্পর্কীয় জ্যামিতি, দর্শন, চিকিৎসা ও সঙ্গীতবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আব্বাসীয় আমলে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষারও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শিক্ষার জন্য খলীফা মামুন ৮৩০ সালে 'বায়তুল হিক্‌মা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ১০৬৫-৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।' সেলজুক আমলে পার্সী মন্ত্রী নিজামুল মুলক এটি প্রতিষ্ঠা করেন। আবাসিক ও বৃত্তি নিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ এখানে ছিলো। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজালী চার বছর (১০৯১-৯৫) এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন।

আব্বাসীয় আমলে শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা ছিলো। শিক্ষার্থীদের সামান্য বেতনও ছিলো বলে জানা যায়। তা আসতো সরকারী এবং বিত্তশালীদের মধ্য হতে। শিক্ষক ছাত্র মধুর সম্পর্ক ছিলো। খোদা বক্স লিখেছেন- "অনেক শিক্ষকই কোন বিষয়ের উপর আলোচনা কালে নিজ আসন ছেড়ে ছাত্রদের সাথে মিশে বসতেন।" শিক্ষকদের প্রতিও ছিলো তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাদের শিক্ষার উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপের দূর দূরান্ত হতে ছাত্ররা ছুটে আসতো। এ আমলে মুসলমানরা গ্রীক, সংস্কৃত, পারসী, সিরীয় ভাষা হতে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেন। খলীফা মনসুর এবং তাঁর পরেও আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে বিপুল পরিমাণ মুসলিম পণ্ডিত, মনীষী ও বিজ্ঞানীর ছোঁয়ায়

মুসলিম দুনিয়া ভরে উঠে। মূলতঃ আব্বাসীয় আমলে মুসলিম মনীষীরাই সভ্যতার পতাকা উত্তীর্ণ করে রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য, আব্বাসীয় যুগকে যেভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়- তেমনি 'কলঙ্কের যুগ'ও বলা হয়। এর জন্য প্রধান দায়ী মুতাজিলারা। খলীফা মামুনের পরিপোষকতায় মুতাজিলারা ইসলাম তথা কুরআনকে এরিষ্টোটলীয় দর্শনের সাথে এক করে দেখার প্রয়াস চালায়। এইচ আর গীব লিখেছেন- "The Mutazilite began to force Muslim Doctrines into the mould of Greak concepts and to drive their theology speculatively from Greek Metaphysics instead of the Koran" তারা ইসলাম তথা কুরআনকে নিছক যুক্তি ও চিন্তার ধুম্রজালে ফেলে আজো মুসলিম বিশ্বকে তথাকথিত 'ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ও দর্শনের জালে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। বহু আলিম তাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন বিরোধিতার কারণে। ইমামে আযম তাঁদের অন্যতম। আকবরের 'দ্বীন ইলাহী' ও সাম্প্রতিক 'বাহায়ী ধর্ম' তাদেরই মতবাদের সংস্করণ বলে প্রকাশ।

ইউরোপে ইসলাম প্রবেশ করে ৭১২ সালে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এটিই সারা বিশ্বের শিক্ষা শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতির রাজধানী হিসাবে পরিচিত লাভ করে। গোটা ইউরোপ ও আফ্রিকায় স্পেন Seat of learning নামে খ্যাতি লাভ করে। কর্ডোবা, সেভিল, টলেডো, জেইন ও মালাগার উচ্চ শিক্ষায়তনগুলোতে ভিড় জমাতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালী হতে আসতো শিক্ষার্থীরা। প্রখ্যাত ধর্ম যাজক আবেলাদ, মলি, এমনকি প্রথিতযশা দার্শনিক মাইকেল স্কটও স্পেনে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয় 'আল আজহার' ও 'নিজামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও ছিল উন্নত। শুধু কর্ডোবাতেই ছিলো ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭০টি কলেজ এবং ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরী। খলীফা মুনতাসির নিম্নবিত্তদের সন্তানদের লেখাপাড়ার জন্য স্থাপন করেন অবৈতনিক ২৭টি বিদ্যালয়। স্পেনে যখন প্রায় প্রত্যেকেই লেখা পড়া জানতো তখন খৃষ্টান ইউরোপে গুটিকয়েক পুরোহিত ব্যতীত অন্যরা ছিল নিরেট মূর্খ। ঐতিহাসিক ডজি লিখেছেন- In Spain almotst everybody knew how to read and write, whilst in Christian Europe..."

কুরআন, আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে স্পেনে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। উচ্চ শিক্ষার মধ্যে তাফসীর, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, আরবী ব্যাকরণ, অভিধান, শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হত। জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধর্ম ও আইনশাস্ত্র বিভাগ কর্ডোবা

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিষয়গুলো ছাড়াও রসায়ন ও দর্শন বিভাগ ছিল গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বক্তৃতা চর্চা ছিলো এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিম, ইহুদি, খৃষ্টান সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও পাঠদানে নিয়োজিত থাকত। নবম শতাব্দীতে একমাত্র কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগার হাজার।

স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপুল উন্নতি বুঝা যায় সেখানকার শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক কার্যকলাপে এবং বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরীসমূহের বহর দেখে। কাসিরির মতে, শুধুমাত্র কর্ডোবাতেই ১৭০ জন শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। এখানকার বিজ্ঞানী ইবনুল খাতিব বিভিন্ন বিষয়ে ১১শত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনুল হাসান ৪ শত আর ইবনুল হাইছামের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। এক একটি অভিধান সমাপ্ত হতো ৪০-৫০ খণ্ডে। ইবনে হাবিব ১ হাজার, আবদুল মালেক ১ হাজার, ইবনুল হাইছাম ৪শতটি' ইবনে হান ৪ শতটি, ইবনে ইবান ও হুনায়েন ১০০টি, ইবনে হাইয়ান ৬০টি গ্রন্থ লিখেন।

স্পেনের প্রত্যেকটি শহরেই ছিল সরকারী গ্রন্থাগার ও সাধারণ পাঠাগার। গৌরবময় যুগে সেখানে ৭০টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিলো। এতে রক্ষিত ছিলো লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী সে যুগে এক প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলো। মন্ত্রী ইবনে আব্বাসের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে চার লক্ষ বই ছিল। সুলতান হাকামের পুস্তক তালিকা ৫০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সাধারণ লোকদের গ্রন্থাগারে দশ/বিশ হাজার গ্রন্থের সমাবেশ কোন অত্যুক্তি বলে মনে হয়, কিন্তু ইবনুল আসরানের লাইব্রেরীতে দশ হাজার, ইহুদী চিকিৎসক দুনাশবেন তামিনের লাইব্রেরীতে ২০ হাজার পুস্তক ছিল।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি মিশর হযরত উমারের (রা.) আমলে মুসলমানদের হস্তগত হয়। শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ এই নগরী মুসলিম আমলে শিক্ষায় নতুন যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আইয়ুবী সুলতান গাজী সালাউদ্দীন মিশরের শিক্ষার উন্নতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো ও জেরুজালেমে অনেকগুলো বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

ফাতেমীয়দের আমলে মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এসময় প্রচুর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১২৩৭ সালে মামলুক সুলতানের কন্যা একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইতোপূর্বে খলিফা আল হাকাম (৯৯৬-১০৫১) তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি জ্ঞান চর্চার জন্য 'দারুল হাকাম'

প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাসাদসম এই জ্ঞান-ভবন থেকে কবিতা, আইন, ব্যাকরণ, সমালোচনা, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দ বিজ্ঞান, প্রভৃতির পাঠ দান করা হত। এছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল। 'দারুল হিকামাহ' জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে মধ্যযুগের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বিবেচিত হয় আজও। মুইজের আমলে বহু বিখ্যাত আল আযহার মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয় (৯৭০-৯৭২) এবং ৯৮৯ সালে মন্ত্রী আবুল ফারাগের পরামর্শক্রমে আল আজিজ এখানে মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস স্থাপনের নির্দেশ দেন। তখন থেকেই আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ও খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এটি আজও নতুন যোজনায় আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। তৎকালীন মিশরের জ্ঞান চর্চার নিদর্শন তাদের লিখিত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিব্রাজক বেঞ্জামিন তখন ২০টি দর্শন চর্চা কেন্দ্র দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের অনেকগুলি শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিলো। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় (৭১২ খৃ.) থেকে শুরু করে সিরাজদ্দৌলার পতন (১৭৫৭) পর্যন্ত বিভিন্নভাবে মুসলিম প্রভাব ও প্রশাসন ভারতে কায়েম ছিল। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মুসলমানরা নতুন যুগের সূচনা করে।

মুসলিম পূর্ব ভারতে গুটিকতেক ব্রাহ্মণের ভেতর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিলো। শিক্ষা যে শুধু কুলীন সমাজের জন্য নয়, সাধারণেরও সমান অধিকার আছে, এই বিরাট পরিবর্তন ভারতে মুসিলম আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত তিনটি স্থান থেকে শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া হতো- মাদ্রাসা, মসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি। এই শিক্ষারীতি ছিল তিন ধরনের-

১. আণ্ডার ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাঠ্যক্রমসহ উচ্চ শিক্ষা;
২. মাধ্যমিক শিক্ষা যা সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়ে লাভ করা যায় এবং
৩. মৌলিক নীতি জ্ঞানসহ প্রাথমিক শিক্ষা।

এছাড়া সাধক, প্রচারক আলেমগণের প্রচারিত শিক্ষা ভারতে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী পৃথক শিক্ষা পাঠ্যভুক্ত ছিলো। রাজভাষা ফার্সীই ছিলো শিক্ষার মাধ্যম।

ভারতে প্রথম মুসলিম সম্রাট শিহাবুদ্দিন ঘোরী রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও জ্ঞান বিস্তারের জন্য আজমীদের কিছু স্কুল ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ইলতুৎমিশের দরবারে আমীর খসরু ও ফখরুল মুলুক উসামির মতো বড় মাপের প্রতিভাবান ব্যক্তি সমাদর লাভ করেছিলেন, নাসিরুদ্দীনের আমলে মীনহাজ

সীরাজসহ অনেক বিদ্বানের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল রাজ দরবার। জলন্ধর কলেজ ও নাসিরিয়া কলেজ তাঁর অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠে। বলবন, খিলজী এবং তুগলকী শাসকরা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা তার সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতির কারণ।

মোগল শাসক বাবর নিজেই একজন সাংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। শূর বংশীয় শাসক শেরশাহ পাতিয়ালা জেলায় নরনাইলে জাঁকজমক পূর্ণ শেরশাহ মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। আকবরের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক পৃষ্ঠপোষকতা বলাই বাহুল্য। তিনি সারাদেশে অসংখ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত প্রায় অসংখ্য বিদ্যালয়ের পুনরুজ্জীবন দান করেন এবং অচিরেই বিলুপ্তপ্রায় এসব শিক্ষাঙ্গন অধ্যাপক ও ছাত্রদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠে।

মোগল আমল ছিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির এক সুবর্ণ অধ্যায়। এস. এম জাফর তাঁর 'Education in Muslim India' গ্রন্থে লিখেন : "মোগল সাম্রাজ্যের দু'শ বছরে কলা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল, তা সমগ্র ভারত বর্ষের ইতিহাসে সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই, এই বিরাট প্রগতির পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিলো শিক্ষা, যা সেদিনের মোঘল সম্রাটদের প্রচেষ্টার ফল। এটি তাঁদের শিক্ষানুরাগেরই প্রমাণ।" এই অনুরাগের ফলেই জন সাধারণের মানসিকতা শিক্ষার প্রতি এসেছিল উচ্চ ধারণা। স্লীম্যান তাঁর 'Rambles and Recollections' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ 'ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যতোটা ব্যপ্তি পৃথিবীর আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা নেই, যিনি মাসিক ২০/- টাকা মাত্র আয় করেন, তিনিও প্রায় একজন প্রধান মন্ত্রীর মতো সন্তানদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস চালান। তারা আরবী-ফার্সী ভাষাগুলোর মাধ্যমে ব্যাকরণ, অলংকার, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করে।'

উল্লেখিত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত বেসরকারীভাবেও ভারতের শিক্ষায় বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। শিক্ষাবিদ, আলেম, সুফী সাধকরাই এতে নিয়োজিত ছিলেন। দরগাহ সরাইখানা, মাদ্রাসা মসজিদ প্রভৃতি স্থাপন করে তাঁরা এ মহৎ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ মওলা, আমীর আঁরসালা, আলাউদ্দীন লাহোরী, বোরহানউদ্দীন ভাকরী, মিনহাজ উদ্দীন কারনি, নাসিরুদ্দিন গণি, শাহাউদ্দীন মুলতানী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, শেখ ওসমান, সদরউদ্দিন হোসাইনী, মাহমুদ গাওয়ান, মোনিম খান, জৈনপুরের মাহমুদ শাহের স্ত্রী বিবি রাজি, রহিম দাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুরুষ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে এসময় আরো অবদান রাখেন ঃ শেখ জৈনুদ্দিন হাফি, আকবরের দাই মা মাহাম আনগাহ, গুজরাটের দেওয়ান মোহাম্মদ সাদি ইর্ক, বৈরাম খানের পুত্র আবদুর রহিম, মাওলানা সদরউদ্দীন খান, আকরমউদ্দীন, আবদুল হাকিম, গাজীউদ্দীন, ফিরোজ জঙ্গ, রাজা জয়সিংহ, শরাফদ্দৌলা, হাসান রাজা প্রমুখ। এই বেসরকারি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক ফলপ্রসূ অবদান রেখেছে। এস. এম জাফর উল্লেখ করেছেন ঃ 'কোন সন্দেহ নেই যে, মোঘল যুগে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো তা প্রায়ই সম্রাটের অবদান। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু কলেজ ও লাইব্রেরী এখনও টিকে আছে।'

মোগল রাজপুরুষ এবং পুরবাসী নারীদের যে রাজকীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা খুবই উন্নতমানের। এজন্য শাসকদের প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতি প্রিয় ছিলেন। মোগল মহলে মহিয়সী নারীদের কথা জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে।

শিক্ষার উন্নয়নে মুসলমানরা যে নতুন যুগের সূচনা করেছে তা তাদের উপায় উপকরণের মধ্যে প্রকাশিত। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম দশম শতাব্দীতে সমরকন্দ থেকে ভারতবর্ষে কাগজ আমদানী করে।

প্রাদেশিক ও বিভাগীয় অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে মুসলমানদের অবদান সুশৃংখলভাবে আজো তেমন লিপিবদ্ধ হয়নি। কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়াও যে অন্যান্য অঞ্চলের সমসাময়িক শিক্ষার উন্নয়নে তারা অবদান যোগ করেছিল, তা মুসলিম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ত্রয়োদশ শতকে প্রথম সূচনাতেই মুসলিম শক্তি বাংলায় প্রবেশ করে।

বাংলায় আগমনের পর মুসলমানরা এখানে এক শক্তিশালী শিক্ষা পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন। এটা রাজনৈতিক বিজয়ের অনেক পূর্বেই সংগঠিত হয়। কেননা বখতিয়ারের আগমনের বহুপূর্বেই, সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত তথ্যানুযায়ী ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রবেশ করে আরবদেশীয় পর্যটক এবং উত্তর ভারতের ত্যাগী সূফী দরবেশগণের অক্লান্ত সাধনায়। সুতরাং মুসলিম বাংলার শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত করতে গেলেই ত্রয়োদশ শতকের বহু পেছনের দিকে তাকাতে হয়। মূলতঃ এই সময়ে মুসলিম শিক্ষার পয়লা গোড়াপত্তন ঘটে। গবেষকগণ তাই মুসলিম বাংলার শিক্ষা বিন্যাসকে চারটি সময়ে বিভক্ত করেছেন। 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মতো বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। এ দেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস চারটি

বিশেষ অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা- সূচনা পর্ব, স্বর্ণযুগ, পতনযুগ ও পুনর্গঠন যুগ।'

১. সূচনাপর্ব ঃ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত।
২. স্বর্ণযুগ : ১২০৩ হতে ১৭৬৫ পর্যন্ত।
৩. পতনযুগ : ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত।
৪. পুনর্গঠন যোগ : ১৯৪৭ হতে শুরু।

চারযুগ পর্বের এ আলোচনা সংশ্লিষ্ট পর্বগুলো এখানে আলোচিত হল ঃ

অষ্টম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে সিন্ধু উপকূলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ভারতে ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। এই সময় এবং নবম শতকে বাংলায় ইসলামের প্রবেশ ঘটেছিল বলে অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত: বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিচরণশীল আরব বণিকগণ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সুবিধার জন্য এ দেশে আসেন। তাঁদের চিরাচরিত আনুষঙ্গিক কাজ ছিল মহান ধর্মের প্রচার। তাদের পরে আসেন সূফী দরবেশগণ। ড: এ, কে. এম আইয়ুব আলী History of the Traditional Islamic Education in Bengal (1983) নামক গবেষণা গ্রন্থে জানান, মুসলিম ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক এবং দরবেশ গণই এই সময় ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ ছিলেন। 'খ্রিষ্টীয় দশম শতক ও দ্বাদশ শতকের আরব ভূগোলবিদগণ বাংলার এমন অনেক শহরের উল্লেখ করেছেন যেগুলো উপকূলের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত, তথায় মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। কতিপয় শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সূফী আধ্যাত্মিক পুরুষ, যারা নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেছেন, তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, চিল্লাখানা, খানকাহ এবং ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে অমরত্ব লাভ করেছেন।'

আরব বণিকদের ইসলাম প্রচারের কাহিনী অনেকটাই অজানা। তবে বেশ কিছু সূফী প্রচারকদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে শায়খ বায়েজিদ বোস্তামী (মৃ. ৮৭২ খৃ.), শায়খ সুলতান বল্‌খী, বাবা আদম শহীদ, শাহ সুলতান রুমী, মাখদুম শাহ দ্দৌলা, শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ বুতশিকন, জালালুদ্দীন তাবরেজী, ফরিদুদ্দীন গঞ্জশকর অন্যতম। এছাড়া আহমদ বিন হামযা নিশাপুরী (মৃ ৯০০ খৃ.), ইসমাঈল বিন নাজানদ নিশাপুরী, (৯৫২ খৃ.) প্রমুখ সাধকের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই পর্বে শিক্ষার কোন প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাস ছিলোনা। সূফীগণ আল্লাহর একত্ব এবং ইসলামী ইবাদাতের শিক্ষার সাথে মানব জাতির বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি, প্রেম ও সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ

ও খানকাই ছিল বাংলার ইসলাম শিক্ষা বিস্তৃতির সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। ড. এম. এ রহিম লিখেন ঃ "শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধারণভাবে বাঙ্গালী অধিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধানে সূফীদের কৃতিত্ব ছিল- মুসলিম সেনাপতি বিজেতা ও শাসক অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী ও কার্যকর। তাদের ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্ম প্রচারের আগ্রহ, আদর্শস্থানীয় চরিত্র ও মানব হিতৈষণামূলক কার্যাবলীর দ্বারা তারা জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ধর্মান্তরিত লোকও শিষ্য সংগ্রহের মাধ্যমে, তারা মুসলমান সেনাপতিদের রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে নৈতিক বিজয় সম্পন্ন করে অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলমান শাসনকে শক্তি ও স্থায়িত্বের একটি উৎস প্রদান করেন। বাংলার প্রতিটি আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত সূফীদের 'খানকাহ্'গুলো ছিল আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর এক একটি প্রধান কেন্দ্র।"

সংকীর্ণতা সূফীদের স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁদের চারিত্রিক শোভনতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির যে সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা ইসলামী শিক্ষা প্রসারের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার লিখেছেন : "সূফিরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, যা পরে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনা করেছিল। অনেকে ধর্মীয় নির্দেশ-আদেশ শিক্ষা দিতেন, যা পরে শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।"

১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা বাংলার মুসলিম শিক্ষার বীজ রোপন করেন। পরবর্তীকালেও অনেক সূফী আলিম এই ধারা অব্যাহত রাখেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্‌জীর বাংলা অধিকারের পর হতে মূলতঃ বাংলার শিক্ষার স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। নতুন শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা অগ্রাধিকার লাভ করে। বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে (বর্তমান) মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিলেনএবং তিনি মুসলিম শাসনকালের ছয়শত বৎসর যাবৎ জাতীয় ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক এদেশ সম্পূর্ণভাবে দখলের পূর্ব পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।

মুসলমানরা এখানে আসার সাথে কেবল রাজনৈতিক চেতনা নয় তাদের ঐতিহ্যগত শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির উত্তরাধিকারও সাথে নিয়ে আসে। এম. এন. ল

মন্তব্য করেন : "ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপরেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।" (Promotion of learning during Muhammedan Rule, London 1916 Page-14).

বাংলার শিক্ষার প্রসার যে মুসলমানদের আবহমান ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। 'বাংলার মুসলমানগণ তাদের প্রথম যুগের মুসলমানদের শিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করে। যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সাফল্য তাদের পূর্বসূরীদের মতো অতটা উল্লেখযোগ্য ছিলোনা, তথাপি তারা যে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যবান মনে করতো এবং তাদের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল-তার প্রমাণ আছে। মুসলমান শাসনকর্তাগণ, আমীর ওমরাহ, রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সর্ব উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। উলেমা ও সূফী-দরবেশগণ বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন। ফলে শহরেও প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়ে উঠে।'

১২০০ খৃষ্টাব্দে হতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছরের দীর্ঘ শাসনকাল ছিল বাংলার শিক্ষার এক স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। এই সময়কালে আরব, আফগান, তুর্কী, মোগল, পারসিক প্রভৃতি বংশীয় প্রায় ৭৬ জন মুসলিম শাসক বাংলা শাসন করেন।

এই সময়কালে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধানত: দুইটি ধারা অবদান রেখেছিলো। একটি, শাসকশ্রেণী এবং অন্যটি আলিম ও সূফী সাধকগণ।

সূফী সাধক এবং আলিমগণের অক্লান্ত সাধনা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে মুসলিম বিজয়ের বহু আগে থেকেই অব্যাহত ছিল। বিজয় পরবর্তীতে তা আরো বিস্তৃতরূপ লাভ করে। সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা মুসলিম শাসকদের গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

ঐতিহাসিক আবদুল করিম লিখেছেন : 'বাংলায় মুসলমানদের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী রাখাই রাজাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলোনা। মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক হবে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা তেমন কোন কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করাও ছিল তাঁদের লক্ষ্য।' এই লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁরা নিম্নোক্ত কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন-

১. মসজিদ নির্মাণ

২. মাদ্রাসা স্থাপন

৩. ইসলামী চেতনার উন্নতি বিধান

৪. মুসলিম পণ্ডিত ও সূফীদের পৃষ্ঠপোষকতা

৫. কিছু সংখ্যক সুলতান ও তাদের কর্মচারীদের জ্ঞান চর্চা এবং

৬. সুলতানদের মানব হিতৈষী কার্যাবলী।

মসজিদই ছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধানতম কেন্দ্র। তাই মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সকল শাসক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। এটা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ছিলোনা। এ কাজে তারা এগিয়ে এসেছিলেন কারণ 'এটা ছিল মুসলমান সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র এবং মুসলমান সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি।' তাদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদের মধ্যে বাগের হাটের খান জাহান মসজিদ, বাকেরগঞ্জের মসজিদবাড়ী মসজিদ, ত্রিবেনীর জাফরখান মসজিদ এবং পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

বাংলা বিজয়ের পর শাসক হিসাবে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তেমন কোন সময় পাননি। এরপর মাত্র ৩ বছর বেঁচেছিলেন (মৃত্যু ১২০৬ খৃ.) তিনি। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি শিক্ষায়তন নির্মাণ শুরু করে দিয়েছিলেন। বখতিয়ার সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মীনহাজ সিরাজ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ঃ "... যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন তখন তিনি 'নওদীয়াহ' নগর ধ্বংস করেন এবং লাখ্‌নৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ্‌ অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন এবং ঐ অঞ্চলসমূহে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় তাঁর ও তাঁর আমীরদের প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে দ্রুত ও সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।"

একদিকে মসজিদ অন্যদিকে সূফীদের খানকাহ্‌ সমগ্র বাংলায়, সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সাড়ে পাঁচশো বছরের মধ্যে এ মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণের কাজ অবিরাম চলেছিল। তবে প্রথম দুশো বছর এর গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত।

মাদ্রাসা স্থাপনেও শাসকগণ ভূমিকা পালন করেন। সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে তিনি ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেনীতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। উদ্ধারকৃত শিলালিপিতে প্রমাণিত হয়, শামস্‌দ্দিন ফিরোজশাহ্‌, জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ প্রমুখ অনেক মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সুদূর মক্কা ও মদীনা শরীফে মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন অন্ততপক্ষে দুইজন বাংলার সুলতান। বিদ্যোৎসাহী মহাপ্রাণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

(১৩৯৩-১৪১০) মক্কার উম্মে হানির তোরণে ও মদিনার শান্তি তোরণের নিকট পৃথক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে গুলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী লিখেন– 'সুলতান গিয়াসুদ্দীন উভয় পবিত্র স্থানের বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণের জন্য মক্কা নগরীতে তাঁর নামে একটি মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অনুচর ইয়াকুত আনানীর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন। ওয়াক্‌ফ করার উদ্দেশ্যে তিনি জমি ক্রয় করেন এবং শিক্ষা ইত্যাদির মত জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করেন... ।'

বাংলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে শাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সূফী প্রচারক ও উলামাগণের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। মূল্যবান উপহার, জায়গীর দান, বৃত্তি এবং যত্রতত্র গমনের সুবিধা লাভ করেছিলেন অধিকাংশ সূফী উলামাগণ। বাংলার এমন অনেক সুলতানের নাম করা যায় যারা বিশেষ কোন প্রচারকের প্রতি সীমাহীন ভক্তি প্রকাশ করতেন। এই জন্য ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ 'বাস্তবিকই রাজকীয় শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন ধর্মীয় নেতাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল।'

মুসলিম বাংলায় শিক্ষা ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক। অধিকাংশ মক্তব, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আলিম সূফীদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূফী দরবেশ এবং মুসলিম পণ্ডিতরাই ছিল বাংলায় ইসলাম ও শিক্ষা বিস্তারের প্রধান পথিকৃৎ। তাঁদের প্রচার কার্যের এই গতি মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রচার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন শাহ তুর্কান শহীদ, তকীউদ্দীন আরাবী, শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহিয়াহ মানেরী, আবদুল্লাহ কিরমানী, সূফী শহীদ, জাফর খাঁ গাজী, পীর বদর, কাত্তাল পীর, শাহ জালাল, কল্লা শহীদ, রিযা বিয়াবানী, মাওলানা আতা, আখি সিরাজুদ্দীন, শাহ মুহসিন, আলাউদ্দীন আলাউল হক, নূর কুতবুল আলম, আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, খান জাহান আলী, বাবা আদম শহীদ, দানিশমন্দ, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ্ চান্দসহ শত শত আলিম, সূফীগণ। শিক্ষা ও জ্ঞানের বহুমুখী প্রচারে তাঁরা অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন। মাদ্রাসা স্থাপন, শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা করেছেন এঁদের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেক সূফী ছিলেন একেক জন বিজ্ঞ আলিম। ড. এম. এ রহিম লিখেছেন : 'সূফী দরবেশদের অধিকাংশই আলেম ছিলেন। মাওলানা শরফুউদ্দিন আবু তাওয়ামা, মখদুম শরফুউদ্দীন এহিয়া মানেরী, হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শেখ আলাউল হক, হযরত নূর কুতুব আলম ও অন্যান্য সূফীদের জীবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ...

তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্গুলো ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। এসব শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে।' আলিমগণের নিজেদের গৃহ পরিণত হয়েছিল এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশ বিদেশের শিক্ষার্থীদেরও তা আকৃষ্ট করেছে। শুধু আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় আহ্কাম নয় জ্ঞানগত বহু বিষয়ের পাঠ এখানে দেয়া হতো। গবেষকের ভাষ্য "... বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাঁরা একদিকে ইসলাম প্রচার ও অন্যদিকে মুসলমানদেরকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাহিমন্তোষ, পাণ্ডুয়া ও সোনার গাঁয়ের মাদ্রাসা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। বাংলার বাইরেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থিগণ এসব শিক্ষা কেন্দ্রে সমবেত হন এবং এখানে অধ্যয়ন করে বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।"

তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় শিক্ষা কেবল গতানুগতিক ও একটা স্তরে সীমাবদ্ধ ছিলোনা। উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হতো। ড. আশকার ইবনে শায়খ ঃ "এ শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের ছিল না; প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন খানকায় ও মসজিদ-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে। সূফী দরবেশ শেখ শরফ-উদ্দীন আবু তাওয়ামা ছিলেন মুসলিম বাংলার প্রথম দিককার একজন বিদ্বান ব্যক্তি। সোঁনার গাঁও-এ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল ওই সময়কার এক সুবিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। ধর্মীয় ও লোকবিজ্ঞানে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন তিনিই। সোনার গাঁও এর এই জ্ঞানপীঠ থেকে উচ্চতম শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উপমহাদেশে। সোনার গাঁও-এর মত উচ্চতম মানের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষ্মনাবতীতে, বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মাহীসুনে, সাতগাঁও-এ, নাগোর-এ, মান্দারনে, পাণ্ডুয়ায়, রাজশাহী জেলার বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রামে।"

বাংলার স্বাধীন সুলতান আমলে এবং পরবর্তীতে মুঘল যুগেও শিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। মুসলিম ঐতিহ্যের ভাষা আরবী, ফারসী হওয়া সত্ত্বে বাংলাকে তাঁরা কখনো অমর্যাদা করেননি। আরবী, ফার্সী এবং বাংলা এই তিন ভাষাতে শিক্ষা দেয়া হতো। "ভারতবর্ষে এসে মুসলমানরা ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষালাভ করে এবং বাংলাদেশে আসার পরে তারা বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করে। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে মুসলমানদের মধ্যে অন্য দেশের ভাষা এবং বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে কোন হীনমন্যতা ছিলনা। এতে মধ্যযুগে ধর্মের ভাষারূপে আরবী এবং ঐতিহ্যের ভাষারূপে ফারসীকে মুসলমানেরা প্রাধান্য দিত।

বাংলাদেশে আসার সময়ে তারা আরবী ও ফারসী এই দু'টি ভাষা সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা এই দেশের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাকেও আয়ত্ত করে ফেলে।"

মুঘল যুগের শিক্ষা সম্পর্কে জগদীশ নারায়ণ সরকার মন্তব্য করেন : "বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসা ব্যবস্থা মুগল শাসনামলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হয়, যা পরবর্তীকালেও বলবৎ ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অনেক ফার্সি স্কুলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলায় ফার্সী স্কুলের অনুসরণে বৃটিশ প্রশাসকরা ইঙ্গ-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।"

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাদ্রাসা নামেই পরিচিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা হতো মক্তবে। শিশুর শৈশবে প্রথম পাঠ হিসাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হতো পাঠ্য জীবন। আর বেশীরভাগ মক্তব বসতো মসজিদ চত্বরে। এখানে শুদ্ধ কুরআন পাঠ ছাড়াও অংকের প্রাথমিক জ্ঞান, আরবী ব্যাকরণের এবং ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ দেয়া হতো। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য মক্তব শিক্ষা ছিল উন্মুক্ত। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, সাহিত্য এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কোন পারদর্শী আলিমকে ঘিরে বসতো এক ধরনের বৃত্ত মজলিশ। যাকে বলা হতো 'হালকা'।

মুসলিম শাসনামলে কতোগুলো মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিলো তার সঠিক হিসাব জানা যায়না। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে বৃটিশদের পরিচালিত W. Adam এর Reports on the state of Education in Bengal (1941) জরিপে দেখা যায়, তারা বাংলায় ৮০ হাজার মাদ্রাসার সন্ধান পেয়েছেন। তখন প্রতি ৪০০ জনের ভাগে একটি করে মাদ্রাসা পড়েছিল। (Dr. M Mohar Ali : History of the Muslims of Bengal (1985).

শিক্ষার স্তর তিন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চপর্যায়। মক্তবে বা বাড়িতে শুরু হতো প্রাথমিক শিক্ষা। ইসলামের মৌলিক এবং নৈতিক শিক্ষা ছিল প্রথম পর্যায়ের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত। মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং সাধারণ বাড়িতে। শিক্ষা পদ্ধতি ছিলো সরল এবং প্রায় এখনকার মতো। শিক্ষার্থীকে প্রথমেই শুদ্ধ উচ্চারণ, যতির্বিন্যাস ও শ্বাসাঘাতসহ বর্ণশিক্ষা দেয়া হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা ও অঙ্ক শিক্ষা দেয়া হয়। এভাবে সে

ধীরে পড়তে লিখতে শিখে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সম্ভব হলে সে ভালো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মানবিক ও বিজ্ঞান পাঠে মনোযোগী হয়।

তাফসীর, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়াবলী মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে পড়ানো হতো। পাঠ্য তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল তাঁর সুবিখ্যাত আইন-ই-আকবরী'তে লিখেছেন, 'প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপ শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা গার্হস্থ্য বিদ্যা, সরকারি আইন-কানুন, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত; এসবগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে।' এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল।

উচ্চশিক্ষার দ্বার ছিল অবারিত। গ্রীক ও ইরানী চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এখানে গবেষণা হতো। সরফনামা' গ্রন্থে আমির শাহাবুদ্দীন হাকিম কিরমানী নামক চতুর্দশ শতকের এক বাঙালী চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থসমূহে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী বহু বিশেষজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক বার্নিয়ার উপমহাদেশের মুসলমান চিকিৎসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে অবহেলিত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। পূর্বে ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কোন নিম্নবর্ণ হিন্দুর শিক্ষার পথ মাড়ানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উদার ও সহনশীল মুসলিম শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা তাদের আত্মবিকাশের পথে বিরাট সুযোগ করে দেয়। মুসলমানদের পাশাপাশি তারাও শিক্ষার আলোতে ক্রমে উদ্ভাসিত হতে থাকে। মুসলিম পাঠ্যসূচী পড়ানোর জন্য কোন হিন্দুকে বাধ্য করা হতোনা। 'হিন্দুদের জন্যে তাদের নিজস্ব জাতীয় গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিলো। তাদের ও মুসলমানদের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রদান করা হতো। এই শিক্ষা প্রদান করা হতো তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে।'

যে ফার্সী ভাষাকে হিন্দুরা মুসলিম ঐতিহ্যের ভাষা বলে ঘৃণা করতো একসময় তারা তাতে বিপুল দক্ষতা অর্জন করলো। এমনকি তারা ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনায়ও নিবৃত্ত হলো। ড: এ. বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী এ ধরনের কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন ঃ শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাও এত সার্থকভাবে এই ফার্সী ভাষা শিখলো যে, তাতে তারা মুসলমানদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে

আরম্ভ করলো। হিন্দুদের মধ্যেও ফার্সী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক, কবি ও লেখক সৃষ্টি হয়েছে।'

উপমহাদেশে মুসলিম আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিবিধ ধর্মের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। বস্তুতঃ তাদের উদার শিক্ষানীতির কারণেই তা সম্ভবপর হয়েছিল। প্রখ্যাত গবেষক মুহাম্মদ আবদুল হাই জানিয়েছেন : "মুসলিম ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং স্থায়ী ফল ফলেছিল ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্য সংগঠন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই একই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষালাভ করত।..... মুসলিম ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোন আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে তা জাতীয় ঐক্য এবং জাতি গঠনের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার এটাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

নারী শিক্ষার ব্যাপারে বলা যায়, সাধারণভাবে একটি স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিলো। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা লাভ তাদের তেমন হতোনা, বাদশাহ আমীর ওমরাহদের মহল ছাড়া। সেখানে সমাজ বাস্তবতায় সাধারণ মেয়েরা যা শিক্ষা পেত তা আগ্রহ্য করার নয়। সহশিক্ষা ছিলোনা বিধায় পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হতো। প্রদেশের মুসলমান রাজা এবং রাজপুরুষদের অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁরা তাদের রাজ্যে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর রাজ্য ভ্রমণের পর জানাচ্ছেন যে, সে রাজ্যে প্রায় তেরটির মতো বালিকা বিদ্যালয় ছিলো। এই অঞ্চলের মেয়েরা সুশ্রী ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন এবং কুরআন মুখস্থ জানতেন।

মুসলিম আমলে অভিজাতবর্গের অন্তপুরীর সকল মহিলাই ছিলেন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাদের মেধা প্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় বহনের জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রচুর সাহায্য পাওয়া যেত। শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা ছিলো প্রবাদতুল্য। সরকারী ব্যবস্থাপনা থেকে তাঁরা জায়গীর ইত্যাদি প্রাপ্ত হতেন। ডক্টর এম. এ. রহিম জানান : "শিক্ষকরা সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন।... শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদেরও গভীর

ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং ছাত্ররা পরম ভক্তির সঙ্গে গুরুর সেবা করতো। রাজসরকার ও সমাজ কর্তৃক শিক্ষকদেরকে প্রচুর পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হতো। মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের লাখেরাজ সম্পত্তি ও বৃত্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র ও অবস্থাপন্ন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরী দেয় হতো। প্রায় সবগুলো টোলই (মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টোল বলা হতো) কোন না কোন উৎস থেকে ভূমি মঞ্জুরী ভোগ করতো। আজকের দিনের শিক্ষকদের চেয়ে সে-যুগের মক্তব পাঠশালার শিক্ষকদের অবস্থা অনেক বেশী স্বচ্ছল ছিল।"

বাংলার তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

অবৈতনিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ছিল।

আবাসিক সুবিধা ঃ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের বিনামূল্যে থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একই স্থানে বসবাসের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত। ফলে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং নৈতিক শিক্ষা ছাত্রদের মাঝে আজীবন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকত।

সমন্বয় সাধনকারী প্রতিষ্ঠান ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রধান শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়সমূহের মধ্যে বিবেকপ্রসূত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হতো। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি ছিল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই সেকুলার কোন বিষয় শিক্ষা দেয়ার সময় ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বিষয়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হতো। যেমনটি গবেষকের ভাষ্য : 'ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা বা যে কোন সেকুলার বিষয়ের সাথে ধর্মীয় আবরণ লাগানো হতো।'

শিক্ষার স্বাধীনতা ঃ সেকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে কোন সরকারী হস্তক্ষেপের প্রভাবমুক্ত ছিলো। তাছাড়া শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন করতে পারতো। বিষয়ের ব্যাপারে ছাত্রদের উপর কিছুই চাপিয়ে দেয়া হতো না। তাদের নিজস্ব পছন্দ ছিলো এবং তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় চয়ন করতেন। ফলে সময় বা প্রতিভার অপচয় প্রায় ছিলোনা বলা যায়।

জ্ঞানার্জন ঃ একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করে ডিগ্রি হাসিল করার মত তথাকথিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তখন ছিলোনা। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানার্জন মূখ্য নয় যেভাবে ডিগ্রী অর্জন করা হয়। কিন্তু তখন জ্ঞানার্জন সবার উপরে উদ্দিষ্ট ছিল। তাই সে সময়ে শিক্ষা অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত ছিলোনা বরং

আত্মশিক্ষা ও অপরকে শিক্ষিত করে তুলে অশিক্ষিত ও অবহেলিত জনগণকে জ্ঞান বিতরণ, সত্যের প্রচার ইত্যাদি ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এক কথায় বলা যায়, সেকালে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ এ লক্ষ্যেই শিক্ষা দেয়া হতো।

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দেওয়ানী হস্তান্তরের সময় থেকে বাংলার ভাগ্য এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে প্রবেশ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী আম্রকাননে নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্‌র ষড়যন্ত্রমূলক পরাজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা শুধু নয় তাদের পুরো অস্তিত্বই অবর্ণনীয় হুমকির সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। অচিরেই স্বর্ণযুগের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়। ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ পর্যন্ত এই ১৯০ বছর বাংলার মুসলিম শিক্ষার বিপর্যস্থ্ এবং পতনের যুগ নামে অভিহিত করা যায়।

মুসলমানদের শাসনামলে বাংলায় একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা অনেক প্রাচ্যবিদ উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রনীতিবিদ ই. সি. বেইলী মন্তব্য করেছিলেন ঃ They possessed system of education which we have abolished, was capable of affording a high degree of Intellectual training and polish, was founded on principle not wholly unsound. Though presented in an antiquated form it was infinitely superior to any other system of education than existing in India; a system which secured to them an intellectual as well as a material supremacy অর্থাৎ, তারা এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত যা আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও মোটেও অবজ্ঞার বিষয় নয় এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি ও আদব-কায়দা প্রশিক্ষণের জন্য সে ব্যবস্থাটি যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন ভাবধারা চালিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি যে নীতির দ্বারা চালিত হত তা সম্পূর্ণ দোষযুক্ত ছিলনা এবং তৎকালীন ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতির তুলনায় তাদেরটা ছিল নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। সে ব্যবস্থার গুণেই বুদ্ধিবৃত্তি ও অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

বৃটিশ শাসনের এক তৃতীয়াংশ সময় মুসলিম প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ইংরেজদের নতুন শিক্ষানীতি অনুমোদনের পর মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন ঃ "আমাদের শাসনের প্রথম পঁচাত্তর বছর প্রশাসন কার্য পরিচালনার যোগ্য অফিসার সৃষ্টির জন্য আমরা তাদের

শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু ইত্যবসরে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করি এবং নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বহুলোক সৃষ্টি হওয়ার পর মুসলমানদের পুরনো ব্যবস্থাটা আমরা বর্জন করেছি; ফলে মুসলমান যুবকদের সামনে রাষ্ট্রীয় কর্মের প্রতিটি রাস্তা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।"

ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ 'ইংরেজ সাহেব' তৈরী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য এতে রাখা হয়নি। এ দেশের গরিষ্ঠ মানুষের আশা আকাংখা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনার কোন প্রভাব এ ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিলো। ওদিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও নিষ্কর লাখেরাজ ভূ-সম্পদে পরিচালিত মক্তব মাদ্রাসাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, বৃটিশরা জমি ও সম্পদগুলোতে কর ধার্য করে অতিরিক্ত রাজস্ব লাভের আশায়। হান্টার লিখেছেন ঃ শত শত প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এবং নিষ্কর জমির আয়ের উপর নির্ভর করে মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল তা মরণ আঘাতপ্রাপ্ত হল।... মুসলমানদের মধ্যে যেসব শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারাও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।"

যাহোক, এ আলোচনায় আরব উপদ্বীপের লোহিত সাগর হতে নীলনদ, স্পেনের জিব্রাল্টা হতে বঙ্গোপসাগরের ঢেউমালা পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম শিক্ষার যে সংক্ষেপ সার বর্ণিত হলো তাতে একথা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম অবদান পৃথিবীতে এক স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করে। মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণফসল তারই প্রমাণ বহন করে যুগ যুগ ধরে।

প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলমান

'বিজ্ঞান' এবং 'প্রযুক্তির' মধ্যে যেমন কিছু মিল রয়েছে, তেমনি অমিলও অনেক। আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলো কেন, কিভাবে ঘটছে তার জবাব অনুসন্ধান করাই সাধারণত বিজ্ঞান। প্রকৃতির নিয়ম জানাই বিজ্ঞান চর্চার মূল লক্ষ্য। এ জন্য বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গণনা, হিসাব, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের উপাদেয় আবিষ্কারগুলোকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। বিজ্ঞান দেয় জ্ঞান আর প্রযুক্তি দেয় এর প্রয়োগের কলা-কৌশল।

বাঁচার তাগিদে মানুষ হাতিয়ার তৈরী করতে শিখে সেই আদিম যুগেই। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষ কৃষি কাজের সূচনা করে। আরব সভ্যতার পূর্বে অনেকগুলো সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিলো পৃথিবীতে। সময়ে সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নও সাধিত হয়।

'Development of science and technology in the initial stages of present human society dates back to about 10,000 years in the introduction of agriculture practices. Invention of the alphabets came about 6000 years ago to establish written languages. This was followed by the discovery of the wheel, about 5000 years back, revolutionising social progress.... Use of copper and bronze were known 7000 years ago, and it was followed by the use of iron, about the same time as discovery of the wheel. This was also the time when the first records of pharmacy can be traced to cheops (about 3700 B.C). Later on it developed through the Egyptians (16th century B.C) Chineese, Persian, Indian (Charaka) and Grecko Roman times upto the fifth century A.D."

বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রান্তিকালেই ঘটেছিলো ইসলামের আবির্ভাব। প্রাচীন সভ্যতাগুলো তখন ধুকে মরছিল। বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল ধর্মবিরোধী অপবাদ দিয়ে। দেশান্তর করা হচ্ছিল গ্রীক বিজ্ঞান আলোচকদের। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মানব জাতির মুক্তির সাথে সাথে বিজ্ঞান জগতও যেন হাফ ছেড়ে

বাঁচলো। অনতিকালের মধ্যেই প্রাচীন বিজ্ঞানের উদ্ধার ও চর্চা শুরু করে দিলো মুসলিম দুনিয়া।

"During the early times of Muslim social evolusion great value was given to the study of science and in the pursuit of knowledge under the direct patronage of the last of the prophets Hazrat Ahmad Muztaba Muhammad Mustafa (SM)."

পবিত্র কুরআনে কারীম এবং মহানবীর (সা) প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় মুসলামনরা বিজ্ঞান সাধনার যে জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে তা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে বিরাজিত রয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা এবং মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অন্যত্র, এখানে প্রযুক্তি এবং তার অনুপ্রেরণা মুসলমানরা কিভাবে পেলো আর কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রযুক্তির অসামান্য উন্নয়ন সাধিত করেছেন তার নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরা হলো।

কুরআনে প্রযুক্তি ভাবনা

কুরআনে কারীমে হযরত সুলায়মান (আ)-এর যেসব কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে অনেক প্রযুক্তিগত চিন্তার খোরাক রয়েছে। বাইবেলেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, তিনি লৌহ এবং তামা গলিয়ে নানা জিনিস তৈরী করতেন। দাউদ (আ) লোহা গলিয়ে বর্ম তৈরী করতেন। লোহার গলন তাপ ১৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর উবালন তাপ ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড; আর তামার গলন তাপ ১০৮৩ ডিগ্রি, উবালন তাপ ৩৩১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এতে বুঝা যায় তখন ধাতুবিদ্যা বেশ অগ্রসর হয়েছিলো। দাউদ ও সুলায়মান (আ) সম্পর্কে কুরআন বলছে- '... এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৯) আরো বলা হচ্ছে- 'আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। (ঐ ঃ ৮০-৮১) নবী সুলায়মান কিভাবে এসব ধাতুর জিনিস তৈরি করতেন, তা নিয়ে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদরা উঠে পড়ে লেগেছেন। ১৯৪০ সালে একদল আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ আকাবা উপমহাসাগরের কাছে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পান যে, এখানে Blast Furnace-এর মতো তামা-লোহা গলানোর ফার্নেস ছিলো। আর এসব ফার্নেস

ব্যবহার করেই পিতা-পুত্র নবীদ্বয় ধাতু গলানোর কাজ করতেন। ওয়াদী আর আরাবাতে প্রবাহিত অবিরাম বায়ুপ্রবাহ তাতে হাপরের কাজ করত। The Bible as History, গ্রন্থে Werner Keller লিখেন ঃ 'The whole thing was a proper up to date blast furnace, built in accordance with a principle that celebrated its resurrection in modern industry a century ago. Flueo and Chimneys both lay along a north to south axis. For the incessant winds and storms from the wadiel-Arabat had to take overrole of bellows. That was 3000 years ago; today compressed air is forced through the forge.'

সুলায়মান (আ)-এর বাতাস ভ্রমণের ব্যাপারে কুরআনে তিনবার উল্লেখ রয়েছে। বাতাস ভ্রমণ এককালে অলীক ঘটনা মনে হলেও বর্তমানে তা আর কল্পনা নয়। আদিম কাল থেকেই মানুষ পাখির মতো উড়তে চেষ্টা করেছে। মুসলিম আবিষ্কারক আব্বাস ইবনে ফারনাস প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষ ধরনের পাখা আবিষ্কার করে কিছুদূর উড়েওছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকালে আহত হওয়ার কারণে তাঁর এই আবিষ্কারের কোন অগ্রগতি সেকালে আর হয়নি। সুলায়মান (আ)-এর আকাশে ওড়ার উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- According to the classical exegetes like Baidawi Ibn-al-Kathir, the prophet would ride a big throne which would be carried by wind according to his order. According to modern comment ors this refers to the prophets naval power on the Mediterranean and through the gulf of Aqaba on the Red sea ana therefore he figuratively commanded the wind.

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নভোভ্রমণ তথা মিরাজ গমন নিয়ে কুরআনে যা বলা হয়েছে তা ছিলো অনেকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আলো, নক্ষত্র, ছায়াপথ, সর্বোপরি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে আকাশ ভ্রমণের এই কাহিনীকে আধুনিক বিজ্ঞান তার নিজের প্রযুক্তি দিয়েই প্রমাণ করেছে। মিরাজের বৈজ্ঞানিক সত্যতার ওপর অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর বাতাস ভ্রমণ, নবীজীর (সা) বুরাক ভ্রমণ পার্থিব শক্তিতে অসম্ভব ছিলো। কারণ এখানে স্থান, কাল ও পাত্রের বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যবধান বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। পার্থিব ও অপার্থিব সময়ের পার্থক্য কিরূপ - এ বিষয়ে আলবার্ট আইনস্টাইন একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরেছেন ঃ Let us suppose that a hollow projectile

holding a man such as Jules Verne and Wells used on their voyages to the moon, should be sent off into space with a velocity one twenty thousandth less than light. If at the end of a year the projectile should be caught like a comet by the gravitation of some star and be swung and sent back to earth, the moon steping out of his shell, would be two years older but he would find the world two handred years older. "(Essay Lesson in Einstine by Slosson).

কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের ভাবনাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি স্বত:সিদ্ধ বাণী। একে বাস্তবে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব মানবজাতির। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর একটি ঘটনার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর সংশয় হয়েছিল, আল্লাহ্ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন এ নিয়ে। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি আল্লাহকে বললেন, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কি তাহলে বিশ্বাস কর না'। ইব্রাহীম বললেন, "কেন করব না, তবে এটা আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্য।" এখানে ইব্রাহীম জানাচ্ছেন যে, তিনি বিষয়টি বিশ্বাস করলেও মনের সংশয় দূর করতে প্রমাণ দরকার। আর আল্লাহ্ তাঁকে নিজেই এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে বললেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)

কুরআনে বর্ণিত মতবাদ ও তত্ত্বকে সংশায়িত মনে করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যাতে মানুষ নিরত হতে পারে, এ শিক্ষা ইব্রাহীম (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ মানব জাতিকে দিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের নানা তথ্য-উপাত্তের জটাজাল থেকে বেরিয়ে একটি সর্বোতভাবে স্বীকৃত মতবাদ প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার প্রথাটি কুরআনের নির্দেশনার অনুসরণ মাত্র। কুরআনে প্রায় ১ হাজার বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করে মানুষ বহু সুফল পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পেতে পারে।

মুসলিম প্রযুক্তি উন্নয়নের পটভূমি

খৃষ্টের জন্মের একশত বছর পূর্বে ভিট্রুভিয়াস তাঁর 'de Architectura গ্রন্থে নির্মাণ কৌশল, পুরকৌশল এবং যন্ত্রকৌশলে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দের কয়েকজন হেলেনিস্টিক প্রকৌশলীদের সম্পর্কে তিনি তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বেশ কিছু যন্ত্র সম্পর্কেও লিখেছিলেন। সপ্তদশ শতকের আগে এসকল যন্ত্রের কিছু মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে

দেখা যেতো। মিশর ও ইরাকে সেচ ব্যবস্থা ছিল বেশ পোক্ত। ইসলাম পূর্বকালে এখানে খাল, স্লুইস এবং নদীতে বাঁধ দেয়ার জন্য পুরপ্রকৌশলীদের দরকার পড়তো। রোমান, পারসীয় এবং ইয়েমেন বাসীরা বড় বড় বাঁধ তৈরী করতো নদীতে। তারা রাস্তা, সেতু তৈরী করে নিজেদের প্রযুক্তিগত সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছিলো।

তৎকালে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহৃত হতো তরবারী, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র। বাইজান্টাইন সেনাদের ছিলো নৌবহর–এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশরে টহল দিতো তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো।

বাইজান্টাইন ও সাসানীয় আমলে বস্ত্রশিল্প বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো। সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতে উন্নত বয়ন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় খৃষ্টাব্দে। ১ম খৃষ্ট পূর্বাব্দে কাঁচ শিল্প যাত্রা শুরু করে সিরিয়াতে। কাঁচের ফুলদানী তখন বাড়িতে বাড়িতে শোভা পেতো।

ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম সাম্রাজ্য অনেকগুলো সভ্যতার লালনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা এ সকল সভ্যতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান লাভ করে। যথার্থ হাতে এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবৃদ্ধি হয় এবং বৈচিত্র্য, নতুনত্ব এবং গৌরবে তা পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে যায়। Max- Neusurger বলেন ঃ "Islamic civilization, which in its prime surpassed that of ancient Rome in animation and variety and all its predecessors in comprehensiveness, lasted until the commencement of the eleventh century."

মুসলিম প্রযুক্তি ঃ উপাদান

মুসলিম প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রধান উপাদান হিসাবে অবশ্যই কাজ করেছে ইসলাম ধর্মের বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা। Islamic Science and Technology গ্রন্থে বলা হয়েছে - "If we wish to analyse the teachings of Islam, we shall find ample evidence to show that it was a positive force in all these achievement." বেশ কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার পাদভূমি মুসলিম কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীন হওয়ায় এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যে মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল তা এতে প্রভূত উপাদেয় ফল প্রদান করেছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির শক্তিশালী সম্পর্ক এক সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্য রচনা করেছিল।

'বিজ্ঞান পরিকল্পনা' মুসলিম প্রযুক্তির বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছে।

প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এমন দরদ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শিত হয়েছিল যে, সাম্রাজ্য যেন বিজ্ঞান চর্চার আদর্শ ক্রোড়ে পরিণত হয়েছিল। বহু মুসলিম খলীফার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অসামান্য। আল মামুন, আল হাকাম, উলুগ বেগ প্রমুখ শাসকগণ নিজেরাই ছিলেন অসামান্য বিদ্বান-পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিজ্ঞানী। শাসকরা ছিলেন বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তার ছায়া। রাজনীতির উত্থান-পতন যা-ই ঘটুক তাদের কখনো বিপদে পড়তে হতো না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থাদি অনুবাদ করা, বিজ্ঞান গবেষণাগার, মানমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থাগার নির্মাণ ছিলো বিজ্ঞান পরিকল্পনার অন্যতম অংশ। আরবী ভাষা ছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মাধ্যম। মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি এ ভাষায় বিরচিত হয়। কুরআন এবং শেষ নবীর ভাষা হওয়ার কারণে আরব-আজম সর্বত্রই আরবীর আলাদা মর্যাদা মুসলমানদের কাছে আজও প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যবাহী পারস্য মুসলিম কলাবিদরাও আরবীতেই তাদের গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এমনকি অনারব মুসলিম অধিকৃত রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসীরাও আরবীতে কথা বলে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করত। স্পেনে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো যে, কট্টরপন্থী একদল খৃষ্টান তাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে একটি গোঁড়া আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো। 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' হিসেবে এটি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে।

যাই হোক, আরবী ভাষায় মুসলিম মনীষীদের শ্রেষ্ঠতম রচনাসমূহ পুঞ্জীভূত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার জন্য অসংখ্য পাশ্চাত্যবিদ আরবী শেখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কারণ বর্তমানে যেরূপ ইংরেজী, সেকালে তদ্রূপ আরবীই ছিলো বিজ্ঞানের স্বীকৃত ভাষা। বিজ্ঞান লেখক ব্রাউনি আরবীকে বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে মূল্যায়ন করে লিখেন ঃ "For a scientific language, indeed Arabic is eminently filled by its wealth of roots and by the number of derivative forms, each expressing some particular modification of the root idea, of which each is susceptible."

'বায়তুল হিকমা' তথা বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম শাসকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সরকারী দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। 'আরবদের অগাস্টাস' হিসাবে খ্যাত আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খৃ.) প্রথম বাগদাদে এই বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ, দেশ-বিদেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ এবং গবেষণাগার ছিলো এ ইন্সটিটিউটের মূল কর্মকাণ্ড। সরকারী বেতনে এখানে চাকুরী করতেন অনেক অনুবাদক, অনুলিপিকার ও বিজ্ঞানী। এর বিজ্ঞান অনুষদ থেকেই

বেরিয়ে এসেছেন বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম কারিগর বনি মূসা ভ্রাতৃত্রয়, সাবিত বিন কোরা, আল ফারগানী, আল খারেজমী প্রমুখ বিজ্ঞানী। মামুন গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কতোটা সিরিয়াস ছিলেন তা বুঝা যায়। রাষ্ট্রীয় বিনিময়াদির ব্যাপারেও তিনি যে বই কূটনীতি কাজে লাগিয়েছেন তা দেখে। তিনি সম্রাট তৃতীয় মাইকেলের কাছে এই বলে একটি সন্ধি প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, কনস্টান্টিনোপলের রাজকীয় লাইব্রেরীর কয়েকটি গ্রীক গ্রন্থ খলীফাকে দিতে হবে। এই শর্তের কারণেই মুসলমানদের হাতে এসেছিল টলেমীর 'আল মাজেস্ট–যে গ্রন্থটি মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েক শতাব্দী আচ্ছন্ন করে রেখেছিল নানাভাবে। The astronomical works of Ptolemy, who flourished al Alexandria between AD 127 and 151, were to become the standard treatises on the subject for the next fourteen centuries, although they were considerably modified by Muslim astronomers. পরবর্তীকালে আল মামুনের অনুসরণে আরো বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মামুনের প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে বসেই তারা জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত 'মামুন তালিকা' (Tested Table or Al Mamn's' Table) এখানে প্রণীত হয়। এখানে বসেই প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

গ্রন্থাগার, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ছিলো মুসলিম প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান। এগুলোর বিশেষ আলোচনা এখানে বাহুল্য মাত্র।

প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলমান

মুসলিম জাতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে বিশাল ভূমিকা ছিল সব আদ্যোপান্ত বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি

মুসলিম বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় অংশটি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। বলে রাখা ভাল যে, প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের একাধিক শাখায় চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। কারও পৃথক পৃথক শাখায় যুগান্তকারী অবদান রয়েছে। মুসলিম ইবাদত চন্দ্র-সূর্য পরিক্রমণ নিয়মানুযায়ী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে এদিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আগে৷ তাই বিজ্ঞানের এই শাখা থেকেই বেরিয়ে এসেছেন প্রথম মুসলিম প্রযুক্তিবিদ। তাঁর নাম আবু ইসহাক

ইবরাহীম আল ফাজারী (মৃ. ৭৭৭ খৃ.)। আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) রাজসভায় তিনি অন্যতম বিজ্ঞানী ও গাণিতিক ছিলেন।

আল ফাজারী প্রথম সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য Astrolabe তথা আস্তারলব নির্মাণ করেন। এই যন্ত্র তৈরী ছাড়াও তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ পদ্ধতির ওপর কয়েকটি গ্রন্থ্ রচনা করেন। খলীফার রাজসভার আরেক প্রতিনিধি ছিলেন নওবখত। জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বাগদাদের ভিত্তি রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই কাজে নওবখতের (মৃ. ৭৭৫-৭৭ খৃ.) সাথে ডাক পড়েছিলো ইহুদী বিজ্ঞানী মাশাআল্লাহ'র। তিনিও একটি আস্তারলব যন্ত্র তৈরী করেন। তাঁর এ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করেই দ্বাদশ শতাব্দীতে রাব্বি বিন এজরা এ সম্বন্ধে গ্রন্থ্ প্রণয়ন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৮১৫ খৃষ্টাব্দে।

পরবর্তীকালে অনেক মুসলিম জ্যোতির্বিদ Astrolob যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন বলে জানা যায়। খ- পদার্থসমূহের উন্নতি নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো এবং এর সাহায্যেই বিভিন্ন খ- পদার্থের অবস্থানও নির্ণয় করা হতো। মুসলিম প্রকৌশলীরা এই যন্ত্রে 'আল ইদাদ' নামক একটি নির্দেশক কাটা সংযোগ করেন। এর সাহায্যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Sextant আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ ও নাবিক উভয় সম্প্রদায়ই আস্তারলব ব্যবহার করতেন।

আল মামুনের দরবারে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশিষ্ট ছিলেন হারুন ইবনে আলী, আলী ইবনে ঈসা আস্তারলবী ও আল খারেজমী।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম জ্যোতির্বিদ আবু মুহাম্মাদ আল খুজান্দী অনেকগুলো যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন। প্রথম যন্ত্রটির নাম 'আস্ সুদ আল-ফাখরী'। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সেক্স্ট্যান্ট। এর নির্মাণ-কৌশল বেশ্ বিচিত্র। ১২ ফুট দূরত্বের ব্যবধানে ৩০ ফুট উঁচু দু'টি দেয়াল নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেকটা দেয়াল মাটির নিচে ৩০ ফুট গাঁথা। দক্ষিণ দেয়ালের দক্ষিণ কোণে এবং সম্ভবত উত্তর কোণেও ছিদ্রবিষ্টি গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজের চারদিকে ৬০ ফুট ব্যাসার্ধের একটি সেক্স্ট্যান্ট ছিল। পূর্ব বর্ণিত দেয়াল দু'টির মাঝখানে অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে পালিশ করা একটি তলের সাহায্যে সেক্স্ট্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। মাটির নিচে ৩০ ফুট থেকে প্রতি ১০ ইঞ্চি পরপর সেক্স্ট্যান্টটির ওপর দাগ কাটা ছিল। গম্বুজের ছিদ্র দিয়ে যে আলো আসতো, তা একটি সাদা সমতলের উপর পড়তো। এই সাদা সমতলটি

একটি বৃত্তের উপর ঘুরতো। এর সাহায্যে সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি নির্ণয় করা যেতো। এর সাহায্যে ৯৯৪ খৃ. আল খুজান্দী সূর্যের সর্বোচ্চ উন্নতি নির্ণয় করেন। এই যন্ত্রটি ছাড়া তিনি 'আল আলা-আস সামিল' নামক আরেকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রায় সকল কাজেই এটি ব্যবহার করা যেতো। প্রথমে এ যন্ত্রটি কেবলমাত্র একটি অক্ষাংশে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল; পরে সকল প্রকার অক্ষাংশে ব্যবহারের উপযোগী করে এটি পরিবর্ধন করা হয়।

কর্ডোভার বিজ্ঞানী আল জারকালী (১০২৯-১০৮৭ খৃ.) টলেডোর রাজপ্রাসাদের বাগানে দুটি চৌবাচ্চা নিয়ে একটি জলঘড়ি নির্মাণ করেন। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই চৌবাচ্চা দু'টির পানি নিয়ন্ত্রিত হতো। পূর্ণিমা হতে হতে এতে পানি পূর্ণ হয়ে যেতো এবং অমবস্যা আসতে আসতে চৌবাচ্চা একেবারে শূন্য হয়ে যেতো। এটা এমন প্রযুক্তিতে তৈরী করা হয়েছিলো যে, তাতে কিছু পানি বেশি ঢেলে দিলে বা কিছু পানি বের করে দিলে পানির পরিমাণ আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যেতো। এছাড়া সবখানে ব্যবহার উপযোগী আস্তারলবের সংস্কারে তিনি অনন্য অবদান রাখেন।

মারাঘার মানমন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসির উদ্দীন আল তূসী (১২০১-১২৭৪ খৃ.)। এই মানমন্দিরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানমন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিরন্তর গবেষণা পরিচালিত হয়। এর প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবস্থা করেন তিনি তাঁর সহকারী আল উরদী আল দামিস্কির দায়িত্বে। কারখানাটি ছিল মানমন্দিরের সাথেই। এতে উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলো যে শুধু বৈজ্ঞানিক মানসম্মত তা নয়, এর সূক্ষ্ম কারুকাজ অতীব বিস্ময়কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির নির্মাণ এবং প্রয়োগবিধি বর্ণনা করে আল উরদী একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এতে এগারটি যন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। মারাঘাতে সে সকল যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়, তন্মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গোলক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন দু'টি বলয় এতে সংযোজিত হয় এবং এর ব্যাস ছিল বারো ফুট। কাস্টিলের রাজা আল ফানসো সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সূক্ষ্ম একটি গোলক নির্মাণ করতে গিয়ে এই গোলকটির অনুকরণ করেন।

উরদীর পুত্র মোহাম্মদ ইবনে উরদী মানমন্দিরের জন্য একটি খ- গোলক নির্মাণ করেন। তার পূর্বে মাত্র ৪টি খ- গোলকের কথা জানা যায়। তা হলো ঃ

১. মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আস সাহলী একাদশ শতকে তৈরী করেন। দুইটি পিতলে ফাঁপা গোলাকার খণ্ড এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এটি নির্মিত হয়, যার ব্যাসার্ধ

২০০ মিলিমিটার এবং এতে ১০১৫টি তারাও ৪৭টি সংযোগের যথাস্থান ও পরিমাপ খোদিত রয়েছে। বর্তমানে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি সংরক্ষিত আছে।

২. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাইসার ইবনে আবুল কাশেম ১২২৫-২৬ খৃ. দিকে তৈরী করেন দ্বিতীয় খ- গোলক। এতে পিতলের গোলকখণ্ড দুইটি জোড়া হয়েছে চারটি পায়ার উপর। নেপলসের জাতীয় যাদুঘরে এটি বর্তমানে রক্ষিত।

৩. মধ্যযুগে গ্লোবের মধ্যে সবচেয়ে বড় খ- গোলকটি তৈরী হয় ১২৭৫-৭৬ খৃস্টাব্দে। এর ব্যাসার্ধ ২১৪ মিঃমিঃ এবং এতে রাশিচক্র, সাতচল্লিশটি সংযোগ এবং দিগন্তের পরিধির উপর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সকল কিছু খোদিত। লন্ডনের Royal Asiatic Society-তে রক্ষিত।

৪. চতুর্থ খ- গোলকটির সময় ও নির্মাতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ১৯৯ মিলিমিটার ব্যাসার্ধ এবং ৪৯ টি সংযোগ এতে খোদিত রয়েছে। প্যারিসের Bibliotheque National-এ এটি সংরক্ষিত রয়েছে।

মোহাম্মদ ইবনে উরদীর খ- গোলকটি নির্মিত হয় ১২৬৯ বা ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে। দুইটি পিতলের গোলকখণ্ড এবং দুইয়ের মাঝে সূর্যপথ দেয়া আছে। বৃত্তগুলোর পরিমাপ খোদিত থাকার ফলে, যে কোন নক্ষত্রের বিষুব লম্ব এবং বিষুবাংশ অতি সহজেই মেপে নেয়া যেতে পারে। এছাড়া এতে ৪৮টি সংযোগ বিষুববৃত্ত এবং বিষুবন বিন্দু থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিমাপের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এগুলোর উপর সোনার বা রূপার কাজ করা আছে। ১৪০ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের এই গোলকটি ড্রেসডেন ইউনিভার্সিটির Mathematical Salon এ সংরক্ষিত রয়েছে।

শেষ যুগের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী জামশিদ গিয়াসউদ্দীন আল কাশী (মৃ. ১৪২৯ খৃষ্টাব্দের ২২ জুন) সমরকন্দ মানমন্দিরের দক্ষ প্রকৌশলী ও পর্যবেক্ষক ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের মধ্যে ইকুয়েটেরিয়াম সর্বোৎকৃষ্ট। সে সময় পর্যন্ত যত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে গ্রহের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সহজ প্রয়োগক্ষম ছিল।

গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিমাপের জন্য মুসলিম প্রযুক্তিবিদগণ নানা ধরনের স্কেল উদ্ভাবন করেছিলেন। তন্মধ্যে ডায়াগোনাল স্কেল, আকাশ ফলক (তাবাকোল মানাতেক), বলয় ও ফলক, আলিদাদ ও রুলার, সংযোগ ফলক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মহাকাশ বিষয়ে তাদের আবিষ্কারও কম নয়, কিন্তু এঁদের বেশিরভাগ আবিষ্কার হাইজ্যাক হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের দ্বারা। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই প্রথম গ্রীক বিজ্ঞানের পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক পদ্ধতিতে মধ্যরেখা (meridian) নিরূপণ করেন। বিষুবরেখা সংলগ্ন পরিধিরেখা, বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল (Equinax), চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া প্রভৃতি তথ্য নির্ণয় করেন। পৃথিবীর গোলত্ব সম্পর্কে তারাই প্রথম নিশ্চিত হন। সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও যখন 'পৃথিবী গতিশীল' 'সূর্য ঘুরছে' বলে মহাপাপ করে ফেলেন এবং নির্যাতিত হন তারও সাতশো বছর আগে মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা পৃথিবীর গতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী উপবৃত্তাকারে ঘুরছে, বহু আগে এ তথ্য তারা জানতেন; অথচ তার কয়েকশো বছর পর টাইকো দ্য ব্রাহে এবং কোপার্নিকাস একে বৃত্তাকার বলে ভুল সিদ্ধান্ত দেন। কোণকে ত্রিখণ্ডিত করার নিয়ম তারা উদ্ভাবন করেন, বাহুর পরিমাপ দিয়ে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল বের করার বিখ্যাত এবং আধুনিক সূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাদের। নিউটনের Calculus নবম শতকের সাবিত বিন কোরার গবেষণার ফল। ইবনে সীনা-আল বেরুনী আলোর গতি আছে এ তথ্যে নিশ্চিত হয়েছিলেন। অথচ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)-এর মতো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেতন-আলো গতিহীন। বিখ্যাত বিজ্ঞান-সাময়িকী Science Today এর ১৯৮০ এর একটি সংখ্যায় স্বীকার করা হয়েছে যে, আরব বিজ্ঞানীদের লেখা থেকেই স্যার আইজ্যাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ধারণা পেয়েছিলেন। বর্তমান দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক সকল উৎকর্ষের মূলে এই মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের অবদান রয়েছে-যার আদি আবিষ্কর্তা আরবরা, অথচ তার কৃতিত্ব হস্তগত করলেন নিউটন। এভাবে এই তালিকা আরো বর্ধিত করা যায়।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি

বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে রসায়ন অন্যতম। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞানের কোন না কোন সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য। প্রথম যুগ থেকে মুসলমানরা এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং অচিরেই প্রভূত সাফল্য লাভ করেন।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা জাবির বিন হাইয়ান। তাঁর পরে অনেক বড় মাপের প্রতিভা এক্ষেত্রে আবিষ্কার ও পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করে রসায়নকে এগিয়ে দিয়েছেন ঃ Jabir Ibn Hayyan, the founder of modern chemistry was also a great alchemist of his times, during the reign of Caliph

Harun al-Rashid. The pursuit of alchemy is right earnest, led to the refinement and discovery of many a basic chemical techniques, its practice in therapy and also preparation of basic chemicals. This includes the refinement and invention of apparatus for the chemical processes of distillation, sublimation and calcination. The discovery of 'all of vitriol' (sulphuric acid), nitric acid, and aqua regin nitriohydrochloric acid mixture to dissolve gold, corrosive sublimate and lunar caustic, which laid a foundation on which chemistry developed quickly."

ফার্মাসিউটিক্যাল ক্যামিস্ট্রির উপর রচিত গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে ইউরোপে পাঠ্য ছিল। ভেষজ তথা ইউনানী বিদ্যাকে হাতে কলমে উন্নয়নের কাজ করেছেন এই বিজ্ঞানীরা। এলোপ্যাথিক বিদ্যালয় Anatomy Opthalmology, অস্ত্র চিকিৎসায় তাঁদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ স্বতন্ত্র নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁরা বহু অস্ত্রোপচারের জনক এবং এ বিষয়ে অনেক যন্ত্রপাতিও তারা উদ্ভাবন করেছেন। চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশনে আরব বিজ্ঞানীদের দক্ষতা ছিলো প্রবাদতুল্য। অথচ গত শতকেই মাত্র ইউরোপীয়রা এসব বিদ্যায় উন্নতি করতে শুরু করে।

বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের সুফল পেতে হলে শিল্প ও প্রযুক্তির প্রসার অনস্বীকার্য। মুসলমানরা যে রাসায়নিক জ্ঞান অর্জন করেন তার ভিত্তিতে তারা নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশাল উন্নয়ন ও প্রযুক্তি জ্ঞান কাজে লাগায়। তন্মধ্যে 1. Phamaceutical or medicinal preparation, 2. Paper making, 3. Glass, Enamel and pottery Glasing, 4. Metallurgy, 5. Chemicals prepared on the basis of acquired knowledge for various applications অন্যতম।

রাসায়নিক প্রণালী ও নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরবরাই পৃথিবীকে শিক্ষা দেন। বিশেষ করে আল জাবির এবং আল রাজীর প্রবর্তিত নিয়মগুলোর ব্যবহার পরবর্তীকালে অনুসৃত হত।

মুসলিম রাসায়নিক প্রযুক্তিতে পাতন (Distillatiion) পদ্ধতি খুবই বিস্তার লাভ করেছিল। ওষুধশিল্পে এই প্রযুক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রযুক্তিতে মুসলমানদের ভূমিকা ইউরোপীয়ান ভাষায় পাতনের জন্য ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রপাতির আরবী নাম থেকেই আঁচ করা যায়।

নবম শতকে তৈরী দু'টি পাতন যন্ত্র সম্পর্কে জানা যায় আল কিন্দির গ্রন্থ Book of Perfume Chemistry and Distillation থেকে। এগুলো

ছিল গোলাপ পানি তৈরী যন্ত্র। চরকোল বা কয়লা দিয়ে এর তাপ উৎপন্ন করা হতো। Retort বা এক ধরনের গলাওয়ালা জগের মতো দেখতে পাতনে ব্যবহৃত যন্ত্র আবিষ্কারে মুসলমান প্রযুক্তিবিদরা ভূমিকা রেখেছেন। ষষ্ঠদশ শতকে এ ধরনের কাচ নির্মিত পাতন যন্ত্রের ব্যবহার অব্যাহত ছিল।

পানি ঠাণ্ডা করার প্রযুক্তি মুসলমানরা আবিষ্কার করেন। গ্যাস ঘনীভূত করণ, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে স্পঞ্জ, কাপড় ইত্যাদি আর্দ্র করতে এ যন্ত্র ব্যবহৃত হত। পশ্চিমাদের দাবী তারা এ যন্ত্র উদ্ভাবন করে। অথচ ১৪৮৫ সালের আগে পর্যন্ত এ প্রযুক্তি পাশ্চাত্যে পৌছায়নি। ১৫৭০ সালে পাশ্চাত্যে রসায়ন বিষয়ে পড়াশুনা শুরু হয়। Cooling bath-এর সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের উপরের অংশকে এখনো Moor's head বলা হয়। এই 'মূর' শব্দ দ্বারাই অনেক আশংকা সত্যি হয়ে যায়। এ সম্পর্কে জোসেফ নিদহাম লিখেন ঃ No explanation of the origin of this term seems to have been attempted by historians of chemistry, but it is hard to believe it was purely pejorative and dose not betray to us some influence from the world of Islam.

সুগন্ধি ও তেল উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিও সম্পূর্ণ মুসলিম যুগের সৃষ্টি। প্রাচীন কোন সভ্যতায় এ ধরনের শিল্পের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। এ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল দামেস্ক, পারস্যের জুর, সাবুর, ইরাকের কুফা এবং স্পেন। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য সুদূর ভারতবর্ষ ও চীনে রপ্তানী হতো।

গোলাপ পানি, আবশ্যকীয় তেল, মৃগনাভি, মোম (ambergris) আবির নামক সুগন্ধি, Prunus Mahaleb থেকে তৈরী সুগন্ধি, Moringa oleifera থেকে বান সুগন্ধি পাওয়া যায় পাতন পদ্ধতির সাহায্যে। স্পেনের সুবিখ্যাত গায়ক জিরয়াব ছিলেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং কসমেটিক বিশেষজ্ঞ। তিনি মুখের লোম সরানোর পদ্ধতি, দাঁত ও চুলের বিভিন্ন প্রসাধনী ও ব্যবহার বিধির প্রচলন করেন।

খনিজ তেল উত্তোলন এবং পরিশোধন প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা সাফল্য লাভ করেন। কিভাবে অপরিশোধিত তেলকে শোধন করতেন তার প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন আল রাজী তাঁর Book of the Secret of Secrets গ্রন্থে।

মুসলমানদের প্রাথমিক যুগেই (৮৮৫ খৃ.) আজারবাইজানের বাকু তেলক্ষেত্রটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে তোলা হয়। ইরাকের তাইগ্রীস নদীর পাড় ধরে মসুল পর্যন্ত টানা রাস্তার দুই পার্শ্বে তেল শোধনাগার স্থাপিত হয়েছিল। পর্যটক

মার্কো পলো বাকু তেলক্ষেত্র পরিদর্শন (ত্রয়োদশ শতাব্দী) করে লিখেছিলেন, এই কূপ থেকে একবারে একশোটি জাহাজ ভরে ফেলার মত তেল উত্তোলন করা হয়। David of Antioch লিখেন, 'অপরিশোধিত তেলের রং ছিল কালো এবং এটি পাতন করার পর পাতনের প্রথম ভগ্নাংশ হত সাদা; এর পর আসত কাল রংয়ের তেল। কাল অংশটুকু পাতন করলে এটি প্রথমাংশের মতো হয়ে যেতো।' মিশরের সিনাই এবং পারস্যের খুজিস্তানে তৈল উৎপাদন করা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

তেল পরিশোধনের পর তা সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। পেট্রোলিয়াম স্পিরিটও তৈরী করা হতো, যা দিয়ে বার্নিশ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন আবুল খাইর আল হাসানী (ষোড়শ শতক)। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এর পতিনকৃত অংশসমূহ ছাড়া আসফাল্ট ছিল প্রচুর পরিমাণে। নির্মাণ শিল্পে, বিশেষ করে গোসলখানা তৈরীতে, জাহাজ নির্মাণে এর ভাল ব্যবহার ছিল।

কাগজ

কাগজ প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে কিন্তু এর মূল্যবান উন্নতি বিধানে ভূমিকা রাখেন মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা। ড. মনযুর-এ-খুদা লিখেন ঃ An Examination of the history of paper making established that it was discovered in china and was introduced to the rest of the world through Samarqand in the mid-eigth century AD. The oldest paper document of Arabian Night (Alf-Laylah) at the Oriental Institute, Chicago, has been dated to the ninth century and paper documents in Europe is datable to the twelfth century. The real art of paper making was developed by the artisans in Samarqand, the high quality being assignable to the use of flax for its manufacture.

৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা সমরকন্দ দখল করার পর চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি আয়ত্তে আনে। মুসলমানদের প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় বাগদাদে ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। এরপর এই শিল্প কৌশলটি সিসিলি, স্পেন, ইটালী ও ফ্রান্সে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। চীন দেশে কাগজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১০৫ খৃষ্টাব্দে, মক্কায় ১০৭-এ, মিরে ৮০০-এ, স্পেনে ৯৫০-এ, কনস্টান্টিনোপলে ১১০০-এ, সিসিলিতে ১১০২-এ, ইটালীতে ১১৫৪ খৃ., জার্মানীতে ১২২৮ খৃ. এবং ইংল্যান্ড ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে।

আরবরা কাগজ তৈরীর কৌশল জানার পর পুস্তক প্রস্তুতের কাজ সহজ হয়ে দাঁড়াল। ইয়াকুবী ৮৯১ খৃ. লিখেছেন যে, বাগদাদে তখন একশোটির অধিক পুস্তক বিক্রয়ের স্থান বিদ্যমান ছিল। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিই ছিল তখনকার পুস্তকের দৈহিক আকার। অসংখ্য লাইব্রেরী গড়ে উঠল দেশের আনাচে-কানাচে। মোঙ্গলদের বাগদাদ ধ্বংসের সময় এখানেই কেবল ৩৬ টি সাধারণ পাঠাগার ছিল। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলো ছিলো আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ। শাহাযাদা সাহিব বিন আব্বাসের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত পুস্তক ছিলো যে, তখনকার ইউরোপের সবক'টি লাইব্রেরীর মিলিত পুস্তকের তা ছিলো সমান। '...princes like Sahib Ibn Abbas in the tenth century might own as many books as could then be found in all the libraries of Europe combined...' (Masterpieces of Persian Art, Pope. P-151)

মুসলিম জগতের এই পুস্তক-প্রিয়তার কারণে কাগজ খুবই গুরুত্ব পেল তাদের কাছে এবং অচিরেই এই শিল্পের পত্তন হল। এই প্রথম কাগজ শিল্পে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হল মুসলমানদের হাতে। মিশরের কেন্দ্রীয় কারখানা সহ বহু কাগজের মিল তৈরী হল। রবার্ট ফরবস এর মতে, দশম শতাব্দীতে টাইগ্রীস নদীর বুকে ভাসমান কাগজের কল দেখা যেত।

কাগজ শিল্পের উন্নয়নে মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। এই প্রথম লোকের হাতে হাতে কাগজের বই ঘুরতে লাগলো। কাগজ এবং বই কেন্দ্রিক আরো শিল্প জন্ম নিল। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বাণিজ্যিক বইয়ের দোকান খোলা হল। কাগজ শিল্পে সমৃদ্ধির পেছনে মুসলিম প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা দেখে যথারীতি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের প্রখ্যাতি রচয়িতা জর্জ সার্টন। তিনি অবাক বিস্ময়ে আক্ষেপ করেছেন, কেন 'Paper' শব্দটি ইংরেজী হতে না হয়ে আরবী থেকে হলো না। যদিও কাগজ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বেশ কিছু শব্দ আরবী থেকে নেয়া। যেমন 'রীম' (Ream) শব্দটি আরবী 'রিস্মার' (Rismab) থেকে নেয়া হয়েছে। স্পেনীশে যা Risma এবং ইতালীয়ান ভাষায় Risma হয়েছে।

কাগজ শিল্পে মুসলমানদের প্রধান অবদানগুলোর মধ্যে বাঁশের ছাঁচ আবিষ্কার, কাগজ উৎপাদনে তিসি, লিনেন এবং সূতি কাগজের খণ্ডাংশের ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কাগজকলে পানিবাহিত চাকার সাহায্যে হাতুড়ি চালানো ইত্যাদি অন্যতম। ইবনে বারিস তাঁর 'উমদাত আল কুত্তাব' গ্রন্থে কাগজ উৎপাদনের প্রযুক্তির বিবরণ দিয়েছেন। কলেবর বৃদ্ধির কারণে এ উৎপাদন প্রক্রিয়া এখানে উল্লেখিত হলো না।

কাগজ তৈরীর প্রযুক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছিলো মুসলমানদের বাঁশের ছাঁচ আবিষ্কারের ফলে। কুটির শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্পে তা রূপান্তরিত হলো। হান্টার লিখেন, 'কাগজ তৈরীর জন্য নেয়া এটিই প্রথম সত্যিকার পদক্ষেপ, কারণ কারিগররা একই ছাঁচ থেকে একহারা লম্বা শিট তৈরী করতে সক্ষম হতেন।' এই ছাঁচ আবিষ্কারের আগে বাঁশের শুধুমাত্র একটি ফ্রেম ব্যবহৃত হত, যার নিচে এক টুক্‌রো কাপড় কোনায় কোনায় গিঁট দিয়ে আটকানো থাকত। কাগজ তৈরী হয়ে গেলে ভেজা কাগজটি কাপড়ের সাথে আটকে থাকতো বলে পুরোপুরি না শুকানো পর্যন্ত সরানো যেতো না। নতুন প্রযুক্তিতে এ ব্যাপারটি থেকে রেহাই পাওয়া গেল। দ্বাদশ শতকে অনুলিপিকৃত পবিত্র কুরআনের একটি কপিতে এ ধরনের প্রযুক্তিতে তৈরী কাগজ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে কাগজ হতো ভাঁজহীন ও মসৃণ।

চীনরা তুত্ গাছের বাকলকে কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করতো। যেহেতু মুসলমানদের আশেপাশে এই গাছ ছিলো না তাই তারা বিকল্প উপাদান হিসাবে তিসি, লিনেন এবং সূতি কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করেন। বিকল্প উপাদান হিসাবে এই নতুন উদ্ভাবন গুরুত্বের দাবীদার।

বিশেষ ধরনের কাগজ তৈরীর কাজে মুসলিম কারিগররা একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। লিনেন কাপড়ের খণ্ডাংশ গাদার করে রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে তবে গেঁজিয়ে তোলা হত। তারপর ভেষজ বা উদ্ভিদীয় ছাই-এর উত্তাপে একে ফুটানো হতো। ময়দার মাড় দিয়ে কাগজের উপরিভাগ মসৃণ করে এর গুণগত মান বৃদ্ধি করা ছিল উৎপাদনকারীদের অন্যতম প্রচেষ্টা। হাতুড়ি দিয়ে আনুভূমিকভাবে স্থাপিত ত্যানার লম্বা পাকানো দণ্ডকে ভালভাবে পিঠিয়ে মণ্ড তৈরীর পদ্ধতি মধ্যপ্রাচ্য ও চীনাদের জানা ছিলো না।

কাগজ কলে পানিবাহিত চাকার সাহায্যে হাতুড়ি চালানো প্রযুক্তির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলিম স্পেনের কারিগররাই সর্বপ্রথম কাগজ উৎপাদনের জন্য ঢেঁকি ব্যবহার করে। তারা পানি উত্তোলনের যন্ত্র নোরিয়ার সাথে আটকানো ঢেঁকি স্পেনে চালু করে। উলম্ব চাকার সাহায্যে এই ঢেঁকি চালানো হত। পরবর্তীতে এই পদ্ধতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মুসলমানদের উৎপাদিত কাগজের বড় বাজার ছিল তাদের নিজেদের কাছে। বিদেশেও কাগজ রপ্তানীর কথা জানা যায় এবং এই ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল। কাগজের বিভিন্ন আকার ও মান নিয়ন্ত্রণ করা হত। সর্বোৎকৃষ্ট কাগজের নাম ছিল

'আল বাগদাদী'। খলীফার আদেশ নির্দেশ এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশে বিদ্বানদের বইগুলো এ কাগজে লেখা হতো। এছাড়া ছিলো খুব হালকা 'শামী', 'হাম্বি' ইত্যাদি রকমের কাগজ। মুসলিম কারিগররা লাল, সবুজ, নীল, গোলাপী, হলুদ, পেয়াজী, মেরুন, পুরনো কাগজের মতো দেখতে ইত্যাদি ধরনের কাগজ তৈরী করতে পারদর্শী ছিল।

কাগজের সাথে আরেকটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। তাহলো ছাপাখানা আবিষ্কার। মুসলিম স্পেনে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর সুলতান নাসিরের প্রধানমন্ত্রী আবদুর রহমান ইবনে বদরশাহী হুকুমনামা লিখে ছাপাবার জন্য পাঠাতেন এবং মুদ্রিত কপি শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে বর্তমানে পরিচিত গুটেন বার্গের চারশত বছর পূর্বে এই ছাপাখানার কাজ সম্পন্ন হয়।

বস্ত্র শিল্প

মানুষের মৌলিক চাহিদা বস্ত্র। অন্যান্য শিল্পের চেয়ে মুসলমানরা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে এই শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। ব্যাপক ব্যবহার এবং চাহিদার ফলে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য বস্ত্রকল স্থাপিত হয়েছিলো। হাজার হাজার শ্রমিক এসব কারখানাতে কাজ করতো। বস্ত্রশিল্পে মুসলমানদের আধিপত্যের ফলে গোটা বিশ্বে তার যে প্রভাব পড়ে তা বুঝা যায় ইউরোপীয়ান ভাষায় মুসলমানদের নিজস্ব কিছু পরিভাষা ঢুকে যাওয়াতে। মসলিন, স্যাটিন, মোহেইর ইত্যাদি শব্দ ইংরেজীতে এসেছে আরবী ভাষা থেকে।

পশম, লিনেন, তিসি, তুলা, রেশম প্রভৃতি ছিল মুসলিম বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল। ভেড়ার লোম, মোহাইর নামক এঙ্গোরা ছাগলে পশম দিয়ে তৈরী হতো সুন্দর সুন্দর পশমী কাপড়, শাল, কোট। কোথাও উটের পশমও ব্যবহৃত হতো। লিনেন, তিসি (Flax) রপ্তানী করে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রপ্তানী আয়ের বেশির ভাগ সংগ্রহ করত মিশর। মুসলিম আমলে বস্ত্র বয়নের উপাদান হিসাবে তুলার ব্যবহার ও উৎপাদন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনের মুসলমানরা তুলা দিয়ে বস্ত্র তৈরী কারখানা স্থাপন করে। স্পেনের আসবেলিয়া শহরে ১৫১ হিজরীতেই ১৬ হাজার কারখানা বস্ত্র উৎপাদন করত। এসব কারখানায় কাজ করত এক লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিক।

স্পেনের মারিয়া ও খিরা শহরে ৬ হাজার কারখানা শুধু রেশমী, সার্টিন ও পশমী কাপড় তৈরী করত এবং ৮ শত কারখানা সূচীকর্ম ও চাদরের পাড়ে ফুলের কাজ করা হত। ছারকিস্তার মলমল ইত্যাদি উত্তম ধরনের সূক্ষ্ম কাপড় বহুল

পরিমাণে তৈরী হত। ইংরেজীতে Damessr নামে কাপড় তৈরীর যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়, তা দামিস্ক পদ্ধতির অনুকরণ।

রেশম প্রথম উৎপন্ন হয় চীনে। কিন্তু মুসলিম আমলেই রেশম শিল্প সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রেশম মুসলিম বিশ্বের প্রধানতম রপ্তানি পণ্য ছিল। বিভিন্ন লতাপাতা, ফুল, পশুপাখির চিত্র, আরবী কালেমা ইত্যাদির ব্যবহার হতো বস্ত্রের নকশায়। পশ্চিমা বিশ্বের এক ধর্মযাজকের কবর ঢেকে রাখতে এরকম এক রেশমী কাপড় এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আরবীতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা রয়েছে। দশম শতকে পারস্যে তৈরী এরকম এক রেশম আবরণের গায়ে কুফিক হস্তলিপি এবং বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকা ছিল, যা সেন্ট জোসের চার্চের জন্য আনা হয়েছিল। বর্তমানে প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামে তা রক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে।

সুতো কাটার চরকায় হাতের পাশাপাশি চাকা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বস্ত্র উৎপাদন ও যন্ত্র কৌশলের দিক দিয়ে এটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চরকার আবিষ্কার প্রাচীনকালে কিন্তু এর উন্নয়ন করেছে মুসলমান প্রকৌশলীরা। স্পেন ও সিসিলি মুসলিম শাসনাধীন থাকাকালে চরকা কোকুন থেকে এক সাথে সুতা ছাড়িয়ে একটি শক্ত টানা সুতা পাকানোর যন্ত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ইবনে হিশকাওয়া (মৃ. ১০৩০ খৃ.) রেশম সুতা কাটার একটি যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'তাজারিব আল উমাম' গ্রন্থে। তিনি কয়েকটি চরকা এক সাথে কাজ করানোর বা সুতা পেঁচানোর যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁত মুসলমানদের হাতে যে বহু উন্নত রূপ লাভ করে তা তাদের বস্ত্রের গুণগত মান দেখেই বুঝা যেতো। কাপড় ও চাদরে বিশেষ ধরনের নকশা করার জন্য মুসলিম কারুশিল্পীরা এক বিশেষ ধরনের তাঁত আবিষ্কার করেন। আরব দেশগুলোতে এর নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থাপিত একটি রেশম কারখানায় এরকম একটি তাঁতের চমৎকার বর্ণনা পরিবেশন করেছেন আল নুওয়াইরি। কাপড়ের প্রকারভেদে প্রায় ১০০ প্রকার তাঁতী ঐ সময় কারখানায় কাজ করত।

অতি উন্নত বস্ত্রের জন্য বিশ শতকেও মুসলিম কারিগরদের সুনাম অক্ষুণ্ন ছিলো। ঢাকায় তৈরী মসলিন ইউরোপকে অনেক বছর মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। মসলিনের বয়ন কৌশল ছিল বিস্ময়কর। এই সূক্ষ্ম কাপড়ের ২০ গজ পরিমাণ নস্যের ডিবায় ভরে নেয়া যেত। মসলিন সম্পর্কে Bradly Birth তার The Romance of an Eastern Capital গ্রন্থে লিখেন ঃ 'For transperancy, fineness

and delicacy of workmanship, these fabrics have never been equalled and not all the improvements in the art of manufacture in modern times have been able to approach them.

প্লিনী মিশর ও আরব দেশ থেকে আমদানিকৃত বস্ত্র দ্রব্যাদির বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিপ্লাস মরিস ইরিত্রিয়ো তার Circum navigation of the Erythrean Sea গ্রন্থে এর সূক্ষ্মতা ও অত্যুৎকৃষ্টতার প্রমাণ দেন। জেমস টেলর কোম্পানী আমলে ঢাকার বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

কার্পেট

কার্পেট বা গালিচা প্রধানত সৌখিন ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ব্যবহৃত মোটা বস্ত্র। এর কারুকাজই এর সেরা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। এই শিল্পটি মুসলমানদের হাতেই জৌলুস প্রাপ্ত হয় এবং বর্তমানেও তার বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়।

সেলযুক আমলে (১০৫৫-১১৯৩ খৃ.) গালিচা প্রস্তুতে বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ভেড়ার লোম দিয়ে এ সমস্ত নকশা করা গালিচার নকশা পরে বাড়ীঘর ও তৈজসপত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। সেলযুকরা বিশেষ পদ্ধতিতে গালিচা বানানোর পদ্ধতি অনুসরণ করেনই এ পদ্ধতিকে বলা হত তুর্কী গিট (Turkish knot) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খাড়া তাঁত ব্যবহার করা হয়। মুগল আমলেও জাঁকজমকপূর্ণ গালিচা তৈরী হতো। জীব-জন্তুর নকশা এবং নিসর্গ চিত্র এতে প্রাধান্য পেত। পারস্য গালিচা তৈরীতে অনেক উন্নতি লাভ করে। স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপ এই শিল্পের সাথে পরিচয় লাভ করে। ফরাসী নৃপতি চতুর্থ অঁরি-র সময় পারস্য গালিচার অনুকরণে ফ্রান্সে গালিচা তৈরী আরম্ভ হয় (১৫৮৯-১৬১০) পরে ফ্রান্সে উদ্ভব হয় আধুনিক বিখ্যাত Tapesty শিল্পের।

লেদার তৈরীর প্রযুক্তি

একাদশ শতাব্দীর মুসলিম কারিগরদের হাতে লেদার বা চামড়া তৈরীর প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হয় এ শিল্পটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বড় প্রভাব বিস্তার করে। লেদার প্রচুক্তিতে মুসলিম প্রবর্তিত রীতিই উনিশ শতক পর্যন্ত বিশ্বে চালু ছিল।

মুসলিম আমলে চামড়াকে ট্যানিং করতে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিই অনুসরণ করা হতো-

ক. তেল সহযোগে প্রক্রিয়াজাতকরণ (Chamoising)

খ. খনিজ লবণ সহযোগে প্রক্রিয়াজাতকরণ (Tawing),

গ. উদ্ভিজ্জ ট্যানিং।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মুসলমানরা বেশ গুরুত্বসহকারে ব্যবহার করতেন। এই ট্যানিং পদ্ধতিতে লবণ, ফিটকিরির সাথে মেশানো হতো বার্লি, ময়দা এবং ডিমের পীতাংশ। চামড়া ট্যানিংয়ের পর চামড়াতে তেল দেয়া হতো। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্যানিং বলে বিবেচিত হতো উদ্ভিজ্জ ট্যান-এর উপাদান সহযোগে ট্যানিং করা। ছাগলের চামড়া ট্যান করতে ইয়েমেন থেকে আমদানিকৃত ক্বারাজ (Mimosa nilotica) সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। আরো কয়েক প্রকারের উদ্ভিজ্জ উপাদান এর সাথে যোগ করা হতো।

কর্ডোভাতে উৎপাদিত লেদারের সুনাম গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা পতঙ্গের শূঁড়-নিঃসৃত দ্রব্য-এর ডাইং করে চমৎকার উজ্জ্বল লাল রং-এর লেদার তৈরী করত। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'কর্ডোভান' 'মরক্কোন' লেদার বাজারের সেরা ব্রাণ্ডগুলোর অন্যতম ছিল।

চামড়াজাত যে সব দ্রব্য তৈরী হত তখন, তন্মধ্যে জুতা, স্যাণ্ডেল, বুট, কন্টেনার, ওয়াটার স্কিন, ব্যাগ, বাদ্যযন্ত্রসহ আরো অনেক জিনিস। ইয়েমেন, হিজাজের আল তাইফ, কর্ডোভা, মরক্কো এবং কায়রোর কারখানাগুলো হতে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করা হতো।

বই-বাঁধাই শিল্প

বইয়ের বিশাল বাজার, বই সংগ্রহ এবং সযত্নে রক্ষার প্রচেষ্টার কারণে গড়ে ওঠে বই বাঁধাই শিল্পের মতো নতুন শিল্প। মুসলিম শিল্প ও সভ্যতাকে বিচার করতে হলে এ শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে। চামড়ার মলাটে বইয়ের বাঁধাই এবং তার উপরে নানা রংয়ের আরবী অক্ষরের উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় শিরোনাম শোভা পেত। সারা পৃথিবীর অসংখ্য গ্রন্থাগারে মুসলিম লেখক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ এভাবে বাঁধাই করা হয়েছিল। বই বাঁধাই-এর নিয়ম কানুন নিয়েও রচিত হয়েছে অনেক বই। আল সুফআনি রচিত 'সিনাআত্ তাফসীর আল কুতুব ওয়াহাল আল জাহাব' (বই বাঁধাই ও গিল্টি করার শিল্প) এবং ইবনে বারিসের 'উমদাত আল কুত্তাব' এ রকম কিছু গ্রন্থ।

ইবনে বারিস বই বাঁধাইয়ের ইন্সট্রুমেন্টের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর লেখায়। তা হলো ব্লেড, স্লাব, তরবারী, তুরপুন, প্রেষণ যন্ত্র, ছোট কাঠের মুগুর, সূঁচ, রুলার এবং কম্পাসের বর্ণনা। আল সুফআনির বর্ণনা বেশ তথ্যবহুল। কভার বোর্ড কিভাবে তৈরী করতে হয় তার জন্য পুরো একটি অধ্যায় খরচ করেছেন তিনি। বই সেলাইয়ের পর চামড়া দিয়ে মুড়ে দেওয়া, সোনার দ্রবণ তৈরী করা, তাছাড়া কভার

ধৌতকরণ, আঠায় ডুবিয়ে রাখা এবং কভারের উপর সোনার কালি দিয়ে বইয়ের নাম লেখার কায়দা কানুন সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

লেদার বাইণ্ডিংয়ের পর অলংকরণ সমৃদ্ধ করা ছিলো শৈল্পিক নৈপুণ্যের অন্যতম ক্ষেত্র। কুরআনের ভেতরের পৃষ্ঠা এমনকি অক্ষরগুলোও অলংকরণ সজ্জিত করা হতো নানা রং ব্যবহারের মাধ্যমে। অক্ষর-চিত্রণ শিল্প মামলুক আমলে খুব উৎকর্ষ লাভ করে।

বাঁধাইকৃত বইয়ের চর্ম মলাটে ধাতু নির্মিত অক্ষরে নাম-ধাম লেখার সূচনা করে মুসলমানরা প্রথম। গরম লোহা ও সোনার পাতের ব্যবহার মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন থেকে গোটা ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। পরে এই প্রযুক্তিটি পারস্য ভেনিশ হয়ে ইংল্যান্ডে পৌছায়।

যন্ত্র কৌশল

মরুভূমির দেশ আরব কূপ থেকেই বিশুদ্ধ পানির চাহিদা মেটাত। হাতে টানা পানি তোলায় প্রতুলতার কারণে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করে মুসলিম সমাজ। এ পর্যন্ত তিনটি পানি উত্তোলক যন্ত্রের কথা জানা গেছে। শাদুফ (Shaduf) সাকিয়া (Saqiya) এবং নুরিয়া (Noria)। প্রথমটি ইট, কাট সুরকিতে নির্মিত এবং ঘূর্ণায়মান বীম থেকে কাজ করে। সাকিয়া চলত পশু শক্তির সাহায্যে এবং নুরিয়ার জন্য প্রয়োজন হত পানি সঞ্চালক চাকার। এই তিন প্রকার যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় মিশর, সিরিয়া, পাকিস্তান ও ইরাকে।

১১৫৪ খৃষ্টাব্দে আল ইদ্রিসী তালাভেরার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় নুরিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাগুজ নদী থেকে পানি তুলে নলের সাহায্যে সরবরাহের কাজে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হত তার ব্যাস ছিল ১৩৫ ফুট। মুসলিম প্রকৌশলীরা পানি উত্তোলন যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন। এমন কিছু যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় বিজ্ঞানী আল-জাজারী ও তাক্বী আল-দ্বীনের লেখা থেকে। ত্রয়োদশ শতকে আল জাজারী যে পানি উত্তোলক যন্ত্রের বর্ণনা দেন তার একটি নিদর্শন ইস্তাম্বুলের তোপকাপি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তিনি পানি সরবরাহ করার জন্য যন্ত্রে কৃত্রিম নালার ব্যবহার করেন।

আল জাজারী পরবর্তীতে এই যন্ত্রের চারগুণ কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করেন, যাতে চারটি গিয়ার চাকা ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সাকিয়া যন্ত্রের আরেকটি উন্নত সংস্করণ

তৈরী করেন, যাতে পশু শক্তিকে পানি শক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এর মূল ক্রিয়াশীল অংশটি চোখের আড়ালে রাখা হয়।

আধুনিক যন্ত্রপাতির মূল অংশটি দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে রাখার দর্শন সম্ভবত এখান থেকে শুরু হয়েছে। তাই আল জাজারী শৈল্পিক মানসিকতার কারণে আধুনিক যন্ত্র প্রকৌশলীদের কাছে পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। তিনি আরো কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যার বিবরণ বাহুল্যের কারণে বর্জিত হল।

সিরামিক

মুসলমানরা সিরামিক শিল্পে চরম উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ শিল্পে মুসলমানদের প্রযুক্তিগত ভূমিকার অধ্যায়টি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও দূরপ্রাচ্য ছিলো সিরামিক শিল্পের সুতিকাগার। এই অঞ্চলে বিশেষ করে পারস্যে মুসলিম সিরামিক শিল্পের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ঘটে।

আব্বাসীয় আমলে মৃৎপাত্রশিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বাগদাদের কুম্ভকাররা মাটিকে শক্ত করে পোড়াবার ও বিভিন্নভাবে গ্লেজ করার কৌশল আয়ত্ত করে। তারা কাঁচামাল হিসাবে চীনামাটি পেত না, ফলে চীনামাটি নকল করার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কাচ উৎপাদক বস্তুর সাথে এরা টিন অক্সাইড (Sno_2) মিশিয়ে গ্লেজ করতে থাকে। এ গ্লেজ করাকে বলে এনামেল (Enamel)।

বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কারিগররা গ্লেজ করা মৃৎপাত্রের উপর ধাতুর দীপ্তি দিতে জানত। একে বলা হয় চমক পদ্ধতি (Lustre technique)। এরা রূপা ও তামার অক্সাইড রজনের (rosin) সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত করতো। এভাবে উত্তপ্ত করলে ধাতব যৌগিক ও রোজিন মিলে রজন যৌগিক সৃষ্টি হয়। এই যৌগিক তারপিন জাতীয় তেলে গুলে মৃৎপাত্রের গায়ে লাগালে একটি সোনালী প্রলেপ সৃষ্টি হয়। এই রকম সোনালী প্রলেপযুক্ত (lustre) মৃৎপাত্র মুসলিম সমাজে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসব পাত্রে নানা নকশা ও লিপি ব্যবহৃত হত।

সেলযুক আমলে মৃৎপাত্র তৈরীর উপাদানে নতুনত্ব আসে। এ সময় কোয়ার্টজ (Quartz) কাঠ পোড়ান ছাই ও এক ধরনের সাদা কাদামাটি মিশিয়ে চীনামাটির মতো এক ধরনের কাঁচামাল তৈরী করা হত। কাসান (Kashan), রাই (Rayy) ও সাভা (Sava)-তে নির্মিত মৃৎপাত্র মিনাই কাজের জন্য খুব প্রসিদ্ধি পায়। চেরাপাতা যুক্ত আঙ্গুর লতার নকশা ও রং-বেরংয়ের সুন্দর আরবী হরফের নকশা এর গাত্রে শোভা পেত। এবনে গোলাম সামাদ লিখেন ঃ "যখন খুব অধিক রঙ ব্যবহার প্রয়োজন হত। অর্থাৎ এ ধরনে মৃৎপাত্র নির্মাণ কেবল শিল্পজ্ঞান থাকলেই

চলত না; থাকতে হত সুনিপুণ কারিগরি দক্ষতা। এভাবে করা বাটি, ফুলদানি, বয়ম প্রভৃতি খুবই সুন্দর হত।"

মৃৎপাত্র পোড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের চুল্লী স্থাপিত হয়েছিল। আল বেরুনীর লেখা থেকে জানা যায়, কিছু চুল্লী কাচ তৈরীর প্রাথমিক উপাদানকে গলিয়ে ফেলার জন্য এবং একই সাথে কাচ ও মাটির পাত্রকে চকচকে করার জন্য ব্যবহৃত হত। ষষ্ঠদশ শতকের একটি আরবী গ্রন্থে নকল রত্ন তৈরীর কারখানায় ব্যবহৃত চুল্লির চিত্র দেয়া হয়েছে। এই চুল্লীটি উল্লম্ব টাইপের, একটি গম্বুজ আছে, নিচে আছে আগুনের চেম্বারটি।

সিরামিককে চকচকে করার জন্য বিভিন্ন ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হতো। কোয়ার্টজ, সোডা, পটাশ, লবণ, বালি, সীসা, সিলিকা, ধাতব অক্সাইড, তামা, কপার, ফেরিক অক্সাইড, আইরন প্রভৃতি উপাদান চমৎকার প্রলেপ কাজে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে মৃৎপাত্র চকমকে করা হতো।

মুসলিম সিরামিক শিল্প বিকাশের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম যুগ একাদশ শতাব্দী, দ্বিতীয় যুগ পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে পরবর্তী যুগ চিহ্নিত করা হয়।

আব্বাসী খিলাফতের প্রথম দিককার একটি গুদাম আবিষ্কৃত হয়েছে সামারাতে। আশেপাশের অনেক এলাকায় এরকম আরো গুদাম নির্মিত হতো রপ্তানিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণের জন্য। এই পণ্যসমূহকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ ও বেশি প্রচলিত চকচকে প্রলেপবিহীন মৃৎপাত্র,

২. মনোক্রোম বা এক রংয়ের আল কালাইন প্রলেপ বিশিষ্ট পণ্য,

৩. রিলিফ-এর অলংকরণ বিশিষ্ট সীসা প্রলেপযুক্ত পণ্য,

৪. সরু-লম্বা অনিয়মিত রেখা বা আঁকাবাঁকা ডোরা, দাগ ছিটানো রংয়ের অলংকরণ অথবা সুষম কোন নকশা ব্যতীত বিভিন্ন রংয়ের ছাপ বা দাগ দিয়ে চিত্রিত সীসা প্রলেপযুক্ত পণ্য,

৫. চকচকে উজ্জ্বল রং দিয়ে চিত্রিত করা সহ টিনের প্রলেপ দেয়া পণ্য,

৬. এবং ভেতরে চকচকে প্রলেপ দিয়ে চিত্রিত করা পণ্য।

এ যুগে মুসলিম কারিগরদের অন্যতম প্রধান অবদান হলো, টিনের প্রলেপ দেয়ার পদ্ধতি পুনরাবিষ্কার করা। নবম শতকে এটি মুসলমান শিল্পীরা পুন: আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতি প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত হতো, কালক্রমে তা হারিয়ে গিয়েছিল। চীনে ক্রীম রঙের যে পোর্সেলিন পাওয়া যেত তার সার্থক

রূপান্তর মুসলমানদের হাতে ঘটে। চীন এই প্রযুক্তিটি লেড-সিলিকেটের চকচকে প্রলেপ থেকে টিন অক্সাইডের চকচকে প্রলেপ তৈরীর মাধ্যমে নতুন রূপান্তর করেন মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা। টিন অক্সাইড দ্বারা আগুনে পুড়িয়ে সরাসরি মাটির পাত্রের গায়ে সহজে প্রলেপ দেয়া যায়, এরপর আগুনে পোড়াতে গেলে রংয়ের কোন গুণাগুণ নষ্ট হয় না, এমনকি রং বিন্দুমাত্র সরে যায় না। এর ফলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিরামিক দ্রব্য নির্মাণে সক্ষম হয় তারা। এই কৌশল থেকেই ইউরোপের বহুল প্রচলিত 'মেজোলিকা' এবং 'ডেল্‌ফট' নামে বিখ্যাত অলংকরণ শিল্পের উদ্ভব হয়।

মুসলিম সিরামিক শিল্পের দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল সাদা রংয়ের মৃৎপাত্র তৈরী করা। হীরক গুড়া, সাদা সাদা এবং পটাশ সহযোগে প্রস্তুত একটি নতুন ধরনের যৌগিক বস্তু ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তুলেছিল। গলনের সাহায্যে ধাতুর সঙ্গে মেশানোর জন্য বোরেক্স-এর ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় আল কালাইন প্রলেপের ব্যবহারে নতুনত্ব আসে। বোরেক্সকে আরবীতে টিংকার বলে, যা গলনের সাহায্যকারী বস্তু হিসাবে মুসলমানরাই প্রথম ব্যবহার করেন।

মুসলিম সিরামিক শিল্পের সোনালী অধ্যায়ে হাজার হাজার শিল্পী-কারিগর একে পেশা হিসাবে নিয়েছিলো। সিরামিক শিল্পের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন শিল্পী আল কাশিম আল কাশানী (১৩০১ খৃ.)। এ গ্রন্থ পাওয়া গেলে এ বিষয়ে বহু অজানা তথ্য বিশ্বের কাছে প্রকাশিত হতো নিঃসন্দেহে।

কাচ শিল্প

মুসলমানদের হাতে যে সকল প্রাচীন শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে তন্মধ্যে কাঁচ শিল্প অন্যমত। কাঁচ শিল্পে মুসলমানরা যে উন্নয়ন ও প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রমাণ বিশ্বখ্যাত যাদুঘরসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাদের নির্মিত কাঁচের নিদর্শনসমূহে। অত্যাশ্চর্য এ সকল নিদর্শন আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে দর্শকদের চোখে।

সামারা, মসুল, নাজাফ এবং বাগদাদে চমৎকার কাঁচ তৈরী হতো। সামারা ও দামেস্কের কাচের খুব সুনাম ছিল। সিরিয়ার আলেপ্পো, রাক্কা, আরমানাজ, টাইর, সিডন, আকরি, হেবরন, রাসাফা, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পারস্য, স্পেন ও মাগরিবে অবস্থিত ছিল কাচ তৈরীর অভিজাত সব চন্দ্র ত্রয়োদশ শতকের ভেনিশিয়ান কাচ উৎপন্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক শতক ধরে সিরিয়াই ছিল প্রধান কাচ রপ্তানীকারক দেশ।

ইউরোপ উন্নত কাচ তৈরীর প্রযুক্তি লাভ করে মুসলিম বিশ্ব থেকে। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সপ্তম বোহেমিয়ানের সাথে এন্টিয়কের রাজপুত্র এবং ভেনিশের শাসনকর্তার মাঝে প্রযুক্তি বিনিময়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কাচ নির্মাণের গোপন কলা-কৌশল ভেনিসে নিয়ে আসতে হবে এবং এর জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরাসরি সিরিয়া থেকে আনাতে হবে বলে তারা রাজী হন। প্রয়োজনে সিরিয়ান আরব কারিগরদের আমদানি করতে হবে বলে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়। উক্ত তিন শাসকের এই গোপন চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল বাকী ইউরোপের অজ্ঞাতসারে কাচ নির্মাণ করে তারা একচেটিয়া মুনাফার অধিকারী হবে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে কাচ তৈরীর আগ পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা ছিল এই।

মুসলিমরা কাচ তৈরীর প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতেন উদ্ভিজ্জাত ছাই (আলকালি) এবং সিলিকা। এই কাচকে বলা হয় সোডা সিলিকা প্রকারের কাচ, যার রাসায়নিক বিশ্লেষণে ৬৫ সিলিকন অক্সাইড, ১৫% সোডিয়াম অক্সাইড, এবং ৯% ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও অন্যান্য অক্সাইড পাওয়া যেত। সিরিয়াতে প্রচুর আলকালি তথা উদ্ভিজ্জাত ছাই উৎপাদিত হত। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে প্রযুক্তি বিষয়ক ইতালীয়ান লেখক ভ্যান্নেসিও বিরিনগুস্মিও তাঁর গ্রন্থ-'Pirotechnia' তে কাচ শিল্প সম্পর্কে লিখেছেন, 'সিরিয়ায় জন্মানো গুল্মের ছাই নিচ্ছে লোকজন'।

উক্ত দু'টি মূল উপাদানের সাথে ম্যাঙ্গনিজ ডাই-অক্সাইড মেশাতে হতো স্বচ্ছ কাচ তৈরীর জন্য। এটা সম্ভব হতো, কারণ বেশিরভাগ বালিতেই পর্যাপ্ত আয়রন অক্সাইড থাকে, যা কাচে সবুজ বা বাদামী রংয়ের আভা দিতে পারে। ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড এই আয়রনকে জারিত করায় বিক্রিয়ার ফলে যে হলদে রং উৎপন্ন হয় তা এর নিজস্ব রক্তাভ রং দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় রং বিহীন স্বচ্ছ কাচ তৈরী সম্ভব হয়। বিজ্ঞানী জাবির বিন হাইয়ান এই থিওরীর আবিষ্কর্তা ছিলেন।

বাণিজ্যিক কাচ উৎপাদনের জন্য বড় চুল্লী ব্যবহৃত হতো। এরকম এক একটি চুল্লীতে ছয়টি চেম্বার থাকত, এর তিনটি চেম্বার পাশাপাশি এবং অন্য তিনটি একটির ওপর অপরটি স্থাপিত হয়েছিল। সবচেয়ে নিচেরটিতে আগুন দেয়ার জন্য, মাঝেরটিতে কাচ গলানোর একটি পাত্র (crucible) এবং সর্বোচ্চ চেম্বারটিতে থাকত প্রস্তুতকৃত কাচের সামগ্রী। ষোড়শ শতকে নকল রুবী, ইন্দ্রনীল পাথর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত একটি চুল্লীর চিত্র পাওয়া গেছে সমসাময়িক একটি গ্রন্থে।

কাচে সাধারণত: তিন ধরনের অলংকরণ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন

প্যাটার্নের মোজাইক ও রং দিয়ে কাচ তৈরী হত প্রাচীনকালে। হারিয়ে যাওয়া এই অলংকরণ কৌশল মুসলিম প্রকৌশলীদের হাতে পুনরাবিষ্কৃত হয়। ধনীরাই এ ধরনের পদ্ধতিতে অলংকৃত কাচদ্রব্য ব্যবহার করতেন। ছাঁচে ফেলে তৈরী করা একটি কাচের বোতল লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত আছে। দশম-একাদশ শতকের মাঝামাঝিতে দু'খণ্ড বিশিষ্ট ছাঁচে ফেলে এ ধরনের কাচ বোতল তৈরী করা হত। ঐ পদ্ধতিকে বলা হয় Optic Blowing পদ্ধতি। কাচ তন্তুকে ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন রকম অলংকরণ করার কাজটি ছিল তুলনামূলকভাবে কঠিন। ওহিওর টলোডো যাদুঘরে এ ধরনের অলংকরণে ভূষিত একটি পাত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

অলংকরণের অন্যতম উপাদান হিসাবে নির্দিষ্ট ডিজাইনে কাটা টুকরো কাচের খণ্ড ও ক্রিস্টালের টুকরো ব্যবহৃত হত। তৃতীয় হিজরী অর্থাৎ নবম শতাব্দীতে রং-বেরংয়ের ক্রিস্টাল টাইপের কাচ কয়েকটি মুসলিম দেশে অলংকরণের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

সাবান

সর্বপ্রথম শক্ত সাবান তৈরী করেন মুসলমানরা। অনেক মুসলিম দেশে বিশেষ করে সিরিয়াতে সাবান উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে। এখানে রঙীন, সুরভীযুক্ত গোসলের সাবান, ডাক্তারী সাবান তৈরী হতো এবং তা বিদেশে রপ্তানী করা হতো। নাবলুস, দামেস্ক, আলেপ্পো, সারমিন প্রভৃতি শহর সাবান শিল্পে বিখ্যাত ছিল।

জলপাই তেল, আলকালি এবং কখনো কখনো ন্যাট্রন ছিল সাবান তৈরীর মূল উপাদান। সমসাময়িক বিজ্ঞান লেখক দাউদ আল আন্তাকি সাবান তৈরীর পদ্ধতির কথা নিজ গ্রন্থে লিখেছেন। আল রাজী সাবান তৈরীর রেসিপি দিয়েছেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখার বিশিষ্টতা এই যে, তিনি বর্তমানের সাবান উৎপাদকদের মতো সাবানের উপজাত হিসাবে জলপাই তেল থেকে কিভাবে গ্লিসারিন পাওয়া যায় তার উপায় বাতলিয়েছেন। দাউদ-এর লেখা থেকে সাবান তৈরীর একটি নিয়ম তুলে ধরছি ঃ

"আলকালির (উদ্ভিজ্জাত পদার্থ) এক অনুপাত এবং তার অর্ধেক চুন নাও। এগুলো ভালো করে গুড়ো করে একটি পাত্রে রাখ। মিশ্রণ পরিমাণের পাঁচ গুণ পানি

মিশিয়ে দুই ঘন্টা ধরে নাড়। পাত্রের ভেতর থাকা ছিদ্রটি নাড়া থামাবার পর খুলে যাবে এবং তরল তৈরী হবে। ছিদ্র দিয়ে পানি বেরিয়ে গেলে সেটি আবার বন্ধ করে দিয়ে আবার পানি মিশিয়ে নাড়। এভাবে কয়েকবার কর, যাতে পানির সকল দ্রবণ মিশে যায়। প্রতিবারই বর্জিত পানি পৃথক পৃথক পাত্রে জমা কর। এরপর প্রথমবার সংগৃহীত পানির চাইতে দশগুণ বেশি পরিমাণে বিশুদ্ধ তেল নিয়ে আগুনে জ্বাল দিতে থাক। এটি যখন ফুটতে থাকবে, তখন শেষবারে সংগৃহীত পানি দেবে। এবার এটি ময়দার তালের মতো হয়ে যাবে। বস্তুগুলো মাদুরের উপর শুকাতে দাও। আংশিক শুকিয়ে গেলে কেটে পানিতে ভেজানো চুনের ভেতর এগুলো রাখ। আলকালি এবং চুনের পানির ভেতর চুনের অর্ধেক পরিমাণ সামান্য লবন দাও। চুলা থেকে নামানোর ঠিক আগে সামান্য স্টার্চ দিতে হবে। এর তেল ও চর্বি অন্য তেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।"

ধাতুর কাজ

মুসলমানরা ধাতুর ব্যবহার করত এবং এ দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরী করত সে সময়। 'Some detailed research invastigations have dimed that is addition to existence of meteoritic iron, in the pre-Islamic early days possibly as early as 2000 B.C, iron smelting from ore was known in Turkey. Records of use of copper bronze, iron, silver, tin, zink, mercury etc. In the alchemical experiments are well documented and were made in the Islamic period also. The commercial use of iron smelting was reported, only in the thirteenth century in Europe.'

ধাতু ব্যবহারের উৎকর্ষ সেলজুক আমলের কিছু নিদর্শন থেকে জানা যেতে পারে। এ সময় এক ধাতুর পাত্রের গায়ে খোদাই করে অন্য ধাতু বসিয়ে নকশার কাজে যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাধারণত: কাসা ও পিতল দিয়ে এক ধরনের পাত্র তৈরী হত। এসব ধাতু পাত্রের গায়ে নকশা করে তার মধ্যে তামা ও রূপার তার পিটিয়ে বসানো হতো। অনেক সময় দামী পাথরও একাজে ব্যবহৃত হতো। জীব-জন্তুর বিভিন্ন আকারের ফাঁপা রূপ তৈরী হতো ধাতু দিয়ে।

দামেশকে তামার পাত্রে খোদাই করে রূপা বসিয়ে বিভিন্ন প্রকার নকশা করা হতো, ভারতেও এ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। মুসলিম মুদ্রায় ধাতুর কাজ করা হতো সরকারী টাকশালে। খোদিত কলেমার হরফ, কোন কোন মুদ্রায় নৃপতিদের

ছবিও এর পৃষ্ঠে খোদিত থাকতো। স্পেনের মারিয়া শহরে ধাতুর তৈরী অতি মনোরম ও মজবুত যন্ত্রপাতি তৈরী হতো।

কালি ও রঞ্জক পদার্থ

ভোগ্য ও ব্যবহার্য সকল বস্তুকে চটকদার এবং হৃদয়গ্রাহী করতে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের বিকল্প নেই। সুন্দর ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের চিরকালীন একটা ঝোঁক প্রকৃতিগতভাবেই রয়েছে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যে কোন ব্যবহার্য বস্তুর সৌন্দর্য বর্ধনে এগিয়ে এসেছে আর এজন্যও মানুষের সহায় কালি এবং রং-বেরংয়ের রাসায়নিক পদার্থ।

কালির মধ্যে মুসলমান শিল্পীরা প্রধানত দুই প্রকারের কালি বেশি ব্যবহার করতেন। একটিকে কার্বন দিয়ে কাল রং আনয়ন করা হতো, আরেকটির জন্য ব্যবহার করা হতো আয়রন বা লোহার গুড়া। কার্বন দিয়ে প্রস্তুত কালির রং তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হতো। নানা ধরনের তেল, চর্বি–যেমন-তিলের তেল এবং পেট্রোলিয়াম ব্যবহারে তৈরী হওয়া ধোঁয়ার কালির গুড়ো অথবা বিভিন্ন ধরনের গাছের ভূগর্ভস্থ চারকোল বা কাঠকয়লা থেকে এই কার্বন সংগ্রহ করা যায়। স্থায়ী কালির জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আঁঠা (বাবলা জাতীয় কয়েক প্রকারের গাছ থেকে বেশিরভাগ আঠা তৈরী হত) এবং কখনো কখনো এর বিকল্প হিসাবে ডিমের সাদা অংশ থেকে তৈরী আঠাও ব্যবহৃত হত। ফেরাস সালফেট এবং ওক গাছের ফলের গুড়া একত্রিত করে এক ধরনের কালি প্রস্তুত করা হত, এ পদ্ধতিটি এখনো টিকে রয়েছে।

কোন বস্তু, কাঠ, কাগজ, চামড়া রঙিন বর্ণে চিত্রিত করতে ব্যবহার করা হয় রঞ্জক পদার্থ। কালো রঞ্জক পদার্থের জন্য সাধারণত কার্বন, সাদা রঞ্জকের জন্য সাদা সীসা এবং কখনো সীসার সাথে হাড়ের গুড়াও মেশাতে হত।

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা লাল রংয়ের বেশ কয়েকটি শেড তৈরী করতে পারতেন। এর প্রধানতম উপাদানটি ছিল ক্রীস্টাল আকৃতির মার্কিউরিক সালফাইড (Cinnabar) এবং লাল সীসা। কখনো কখনো প্রয়োজনে লালচে কাদার মতো নরম আয়রন মেশানো হত এ দু'টোর সাথে। লাক্ষা গাছে বাসা বাঁধা ... পোকা গাছের গায়ে যে গাঢ় লাল বর্ণের বহিরাবরণ তৈরী করে তা থেকেও মুসলমানরা লাল রং তৈরী করতেন। হলুদ রং তৈরীর জন্য মূলত: আর্সেনিক ট্রাইসালফাইড (Orpiment) ব্যবহৃত হত। হলুদ খনিজ আয়রন কাজে লাগাতেন তারা। জানা

যায়, সীসার মনোক্সাইড এবং জাফরান অন্যান্য রঞ্জক পদার্থের সাথে মিশিয়ে হলুদ রং আনার কাজ করা হত।

নীলকান্তমনির খনি থেকে সুন্দর নীল বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে তা থেকে নীল রং তৈরী হত। যদিও তারা আজুরাইট বা কপার কার্বনেটের একটি প্রকার নীল হিসাবে ব্যবহার করার নিয়ম জানতেন। সবুজ রং তৈরী করতেন কপার কার্বনেটের কলঙ্ক এবং মালাকাইটের আকরিক থেকে। পানির মাধ্যমে কাজ করতে হলে এসব রঞ্জকের সাথে মেশাতে হতো বিশেষ ধরনের binding medium। বই বা কাঠের গায়ে মিনিয়েচার চিত্র আঁকতে স্থায়িত্ব ও অন্যান্য কারণে তেল রংয়ের প্রয়োজন হত বলে মুসলমানরা তেলকেও মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাতেন।

শিল্পীর চিত্রকে বাহ্যিক পরিবেশের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য এক প্রকার বার্নিশ তৈরী করতেন আরবরা। পাতিত নাফতার সাথে আঠাযুক্ত রেজিনের ঘন মিশ্রণ ও তিলের তেল মিশিয়ে এক ধরনের বার্নিশ তারা প্রস্তুত করতেন। এছাড়া বস্ত্র শিল্পের জন্য ডাইং করতে লাগতো প্রচুর রঞ্জক। এসব রংয়ের প্রস্তুত উপাদান ব্যবসায়িক কারণেই আরব বস্ত্র মিল মালিকরা প্রকাশ করতে চাইতেন না। তবে যতটুকু জানা যায়, লাক্ষা পোকাসহ বিভিন্ন ধরনের ও রঙের কীট-পতঙ্গ, বিভিন্ন গাছ-গাছড়াই ছিলো কাপড়ে রং করার রঞ্জক পদার্থের অন্যতম উপাদান।

রং পাকা করার জন্য কাপড়-তন্তু, এলুমিনিয়াম সালফেট বা এলাম ব্যবহৃত হত। ইয়েমেনের এলাম বলে পরিচিত এই এলামের প্রচুর চাহিদা ছিল ডাইং শিল্পে।

যান্ত্রিক প্রযুক্তিতে মুসলমানদের কৃতিত্বের অন্যতম স্বাক্ষর বহন করে আব্বাসীয় আমলের শুরুতে তাদের জলঘড়ি আবিষ্কার। খলীফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট Charlemagne-কে যান্ত্রিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ একটি চমৎকার ঘড়ি উপহার দেন ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। ঘড়িটি ছিল Clepsydra বা জলঘড়ি। এর ডায়ালে ছিল বারেটি ছোট দরজা, দিনের বারো ঘণ্টার প্রতীক হিসাবে। প্রত্যেক ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট ঘণ্টার দরজাটি খুলে যেতো এবং ঘণ্টার সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক ছোট ছোট বল একটি কাঁসার পাত্রের উপর পড়ে নির্দিষ্ট শব্দ করতো। যতটা বাজে ঠিক ততটা শব্দ। বারোটা বাজলে বারোজন ছোট ছোট ধাতব ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা একসঙ্গে বেরিয়ে ডায়ালের

চারদিকে প্যারেড করতো এবং একে একে দরজাগুলো করে দিত বন্ধ। জলঘড়ির এই উন্নত প্রযুক্তি দেখে সেদিন ইউরোপ সত্যিকারভাবে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা ওজনকে ব্যবহার করে নির্মিত ঘড়িতে পারদের ব্যবহার করে। এই সময়ে আল মুরাদি জটিল গিয়ার খণ্ডায়িত এবং বিকেন্দ্রিক গিয়ারের সাথে সংযুক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আল জাজারি এবং রিদওয়ান বিরাট আকারের জলঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ওজনকে ব্যবহার করে ঘড়ির গতি-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় সম্ভবত ইউরোপে চতুর্দশ শতকে। একই সময়ে টাওয়ার ঘড়ি নির্মিত হয়, যার সাথে আরবদের জলঘড়ির বেশ মিল আছে। 'গাবেরুল উন্দুলুস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, স্পেনীয় শাসক আব্বাস বিন ফারনাছ আজকালকার দেওয়াল ঘড়ির মত ঝুলন্ত একটি ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন।

কামান ও বারুদ আবিষ্কার করে স্পেনীয় মুসলমানরা। তাদের তৈরী কামান এখনও স্পেনের যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে। মুসলমানরা কামানের সাহায্যেই ক্রুসেড যুদ্ধে কনস্টান্টিনোপল সম্পূর্ণ করায়ত্ত্ব (১৪৫৩ খৃ.) করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলিম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব

মুসলিম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পুরো আনুপুঙ্খ পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও গোলযোগে তার একটা বড় অংশের খবর আর হয়তো কোন দিনই জানা যাবে না বই-পুস্তক ধ্বংসের ফলে। যে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি বেঁচে আছে তার খবর নেয়া তো দূরে থাক, ঠিকমত তালিকাও করা হয়নি। ৭৫০ খৃ. থেকে ১০৫০ পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের যে স্বর্ণকমলসমূহ প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও আমাদের জানা সীমিত। আমরা যা জানি তা মূল অংশের কিছুটা মাত্র। ইহুদী চিন্তাবিদ Will Durant লিখেন ঃ What we know of Muslem thought in those centuries is a fragment of what survives, what survives, what survives is a fragment of what was produced; what appears in these pages is a morsel of a fraction of a fragment. When scholarships has surveyed more thoroughly this half-frogotten legacy, we shall probably rank the tenth century in Estern as one of the golden ages in the history of the mind. (The Story of Civilization (1950).

মুসলিম বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ইউরোপের জন্য ছিল আলোকবর্তিকাস্বরূপ। প্রথমে ল্যাটিনে ব্যাপকভাবে তাদের বই-পুস্তক অনূদিত হতে থাকে। ইউরোপের মুসলিম ভূখণ্ড, স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোপীয় রেঁনেসার অগ্রদূতরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে এখানে মুসলিম শক্তির পতন ঘটে। নতুন বিজয়ী খৃষ্টানরা হাতে পায় মুসলমানদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এভাবে তাদের হাত হতে খৃষ্টান পাশ্চাত্যের হাতে মুসলিম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হাত-বদল হয়। Ziauddin Sardar লিখেন ঃ "Science developed a uniqe mould under Islam and flourished. Scholars in the Latin cultures of Northern Europe literally sat at the feet of Muslim scientists. In Spain and various Mediterranean centres, learning the rudiments of science and other aspects of the Islamic achievement. Only in the sixteenth century did European science and technology equal the best of Islam."

মুসলমানদের রাজনৈতিক কলহ, আরাম-আয়েশ তাদের পতনের অন্যতম কারণ। ড. মনযুর-এ-খুদার কথায় ঃ "The scientific developments in Europe took over with the decline of Muslim dominance in the fields of science in the 14th century A.D., the cause of decline is more due to a political failure, which resulted in the non-utilisatioin of the advantages gained through the technological developements. The Muslim domain entered an age of relaxed luxury and qffluence which destroyed the morale as exemplified in the India su-bcontinent of the time when the Moghuls were ruling supreme. The Muslim Spain as it had developed earlier, changed to the christian domination as in the rest of Europe but the scientific literature of Muslims were not ignored. Extensive translation of these books were made, and some of them remained text books for a long time in the European institutes of higher education particularly in fields of medicine, pharmacy, anatomy, opthalmology, surgary, astronomy and mathematics."

উক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম মনীষার দান। ইউরোপীয় শিল্প-প্রযুক্তিতে চিরকালীন বেশ কিছু শব্দ আরবী থেকে

প্রবিষ্ট হয়েছে এই কারণে। যেমন ঃ মসলিন, সার্সানেট, দামাস্ক, তাফ্‌ফতা, তেথি, আর্সেনাল, এডমিরাল, এ্যালেম্বিক, এলকোহল, আলকালি, রীম, আল ফালফা, সুগার, সিরাপ, শেরবেট, কর্ডোভান উল্লেখযোগ্য।

প্রযুক্তির বেনামীকরণ

মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বহু আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইউরোপীয়রা সচেতনভাবে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। অনেকটা গোয়েবলসীয় কায়দায় দশবার মিথ্যা বলে তাকে সত্য বানাবার প্রচেষ্টায় তারা খানিকটা সফলতা অর্জন করেছে বলতে হবে। পুরো মুসলিম জাতির কাছে তাঁদের অতীত গৌরব ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করতে তারা সক্ষম হয়েছে। মুসলিম দেশের মুসলিম ছাত্ররাও আজ জানতে পারে না বিজ্ঞান বিষয়ে তারা যে থিওরী পশ্চিমা আবিষ্কার বলে মুখস্থ করছে তার কোন কোনটি তাদের পূর্বপুরুষ কোন মুসলিম বিজ্ঞানীরই আবিষ্কার। এমনকি কালজয়ী বহু বিজ্ঞানীর নামও তারা কিম্ভূতকিমাকার করে ছেড়েছে, যাতে তাঁর জাতি-পরিচয় চেনা না যায়।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম ও আবিষ্কার বেনামীকরণের তথ্য আমরা স্থানে স্থানে কিছু উল্লেখ করেছি। এরকম কিছু বিকৃত ও প্রকৃত নাম হলো ঃ আল বাত্তানী (রেথেন), ইউসুফ আল ঘুরী (জোসেফ টি প্রিজড), রাজী (রাজম), আল খাসিব (বুবাথের), কায়বিসি (ক্যাবিটিয়াস), খারেজমী (আল গরিদম), ইবনে সিনা (এভিসিনা), ইবনুল হাইছাম (হাজেন), যারকালী (মারজাকেল), ইবনে বাজ্জা (এভেনপেজ), বিতরুজী (পিট্টাজিয়ান), ইবনে রুশদ (এভেরুন) প্রমুখ।

এই ন্যাক্কারজনক কাজ যে ভাষার পরিবর্তন ও অগোচরে ঘটে গেছে তা মনে করার অবকাশ নেই। অতি সচেতনভাবে, ইতিহাস বিকৃত ও আত্মস্থ করার এই প্রকল্প কয়েকশত বছর আগে পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর কু-মতলবীরা গ্রহণ করে। নইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে লাফ দিয়ে এসেছে এমন উদ্ভট কল্পনামূলক বক্তব্য তারা পাড়তো না। Islamic Technology গ্রন্থে বলা হচ্ছে এ কথাই– "The traditional view of western historians is that European culture is the direct descendant of the classical civilization of Greece and Rome." এখানে বলে রাখা ভাল যে, পাশ্চাত্যেরই সত্য-সন্ধানী অনেক ঐতিহাসিক, বিজ্ঞান বিষয়ক ইতিহাসের গবেষক প্রমাণ করেছেন যে আরবরাই পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল জনক। এ রকম কয়েকজন লেখক হলেন ঃ

G. Sarton, Sir T. Arnold, R.A Nicholson, Hitti Draper, Gibb, Joseph Hell, Levy, Macdonald, Pickthal, Richmond, Breiffault, E. Deutsch, Sedillot, Max-Neuburger, Renan, Lane poole, Roger Bacon, Humbold প্রমুখ।

তারা বললেন, গ্রীক সভ্যতা থেকেই নাকি আধুনিক সভ্যতা তারা পেয়েছে। অথচ Prof. H. A. Salmon তাঁর Rise and fall of the Arab Dominion গ্রন্থে লিখেন ঃ "The Arab, were the first to introduce Greek writers to the notice of the world. They kindled the lamp of learning which illuminated the dark pages of history and it may be safely assumed that it were it not for the Arabs, it would have been long before Europe, the present centre of civilizatioin and progress would have been irradiated by the bright light of knowldege."

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ-গবেষকরাই আবিষ্কার করেছেন, তাদের পূর্বতন অসাধু এক শ্রেণীর লোক আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুচতুরভাবে আত্মস্থ করতে নিয়োজিত ছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের শিক্ষক ফুয়াট সেজগিন প্রায় ৩০ বছর আগে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি ইস্তাম্বুলের লাইব্রেরীতে খুঁজে পেলেন ১ লক্ষ ২০ হাজার পাণ্ডুলিপি, যা মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের অসামান্য দলিলরূপে প্রমাণিত হলো। এই পাণ্ডুলিপিগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যার পর তিনি জানালেন, সারা পৃথিবীতে ১.৫ মিলিয়ন আরব বিজ্ঞানীদের পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার জন্য জার্মান রিসার্চ এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় গড়ে তুললেন একটি প্রজেক্ট। তাঁর এ অবদানের জন্য ১৯৭৯ সালে তিনি ফয়সল ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন।

ফুয়াট সেজগিন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাজ নকল করা, অনুকরণ করা এবং কখনো কখনো পুরোটাই নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছে পাশ্চাত্য জগত। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দেই এই চক্রান্ত টের পেয়েছিলেন আরবরা। তাই সেই সময় এক ডিক্রি জারী করা হয় যে, 'খৃষ্টানদের কাছে বিজ্ঞানের কোন লেখা বিক্রি করা যাবে না'। পরে আরো কঠোরভাবে বলা হয় যে, 'তাদেরকে কোন লেখা অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হবে'।

দশম শতাব্দীতেই শুরু হয় পাশ্চাত্যের আরব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অহরণের

প্রক্রিয়া। জানামতে, সবচেয়ে প্রাচীন অপহরণকারীর নাম ল্যাপিটাস ডি বার্সেলোনা। দশম শতকে স্পেনের টলেডো শহর ছিল এই জ্ঞান ও প্রযুক্তি পাচারের প্রধানতম ঘাঁটি। এখানে দলবেঁধে পাশ্চাত্যের দূর-দুরান্তের শহর থেকে ছাত্ররা পড়তে আসতো। পরে কাস্ট্রেস, টোলাউজ, রেইমস, টুরস, প্যারিস প্রভৃতি শহর এই অপকর্মের পীঠস্থান হিসাবে যুক্ত হয়। ইটালী এবং কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে অবস্থিত ট্রাবজোনের গ্রীক অনুবাদের স্কুলে এসে মিলিত হল এরকম বহু পথ। দ্বাদশ শতকে গেরহার্ট ভন ক্রেমোনা নামক এক অনুবাদক একাই নব্বইটি পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন। ১১২০ খৃ. জীবিত সুপ্রসিদ্ধ আরব বিজ্ঞানীর লেখা অনুবাদ করেন প্লেটো ভান টিভোলী। আল বাত্তানীর এই অনুবাদের নাম দিলেন তিনি 'Hand book of Astronomy, পরবর্তীতে যা টলেমীর জ্ঞান হিসাবে পরিচিতি পেলো।

যাক, এ ধরনের চুরি ইউরোপীয় আধিপত্য যুগে কতো ব্যাপক হতে পারে তা অনুমান কঠিন নয়। পাশ্চাত্য বিবেকবানদের সাথে সাথে আমাদেরও এ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস উদ্ধারে এগিয়ে আসতে হবে– আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে। তবেই বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস নতুন মাত্রা পাবে, পাবে পূর্ণতা।

স্থাপত্যে মুসলমানের দান

মানুষ যখন বসবাসের জন্য গৃহ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মশালা এবং সাধারণ প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করল, তখন থেকেই স্থাপত্যের ইতিহাসের যাত্রা শুরু করে। স্থাপত্য শব্দের ইংরেজী শব্দ "Architecture". স্থাপত্যের প্রকৃতি ও আওতা নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক যে কোন নির্মিত বস্তুকে স্থাপত্য বলে ধরে নেন। কিন্তু আধুনিক কালে এ বক্তব্য কেউ গ্রহণ করেন না। "আরকিটেকচার" শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসস্থান নির্মাণ ও কৌশল প্রণালী। সাধারণ অর্থে সৌন্দর্য, সুষমা, ঐতিহাসিক ভিত্তি এই গুণগুলো থাকলে তাকে স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভাবাবেগ দ্বারা বা মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে বিশেষ প্রক্রিয়া বা কৌশল অবলম্বনে ঘর তথা অট্টালিকা তৈরী করাকে আধুনিককালে স্থাপত্য বলা হয়। "Prof W. R. Lethaby সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ঃ 'Architecture is the practial art of building touched with emotion, not only in the past, but now and in the future.' পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন দেশে নির্মিত স্থাপত্যসমূহে একটি নিবিড় যোগসূত্র থাকলেও স্থান, কাল ও আবহাওয়ার বিভিন্নতার কারণে একদেশের সাথে অন্যদেশের স্থাপত্যের যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়। উপকরণ, মাল মশলার বিভিন্নতা ছাড়াও নির্মাণ কৌশল, আকৃতি ও অলংকরণের মধ্যেও বৈসাদৃশ্য থাকে। এ সকল বৈসাদৃশ্যকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। এজন্য স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতির মানসিকস্বরূপ প্রকাশিত হয়। বলা হয়েছে, The architecture as ever mirrors the soul of the nation.

স্থাপত্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী মিশরকেই প্রথম প্রাচীন স্থাপত্য নগরী হিসেবে গণ্য করা হয়। খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে ছয় হাজার বছর পূর্বে পিরামিড নির্মাণ এক বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্তি। এরপর ব্যাবিলনীয়, আশেরীয়, গ্রীক, রোমান, সভ্যতাতে স্থাপত্য নতুন নতুন ধারাতে উন্নতি লাভ করেছিল।

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবে কোন স্থাপত্য নিদর্শন ছিলোনা। উটের ও ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরী তাঁবুতে তারা বাস করত। ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন ঃ প্রাক-ইসলামী আরবে এ্যাসিরির ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, একামেনীয় প্রভৃতি সভ্যতার স্থাপত্যের মতো উৎকৃষ্ঠ কোন স্থাপত্যের প্রচলন ছিলোনা। তবে দক্ষিণ আরবে সাবরীয়ান ও হিমারীয় যুগের স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে।

আরবদের স্থাপত্য বলতে যা উল্লেখ করা যায় তা হলো চতুষ্কোণাকৃতি কা'বা ঘর এবং জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব স্থাপত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়। এক সময় তা গৌরবময় কীর্তিতে রূপময় হয়।

৬২২ খৃ. নির্মিত মদীনায় মহানবী (সা.)-এর মসজিদ আরব স্থাপত্যের প্রকৃত সূচনা করে। স্থাপত্য কর্ম হিসেবে এটির স্থান তখন না হলেও মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশে এই মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাচা ইট, কাদামাটি ও খেজুর বৃক্ষ আচ্ছাদিত হয়ে এ মসজিদের যাত্রা শুরু হয়। মোটামুটি ১০০ বর্গহাত আয়তন, ৭ হাত উচ্চতার চারিদিকে দেওয়াল দুই সারিতে ১৮টি করে খেজুর গাছের স্তম্ভ, প্রথমে ছাদ বিহীন ও পরে খেজুর পাতায় ছাউনি প্রদান। এই হল মদীনা মসজিদের প্রাথমিক রূপ। ৬২৮ খৃ. ঝাউকাঠের তিন ধাপের একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। মসজিদের দক্ষিণ দিকে দুই কক্ষ বিশিষ্ট নবীর বাসগৃহ ছিল, যা পরে ৯ কক্ষে উন্নীত হয়েছিল।

পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্যের অনেক উপাদান এই মসজিদ থেকে পাওয়া। জুল্লাহ, সাহন, মিম্বর, মিনার, কিবলা নির্দেশক পাথর, ওজুখানা ইত্যাদি শুরু এখান থেকেই হয়। তাই রিচমন্ড বলেন ঃ It is an old still accepted idea that the mosque of Muhammad at Madina represents in an elementary from the prototype of the congregational Mosque of the first centuries of Islam. "Encyclopedia of Islam গ্রন্থে ৫ম খণ্ডে বলা হয়েছে– "The Mosque of Madina was developed the general type of the Muslim Mosque."

৬২২ খৃ. হতে ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্যের প্রাথমিক যুগ ধরা হয়। এর মধ্যে আরো নির্মিত হয় ৬৩৫ খৃ. বসরা মসজিদ ও "দারউল ইমারাত"। ৬৩৮ খৃ. আবু মূসা আশয়ারী এগুলো আরো সম্প্রসারিত করেন। ৬৬৫ সনে যিয়াদ বিন আবীহি বসরার গভর্ণর থাকাকালে এ মসজিদ আরো বিস্তৃত রূপ লাভ করে। ৬৩৮ খৃ. সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কুফা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এখানে যে 'দার উল ইমারাত' স্থাপন করেন ১৯৫৬ সালে খনন কাজের ফলে তার প্রকৃত

অবস্থান ও স্থাপত্য শৈলীর পরিচয় আবিষ্কৃত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের পর ৬৪১ সালে আমর বিন আস ফুস্তাত নগরীর গোড়াপত্তন করে সেখানে নির্মাণ করেন ফুস্তাত মসজিদ। বিভিন্ন আমলে এই মসজিদ পরিবর্ধিত ও নতুন কাঠামোয় পুনঃ নির্মিত হয়।

মুসলিম স্থাপত্যের মূল পর্বে প্রবেশ করার পূর্বে তার প্রেরণা, প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর হাতে মদীনা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন মুসলিম স্থাপত্য শিল্পেরই ভিত্তি স্থাপন। এ ঘটনার পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হতেই স্থাপত্যে মুসলিম অবদানের নতুন ধারা ইতিহাসে স্থান লাভ করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। কুরআনে আদর্শ স্থাপত্য রীতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে; বসবাসকারীদের সর্বাধিক আরাম আয়েশ, আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের কথা বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রকৃতির সম্পদের সর্বাধিক মাত্রায় সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। সূরা তাওবাতে আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ মুমিন নরনারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে" (৯ ঃ ১২)। বসবাসের জন্য প্রযুক্ত বাগানের অতিরিক্ত সুবিধার কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ 'তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী থাকবে এবং তাদের চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করাব' (৪ ঃ ৫৭)। শান্তিময় বাসস্থান সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে ঃ সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনসমূহে সমাসীন থাকবে, সেখানে তারা বেশী গরম অথবা বেশী শীত কোনটা বোধ করবে না; সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণ তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। (৭৬ ঃ ১৩-২৪)

এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শ বাসস্থানের বর্ণনা ইসলামী যুগের প্রথম দিকে স্থাপত্য রীতির প্রেরণা যোগায়। যার ফলে গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ হতে শুরু করে আগ্রার তাজমহল পর্যন্ত বিস্ময়কর স্থাপত্যের সৃষ্টি হয় পরবর্তী যুগে।

মুসলিম স্থাপত্য শিল্পে প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর ব্যবহার সৌন্দর্য ও দক্ষতার সাথে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম স্থাপত্যের নকশাতে ও নগর পরিকল্পনায় আলোর যে ব্যবহার হয়েছে তা বিরাজমান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আনন্দ, আলোক ও তাপের উৎস প্রমাণ করে। এভাবে ঐতিহ্যগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে বাসভবন ও শহরে শান্তি ও সৌন্দর্যের এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় এবং একই সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুষম

ভারসাম্য রক্ষা করে, ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি সহজাত সুসামঞ্জস্যতা ও ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটে।

সাধারণভাবে দু'টি ধারাকে কেন্দ্র করে মুসলিম স্থাপত্য গড়ে উঠেছে। তা হলো ঃ

১. ধর্মীয় স্থাপত্য; মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার ইত্যাদি।

২. লৌকিক স্থাপত্য; দুর্গ, প্রাসাদ, দরবারকক্ষ, বাসগৃহ, উদ্যান, সেতু, পানি নিষ্কাশনের নালা, নগর তোরণ, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি।

ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণ ইসলামে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। স্থাপত্য ও শিল্পকলার এই প্রতিবন্ধকতার ফলে ইসলামের নিজস্ব আদর্শ স্বতন্ত্রভাবে স্থান করে নিয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন ঃ 'মুসলমানদের ধর্মকে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের দিক দিয়ে অনুন্নত বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, চিত্র সম্পর্কে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা বাইবেলের লেভিটিকাস এর অনুশাসনের মতো। এটা মূসার বিধানের সম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়; লক্ষণীয় যে, মূসার বিধান ইহুদীদের মধ্যে খোদাই মূর্তিশিল্প কঠোরভাবে দমন করে, আর এর যৌক্তিকতার ভিত্তি হচ্ছে প্রাক্-ইসলামী আরবদের ঘোর পৌত্তলিক স্বভাব। অতএব প্রাথমিক মুসলিমদের জন্য চিত্রশিল্প আর ভাস্কর্য ঘৃণিত ও নাজায়েজ ছিল, আর এই দৃঢ় নিবন্ধ মূর্তি বিরোধীতা নিঃসন্দেহে ইসলামকে পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, যা অন্যান্য জাতির বেলায় রক্ষা পায়নি। কিন্তু আদি গণরাষ্ট্র একটি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর আর বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভের ফলে মুসলমানরা এই নিষেধাজ্ঞার মর্মোপলব্ধি করতে সমর্থ হয় আর সংকীর্ণ ব্যাখ্যার বাঁধনকে দূরে নিক্ষেপ করে।'

উমাইয়া যুগে মুসলিম স্থাপত্য

৬৬১ খৃষ্টাব্দে উমাইয়া খলীফা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এই বংশের শাসনের গোড়া পত্তন করেন। দীর্ঘ নব্বই বছরকাল এ বংশের শাসন স্থায়ী হয়। উমাইয়া শাসনের সূচনা মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বের দাবীদার। এ.বি.এম হোসেন লিখেন ঃ 'উমাইয়াদের খিলাফতে অধিষ্ঠান আরব স্থাপত্য ইতিহাসে দুইটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের একটি হইল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মদীনা হইতে দামেস্ককে স্থানান্তর এবং অপরটি খিলাফতকে 'মুল্‌ক' এ পরিণত করণ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর রাজতন্ত্রের স্বাভাবিক ফল হিসেবে স্বভাবতই তাহাদের দৃষ্টি যশ, প্রতিপত্তি ও ভোগ বিলাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। খ্যাতি

ও ভোগ বিলাসের অন্যতম মাধ্যম স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাই তাহারা আর উদাসীন থাকিতে পারেনা। উল্লেখযোগ্য যে চৌদ্দজন উমাইয়া খলিফার মধ্যে দশজনই স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কমবেশী খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি লাভ ছাড়া ও ইসলামকে গৌরবমণ্ডিত করা উমাইয়াদের অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল।

উমাইয়া খলীফাগণ ধর্মীয় ইমারত এবং প্রাসাদ নির্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে 'কুব্বাত আস সাখরা' এবং সদ্যাবিষ্কৃত খলীফা দ্বিতীয় উমারের কবর ফলক ব্যতীত বাকী সবগুলোই মসজিদ। প্রাসাদ স্থাপত্য সম্পর্কে এই শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সুধীজনের জ্ঞান ছিল সীমিত। বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে কয়েকটি ইমারতের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব প্রাসাদের সবগুলোই বর্তমান সিরীয় জর্ডান মরুভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এই আবিষ্কারের ফল দুটি; প্রথমতঃ খলীফাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী জানা গেছে, দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে যে মুসলিম লোকায়ত শিল্পের সূচনা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আবিষ্কৃত প্রাসাদগুলো হল ঃ মিনইয়া প্রাসাদ (৭০৫-১৫), কুসায়ের আমরা (৭১১-৪৪), জাবাল সাইজ প্রাসাদ (৭০৫-১৫), আনজার প্রাসাদ (৭০৫-১৫), মুত্তায়াক্কার (৭২২), হাম্মাম আস্ সারাখ (৭২৫-৩০), কাসর আল হাইর আল গরবী (৭২৭), কাসর আল হাইর আশ্ শরকী (৭২৯), খিরবাত আল মাফজার (৭২৪-৪৩), মাশাত্তা (৭৪৩), কাসর আল তুব্বা (৭৪৩), ও কাসর বায়ির (৭৪৩)।

উমাইয়া স্থাপত্যে বাইজেন্টাইন, সাসানীয়, মিশরীয় কারিগর ব্যবহারের ফলে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও উক্ত সভ্যতাসমূহের স্থাপত্যিক প্রভাব পড়েছে। এ সময়ের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে রয়েছে কুব্বাত আস্ সাখরা, ফুস্তাত মসজিদ, ওয়াসিত, কায়রাওয়ান মসজিদ, দামেস্ক মসজিদ, আকসা মসজিদ, কুসায়ের আমরা, রামলা ও আলোপ্পা মসজিদ, বোসরা মসজিদ ইত্যাদি। নিম্নে এর কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল।

১. কুব্বাত আস্ সাখরা ঃ

খলীফা আবদুল মালিকের আমলে ৬৯৯ খৃ. জেরুসালেমে মহানবীর (সা.) মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে এটি নির্মিত হয়। Dome of the Rock অর্থাৎ পাথরের উপর নির্মিত গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত আরবীতে 'কুব্বাত আস্ সাখরা' নামে পরিচিত। সিরিয়ার বাইজেন্টাইন গীর্জার প্রাধান্য থাকায় খলীফা এমন এক

অত্যুৎকৃষ্ট সৌধ নির্মাণের মনস্থ করেন যা বৈশিষ্ট্য, উপকরণের ভারসাম্য ও বিন্যাস এবং কারুকাজের দিক দিয়ে সকল সৌধকে ম্লান করে দেয়। তদুপরি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এ মসজিদ নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

চুনা পাথরের নির্মিত কুব্বাত আস্ সাখরার ভূমি পরিকল্পনা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ অভ্যন্তরে বৃত্তাকার অংশ, বৃত্তাকৃতির চারপাশ পরিবেষ্টিত এলাকাকে ঘিরে দ্বিতীয় অষ্টভুজ বিশিষ্ট অংশ। একটি গোলাকৃতি দুটি অষ্টভুজ দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে নিখুঁত জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভূমি নকশার মাধ্যমে। মসজিদের ভিতরের অংশ স্তম্ভের দ্বারা গঠিত বৃত্তাকৃতিভাবে বেষ্টিত। এই বেষ্টনীর স্তম্ভের অর্ধবৃত্তাকৃতি খিলানের উপর গম্বুজটি নির্মিত হয়েছিল। এতে ছিল ১৬টি স্তম্ভ যার ৪টি ছিল আয়তাকার এবং বাকীগুলো গোলাকার। প্রথম অষ্টভুজের ৮টি স্তম্ভের প্রতিটির মাঝে ৩টি করে ২৪টি খিলান ছিল। দ্বিতীয় অষ্টভুজের প্রাচীর দৈর্ঘ্য ছিল ৬৭ ফুট এবং প্রস্থ ২১.৫ ফুট। খিলানের শীর্ষ দেশের উপর একটি ড্রাম বা পিপা নির্মিত হয়। ৬৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এই পিপার উপরই নির্মিত হয় বিখ্যাত গম্বুজ। এটি ছিল কাঠের এবং স্বর্ণমণ্ডিত। মসজিদের অভ্যন্তরে মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত ৬০ ঃ ৪৪ ফুট আকৃতির প্রস্তর খণ্ড রাখা আছে। অলংকরণ ও কারুকাজে এটি অবিস্মরণীয়। মর্মর পাথরে বিভিন্ন রংয়ের সোনালী, নীল ও সবুজ মোজাইক ও ঝিনুক কাজের চাকচিক্য একে দারুণ সুষমামণ্ডিত করেছিল। রিচমন্ড তাই বলেন ঃ The Dome of rock is the earliest existing monument of muslim architecture.

২. দামেস্কের জামে মসজিদ ঃ

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মসজিদ। আল ওয়ালিদের আমলে বাইজেন্টাইন, কপটিক, ভারতীয় ও মাগরেবী শিল্পীদের সহায়তায় এই জমকালো মসজিদটি নির্মিত হয়। তখনকার সময় এটি চতুর্থ বিস্ময় হিসেবে পরিগণিত হত। আল্লামা মাসউদীর মতে, ৭০৬ খৃ. এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ইবনুল ফকীহ উল্লেখ করেছেন, সাম্রাজ্যের সাত বছরের খারাজ উক্ত মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা হয়। অন্যান্য তথ্য মতে, ৫৬ লক্ষ, অন্য মতে ১১ লক্ষ ২০ হাজার দীনার ব্যয় হয়।

অসম আয়তাকার এ মসজিদের সাহনের পরিমিতি পূর্ব-পশ্চিমে ১২২.৫ মিটার, পূর্ব প্রান্তে ৫০ মিটার এবং পশ্চিম প্রান্তে ৪৭.৪৭ মিটার। দক্ষিণ দিকের লিউয়ানের পরিমিতি পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৬ মি. উত্তর-দক্ষিণে ২৭ মিটার। ৬৬টি খিলান বিশিষ্ট দামেস্ক মসজিদে সর্বপ্রথম ট্রান্সেপ্টে নির্মিত হয়। একটি প্রশস্ত

ট্রান্সেপ্ট নামাজ ঘরকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। ট্রান্সেপ্টের মধ্যবর্তী স্থানে চারটি আয়তাকৃতি স্তম্ভ থেকে চারটি খিলান এবং স্কুইজের সাহায্যে চতুষ্কোণী এলাকায় প্রথমে অষ্টভুজ পরে গোলাকার করে এর উপর গম্বুজ নির্মিত হয়। Cresswell বলেন ঃ 'The central bay is covered by a stone dome on Squinches, but the present arrangement is not the original.' কিবলা প্রাচীরে চারটি মিহরাব এবং প্রধান মিহরাবের পাশে ১৩ ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বার রয়েছে। রিওয়াক, বায়তুল আল, ওজুখানা , চারটি মিনার, সাহন ইত্যাদি মিলে এক পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দেয়া হয়। আর মোজাইক চিত্রে বৃক্ষ, লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা ও আরবী লিপি শৈলীর অপূর্ব অলংকার একে ঐতিহাসিক আল মুকাদ্দেসীর ভাষায় 'বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ইমারত' এর মর্যাদা দান করেছিল। হিট্টি ইহাকে মক্কা, মদীনা ও জেরুসালেমের পর চতুর্থ শ্রেষ্ঠ ইবাদতগাহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বি এম হোসেন লিখেন ঃ 'দামেস্ক মসজিদ মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইমারত। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই প্রাচীনতম মসজিদ যাহা মূল কাঠামোসহ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রাচীনত্ব ব্যতিরেকেও মসজিদ স্থাপত্য ক্রমবিকাশে ইহাই প্রথম পূর্ণ অবয়ব মসজিদ।

৩. কাসর আল হাইর ঃ

হিশাম ৭২৭ সনে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৯৩৬ সালে Daniel Schlumberger দামেশ্‌ক পামীরা রাস্তার ২৬ মাইল অদূরে খনন কাজ করে এর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। উত্তর-দক্ষিণে ৭০.১৫ এবং ৭১.০৫ মিটার; পূর্ব-পশ্চিমে ৭১.৪৫ ও ৭৩.০৩ মিটার মূল প্রাসাদের তোরণ ৩ মিটার প্রশস্ত ছিল। জমকালো এই প্রাসাদের দুইটি সিঁড়ি কক্ষ সবচাইতে আকর্ষণীয় বস্তু; যার মেঝের দুটি ফ্রেসকো আজও মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রাসাদের অন্য অংশ সরাইখানাতেও কারুকাজের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৪. আনজার ঃ

সিরীয় সীমান্তের নিকট লেবাননে দামেস্ক বৈরুত রাস্তার পাশে নির্মিত এই প্রাসাদ এ যাবত প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণ উমাইয়া স্থাপত্য। ৭১৪/১৫ খৃ. ওয়ালিদের আমলে নির্মিত হয় বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারনা। ৩৭০ ও ৩১০ মিটার পরিমাপে এই বিশাল প্রাসাদের মধ্যবর্তী অংশে অন্যান্য উমাইয়া প্রাসাদের ন্যায় গোলাকার বুরুজ ছিল। শহর, রাস্তা, মসজিদ, স্নানাগার, বত্রিশটি বিপণী, প্রবেশ তোরণ ও অন্যান্য চারটি আয়তাকার ইমারত এই প্রাসাদের বিশালত্ব প্রমাণ করে।

৫. কর্ডোবার জামে সমজিদ ঃ

৭৫০ খৃ. উমাইয়াদের পতন হলেও আব্বাসীয়দের হাত থেকে হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান রক্ষা পান এবং বহু কষ্টের পর ৭৫৬ খৃ. তিনি স্পেনে উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম আবদুর রহমান নামে পরিচিত এই শাসকের সবচেয়ে গৌরবজনক কীর্তি কর্ডোবার জামে মসজিদ নির্মাণ। মুসলিম মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মসজিদের স্থান তৃতীয় শ্রেষ্ঠতম। ৭৮৫ খৃ. এর নির্মাণ শুরু হয় এবং এক বছরে প্রায় ৮০ হাজার দীনার ব্যয়ে নির্মাণ শেষ করা হয়। ২৬৫০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত এই মসজিদের আকৃতি দেয়ালের মাথার উপর সারিবাধা ধাপযুক্ত পিরামিডের মত অলংকরণ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছিলো। মিনার, মিহরাব, গম্বুজ, ১৭টি অশ্বখুরাকৃতির খিলানযুক্ত ফ্যাসাদ, সাহন, বুরুজ, জুল্লাহ, প্রভৃতি দিক দিয়ে এ মসজিদ বিশিষ্টতার অধিকারী ছিল। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার পরিবর্ধনের পর বর্তমানে ৮৫০টি স্তম্ভ বিশিষ্ট এই মসজিদ পাশ্চাত্যে মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

বিভিন্ন মসজিদ, প্রাসাদ, সরাইখানা, নগর স্থাপত্যের নির্মাণ ছাড়াও পূর্বতন মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ করেন উমাইয়ারা। তন্মধ্যে ফুস্তাত মসজিদ, কায়রাওয়ান মসজিদ, মদীনা মসজিদ, আক্‌সা মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আব্বাসীয় স্থাপত্য ঃ

৭৫০ খৃ. আব্বাসীয়রা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় আমল এমনিতেই মুসলিম সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ রূপে চিহ্নিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান শিল্পকলার প্রতিটি স্তরে এই পিরিয়ডে অত্যুজ্জ্বল ফসল ফলেছে। স্থাপত্যও এ থেকে বাদ যায়নি। উমাইয়া আমলে স্থাপত্যের যে ধারা নির্মিত হয়ে এসেছিল এ সময়ে তা নতুন গতি ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। উমাইয়া স্থাপত্যে সিরীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; আব্বাসীয় স্থাপত্যে তা স্বভাবতই পারসিক প্রভাব বলয়ে প্রবেশ করে। তারা পারসিক স্থাপত্যশৈলী হতে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার সাথে সাথে উমাইয়া স্থাপত্য শৈলীর ধারাবাহিকতাও রক্ষা করেন। ফলে এই দুই মিশ্রণে এক নতুন স্থাপত্য রীতি আব্বাসীয় আমলে গড়ে উঠে।

নির্মাণ উপাদানের প্রধান যে পার্থক্য সূচিত হয় তাহলো উমাইয়ারা প্রস্তর ব্যবহার করতো প্রধান উপাদান হিসেবে আর আব্বাসীয়রা ইট। অর্ধবৃত্তাকার খিলান ব্যবহৃত হতো উমাইয়া স্থাপত্যে আর দ্বি কেন্দ্রিক, চতুর্কেন্দ্রিক ও ডিম্বাকৃতি

কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয় আব্বাসীয় স্থাপত্যে। অলংকরণে খোদাই ও অংকনের চাইতে আব্বাসীয়রা পলেস্তারার কার্যক্রমের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। দেয়াল চিত্রের চেয়ে এই পলেস্তারা পদ্ধতি আব্বাসী স্থাপত্যের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৭৫০ হতে ১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনামলে নির্মিত বিশেষ কয়েকটি স্থাপত্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

১. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা ঃ

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা আব্বাসীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা। খলীফা আল মনসুর ৭৬২ খৃ. হাশেমীয়া থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তাইগ্রীস তীরবর্তী এই স্থান নির্বাচনের পর সিরিয়া, পারস্য ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রকৌশলী স্থপতি ও কারিগর এনে বাগদাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এক লক্ষ লোকের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে ৪০ লক্ষ দিরহাম ব্যয়ে ৭৬৬খৃ. নগরী নির্মাণ সমাপ্ত হয়। মনসুরের নামানুসারে এর নাম হয় 'মদীনাতুল মনসুর' কিন্তু সরকারীভাবে নামকরণ করা হয়েছিল 'মদীনাতুস সালাম'।

বাগদাদ নগরী যা মনসুর নির্মাণ করেছিলেন তার কোন চিহ্ন আজ অবশিষ্ট নেই। ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, বৃত্তাকার এই শহরটির দুটি প্রাচীন কাঁচা ইটের স্তরে স্তরে নল খাগড়া দ্বারা নির্মাণ করা হয়। অন্তঃ প্রাচীর ও বহিঃ প্রাচীরের মধ্যে ৬০ কিউবিক প্রশস্ত পরিসর এবং উহার চতুর্দিকে খাল খনন করে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। এতে কুফা, বসরা, দামেস্ক ও খোরাসান নামক দূরবর্তী চারটি প্রবেশ তোরণ ছিল। রাজধানীর মধ্যস্থলে খলীফার 'কাসর আল যাহাব' বা সোনালী প্রাসাদ অবস্থিত। নগরের অভ্যন্তরে প্রাসাদ লগ্ন একটি জামে মসজিদও নির্মিত হয়। বর্তমানে বাগদাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত মিহরাবটি এ মসজিদেরই বলে মনে করা হয়।

নগরী নির্মাণের জন্য মনসুর ছয়জন স্থপতি নিয়োগ করেন, তাদের অধীনে ছিলেন চার জন তত্ত্বধায়ক। স্থপতিরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ বিন মুহরিয, হাজ্জাজ বিন আরতাত, রাবাহ, ইমরান বিন আল ওয়াজযাহ, শিহাব ইবনে কাসীর ও বিশর ইবনে মায়মূন।

২. রাক্কা শহর ও মসজিদ ঃ

বাগদাদ নির্মাণের পরপর মনসুর রাক্কা শহর নির্মাণ শুরু করেন ৭৭২ খৃ. বাগদাদেরই অনুকরণে। নিশ্চিহ্ন এই শহরের বাগদাদ তোরণের বুরুজের সুদৃশ্য

কিছু অংশ, প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ও রাক্কা জামে মসজিদ আজও আব্বাসীয় স্থাপত্য কীর্তির চিহ্ন বহন করে যাচ্ছে। বাগদাদ তোরণের মূল প্রশস্ততা ও গভীরতা ছিল যথাক্রমে ১৮.০৭ এবং ১৪.৫ মিটার। বর্তমানে যে অস্তিত্ব আছে তার উচ্চতা ১৯.৩ মিটার। এর খিলান দ্বার সাড়ে ১০ ফুট প্রশস্ত যার পশ্চাতে আছে ১২ মিটার আকৃতির একটি কক্ষ। রাক্কার নির্মিত মসজিদ মেসোপটেমীয় ও সিরীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। মসজিদের আয়তন ছিল ৩০৫ বাই ৩৫০ ফুট। ২০টি বুরুজ, ১১টি দরজা, ১০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩টি খিলান এ স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

৩. কায়রাওয়ানের জামে মসজিদ ঃ

উমাইয়া শাসনামলে মিশরের গভর্নর ওতবা বিন নাফে ৬৭০ খৃ. সাদামাটাভাবে কায়রাওয়ানের মসজিদ নির্মাণ করেন। ৭০৩ খৃ. এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আফ্রিকার শাসনকার্তা হাসান বিন নোমান পুনঃ নির্মাণ করেন এবং ৭২৪ সালে বিশর বিন সাফওয়ান সম্প্রসারণ কাজ করেন। এরপর আব্বাসীয় আমলে ৭৭৪ খৃ. ইয়াজিদ বিন হাতীম মিহরাব ছাড়া পুরো মসজিদটি নতুন করে নির্মাণ করেন; বর্তমানে যে কাঠামোটি আলোচিত হয় কায়রাওয়ানের মসজিদের, তা আগলাবীয় বংশের শাসক যিয়াদুতুল্লাহ (৮১৬-৩৭ খৃ.) কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পুনঃ নির্মিত হয়েছিলো। এর মিনারটি ত্রিতল বিশিষ্ট মোট ১০৩ ফুট উচ্চতার চতুষ্কোণী ইমারত। মোট আয়তন ২১৪ ফুট উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পূর্বে ২৩০ ফুট, উত্তর-পূর্বে ৩৯৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৯৫ ফুট। মসজিদের বহিঃ দেয়ালের আয়তাকার পাথর নির্মিত পোস্তা বাট্রেস এর জন্য এটি অদ্ভুত ও অপ্রচলিত ভবন নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

৪. সামাররার জামে মসজিদ ঃ

তুর্কী উৎপাত হতে বাঁচার জন্য আল মুতাসিম বিল্লাহ রাজধানী বাগদাদের ষাট মাইল উত্তরে দজলা নদীর তীরে একটি শহরে স্থানান্তর করেন। ৮৩৬ খৃ. নির্মিত এই নতুন শহরের নাম সামাররা শহর। এখানে খালীফা প্রাসাদ, দরবার কক্ষ, হলঘর, উদ্যান, বাজার এবং বাজারের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। আল মুতাওয়াক্কিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার দিরহাম ব্যয়ে জওজীর মতে ৮৪৮-৮৫২ খৃ. এর মধ্যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাররা মসজিদের নির্মাণ শেষ করেন। উত্তর-দক্ষিণে ৭৮৪ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫১২ ফুট আয়তন বিশিষ্ট এই মসজিদ ৪০ একর জমির উপর নির্মিত হয়। এ মসজিদের স্থাপত্য কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ

কীর্তি হচ্ছে উত্তর দিকে পেঁচ বিশিষ্ট মালবিয়া মিনার নির্মাণ। মূল ভবন হতে ৮৯ ফুট দূরে অবস্থিত এটি ৮২ ফুট দীর্ঘ ৩৯.৫ ফুট প্রস্থ ও ১০ ফুট উঁচু অবস্থিত একটি সেতু দ্বারা মসজিদের সাথে যুক্ত হয়েছে। সেতুটির পেঁচানো পথ মিনারটিকে বেষ্টন করে উপরে উঠে গেছে। ভিত হতে মিনারের উচ্চতা ১৬৪ ফুট বা ৫০ মিটার। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা, স্তম্ভের বিন্যাস, দেয়ালে বুরুজের ব্যবহার, অধিক সংখ্যক দরজা, রিওয়াক সাহন এবং বিশালত্ব অন্যতম। আবু দুলাফের মসজিদে এর স্থাপত্য সরাসরি প্রভাব ফেলেছে।

৫. ইবনে তুলুনের স্থাপত্য কীর্তিসমূহ ঃ

আল-মামুনের আমলে মিশরের শাসনকর্তা আহমদ ইবনে তুলুনের স্থাপত্যকীর্তিসমূহ মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর অনেকগুলো কীর্তির মধ্যে আল্ ময়দান প্রাসাদ, মসজিদ, একটি হাসপাতাল ও জল প্রণালী অন্যতম। তবে বৈশিষ্টের দিক থেকে মসজিদটি তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। ইবনে তুলুনের মসজিদ ৮৭৭ হতে ৮৭৯ খৃ. এর মধ্যে এটি নির্মিত হয়। আবেষ্টনীসহ মোট দৈর্ঘ্য ৪৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০১ ফুট; নির্মাণ উপাদান প্রতিটি ইটের আয়তন ৭-৭.৫×৩-৩.৭৫×১.৫-১.৭৫" আব্বাসীয় যুগে নির্মিত যে অল্প সংখ্যক স্থাপত্য নিদর্শন মূল কাঠামোসহ দণ্ডায়মান আছে– এটি তন্মধ্যে একটি। মসজিদের সুষমায় বিমুগ্ধ হয়ে কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান Dr. John. S. Badean মন্তব্য করেছেন ঃ 'ইবনে তুলুনের মসজিদের যে মহিমা ও সহজ সরল রূপ, সেরকম একটি স্থানই আমার কামনার, যেখানে আমি প্রার্থনা করে স্রষ্টার নৈকট্য বোধ করতে পারতাম।'

ইবনে তুলুনের আল-ময়দান প্রাসাদ বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে তাঁর নির্মিত সর্বপ্রশংসিত বেসামরিক হাসপাতালটি ১১৮৪ সনেও অবশিষ্ট ছিল। এ হাসপাতাল নির্মাণে তিনি ৬০ হাজার দীনার ব্যয় করেছিলেন। তিনি যে জলপ্রণালী নির্মাণ করেছিলেন তার বিভিন্ন ভগ্নাংশ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে বাসাতীন গ্রামে অবস্থিত পানির বুরুজটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ইহা পোড়া ইটে নির্মিত এবং ৩৪.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট; মধ্যবর্তী জলাধারের দৈর্ঘ্য ১৫.৫ ফুট এবং প্রস্থ ১৩.২৫ ফুট। বুরুজের উত্তর-পশ্চিমদিকে অনেক দূর পর্যন্ত জল প্রণালীর ভগ্ন খিলান বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। এতে দুটি বলদ চালিত সাকিয়ার সাহায্যে পানি তোলার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়।

৬. ইস্পাহান জামে মসজিদ ঃ

স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে ইস্পাহান জামে মসজিদ এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। শুধু তাই নয় ইস্পাহান নগরীটিই মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এল হোনারফার সত্যিই বলেছেন : 'It is a record of all the changes in iraivian Islamic architecture over a period of more than a thousand years' ইস্পাহানের জামে মসজিদ তামিনী আরবদের দ্বারা নবম শতকের শুরুতে নির্মিত হয়েছিল। ৮৪১ খৃ. হতে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহুবার এর পুনঃনির্মাণ হয়, তবে সেলজুক শাসক মালিক শাহ্ এর আমলে (১০৭২-৯২ খৃঃ) তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিখ্যাত নিযামুল মুলক, এর যে কাঠামো দাঁড় করান তা এক বিশেষ কীর্তির দাবীদার। প্রধানত আগুনে পোড়ানো ইট, পাথর, অলংকরণের জন্য মোজাইক, টালি ও মিনাকরা টালি এতে ব্যবহৃত হয়েছে। জুল্লাহ, গম্বুজ, মেহরাব খিলান, আইওয়ান ও বিভিন্ন গ্যালারী বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। সাফাভী আমলে অলংকৃত মসজিদের পশ্চিম দিকের আইওয়ান সবচেয়ে দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান যা আজও বিদ্যমান। এ মসজিদ সম্পর্কে আর্থার উপহাম পোপ উল্লেখ করেছেন: 'The power and nobility of Seljuk architecture is doubutless best ememplified by the Masjid-e-jame at isfahan, of the greatest mosques in the world.'

আব্বাসীয় স্থাপত্যে নতুনভাবে নির্মিত ও পুনঃ নির্মিত আরো অনেক মসজিদ, প্রাসাদ, মাকবারা, পয়ঃপ্রণালী, নগরীর বর্ণনা সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ মার্ভের দারুল ইমারত, ফুস্তাত জামে মসজিদ, কা'বা ও আকসা মসিজদ, উখায়দির, রামলা জলাধার, দামগান তারীখ খানা, জউসাক আল হাকানী, বালকুয়ারা, আবু দুলাফ মসজিদ, কুব্বাত আস্ সুলাইবিয়া, কাসর আল আশিক, সূসার রিবাত, সূসার জামে মসজিদ, তিউনিস জামে মসজিদ, বোখারার সামানীয় সমাধি প্রভৃতি।

স্পেনের মুসলিম স্থাপত্য ঃ

মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান ইউরোপের মর্মে প্রবেশ করে স্পেনের মাধ্যমে। ৭১২ খৃ. সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ স্পেনে বিজয় লাভের মাধ্যমে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ৭৫৫ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৪ বছর সময় স্পেনে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এক অন্তর্বর্তীকালীন সময় অতিবাহিত হয়। ৭৫৫ খৃ. প্রথম আবদুর রহমান স্বাধীন উমাইয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠা করার পর স্পেনে

মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস শুরু হয় এবং কালক্রমে তা ইউরোপের উজ্জ্বল বাতিঘরে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডের মনীষী Roger Bacon সত্যিই বলেছেন ঃ Spain set to all Europe the example of a civilized and shinning emire। মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তখনকার ইউরোপের দৈন্যতা স্বীকার করে লেনপুল তার Moors in Spain গ্রন্থে লিখেন : 'When we remember that the sketch we are about to entract from the records of Arabian writers, concerning the glories of Cordova, relate to the tenth century, when our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our langnage was untormed and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks we can to some extent realise the extraordinary civilization of ... moors...'

নিম্নে স্পেনীয় স্থাপত্যের নিদর্শন উল্লেখ করা হল-

১. কর্ডোবা নগরী ঃ

প্রথম আবদুর রহমানের সময় কর্ডোবা মসজিদ নির্মাণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কর্ডোবার উত্তর প্রান্তে 'রাসাফা' নামক একটি উদ্যান প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কর্ডোবা শহরের নির্মাণ তাঁর হাত দিয়ে শুরু হলেও তৃতীয় আব্দুর রহমানের হাতেই তা পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর সময়কার কর্ডোবা শহরের পরিধি ছিল সাড়ে ৭ মাইল এবং প্রশস্ততা দুই মাইল। মোট ৫ অংশে বিভক্ত, মধ্যস্থলে ছিল প্রাচীর বেষ্টিত দু'টি প্রাসাদ, ২১টি শহরতলী। শাকুন্দীর পরিবেশিত তথ্য মতে, কর্ডোবা শহর, শহরতলী এবং মদীনাতুয্ যাহারার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ছিল দশ মাইল। গৌরবোজ্জ্বল দিনে এখানে পাঁচ লক্ষ লোকের বসবাস ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার গৃহের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ তের হাজার। এছাড়া ৩ হাজার মসজিদ, ৩ শত সাধারণ স্নানাগার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ইমারতসহ প্রায় ৬০ হাজার ইমারত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাতে সরকারী আলোয় অধিবাসীরা দশ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতো অথচ এর ৭ শত বছর পর লন্ডনে কোন সরকারী বাতি ছিলনা। Draper লিখেন 'Cordova... boasted of more than 200,000 houses and more than a million of inhabitants, After sunset, a man might walk though it in a straight line for ten miles by the light of the public lamps. Seven hundred years after this time there was not so much as one public lamp in London.'

২. কর্ডোবা মসজিদের সম্প্রসারিত রূপ ঃ

প্রথম আবদুর রহমান কর্ডোবা মসজিদের ভিত্তি নির্মাণ করার পর তার পুত্র হিশাম (৭৮৮-৯৬), দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৫২), প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৬), আবদুল্লাহ (৮৮৮-৯১২) তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৬১), দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৭৬) এবং সর্বশেষ দ্বিতীয় হিশামের (৯৭৬-১০০৯) আমলে বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও বৃহত্তম পরিবর্তন ঘটে। শেষ সম্প্রসারণের (৯৮৭/৮৮)-পর মসজিদের পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৫৮৫ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪১০ ফুটে দাঁড়িয়েছে। সামাররা ও আবী দূলাফের মসজিদের পরই ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মসজিদ। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট পঞ্চম চার্লস এই মনোরম মসজিদের মধ্যাংশ ভেঙ্গে গীর্জা (১৫২৩-১৬০৭) নির্মাণ করেন। শিল্পের এই অবমাননার কারণে তিনি শেষ জীবনে আক্ষেপ করেছিলেন। আজও কর্ডোবা মসজিদের যে অনুপম শৈলী কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে তা পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মসজিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ড. এম আবদুল কাদের লিখেন ঃ 'গীর্জায় পরিণত হইলেও আজিও কর্ডোভায় ইহাই সৌন্দর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। খিলানের সংখ্যা পূর্ব-পশ্চিমে ১৯ ও উত্তর-দক্ষিণে ৩১। উজ্জ্বল পিত্তল বিমণ্ডিত ২২টি দরজা মুসল্লীদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত; ১২৯৩টি স্তম্ভের উপর বিশাল ছাদ স্থাপিত, মেঝে রৌপ্যে আবৃত ও মূল্যবান প্রস্তরের কারুকার্যে খচিত; ইহার সারি সারি স্তম্ভ স্বর্ণ ও ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরে মণ্ডিত। মিম্বর বা বেদী গজদন্ত ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠে নির্মিত; ইহাতে ৩৬০০০ পৃথক খোপ আছে; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই মূল্যবান প্রস্তরে মণ্ডিত ও সোনার ফ্রেমে আবদ্ধ। নামাযের পূর্বে অযু করার জন্য চারটি ঝরণা ছিল; পাহাড় হতে অহর্নিশ পানি আসিয়া ঐগুলো পরিপূর্ণ রাখিত।'

৩. মদীনাতুজ্ জাহরা ঃ

তৃতীয় আবদুর রহমানের বেগম জাহরার নামানুসারে ২৮০ একর জমির উপর প্রায় ৪০ বছর ধরে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাহরা তথা 'তিলোত্তমা' নামীয় এই প্রাসাদে খলীফা ল্যাভারের রাজা ও নৃপতি সাঙ্কোকে অভ্যর্থনা করেন। বিলাস ও জাঁকজমকপূর্ণ এই প্রাসাদ নগরীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিকরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নগরী আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১০১০ খৃ. বার্বার সৈন্যরা লুণ্ঠনের পর, আরো অনেকবার আজ জাহরা লুণ্ঠিত হয়। এভাবে দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে একেবারে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বর্তমানে স্পেনের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করে

যে ভগ্নদশাগ্রস্থ অংশ আবিষ্কার করেছে তাতে এককালের এ নগরীর স্থাপত্যিক গৌরব ফুটে উঠেছে।

৪. আল হামরা প্রাসাদ ঃ

নাসিরীয় বংশের প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বনু আল্ আহমার এই প্রসাদের নির্মাতা ও ভিত্তি স্থাপয়িতা। ১২৪৮ সালে সেভিলের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি গ্রানাডায় এই প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন। এরপর বিভিন্ন সুলতানের হাতে প্রবৃদ্ধ হয়ে পঞ্চম মুহাম্মদের (১৩৫৪ এবং পুনরায় ১৩৬২-৯১) হাতে আল হামরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১৪৯২ সালে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা গ্রানাডা বিজয় করলে তারা আল হামরা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চম চার্লস ১৫২৬ সনে এ প্রাসাদে বসবাস করতেন। অষ্টাদশ শতকে স্পেনে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় এটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং নেপোলিয়ান যখন স্পেন আক্রমণ করেন তখন তিনি আল হামরাকে সামরিক ব্যারাকে পরিণত করেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার সময় প্রাসাদের অনেক দেওয়াল, বুরুজ ও অন্যান্য অংশ কামানের গোলায় ভেঙ্গে দেয়। ১৮৩০ সনে সপ্তম ফার্ডিনান্ড প্রাসাদটি সংস্কার করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। ১৮৭০ সালে সরকার ইহাকে স্পেনের জাতীয় ইমারত ঘোষণা করে। ১৯৩৮ সালের পর হতে আল্ হামরা প্রাসাদ স্পেনীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রক্ষিত আছে।

লাল ইটে নির্মিত বলে প্রাসাদের নামকরণ আল হামরা বা 'লাল প্রাসাদ' রাখা হয়। প্রাসাদের প্রধান অক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে বক্রাকারে বিস্তৃত। উভয় প্রান্ত ক্রমশ: সরু হওয়ায় ভূমি নকশা অনেকটা নৌকার আকার ধারণ করেছে। প্রাসাদের প্রাচীর বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮১০ গজ এবং প্রস্থ ২৪০ গজের মত চতুস্কোণী বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এর উত্তর ও পশ্চিমের দারো নদীর উপত্যকা, দক্ষিণে সাবিকা পাহাড়ের বিস্তৃতি এবং পূর্বে রেইচিকো পাহাড়ের ঢাল অবস্থিত। দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ পথে রয়েছে তিনটি তোরণ। আল্ হামরা প্রাসাদের সমস্ত অলংকরণ অভ্যন্তর ভাগে; টালি মোজাইক, রঙিন পলেস্তারা, মর্মর, রঙ চিত্র কাষ্ঠকার্য দ্বারা সম্পন্ন। আর অঙ্গনসমূহ জলাধার, ফোয়ারা এবং চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ। আল হামরা'র স্থাপত্য-মূল্যায়ন সম্পর্কে ঐতিহাসিক লিখেন ঃ 'আল-হামরা মুসলিম মাগবেরী স্থাপত্যের চরম বিকাশ। এই বিকাশে অবশ্য শক্তি নাই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে। এই সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ একদিক হইতে পতনের পরিচায়ক। আল-হামরা তাই মাগবেরী স্থাপত্যের পতনের ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

স্পেনে মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে জাফেরিয়া প্রাসাদ, জিরাল্ডা, স্বর্ণবুরুজ, গ্রানাডা, আল কাজারও উল্লেখযোগ্য।

ফাতেমীয় স্থাপত্যের যুগ

সাঈদ ইবনে হুসাইন শেষ আগলাবীয় গভর্ণর জিয়াদত উল্লাহকে বিতাড়িত করে ৯০৯ খৃ. মিশরে ফাতেমীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন উবায়েদ উল্লাহ, আল মাহদী নাম ধারণ করে। ৯২০/২১ খৃ. তিনি মাহদীয়াতে রাজধানী স্থাপন করেন যা ৯৪৯ খৃ. পর্যন্ত ফাতেমীয়দের রাজধানী ছিল। চতুর্থ খলিফা আল্ মুইজের প্রধান সেনাপতি গওহর ৯৬৯ খৃ. আল কাহিরা বা কায়রোকে নতুন রাজধানী ঘোষণা করেন। ১১৭১ খৃ. আইয়ূবী বংশের গাজী সালাহউদ্দীনের হাতে ফাতেমী শাসন অবসানের পূর্ব পর্যন্ত আল-কাহিরা তাদের শ্রেষ্ঠতম রাজধানীতে পরিণত হয়। এ দু'শ বছরেরও বেশী সময়কালে ফাতেমীয়রা কায়রোকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন অনেক ধর্মীয় ও লোকায়ত ইমারত। কালের স্রোতে এর অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত, যেটুকু রক্ষা পেয়েছে অথবা ভগ্নাবশেষ রক্ষিত হয়েছে ফাতেমীয় স্থাপত্য বলতে মূলতঃ সেগুলিকে বুঝানো হয়। উমাইয়া-স্পেন স্থাপত্যরীতি ছিল তাদের স্থাপত্যের ভিত্তি। পারস্য স্থাপত্য ধারা হতেও ফাতেমীয়রা অনেক কিছু গ্রহণ করে। মাহদীয়া ও কায়রো নগর নির্মাণ, সাবা বানাত, আসওয়ানের সমাধিসমূহ, বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মিনার, আল জুয়ূশীর মসজিদ, কায়রোর প্রাচীর ও তোরণের পুনঃনির্মাণ, আসওয়ানের মাশহাদ, আল আকসার মসজিদ, সালিহ তালাই'র মসজিদ ফাতেমীয় স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। তবে ফাতেমীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন আল আজহার মসজিদ, আল হাকিমের মসজিদ ও আল আকসার মসজিদ। নিম্নে-এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

১. আল আজহার মসজিদ ঃ

আজকের মিশরের ভুবনবিখ্যাত আকর্ষণ আল আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি ভিত্তি এই মসজিদ। ৯৭০-৭২ খৃ. গওহর এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। আবদুল আযীযের (৯৭৫-৯৯৬) আমলে মন্ত্রী আবুল ফারাগের (ইয়াকুব বিন কিলিস নামেও পরিচিত) পরামর্শক্রমে ৯৮৯ সালে মসজিদে মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস আরম্ভ হয়। তখন হতে আজতক্ প্রায় এক হাজার বছর এই মসজিদ অগণিতবার পরিবর্ধন ও পুনঃনির্মাণ করা হয়, ফলে ফাতেমীয় আমলের প্রাচীন স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণা অনুযায়ী মসজিদটির উত্তর পশ্চিম দেয়ালের পরিমিতি ছিল ২৭৮ ফুট, দক্ষিণ-পূর্ব

দেয়াল ২৭৯.৭৫ ফুট, উত্তর-পূর্ব দেয়াল ২২৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দেয়াল ২২৩.৫ ফুট বিশিষ্ট। মসজিদের কিবলা প্রান্তে দুই গম্বুজ ফাতেমীয়দের নতুন বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের জমকালো বৈশিষ্ট্যের কারণে এর নাম দেয়া হয়েছিল 'আজহার'; কোন কোন মতে, নবী নন্দিনী ফাতিমা জাহরা (রা.)-এর নামানুসারে আল আজহার নাম রাখা হয়।

২. আল হাকিমের মসজিদ ঃ

ষষ্ঠ ফাতেমী শাসক আবু আলী মনসুর আল হাকীম ৯৯০ খৃ. এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১০০৩ সালে এই নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অসম আয়তাকার আদর্শ ডিজাইনে নির্মিত এর উত্তর-পূর্ব পরিমাপ ৩৫৬ ফুট, দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬৫১ ফুট, উত্তর-পশ্চিমে ৩৯৮ ফুট এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩৯৬ ফুট ছিল। মসজিদটি সাধারণভাবে ইবনে তুলুন ও আল আজহারের পরিকল্পনায় নির্মিত। তবে ইহার প্রধান তোরণ ও পার্শ্ববর্তী বর্গাকৃতি বুরুজসমূহ মাহদীয়া মসজিদের বৈশিষ্ট্য হতে অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়। মসজিদের উত্তর মিনারটি ছিল অন্যান্য মিনারের তুলনায় বৈশিষ্টমণ্ডিত। ইবনে তুলুনের মসজিদের মিনারটি একই ধরনের বর্গাকার ভিতের উপর গোলায়িতভাবে নির্মিত হলেও উপরে উঠার পেঁচালো রাস্তাটি মিনারের বাইরের দিকে ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরে পেঁচালো সিঁড়ি বিশিষ্ট গোলায়িত মিনার সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সমকালীন স্থাপত্যে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সেলজুক স্থাপত্য

প্রাচীনকাল থেকেই বহু আরব গোত্র মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার উর্বর এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। আব্বাসীয় খলীফাগণ হীনবল হয়ে পড়লে এ সকল গোত্র ক্রমে শক্তিশালী হয়ে স্বাধীন আরব রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন এবং দশম শতাব্দীতে তারা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার অধিকাংশ এলাকা করায়ত্ব করে ফেলে। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক নামক জনৈক তুর্ক সর্দারের বংশধরগণ আরবদের এ আধিপত্য করায়ত্ব করে এবং তাদের পরিচালিত এক প্রবল শক্তিশালী বাহিনী গজনবীদের হাত হতে পারস্য কেড়ে নিল। এরপর আরব, কুর্দ, আফগানিস্তান, গ্রীক, মিশর হতে এশিয়া মাইনর প্রভৃতি ভূখণ্ড ব্যাপী এক বিরাট সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং এশিয়া মাইনর তাদের প্রধান কেন্দ্র ও কর্মস্থল ছিল। তাই এ সকল এলাকায় সেলজুকদের প্রধান স্থাপত্য গড়ে উঠে।

সেলজুক স্থাপত্য এবং তৎসংলগ্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রফেসর এ.কে.এম ইয়াকুব আলী লিখেছেন : 'সেলজুক তুর্কীরা উদ্ভাবনী চিন্তা দিয়ে নূতন কোন কিছু সৃষ্টি করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা স্থানীয় স্থপতি ও শিল্পীদিগকে আঞ্চলিক স্থাপত্য গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছেন। সেলজুকদের সময়ে মসজিদ স্থাপত্যের সাথে মাকবারা ইমারত এবং মাদরাসা স্থাপত্য ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। পারস্যে মসজিদ স্থাপত্যের সাথে গম্বুজের সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের ন্যায় মাদ্রাসা ইমারতে ও মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত চত্বরকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে বক্রাকৃতি (vault) পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত বা খিলান ওয়ালা ছাদ বিশিষ্ট 'ইওয়ান' গড়ে উঠেছে। মেসোপটেমিয়াতে স্তম্ভ সারির উপর সমতল ছাদ সংস্থাপনের ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে, তবে এককভাবে কিছু কিছু পারসীয় স্থাপত্য কৌশল এতে সংযোজিত হয়েছে। সিরিয়াতে জুল্লায় প্রধান গলিপথ (Transept) ছাড়া সমতল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সমাধি সৌধে গম্বুজ নির্মাণ একটি বিশেষ স্থাপত্য কৌশল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

মামলুক স্থাপত্য

১২৫০ হতে শুরু করে ১৫১৭ খৃ. পর্যন্ত প্রায় ২৬৭ বছর ধরে প্রধানতঃ মিশর, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে মামলুক শাসন জারী ছিল। এই বংশের শাসনকাল মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। প্রধানতঃ আল বায়বারস, কালাউন, আল নাসির, মুহাম্মদ, সুলতান বারকুক ও সুলতান কায়েত বে প্রমুখ নৃপতি এ বংশের স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মামলুকরা স্থাপত্যশিল্পে নূরিদ ও আইয়ুবী সুলতানদের ঐতিহ্য গ্রহণ করেছিলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে বাগদাদ ও দামিশ্কের বহু শিল্পী ও কারিগর পালিয়ে মিশরে চলে আসে। তাদের এ আগমনের ফলে মামলুক স্থাপত্যে সিরীয় ও মেসোপটেমীয় প্রভাব পড়তে থাকে। ক্রুসেডারদের পতনের ফলে উত্তরের দেশগুলো হতে প্রচুর পাথর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, ফলে মামলুকরা এতদিনকার উপাদান ইটের পরিবর্তে পাথর ব্যবহার শুরু করে। মামলুক স্থাপত্যের আলঙ্করিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক রেজা-ই-করীম লিখেছেন ঃ 'হালকা গম্বুজগুলোর বহির্ভাগে সৌন্দর্য ও অলংকরণ দৃষ্টিগোচর হতো। ইমারতের অলংকরণে বাইজানটাইন প্রভাব ছিল। কুফিক লিখন পদ্ধতি, অ্যারাবেস্ক ও জ্যামিতিক অলংকরণসহ অন্যান্য মুসলিম স্থাপত্যের রীতিগুলো মামলুকদের ইমারতে পরিলক্ষিত হতো। মামলুক স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শনগুলো আজও

বর্তমান রয়েছে। সাদা ও লাল রং-এর বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে কাইতবের মসজিদের গম্বুজে বৈচিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর অলংকরণে লতাপাতা ও ফুলের ব্যবহার রয়েছে।

মুসলিম ভারতের স্থাপত্য কীর্তি ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বহুভাগে বিভক্ত। মুসলিম একাধিক রাজবংশ এখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো শত শত বছর ধরে। এই পৃথক সত্তার কারণে এখানকার মুসলিম স্থাপত্যও মিশ্র প্রভাব বিকিরিত করেছে।

৭১২ খৃ. মুহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু বিজয় করলে উপমহাদেশে মুসলিম সভ্যতা আগমনের দ্বার উন্মোচিত হয়। কিন্তু এ বিজয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটাতে পারেনি। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদ একাধিকবার ভারত আক্রমণ করলেও এখানে শাসন ক্ষমতা স্থাপন করেননি, ফলে তখন ভারতে স্থাপত্য নিদর্শনও গড়ে উঠেনি। অথচ তিনি গজনীতে অনেক মনোরম হর্ম্যরাজি, মসজিদ ও বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। গজনীর স্থাপত্যরীতি পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মোহাম্মদ ঘোরী ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তখন থেকে ১৭৫৭ সালের পলাশী ট্রাজেডী পর্যন্ত মুসলমানরা উপমহাদেশে রাজত্ব করে। এ সুদীর্ঘ সময়ে অনেক বিষয়ের মতো স্থাপত্যেও তাদের স্মরণীয় অবদান যুক্ত হয়। উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. দিল্লী সালতানাতের স্থাপত্যরীতি
২. মুঘল রাজকীয় স্থাপত্য এবং
৩. প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্থাপত্য

সুলতানী স্থাপত্য রীতিতে বহুলপ্রজ ছাপ পরিলক্ষিত হয়। কেননা এ বিভাগে মামলুক, খলজী, তুঘলক, সাইদ, সুরী ও লোদী প্রভৃতি রাজবংশ পর্যায়ক্রমে ভারত শাসন করে। মামলুক আমলে নির্মিত স্থাপত্যে হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। এ সময় নির্মিত ইমারতগুলোর উপাদান প্রধানতঃ হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ থেকে গৃহীত। এগুলো কাটছাট করে ব্যবহার ছাড়াও স্থানীয় স্থপতিদের নিয়োগের ফলে স্বভাবত: স্থানীয় প্রভাব পড়বে-এটাই স্বাভাবিক।

মামলুক স্থাপত্যের মধ্যে ১১৯৭ খৃ. কুতুব উদ্দীন আইবেক নির্মিত 'কুওয়াতুল ইসলাম' মসজিদ ও তার অদূরে 'কুতুব মিনার' বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মসজিদের ভূমি পরিকল্পনা আয়তাকার এবং পরিমাপ ২১২×১৫০ ফুট। প্রায় ২৭টি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপকরণ এতে ব্যবহৃত হয়। এর স্তম্ভ, খিলান, জুল্লাহ ও গম্বুজ নির্মাণে মূর্তিস্তম্ভগুলো কাটছাট করে লাগানো হয়। মসজিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হলো এর জুল্লার সামনে নির্মিত পাঁচটি খিলানের একটি স্ক্রীন। ১০৮ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট উচ্চতার এ খিলানের অলংকরণের জন্য আরবী লিপি, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর। মহিলা গ্যালারী ২০ বর্গফুট আয়তনের ২টি গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত। আযানের জন্য মসজিদের পূর্বে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মিত হয়। বিখ্যাত সাধক কুতুব উদ্দীন কাকীর নামে এর নাম রাখা হয় 'কুতুব মিনার'। এ মিনার পরবর্তীতে বিজয় স্তম্ভরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ২২৫ ফুট উচ্চতার চার তলা বিশিষ্ট এই মিনারের কাজ শেষ করেন সুলতান ইল্‌তুত্‌মিস। ১৩৭৮ সালে বজ্রপাতে উপর তলা ক্ষতিগ্রস্থ্‌ হলে ফিরোজ শাহ উহা মেরামত করে আরো একটি তলা সংযুক্ত করেন ফলে ইহার উচ্চতা দাঁড়ায় ২৩৪ ফুটে। নিচের তলাগুলো ধূসর স্ফটিক পাথরের তৈরী এবং উহার উপর লাল বেলে পাথরের সংস্থাপন করা ছিল; খোদাইয়ের অপূর্ব কারুকাজ এবং কুরআনে উৎকীর্ণ লিপি ইহাকে সংযত সৌন্দর্য দান করে। ১২০০ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আইবেক রাজপুতনা দখলের পর আজমীরে 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া মসিজদ' নির্মাণ করেন। 'কুওয়াতুল ইসলাম' মসজিদের চেয়ে এটি আয়তনে বড় হলেও স্থাপত্য রীতিতে একই ইন্দো-মুসলিম রীতিতে নির্মিত।

খলজীদের আগমন উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। হিন্দু স্থাপত্য কৌশল বর্জন এবং খিলান ও গম্বুজের বর্ধিত ব্যবহার, তাছাড়া ইমারতের সুষমাবৃদ্ধির জন্য কারুকার্য ও অলংকরণের মাত্রা এসময়কার স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দরগায় নির্মিত 'জামাআত খানা মসজিদ' এবং আলাউদ্দীন খলজী নির্মিত 'আলাই দরওয়াজা' এ সময়কার স্থাপত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

তুগলক, সাইয়েদ, লোদী ও সুরীদের আমলে নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে কৃচ্ছতার ছাপ ফুটে উঠে। তবুও গিয়াসউদ্দিন তুগলক নির্মিত 'তুগলকবাদ কেল্লাটি' ধ্বংসস্তূপ হয়েও আজ খ্যাতির অধিকারী। ফিরোজশাহ তুগলক বহু নগর, দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে ফতাহ্‌বাদ, হিসার ফিরোজা, কোটলা ফিরোজ শাহ্‌ অন্যতম। পরবর্তী সুলতানদের নির্মিত মাকবারাগুলো স্থাপত্য খ্যাতির অধিকারী।

মুগল স্থাপত্য শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। অনুপম কারুকাজ, আরবী উৎকীর্ণ লিপির রেখা, পর্দার জালি কাজ, মোজাইক নকশা ও পাথরের সাজসজ্জা এ যুগের স্থাপত্য শৈলীর বৈশিষ্ট্য। বাগানের মাঝে আকবারা তৈরীর প্রথা মোগল আমল থেকে শুরু হয়। পারসীয় এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলিত প্রভাব এ সময়কার স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান দিক। মাকবরের হাতে শুরু হয়ে শাহজাহানের হাতে চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মুগল স্থাপত্য। হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, আকবরের ফতেহপুর সিক্রির ইমারতসমূহ, ইতেমাদ্‌দৌলার মাজার, আগ্রার তাজমহল, মোতি মসজিদ, লাহোরের বাদশাহী মসজিদ প্রভৃতি মুগল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। স্থাপত্য হিসাবে এর কোন কোনটার অবস্থান বিশ শতকে এসেও মধ্যাহ্নে সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্থাপত্যে ভারতীয় মূল কেন্দ্রের প্রভাব পড়েছে। তবুও প্রাদেশিক মসজিদ, প্রাসাদ ও ইমারতসমূহের গঠন ও অলংকরণে স্থানীয় স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য এগুলোকে স্বাতন্ত্রতা দান করেছে। উদাহারণত: বলা যায়, ইট নির্মিত ইমারতে বাঁশের ন্যায় বক্রাকৃতি ছাদ, একাধিক গম্বুজের সন্নিবেশ এবং পোড়া মাটির কারুকাজ বাংলার স্থাপত্যে স্বাতন্ত্রতা দান করেছে; আবার জৌনপুরের প্রাদেশিক স্থাপত্যে প্রবেশ পথের দু'পাশে উচ্চ আয়তাকার বুরুজ (propylon) স্থাপন করে উহার স্বাতন্ত্র নির্দেশ করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও উপমহাদেশের স্থাপত্যের মধ্যে এক অদ্ভুত ঐক্যসূত্র নিবিড়ভাবে তাকালেই লক্ষ্য করা যাবে।

বহু সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব যেমন মুসলিম স্থাপত্যে পড়েছে তেমনি মুসলিম স্থাপত্যের নিজস্ব কিছু দান রয়েছে যা অন্যান্য সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এতদাঞ্চলে উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য যে প্রভাব বিস্তার করেছে , তা একটু পরেই উল্লেখ করা হবে। ইউরোপের পিসা, জেনোয়া, সিয়ালা, ফিরেঞ্জে ও ইটালীয় অন্যান্য শহরে মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ বর্তমান। ইংরেজী 'S' আকারের খিলান ও টিউডর খিলানও মুসলিম রীতি হতে উদ্ভূত। দেয়াল কাজের অলংকরণ ও নক্সা এবং গম্বুজ নির্মাণের মুসলিম রীতি ইউরোপীয় স্থাপত্যে চিরস্থায়ী ছাপ রেখেছে।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য ও তার প্রভাব ঃ

১২০১ খৃ. বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় করেন। বাংলার সনাতন স্থাপত্যের ইতিহাস এটি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তুর্কী বিজয়ের এই ঘটনা এদেশের স্থাপত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী লিখেন : 'তুর্কী মুসলমানগণ

এক উন্নত স্থাপত্য ঐতিহ্য নিয়ে বিজয়ী বেশে বাংলায় প্রবেশ করেন। তাঁরা যে স্থাপত্য অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন তা এদেশের স্থাপত্য কাঠামোতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। মধ্য এশীয় এবং পারসিক প্রভাব বাংলার স্থাপত্যিক অবকাঠামোতেও অলংকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে বিজয়ী মুসলমানগণ তাঁদের সুচিন্তিত ইমারত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে এদেশের কারিগর, স্থাপত্য কৌশলী ও অলংকরণ শিল্পীদের নিয়োগ করেছেন। ফলে মুসলিম শাসনামলে গড়ে উঠা ও দেশের স্থাপত্য ইমারতগুলোতে দেশীয় ও আঞ্চলিক অনেক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে।"

বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রবেশ এবং শিল্পকলার বিকাশ প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। কারণ এতদাঞ্চলের অধিবাসীর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। ফলে এখানে মুসলিম স্থাপত্য কলার ক্রমঃ প্রসার মুসলিম কেন্দ্রীয় উৎকর্ষের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্যে খিলান এবং গম্বুজ ছিল সম্পূর্ণ নতুন যা তুর্কী প্রভাবে এখানে প্রথম যুক্ত হয়। গবেষকের ভাষায়, "তুর্কী মুসলমানরাই প্রথম এদেশে খিলান ও গম্বুজ তৈরীর কৌশল নিয়ে আসেন। আগে খিলান করে ইমারত তৈরীর কৌশল এদেশের স্থানীয় লোকদের কাছে ছিল অজানা। এদেশের বাড়ীঘরেও দেবমন্দিরে গম্বুজ বানান হতোনা। খিলান ও গম্বুজ এদেশের সনাতন স্থাপত্যরীতিতে বৈচিত্র্য আনে। তুর্কীরা এদেশে এসে তাঁদের ইমারত তৈরীর কাজে প্রধানতঃ ব্যবহার করতেন মাটি-পোড়ান লাল ইট। উপকরণের দিক থেকে এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হয়েছে তুর্কী স্থাপত্যে থেকে অনেক আলাদা।"

তদ্রূপভাবে ভারতীয় স্থাপত্যেও নতুন পদ্ধতির প্রসার ঘটে। স্যার জন মার্শাল তাঁর "Cambridge History of India" গ্রন্থে লিখেন- "Thanks to the strength of their binding properties is was possible for the Muslim builders to achieve effect of grandeur such as the Indians had never dreamt of." "সু খিলান ও বিশাল গম্বুজের সাহায্যে এবং আরও বিবিধ উপায়ে মুসলমানরা তাদের অট্টালিকাগুলোকে যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ করতে সক্ষম হন, ভারতীয়রা কখনো স্বপ্নেও তার কল্পনা করতে পারেনি।"

মুসলিম বিজয় ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত করে। তারা চাঁদ লিখেছেন, "মুসলিম বিজয় ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে...। এ সময়কার ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পেও এই ধরনের সমন্বয় প্রবণতা দেখা

দেয়। হিন্দু রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও স্মৃতিসৌধগুলি আর বিশুদ্ধ প্রাচীন শৈলীতে নির্মিত হচ্ছিল না। তারা শুধু মুসলিম স্থাপত্য কলার নানা উপাদানই যুক্ত করেনি, একটা নতুন চেতনার উন্মেষও ঘটিয়েছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল পুরানো নান্দনিক বোধ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ ছাড়া এই প্রভাব দেশের কোন নির্দিষ্ট এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকছিল না"।

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের যুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সুলতানী যুগ এবং মুঘল যুগ। লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল হতে শুরু করে মুঘলদের বাংলা বিজয় পর্যন্ত (অর্থাৎ ১২০৪-১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ) সুলতানী যুগ। আর মুঘল যুগ ১৫৭৬ খৃ. হতে নবাব সিরাজদ্দৌলাহ'র পতন অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। এই দুই বিভক্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যা উভয় যুগে মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকলেও মুঘল যুগে গড়ে উঠা স্থাপত্য সুলতানী যুগের স্থাপত্য হতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মুসলিম শাসনামলে গড়ে উঠা স্থাপত্যকলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো ঃ ধর্মীয় স্থাপত্য- মসজিদ, মাদ্রাসা, ইবাদতগাহ, খানকাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরের উপর মাকবারা এ ধরনের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি হলো ঃ রাজপ্রাসাদ, গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ, সেতু, সেনাছাউনি, প্রশাসনিক কার্যালয় ইত্যাদি এগুলো লৌকিক স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত।

সুলতানী আমলে নির্মিত স্থাপত্যে ছিল এযুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ধনুক সাদৃশ্য ছাদ, চৌচালা ও অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজ ছিল প্রাথমিক শৈল্পিক নিদর্শন। এতে সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছে আবহমান বাংলার বাঁশ শিল্প। বাংলাদেশের মানুষ থাকতো বাঁশ ও খড়ের তৈরী দুচালা ও চৌচালা গৃহে। এই আকার-আকৃতিই পরবর্তীকালে ইট দিয়ে তৈরী ইমারতের আকৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকে তাই এই স্থাপত্যরীতিকে Bamboo style হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন, "সুলতানী আমলের বিশেষ করে হোসেন শাহী আমলের মসজিদগুলির আকার বাংলাদেশের চারচালা ঘরের মতো। এসব মসজিদের কার্ণিশ (Cornice) খড়ে ছাওয়া বাঁশের চারচালা ঘরের চালের মত বাঁকা। সুলতানী আমলের অনেক মসজিদের গম্বুজের আকার অর্ধগোলাকৃতি বাটির মত। এদের আকার আকৃতি মনে করিয়ে দেয় বৌদ্ধস্তূপের কথা। কিন্তু কোন কোন মসজিদের এরকম গোল গম্বুজের সারির মধ্যে দেখা যায়, কতগুলো গম্বুজকে করা হয়েছে বাংলাদেশের চারচালা ঘরের মতো। অন্য কোন দেশের মসজিদে এ ধরনের গম্বুজ তৈরীর নিদর্শন দেখা যায় না। এ হল

কেবলমাত্র বাংলাদেশের আপনরীতি। হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) তৈরী গৌড় এর (বর্তমানে বাংলাদেশের সীমানায় নবাবগঞ্জ মহকুমাতে) ছোট সোনা মসজিদ স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"

পোড়ামাটির ফলক এবং শিলাগাত্রে খোদিত দেশীয় লতাগুল্মের অনুকৃতি শিকল ঘণ্টা ইত্যাদি এ দেশীয় শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করে।

স্থাপত্যগত অবকাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুলতানী আমলের স্থাপত্যকে গবেষকরা চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রারম্ভিক পর্যায় (১২০৪-১৪১৪ খৃ.)
২. গঠন ও বিকাশ পর্যায় (১৪১৫-১৪৩৬)
৩. চূড়ান্ত পর্যায় (১৪৩৭-১৫৩৮)
৪. ক্রমাবনতির পর্যায় (১৫৩৮-১৫৭৬)

১. প্রারম্ভিক পর্যায় ঃ

ডক্টর এ কে এম ইয়াকুব আলীর মতে, 'সমকালীন মুসলিম বিশ্ব এবং বিজয়ী ও বহিরাগত মুসলমানদের দেশে গড়ে উঠা স্থাপত্যের অনুকরণে এ দেশে স্থাপত্যের যাত্রা শুরু হয়।" মুসলিম বিজয়ের পর হতে প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী বংশের পতন পর্যন্ত (১২০৪-১৪১৪) এ ধারা অব্যাহত থাকে। সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯৩) নির্মিত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ এ সময়ের এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ঐতিহাসিকদের মতে, আদিনা মসজিদ নির্মাণ সিকান্দার শাহের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদের দামিশ্‌কে নির্মিত মসজিদের আদর্শে এই বিশাল মসজিদ ১৩৬৪ থেকে ১৩৭৪ এই দশ বছরে তৈরী করা হয়। মসজিদটি ৫০৭.৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ২৮৫.৫ ফুট। উল্লেখ্য বাংলার বর্ষণমুখর আবহাওয়ার সাথে এ মসজিদ উপাযোগী না হওয়ায় পরবর্তীতে এর গঠনরীতি আর অনুসৃত হয়নি।

১২৯৮ সালে নির্মিত ত্রিবেনীর জাফর খান গাজী মসজিদ এবং উক্ত আদিনা মসজিদ (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মালদহে অবস্থিত) ক্ষয়িত ধারায় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এ সময়কার অধিকাংশ স্থাপত্যকীর্তি বিলুপ্ত। কারণ হিসেবে বলা হয়, এগুলোর নির্মাণ উপকরণ ছিল রৌদ্রস্নাত বা পোড়া ইট, যা দীর্ঘ সময়ের প্রতিকূল আবহাওয়ায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০) এর কবরে এক প্রাচীনতম ইমারতের অবশেষাংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। সম্ভবত ১৪১০ সালে নির্মিত বর্তমানে সোনার

গাঁ এর মোগড়াপাড়ায় এ সমাধিটি অবস্থিত। আযম শাহের ইমারতটি এমনভাবে লুণ্ঠিত ও অঙ্গহীন করা হয়েছে যে, প্রস্তর নির্মিত চমৎকার সার্কোফেগাস বা শবাধারটি ছাড়া সমাধির অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জেমস ওয়াইজের বর্ণনা মতে, সমাধিটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু একসময় ইহার মাঝখানে স্থাপিত বিরাট প্রস্তর খণ্ডটি নিয়ে গঠিত ছিল বিশাল সৌধ। এ প্রস্তর খণ্ডটি আবার ছিল পাঁচ ফুট উঁচু স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এসব পাথরের টুকরা ছিল চমৎকারভাবে খোদাই করা। এদের কোণগুলো এবং জ্যামিতিক নকশার গতিময়তা কারিগরের নির্মাণকালে যেমন ছিল এখনো তেমনি অম্লান রয়েছে। পাথরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন কালো ব্যাসাল্ট দ্বারা গঠিত ছিল। মুসলিম শিল্পরুচির উত্তম পরিচায়ক ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সমাধির চেয়ে ভাল কোন ইমারত পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার কোথাও নেই।

২. গঠন ও বিকাশ পর্যায় ঃ

রাজা গনেশ বংশের স্থাপত্য এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে। এসময় বৈদেশিক ও স্থানীয় মিলে একটা শংকর স্থাপত্যরীতি আত্মপ্রকাশ করে। হযরত পাভুয়ায় অবস্থিত রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৫-৩১) একলাখী পরিচিত সমাধি সৌধ এর পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, রাজা গণেশের পুত্র যদু বিখ্যাত সাধক নুর কুতুবুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন। জালালুদ্দীনের নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আহমদ হাসান দানী লিখেছেন ঃ But for the hemispherical dome that covers the roof the building tries to tepresent in brick all thous features that characterise a bamboo hut. With the evolution of this buiding the Muslim architecture in Bengal found for the time being a solution of its architectural demands, in which the local characteristics were impressed over the general Muslim pattern."

৩. চূড়ান্ত পর্যায় ঃ

মুসলিম স্থাপত্যের সমৃদ্ধ অধ্যায় মাহমুদ শাহী আমল হতে হোসেন শাহী আমলের শেষ পর্যন্ত (১৪৩৫-১৫৩৮)। এ সময় বাংলার রাজধানী ছাড়াও দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, সেতু, খানকা চিল্লাখানা ও দুর্গ সুষম স্থাপত্যিক পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। প্রধানতঃ মসজিদ স্থাপত্যই এ সময় নিজস্ব গতিতে ও গ্রহণযোগ্য নির্মাণশৈলীতে বিকাশ লাভ করে। এগুলোরই বাংলার স্থাপত্যের শীর্ষে অবস্থান করছে।

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫-১৪৬০) গৌড়ের বিখ্যাত সেনানী দরজা বা কোতওয়ালী দরজার নির্মাতা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্য পশ্চিমে বিহারের ভাগলপুর, দক্ষিণে হুগলী জেলা এবং পূর্বে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সময়েই বাগেরহাটের স্বনামধন্য সাধক ও সেনাপতি খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন। খান জাহানের সমাধি মসজিদ ও দীঘি এখনও বর্তমান। তাঁর নির্মিত ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ।

ষাট গম্বুজ মসজিদ আকার ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণ ১৬০ ফুট এবং ভিতরের অংশ ১৪৩ ফুট লম্বা। পূর্ব-পশ্চিমের দিকে ১০৪ ফুট লম্বা এবং ভিতরের অংশ চওড়ার ৮৮ ফুট। দেয়ালের ঘনত্ব ৮.৫ ফুট। পূর্বদিকে ১১ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৭টি দরজা। চারকোণে ৪টি বিশাল মিনার। অভ্যন্তরে ৬০ টি স্তম্ভ। স্তম্ভ এবং দেয়ালের উপর গড়া হয়েছে একের পর এক গম্বুজ। ষাট গম্বুজ নামকরণ হলেও মসজিদে সর্বমোট গম্বুজ আছে ৭৭টি। রাজমহল থেকে পাথর এনে মসজিদটি নির্মিত হয়।

সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১) নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে মালদহের সাতকাহন মসজিদ, গৌড়ের কদমরসূল মসজিদ, দরাসবাড়ী জামে মসজিদ এবং তাঁতীপাড়া মসজিদ উল্লেখযোগ্য। সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৭-১৪৯০) গৌড়ে একটি মসজিদ, একটি মিনার ও একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। 'ফিরোজ মিনার' এর নির্মাতা রূপে মিঃ কার্নিংহাম নির্দেশ করেছেন সাইফ উদ্দীন হামজা শাহকে (১৪১২)। ফিরোজ মিনার ৮৪ ফুট উঁচু এবং বেড় ৬২ ফুট। এতে ৭৩ ধাপের একটি পেঁচালো সিঁড়ি আছে। মিনারের মাথায় একটি গম্বুজ এবং পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ ছিল। যা এখন আর নেই। জানা যায়, ফিরোজ মিনার তৈরী হয়েছিল বিজয়স্মৃতি রক্ষা এবং আযান দেওয়ার জন্য। মিনারটি একটা বড় দীঘির পাড়ে অবস্থিত।

হোসেন শাহী আমল (১৪৯৩-১৫৩৮) ছিল মুসলিম বাংলার অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম যুগ। ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য হচ্ছে, 'প্রাক-মোঘল যুগে হোসেন শাহী আমল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ। ... তাঁহার সময়ের অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাঁহার উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি এবং মুদ্রা পাওয়া যায়।'

বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং তাঁর পুত্র নাসির উদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১)

আমলে। তাঁদের নির্মিত মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপনা যার কারুকার্য এদেশের স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সুলতান নুসরত শাহ গৌড়ের কদম রসুল ভবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি পবিত্র পদচিহ্ন স্থাপন করেন। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃত এই অট্টালিকা ভবনের আয়তন হচ্ছে ৬৩ ফুট ৩ ইঞ্চি ×৪৯ ফুট ১০ ইঞ্চি। প্রধান প্রকোষ্টের মাপ ২৫×১৫ ফুট। দেয়ালগুলো ৫ ফুট পুরু এবং তিনপাশে ৯ ফুট চওড়া বারান্দা অবস্থিত। নির্মাণ কাল ৯৩৭ হিজরী (১৫১৩ খৃ.) নবীর পদচিহ্নটি গম্বুজের কালো মার্বেল পাথরের একটি ছোট খোদাই করা বেদীতে রক্ষিত ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলাহর রাজত্বকালে এটি মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। মীর জাফর এটাকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। জানা যায় এটি একবার চুরি হয়ে যায়, পরে পুলিশ উদ্ধার করে। মখদুম জাহানিয়া গাস্ত নামক একজন দরবেশ এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নটি আরব দেশ থেকে প্রথম আনেন। কদম রসুল অট্টালিকাকে ঘিরে পার্শ্বোপরি গড়ে উঠেছিল বিশ্রামাগার, মাকবারাহ, জালালী দীঘি, চিকা মসজিদ, গোমতি ফটক, লুকোচুরি ফটক প্রভৃতি অমূল্য স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী।

হোসেন শাহ নির্মিত রাজশাহীর চাঁপাই নওয়াব গঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছোট সোনা মসজিদ এবং নুসরত শাহ্ নির্মিত বড় সোনা মসজিদ (ভারতের অন্তর্ভুক্ত) স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় গৌড়ের ঐতিহাসিক এলাকার অধিকাংশই পড়ে ভারতে আর যে অংশ বাংলাদেশে পড়ে তা উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে স্থাপত্যকীর্তি রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। একলাখী মসজিদ (১৪১২) জাহানিয়া মসজিদ (১৫৩৮), আদিনা মসজিদ (১৩৭৪) ক্ষুটি মসজিদ (১৪৯০) বাঘা মসজিদসহ অন্যান্য সমাধি স্থান সুলতানী আমলের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি।

৪. ক্রমাবনিত পর্যায় ঃ

১৫৩৮ সালে হোসেন শাহী বংশের পতনের পর হতে ১৫৭৬ সালে মুঘলদের বাংলা অধিকার পর্যন্ত এই সময়ের বিস্তৃতি ধরা হয়। এ সময় শুরী ও কাররানী বংশের শাসকরা কেবল হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেন। রাজনৈতিক ডামাডোল ও বিশৃংখলার কারণে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়। রাজশাহীর মান্দা জিলার অন্তর্গত কুসুম্বা মসজিদ খানিকটা এ যুগের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এটি লম্বা ৫৮ ফুট এবং চওড়া ৪২ ফুট, এর ইটের দেয়ালগুলো ৬ ফুট

পুরু। ছোট আকারের ৬টি গম্বুজ, ৪টি মিনার এবং ভেতরে পাথরের তৈরী দুটি স্তম্ভ। কয়েকটি দরজা এবং চমৎকার ৩টি মেহরাব আছে। নির্মাণকাল ৯৬৬ হিজরী।

এরপর আসে মুঘল আমল। মুঘল যুগের স্থাপত্য সুলতানী যুগের স্থাপত্য থেকে কৌশল ও প্রক্রিয়াগতভাবে ভিন্নতর। রাজশাহীর গৌড়াঞ্চলের শাহ সুজা মসজিদ ও শাহ নেয়ামতুল্লাহ সমাধি সৌধ মুঘল স্থাপত্যের প্রাদেশিক পর্যায়ভুক্ত। শিল্পতাত্ত্বিক গবেষকরা মুঘল যুগকে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির নেতিবাচক দিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ড. এবনে গোলাম সামাদ লিখেন- "মুঘল আমলে এদেশের স্থাপত্যের কোন উন্নতি হয়নি; বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে- বিশেষ করে মসজিদ নির্মাণে। এই আমলে যেসব মসজিদ তৈরী হয়েছে তার কোন কোনটির সঙ্গে দোচালা কুঁড়ে ঘরের আকৃতির মত ঘর ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঢাকার করতলব খানের মসজিদের কথা উল্লেখ করা চলে। ... মুঘল আমলে এদেশে মসজিদ তৈরী হয়েছে অনেক। কিন্তু তাদের স্থাপত্য খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হল ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ। মসজিদটির আকৃতি ও গঠন কৌশল এদেশের অন্যান্য মসজিদ থেকে আলাদা। এই রীতির মসজিদ এদেশে আর কোথাও দেখা যায় না।"

সুলতানী আমলের তুলনায় মুঘল বাংলার স্থাপত্য শিল্পে বৈচিত্র্য তেমন না থাকলেও একেবারে যে নেই তা নয়। একটু আগেই সাত গম্বুজ মসজিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার পশ্চিম সীমানায় এই মসজিদ অবস্থিত। নির্মাণকাল এবং নির্মাতা সম্পর্কে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় ১৬৮০ সালের দিকে শায়েস্তা খান এ মসজিদ দুটি নির্মাণ করেন। দৈর্ঘ্য ৫৮ এবং প্রস্থ ২৭ ফুট। চারদিকের দেয়াল ৪ ফুট পুরু। চারদিকে অষ্টকোণ বিশিষ্ট মিনারের উপর ছোট আকৃতির ৪টি গম্বুজ। এ ছাড়া মূল গম্বুজ ৩টি। মোট ৭টি গম্বুজের কারণে সাত গম্বুজ সমজিদ বলা হয়। দু'পাশে আছে বারান্দা। মুঘল নির্মিত কোন মসজিদই এ রকম বারান্দা দেখা যায়না। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে কোন কারণে মসজিদ এলাকাটি পরিত্যক্ত হয়। নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহর (১৮৪৬-১৯০১) হস্তক্ষেপ এবং সাহায্যে মসজিদটি সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। কাঠামোগত দৃঢ়তার কারণে এবং পুনঃ সংস্কারের ফলে সাত গম্বুজ মসজিদ একটি দর্শনীয় স্থান বর্তমানেও।

ঢাকার লালবাগ কেল্লা বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের আরেকটি নিদর্শন। লালবাগ এলাকায় অবস্থিত দুর্গের প্রকৃত নাম 'কিল্লা আওরঙ্গবাদ'। সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আযম শাহ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার হিসেবে এখানে আগমনের পর বুড়ীগঙ্গার তীরে এই দুর্গ নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পিতার নির্দেশে তিনি বাংলা ছেড়ে চলে গেলে দুর্গের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

দুর্গটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২ হাজার ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে চওড়ার প্রায় ৮ শত ফুট। একাধিক প্রবেশ পথ আছে। লাল সুরকি ও পাতলা ইট দিয়ে এর দেয়াল নির্মিত। শুধু পুরাকীর্তি হিসাবে নয়, অনেক রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই দুর্গ। শুধু পুরাকীর্তি হিসেবে অতি আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যার স্মৃতিতে নির্মিত পরী বিবির মাজার। সাদা মার্বেল, বেলে পাথর ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে এটি নির্মিত হয়। চন্দন কাঠের অলংকৃত দরজা সুদৃশ্য মিনার, তামার পাতে ঢাকা গম্বুজ, সোনালী রং, কালো পাথরের কাজ সব মিলিয়ে এমন কারুকাজ খচিত সমজিদ বাংলাদেশে আর নেই। এছাড়া একই এলাকায় লালবাগ শাহী মসজিদ, মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, চক মসজিদ, তারা মসজিদ উল্লেখযোগ্য মুঘল স্থাপত্যকর্ম।

চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ, কুমিরা মসজিদ, বায়েজিদ বোস্তামী দরগা মসজিদ, চন্দনপুরা মসজিদ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যময়।

পটুয়াখালীর শ্রীরামপুরের কালে খাঁ মসজিদ, ঢাকার মূসা খানের মসজিদসহ মুঘল আমলের শত শত মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দু-মন্দিরে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক মন্দিরে গম্বুজ, খিলান করা হয়েছে। মন্দিরের ইটের নক্‌শায় পড়েছে ইসলামী নক্‌শা কলার প্রভাব। ডঃ তারা চাঁদ লিখেছেন, "বাংলার দিনাজপুরের নিকটবর্তী কান্তগরের মন্দির-এ সবই তাদের পূর্বসূরীদের স্থাপত্যকলার হিন্দু-মুসলিম রীতির মিলিত নিদর্শন। বাংলার এই মন্দিরটি মুসলিম শাসনামলে গৌড় মালদহ মসজিদের স্থাপত্যরীতির অনুসরণে নির্মিত এই শ্রেণীর প্রথম হিন্দু ইমারত। এটি ১৭০৪ থেকে ১৭২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত।"

ঢাকার তেজগাঁয় নির্মিত তেজগাঁ গীর্জাতে মুসলিম স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত। আনুমানিক ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এ গীর্জাতে কারুকাজ করা সুন্দর খিলান, বিভিন্ন নক্‌শা, ধনুকের মত বাঁকা ছাদ মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

এ প্রসঙ্গে ইতি টানার পূর্বে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, মুসলিম স্থাপত্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই স্থপতির নিজস্ব পরিচিতি গৌণ। সাধারণভাবে বিশেষ বিশেষ যুগ দ্বারাই স্থাপত্যকীর্তিসমূহের বিচার বিবেচনা হয়। কিন্তু আধুনিক কালে মুসলিম স্থাপত্যের গৌরবময় যুগ যখন পেছনে ফেলে এসেছে তখন স্থাপত্য কীর্তির সাথে স্থপতির নাম ও পরিকীর্তিত হয়। স্থাপত্য এখন দেশ ও ভূগোলের সীমানা পেরিয়েছে, কোন বংশ বা সীমারেখার ভেদ টানা এখন হয় না। সেক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত বাঙালি স্থপতি ফজলুর রহমান খান (১৯২৯-১৯৮২) এর অবদান বৈশ্বিক পটভূমিতে সেরা স্থপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন হিসেবে পরিচিত আমেরিকার Sears Tower-এর স্থপতি ছিলেন ড. এফ আর খান। ১৪৫৪ ফিট উচ্চতার এ ভবন এক বিস্ময়কর প্রযুক্তিতে তৈরী হয় ১৯৭০-৭৩ সালের মধ্যে। আমেরিকায় ১৯৬২ সালে নির্মিত ৩৮ তলা বিশিষ্ট Brunswich Building; ১৯৬৪ সালে ৪৬ তলা বিশিষ্ট ভবন Chestunt Deaitt Apartment; ১৯৬৫ সালে ১০০ তলা বিশিষ্ট John Hancock Center-এরও মূল স্থপতি ছিলেন তিনি। এছাড়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিমানবন্দর জেদ্দা এবং হজ্জ টেন্ট তাঁরই স্থাপত্য মেধার সেরা নিদর্শন। এ অবদানের জন্য তিনি 'আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার' লাভ করেন। Engineering News Record তাঁকে যথাক্রমে চারবার ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২ সালে বছরের সেরা স্থাপত্য মানব নির্বাচিত করে। অসংখ্য পুরস্কার ও খেতাবে তিনি ভূষিত হন। উঁচু ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Tubular System আবিষ্কার তাঁকে বিশ্বের স্থাপত্য ইতিহাসে অমর করে রাখবে। বাংলার সন্তান এই মনীষীর খবর আমরা না রাখলেও আমেরিকাবাসীরা ফজলুর রহমান খানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ শিকাগোর কেন্দ্রস্থলে ৮ ফুট মঞ্চের উপর নির্মাণ করেছে তাঁর ব্রোঞ্জ ও ষ্টেনলেস ষ্টীলের ১৫ ফুট দীর্ঘ এক আবক্ষ মূর্তি। উক্ত ভাস্কর্যের পেছনে খোদাই করে লেখা রয়েছে- 'The Structural Engineers Association of Illionis recognized Fazlur Rahman Khan one of the great Structural Engineers of our time.'

হস্ত লিখন শিল্প চর্চায় মুসলমান

হস্তলিপিকলা তথা Calliography শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ- সুন্দর লিখন কার্য। মুসলমানদের উদ্ভাবিত ও লিখিত আধুনিক আরবী হস্তলিপি কলা বর্তমানে এক রুচিশীল স্বীকৃত বিজ্ঞান। যন্ত্র সভ্যতার বিস্ময়কর যুগেও এ শিল্প আলাদা বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছে। এখনও হস্তলিপি শিল্পে অবাক করা কাজ হচ্ছে।

মুসলিম শিল্পকলাকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। স্থাপত্য, চিত্রকলা এবং হস্তলিপি কলা- এই তিন শ্রেণীর মধ্যে লিপিকলার স্থান বিশিষ্ট, কেননা এই বিভাগে মুসলিম লিপিকাররা নতুন জীবন এবং প্রতিষ্ঠা দান করেছে। Muslim Calliography গ্রন্থে ড. জিয়াউদ্দীন লিখেন, 'মুসলমানরা যে সকল শিল্পের চর্চা করতেন, তন্মধ্যে হস্তলিপিই ছিল সর্বাপেক্ষা রুচিঋদ্ধ।' ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান লিখেছেন, 'মুসলিম শিল্পকলার মধ্যে লিপিকলা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত। আরবদের মত অন্য কোন জাতি লিখন পদ্ধতিকে শিল্পকলার মাধ্যম হিসাবে গভীর মনোনিবেশের সাথে ব্যবহার করেনি।'

অন্যদিকে পারস্যবাসীদের মধ্যে লিখন শিল্পের যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং রীতি কৌশল ব্যাপকতা লাভ করেছে তা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। আরব ও পারস্যবাসীরা বহু মূল্যবান পাথর অপেক্ষা লিপিকলাকে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে থাকে।

অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের মতো মুসলমানরা হস্তলিপি শিল্পে কুরআনের মাধ্যমে প্রেরণা লাভ করে। কুরআনের ভাষা আরবীকেই তারা প্রাথমিক হস্তলিপির উপাত্ত হিসাবে গ্রহণ করে। ইসলামের প্রথম যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের তাগিদে তারা পাথর, চামড়া, কাঠের টুকরো, হাড় ইত্যাদির উপর কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন। কিছুকাল পর কুরআন গ্রন্থবদ্ধ করা হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্র বিশাল ব্যাপ্তি লাভের পটভূমিতে কুরআনের শিক্ষা, পাঠ এবং নকল করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষপাদ পর্যন্ত কাগজে লিখে রাখার প্রচলন

ছিলোনা। কাগজে লিখিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় বাগদাদে। চতুর্থ হিজরী শতকের শেষদিকে কাগজের প্রবর্তন হয়। ফলে লিপির জন্যও তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তখনও মুসলমানরা তাদের পূর্বসূরীদের মতো নিজ হাতে কুরআন লিপিবদ্ধ করতে গৌরব বোধ করতো। এই লেখা সুন্দর করার তাগিদ মুসলিম বিশ্বের হস্তবিদ্যার উন্নয়নে এক বিরাট ফলপ্রসূ অবদান রাখে এবং আদর্শ হিসাবেও গৃহীত হয়। আজ চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আরবী ভাষা ও আরবী হস্তলিপিকলার প্রচলন রয়েছে। ধর্তব্য যে, চিত্রাঙ্কন, মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি কুরআনের নিরুৎসাহ ও আপাত নিষেধাজ্ঞা চিত্রকলার দিকে মুসলমানদের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মুসলিম লিপিকলার উৎস পরিচিতি

প্রাক-ইসলামী আরবে এক ধরনের লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এটা মূলতঃ দুই প্রকারের। যথা- চক্রাকার এবং শিরোকোণ্য চক্রাকার লিপির সাথে প্রধানত বেদুঈনদের পরিচয় ছিল। প্রাক-ইসলামী কবি ইমরুল কায়েসের অনুকরণে A Volime of oriental staudies' গ্রন্থে বলা হয়, বাসগৃহের যে নিদারুন দৃশ্য আমি দেখেছি এবং যা আমাকে ভারাক্রান্ত করেছে তা দক্ষিণ আরবের তালপাতায় লিখিত চক্রলিপির সমতুল্য।' আর শিরোকোণ তথা শিলালিপি ছিল মূলতঃ উন্নতমানের, হাড়ের চওড়া অংশ, মৃৎপাত্র, সমান্তরাল সাদা পাথর কাঠ ও ধাতব পাত্র ইদ্যাদিতে এসব নিদর্শন রয়েছে। এসকল উৎস থেকে মুসলমানরা কুরআনকে অবলম্বন করে হস্তলিপিকলার বিকাশে উৎসাহিত হন।

মুসলিম লিপিকলার উদ্ভবের পূর্বে চীনের ইডিয়গ্রাফ, প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফস, সিনাই উপদ্বীপের সিনাইথীয়, ব্যাবিলনের কিউনিফরম, সেমেটিক বা সামী ভাষাসমূহের বর্ণমালা, ফিনিসিয়, গ্রীক ও ল্যাটিন বর্ণমালার পর আরবী বর্ণমালার উৎপত্তি ও ক্রমউন্নয়নে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। সেমেটিক ভাষাসমূহের মধ্যে আরবীর স্থান কনিষ্ঠ হলেও অন্য সব ভাষার চাইতে এর গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা এত বেশী যে, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগে ইহা আন্তর্জাতিক ভাষার গৌরব লাভ করেছিল। সেমেটিক ভাষাসমূহের তিনটি লিখন পদ্ধতির আরবী বর্ণমালা এবং লিখন পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিল। আরবী বর্ণমালার লম্ব দণ্ডের জন্য 'মাকালী' পদ্ধতি, গোলায়িত আকৃতির জন্য নাবাতীয় পদ্ধতি এবং স্বরচিহ্ন অক্ষর ইত্যাদি পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে

ব্যবহৃত কৌশলের জন্য 'সিরীয়' লিখন পদ্ধতি উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে মুসলিম লিপি শৈলীর বিকাশে অত্যাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে 'ম্যানিকিয়ানদের অনুসৃত রীতি। ম্যানিকিয়ান ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মনি। ২১৬/১৭ খৃ. ব্যাবিলনে তাঁর জন্ম। তিনি একজন ক্ষণজন্মা চিত্রকর ছিলেন, তাঁর গ্রন্থসমূহ তিনি অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রায়িত করেন। ম্যানিকিয়ান পাণ্ডুলিপিগুলো বহু মূল্যবান রং দিয়ে অত্যন্ত রুচিশীল উপায়ে সুশোভিত করা হয়েছিল। ৯২৩ খৃ. বাগদাদে যখন ১৪ বস্তা ম্যানিকিয়ান পাণ্ডুলিপি অগ্নিদগ্ধ করা হয় তখন এই ধ্বংসযজ্ঞ হতে সোনা ও রূপার একটি নহর বয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই এই উঁচু ধরনের শিল্প কর্মের প্রভাব মুসলিম লিপিকারদের প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান লিখেন, 'ইসলামী-লিপিকলার উদ্ভব ও বিকাশে অপরাপর হস্তলিপি পদ্ধতি অপেক্ষা ম্যানিকিয়ান রীতির প্রভাব ছিল সর্বাধিক। যদিও সিরীয়াবাসীরা সর্বপ্রথম মুসলমানদের লিপিমালাকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুপ্রাণীত করে তবুও ম্যানিকিয়ান ঐতিহ্যের অসামান্য প্রভাবের ফলেই লিপিকলা শিল্পকর্মের উচ্চমার্গে পৌছতে পেরেছিল।'

মুসলিম লিপিকলার বিকাশ

মুসলিম হস্তলিপি কলার বিকাশের স্তরগুলো প্রধানত নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত। যেমন ঃ

প্রাথমিক পর্যায় ঃ মহানবী (সা)-এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। হযরত উমার (রা.)-এর আমলে কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ না করেও এ শিল্পের ক্রমোন্নয়ন সাধিত হতে থাকে। হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে পরোক্ষভাবে মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ লাভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ আরবী লিখন শিল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় আবদুল মালিকের আমলে। তার আরবীয়করণ নীতির অনুসরণে সর্বস্তরে আরবী ভাষা চালু হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরবী হরফে নুক্তা প্রবর্তন করেন, আর এরপর আরবী লিপিতে দ্রুততার জন্য কৌণিকের পরিবর্তে গোলায়িত পদ্ধতি চালু শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ আব্বাসীয় আমলে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উন্নতির লগ্নে বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হতে থাকে। ফলে মুসলিম লিখন শিল্পের গতির সঞ্চার হয় এবং নানা প্রকার লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। আরবী লিপি এ সময় চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

<u>চরম বিকাশ পর্যায় ঃ</u> আব্বাসীয় আমলে মুসলিম হস্তকলা শিল্পের চরম উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে মামলুক, তৈমুরীয়, সাফাভী, ভারতীয় সুলতানী ও মোঘল আমলে, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় এর চরম বিকাশ ঘটে।

<u>আরবী লিপিকলার বৈশিষ্ট্য ঃ</u>

<u>১. আলংকরিক উৎকর্ষ ঃ</u> মুসলিম লিপিকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলংকরণ। আলংকরিক লিপিকলার একটি রেখা চিত্রকলার মত পটভূমির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। এর খাপ খাওয়ানোর গুণাবলী পরিবেশের সাথে একাত্ম করে রাখতে পারে এবং পরিবর্তে প্রদান করে লাবণ্য ও মাধুর্য।

<u>২. পেলব রীতি ঃ</u> আরবী বর্ণমালার সকল অক্ষর শেষ হয়েছে পেলব বড় বড় টানা রেখায়। যেখানে যেমন খুশী কৌণিক অথবা বক্রাকার রেখায় রূপান্তরিত করা যায়। এসকল অক্ষরের রেখাংশকে দীর্ঘয়িত এবং সংকোচন করা যায়। সমান্তরাল রেখার সাথে খাড়া রেখার সামঞ্জস্য বিধান অথবা বৈপরীত্য এমন ঐন্দ্রজালিক অভিপ্রায়ের সৃষ্টি করে যা সুমিষ্ট সংগীতের আবেশের সমতুল্য।

<u>৩. গতিময়তা ঃ</u> আরবী লিপিমালায় হস্তলিখন রীতিতে সমস্ত গুরুত্ব আরোপিত হয় গতিময় ও ছন্দোময় রেখায়। রোজার ফ্রাই বলেন, সম্ভবত রেখায় অসামান্য গতিময়তা ও সম্ভাবনার জন্য আরবী লিপিমালাকে আমরা অধিকতর মাধুর্যপূর্ণ বলতে পারি। শিলালিপির সরল রেখাগুলোকে লালিত্য ও ছন্দের সাথে আন্দোলিত হতে হবে, অন্যদিকে প্রতি চক্ররেখা এবং খাড়া রেখাগুলো পরস্পরের সাথে যেন ভারসাম্য বজায় রাখে। এভাবে ছন্দ গতিময়তা এবং লালিত্য লিপিকার সৃষ্টি করেন বাস্তব প্রতিফলনের মাধ্যমে নয় বরং এসমস্ত ত্রিমাত্রিক বস্তু থেকে আহৃত বিমূর্ত রেখার সাহায্যে।

<u>৪. রংয়ের সংযোজন ঃ</u> পারস্যের মতো স্পেনেও নীল সিন্দুর রং দ্বারা মসজিদ ও প্রাসাদসমূহ রং করা হয়। কখন কখন সমস্ত পৃষ্ঠদেশ লাল অথবা নীল রং দ্বারা শোভিত এবং তারপর বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে অলংকরণ করা হত। পৃষ্ঠদেশ লাল হলেও লিপিমালা লতা পাতা ও রৈখিক নকশা নীল, কাল, সবুজ ও হলুদ রং দ্বারা খোদিত হত। আল হামরার অলংকরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. পোপ বলেন ঃ 'আরাবেস্ক্ এবং নক্ষত্রের অনুরূপ মেডালিয়ান বা পদক রাজন্যবর্গ অথবা উৎফুল্ল ও লম্ফমান ঘোড়ার সওয়ারী বলিষ্ঠভাবে উৎকীর্ণ কুফী অথবা ছন্দায়িত ষ্টাকো বা খোদাই কাজের সূক্ষ্ম কুফী লিপিমালা যখন সোনালী ধাতু রং, সবুজ, ফিরোজা, তামাটে এবং কাল রংয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নকশা প্রভৃতি এক অনিন্দ্য সুন্দর

রূপসজ্জায় পরিণত হয়। সনেটের মত বিষয়বস্তু উপাদান রঙ এবং নকশাবলী সম্পৃক্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

মুসলিম লিপিকলার স্টাইল বা লিখন পদ্ধতি

জিয়াউদ্দীন তাঁর Muslim Calligraphy গ্রন্থে আরবী বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা, কৌণিক ও গোলায়িত। এছাড়া সামগ্রিকভাবে আরবী লিখন ধারাকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়-

কুফিক ঃ মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের প্রধান ধারা কুফিক রীতির ব্যবহার। ইরাকের কুফা নগরীতে এ ধারার উদ্ভব হয়। হযরত উমারের (রা.) সময় থেকে সরকারীভাবে এ রীতি ব্যবহৃত হতে থাকে এবং পরবর্তী ৫০০ বছর এ রীতিতে লিখন কার্য সমাধা হয়। মনে করা হয় প্রাথমিক যুগে ইসলামের ওহী এ পদ্ধতি অনুসরণে বিভিন্ন বস্তুতে লিপিবদ্ধ করা হতো। শক্ত উপাদানে লেখার কারণে ইহা কৌণিক আকার ধারণ করে। আরবরা পারসিক লিপিশৈলীর অনুকরণে বিভিন্ন কুফী Style-এর প্রবর্তন করেন। যেমন জলী বা স্পষ্ট, সিলোজাত, সালামী, মিফতা, হেরেম ইত্যাদি। কুফী রীতিতে সৌন্দর্য থাকলেও কৌণিক জটিলতার ফলে কালক্রমে এটি আলংকরিক পর্যায়ে চলে যায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে কুফীর স্থলে 'নাসখ' তথা চক্রাকার লিপির উদ্ভব হয় এবং মোটামুটিভাবে কুফী রীতি বিলুপ্ত হতে থাকে।

নাসাখ ঃ কুফী রীতির সামান্য পরিবর্তন এবং এর উন্নততর রূপই 'নাসাখ' নামে পরিচিত। এখানে কুফিক কৌণিক পদ্ধতির বিপরীতে গোলায়িত ও ঢালুভাবে দ্রুততার সাথে লিখা হতো। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নুকতা ও স্বরচিহ্ন ব্যবহার। নাসাখ লিপি সাধারণত স্থাপত্য, ধাতব পদার্থ, তৈজসপত্র, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা প্রভৃতিতে প্রচলন হয়। এর সমবৈশিষ্ট্যের অপর পাঁচটি পদ্ধতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এগুলো হল ঃ সুলস, গাওকী, রিকা, মুহাক্কাক ও রায়হান। বাগদাদের অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে মাকলা (মৃ. ৯৪০ খৃ.) নাসাখ লিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই লিপি রীতির আবির্ভাব মুসলিম ক্যালিগ্রাফির ইতিহাসে এক রেনেঁসা যুগের সৃষ্টি করে। আরবী লিপি কৌশলের যে সম্ভাবনা ছিল তা উন্মোচিত হয়।

তালিক ঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে প্রাচীন পাহলভী রীতির সংস্কার করে আরবী বর্ণমালার ছকে লিখন শিল্পীদের এ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। ধারণা করা হয় রিকা ও তাওকী হতে এ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পকাল স্থায়ী এ পদ্ধতিতে খাড়া ও লম্বা দণ্ডের সারি আনুপাতিক হারে কম।

নাসতালিক ঃ আরবী-লিপি-শৈলীতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় রীতি হলো নাসতালিক পদ্ধতি। আরবী নাসাখ্ এবং পারসিক তালিক পদ্ধতির সমন্বয়ে নাসতালিক পদ্ধতির সূচনা হয়। এই পদ্ধতি আরবী লিপিকলাকে স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। পারস্যের বিখ্যাত লিপিকার মীর আলী সুলতান আল তাব্রিজী এই লিপি শৈলীর প্রচলন করেন। নাসতালিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো এ পদ্ধতিতে বর্ণ ও অক্ষরগুলো অধিক গোলায়িত ও ঢালু বর্ণ ও অক্ষরের সমান্তরাল বক্রায়িত রেখাগুলোকে এমনভাবে গোল ও ঢালু করে প্রলম্বিত করা হয় যে, লিখন শিল্পী তার রূপায়নে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হননা। 'শিকাস্তা' পদ্ধতিকে নাসতালিক রীতির সহজ পদ্ধতি তথা সার্টলিপি হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

সুলস ঃ নাসাখ পদ্ধতির আলংকরিক রীতির বিকাশ লাভ হয়েছে Sools Style-এ। নাসাখ এর সাথে এ পদ্ধতির পার্থক্য হলো, নাসাখ এর রেখা ও বাক্য টান হতে এর বাক্য ও রেখাটান প্রায় তিনগুণ বেশী।

তুঘরা ঃ এটি কুফিক নাসখ, সুলস ও তাদের সমগোত্রীয় পদ্ধতি, বিশেষ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়ে তুঘরা নাম ধারণ করে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত বিমূর্ত অলংকরণ করা হতো। ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী লিখেন ঃ আরবী লিপির একটি অভিনব লিখন শৈলী হিসেবে এটি বিবেচিত হতে পারে। লিপির অন্তস্থিত বর্ণসমূহের একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার ফলে এমন একটি অলংকৃত আকৃতি ধারণ করে, যার পাঠোদ্ধার সত্যিই কষ্টসাধ্য। কুরআনের কোন আয়াত বা বিশেষ দোয়া অবলম্বন করে অলংকরণ প্রক্রিয়ায় পাখি, বাঘ, সিংহ বা হাতের প্রতিকৃতি রেখায়িত করা হয়। লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহের সম্প্রসারণ, সংকোচন এবং প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘায়িত ও পরিবর্তন করণের মাধ্যমে তুঘরা পদ্ধতির রূপায়ন সম্ভব হয়। তুঘরা লিখন পদ্ধতিতে প্রতিকৃতির উপস্থাপন ছাড়াও নানা প্রকারের বিমূর্ত অলংকরণ মটিফ বা শৈলী সৃষ্টি করা হয়।

লিপি শিল্পীদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রভাব ঃ

মুসলিম ক্যালিগ্রাফী তথা লিখন কলা ইসলামী শিল্পকলার এক বাস্তবিক বহিঃপ্রকাশ। লিপিশিল্পে অসামান্য বিকাশ শিল্পীদের মর্যাদাকেও সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। পাপাডোপোলো বলে ঃ If we begin with Calligraphy, it is because it is the only truly Arabian art of Islam; its raw material being the shapes of letters of the Arabic alphabet. Moreover, it seems only natural to suppose that it was among the Arabic Irtehati and scribes

that the first impulse towards art arose in connection with their preparaton of copies of the Quran.'

প্রথম যুগের লিপিকারদের মাধ্যম প্রাকৃতিক বস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আব্বাসীয় আমলে কাগজ উদ্ভাবনের ফলে লেখার উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা দূর হয়। 'ওয়ারাকাত' তথা লিখন ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ শিল্প, শিল্প ও সংস্কৃতমনা ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে অভিজাত বর্গের মধ্যেও এ প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করে। এসময় বিভিন্ন ভাষা হতে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের জন্য পেশাদার হস্তলিখন শিল্পীদের নিয়োগ করা হয়। আব্বাসীয় আমলে হস্তলিপি একটি উন্নতমানের সুকুমার শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। এ সকল শিল্পীদের উচ্চহারে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ফরমান ও দলীল দস্তাবেজের অনুলিপি তৈরী করার জন্য নিয়োজিত করা হতো। সে যুগে বিক্রয়যোগ্য গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করে একজন হস্তলিখন শিল্পী দৈনিক ৩/৪ হাজার টাকার সমপরিমাণ প্রচলিত মুদ্রা আয় করতে পারতেন। খ্যাতিমান শিল্পীদের গ্রন্থাগারিক, রাজকীয় পরিবারের শিক্ষক ইত্যাদি নিযুক্ত করা হতো। ইবনে সুকলা ছয়টি লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁর এ যোগ্যতা তাঁকে আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির ও রাজীর মন্ত্রীদের দায়িত্ব গ্রহণে সাহায্য করেছে। ইবনে বাওয়াব, ইয়াকুব আল মুসতাসিমীর এ যোগ্যতা তাঁদের উচ্চতম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল।

ইয়াকুব আল মুসতাসিমী (মৃ. ১২৯৮ খৃ.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম লিপিকলার একচ্ছত্র দিকপাল ছিলেন। তিনি কলমের সংস্কার করে ইবনে বাওয়ার (তিনি আলী ইবনে হিলাল নামেও খ্যাত) লিপিশৈলীকে অধিকতর লালিত্য দান করেন। তিনি সুলস এর উন্নতি বিধান করেন। আলী ইবনে উবায়দা আল রায়হানী ছিলেন 'রায়হানী' লিপিশৈলীর উদ্ভাবক। অন্যতম প্রধান লিখন শৈলী হিসাবে 'তৌকী'-কে প্রতিষ্ঠা দান করেন ইবনে আল খাজিম (মৃ, ১২২৪)। অটোমান তুরস্কে 'রিকা' সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এ রীতিতে খ্যাতি লাভ করেন শেষ হামদুল্লাহ আল আমাসী (মৃ. ১৫২০ খৃ.)।

তুর্কী সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিম হস্তলিপি লিখন শিল্পকে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগে উপনীত করেছিল। এখানে 'দিওয়ানী' তুঘরা, শিকায়তা' প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়। আল আমাসী, আহমদ কারাহসারী (মৃ. ১৫৫৫), ওসমান ইবনে আলী তুরস্কে আরবী লিপিকলাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন। ওসমান ইবনে আলী 'হালি' রীতির উৎকর্ষ বিধান করেন। 'শিকায়তা'-র সমতুল্য সরকারী লিপি

হিসাবে 'দিওয়ানী'-র প্রচলন হয় তুরস্কে এবং তুর্কী 'তালিক' থেকে ইব্রাহীম মুনিক এই শৈলী উদ্ভাবন করেন। সুলতান সুলায়মানের সময় অসংখ্য লিপিশিল্পী ও কারিগর ইস্তাম্বুলে বাস করতেন। মসজিদে নববী এবং বায়তুল্লাহর মসজিদে এখনো খোদাইকৃত তুর্কী লিপির নিদর্শন বিদ্যমান। শৈল্পিক গুণগত মান, সাবলীল ছন্দ ও গতিময়তার দিক থেকে তুর্কী সুলতানদের স্বাক্ষরের জন্য সীল মোহর হিসাবে 'তুঘরা'-এর প্রচলন সকল লিপিকে ছাড়িয়ে গেছে। সাফাদীর মতে, The Tughra, a Calligraphic device which became especially famous as the emblem of the Ottomen sultans developed in the hands of successive generations of calligraphers to reach heights of elegance and elaborate ornamentation.

সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম লিপিকলার চর্চা হয়েছে ললিতকলা রূপে। এই দীর্ঘ সময়ে লিপিশৈলী সর্বাধিক উৎকর্ষতা, সৌন্দর্য ও গতিময়তা লাভ করেছে পারস্যে। ইলখানী রাজবংশের গাজান খান শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ওলজাইতুর রাজত্বে রশীদউদ্দিন এবং তার ভ্রাতা সাদউদ্দীন লিপি ও অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ যুগের সর্বোৎকৃষ্ট লিপিমালার নিদর্শন রায়হানী শৈলীতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল হামদানী কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি কুরআন, অপরাপর শ্রেষ্ঠ লিপিকারদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ আল সুহবারদী, মুবারক আল কুতুব, সাইদ হায়দার মুবারক শাহ আল সূয়ুফী, আবদুল্লাহ আরগুন, ইয়াহিয়া আল জামাল সূফী, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল আনবারী প্রমুখ শিল্পী।

মুসলিম সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে তৈমুরী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম চিত্র ও লিপিকলায় এক সুরুচি ও সুষমামণ্ডিত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আমীর তৈমুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'তুমার নামক লিপি শৈলীর উদ্ভব হয়। এ সময় দরবারী শিল্পী উমার আকতা ক্ষুদ্রাকার এক আংটির সমান একটি এবং এক মিটার প্রস্থ পরিমাপ পাতায় বিরাট আরেকটি কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। সুলতান হোসেন বায়কারার দরবারে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন মীর আলী শির নিওয়ার।

পারস্যের সাফাভীদের মুসলিম লিপিশিল্পের উৎকর্ষতার দানে অসামান্য অবদান রয়েছে। শাহ ইসমাঈল এবং শাহ তাহমাসফের রাজত্বকালে পঞ্চদশ শতকে পারস্যে 'তালিক' রীতির উদ্ভব হয়। এর আবিষ্কারক ছিলেন তাজ-ই

সালমানী এবং আবদুল হাই। এ পদ্ধতি থেকেই মীর আলী সুলতান আল তাব্রিজী 'নাসতালিক' পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৫৩৯ খৃ. শাহ্ তাহ্মাসপের জন্য নিশাপুরের শাহ্ মুহাম্মদ কুরআনের অতীব সুন্দর একটি কপি প্রণয়ন করেন। সাফাভী রাজত্বে লিপি শিল্পীদের মধ্যে আরো উল্লেযোগ্য ব্যক্তিত্বরা হলেন কাসিম সাদী, শাহ্ কবীর ইবনে উয়াইস, আল আরদাবিলী, আবদুর রহিম আনিসী, কামাল উদ্দীন হিরাতী, গিয়াসউদ্দীন ইস্পাহানী, ইমাদ আল দ্বীন আল হোসাইনী, আলী মাসহাদী এবং মীর আলী হিরাতী প্রমুখ।

পারস্যের মুসলিম লিপিকলার ধারা আফগানিস্তান এবং মুসলিম ভারতে প্রবর্তিত হয়। সুলতানী আমলে তুর্কী বংশোদ্ভূত হস্তলিখন শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হতো। মধ্য এশিয়া এবং এশিয়া মাইনর হতে অনেক নামকরা শিল্পী এখানে এসে হস্তলিখন শিল্পের বিকাশ সাধনে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। মামলুক সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন উঁচু দরের লিখন শিল্পী ছিলেন এবং কুরআন কপি করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে এবং প্রাদেশিক বিভাগগুলো বিশেষ করে বাংলার যে সকল শিলালিপি, মসজিদ স্থাপত্যের নিদর্শন রচিত হয়েছে তাতে লিখন শিল্পের অব্যাহত উন্নতির ধারা চিহ্নিত করা যায়। আর মোগল আমলের সম্রাটদের শৈল্পিক মানসিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতা অনেকটা প্রবাদের মতো দাঁড়িয়েছে। বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রত্যেকেই ছিলেন এই শিল্পের বড় ধরনের সমঝদার। আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহাজাহানের যুগ ছিল আক্ষরিক অর্থেই শিল্পকলা বিকাশের শ্রেষ্ঠ যুগ। 'তাজকিরায়ে খুশ নবীশান, বা 'লিপিকারদের স্মৃতি' নামক পুস্তকে মোগল লিপিকারদের উল্লেখ রয়েছে। কাশ্মীরের মুহাম্মদ হুসাইন স্বর্ণকলমধারী উপাধি লাভ করেন। অন্যান্য লিপিকারদের মধ্যে মীর আলী, বাকী মুহম্মদ আমীন, মীর হুসাইনী, কুলানকী, আবদুল হাই, দাওরী সুলতান বায়েজিদ, আবদুল মহিম, আলী চমন, কাশিম আরসালান, আবদুস সামাদ, মুজাফফর আলী, কান্দাহারের মীর মাসুম, মুহাম্মদ আসগর ওরফে আশরফ খান উল্লেখযোগ্য। এমনকি হিন্দুদের মধ্যে কয়েকজন লিপিকার যেমন রাও মনোহর পণ্ডিত, জগন্নাথ, তোডরমল প্রমুখ প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন।

জাহাঙ্গীরের আমল মুসলিম ভারতের লিপি ও চিত্রকলায় স্বর্ণযুগ ছিল। মুসলিম ভারতের যে সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন আজো বেঁচে আছে তাতে এ শিল্পের উৎকর্ষ সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশেও লিপিকাররা অবদান রেখেছেন।

মুসলিম সাম্রাজ্য যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে, সেখানেই লিপিশিল্পের চর্চা ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, তুরস্ক প্রভৃতি কেন্দ্র লিপিশিল্পে সোনালী অধ্যায় রচনা করেছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের লিপিশিল্প ইসলামী শিল্পকলার ঐক্যেরও প্রতীক। ফিলিপ ব্যামবরো লিখেন ঃ One of visible links of Islam that can be seen throughout the Islamic world, in countries of different races and cultural background in the Arabic script.

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে কুরআন ও গ্রন্থাদির হস্তলিপি এবং অলংকরণ, কারুকাজ ছাড়াও আর যে সকল মাধ্যমে এই শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তন্মধ্যে মসজিদ ও মিনার গাত্র, প্রাসাদ, বিভিন্ন পান ও আহার পাত্র, প্রদীপ, ফুলদানী, ঝুড়ি, মুদ্রা, হেলমেট, কাপড় বুনন, কার্পেট, টাইলস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী লিখেন ঃ 'মুসলিম শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অলংকরণ ও বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে আরবী সুন্দর হস্তলিখন শৈলী যুগ যুগ ব্যাপী প্রভূত অবদান রেখেছে। প্রয়োজন বোধে আরবী বর্ণমালার সম্প্রসারণ ও সংকোচন বিধি অলংকরণের ক্ষেত্রে উপযোগী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

কাজেই কেবল মাত্র লিখন শিল্পের কার্যকারিতা হিসাবে আরবী হস্তলিখন শিল্প বিকাশ লাভ করেনি, বরং অলংকরণ ও সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে তা সমাদৃত হয়েছে। টমাস আরনল্ড হস্তলিখন শিল্পের আলংকরিক প্রয়োগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

অংকন ও অঙ্গ সজ্জায় যে আরবী লিপি ব্যবহৃত হয় তার নাম এ্যারাবেস্কু (Arabesque)। এ্যারাবেস্কুর জনপ্রিয়তা এতই প্রভাবশালী হয় যে, পরবর্তীতে খৃষ্টানদের গীর্জা, পোষাক ও ভবনসমূহে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্পেন, ইটালী, গ্রীস ও মাল্টায় এ্যারাবেস্কুর প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলিম শিল্পীদের কাজ ইউরোপের অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগী দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। ক্যালিগ্রাফী শিল্পের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিশ্বাস সংক্রান্ত আরবী বাক্য খৃষ্টান শাসকদের দ্বারা তাদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণত অষ্টম শতাব্দীর মারসিয়ার খৃষ্টান শাসক আফ্ফা তাঁর মুদ্রায় কুফিক লিখন পদ্ধতিতে কালিমা উৎকীর্ণ করেন। এটি অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নবম শতাব্দীর ব্রোঞ্জ নির্মিত একিট আইরিশ ক্রুশের মধ্যস্থলে কুফিক লিখন পদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ' উৎকীর্ণ হয়েছে। সাধু পিটারের গীর্জার সুউচ্চ প্রবেশ পথের প্রাচীর গাত্রে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাসে সুহস্ত লিখনে

শোভা পাচ্ছে। এমনকি ইউরোপের ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ডের গীর্জা ও স্থাপত্য অলংকরণের আরবী হস্তলিখন শিল্পের প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রফেসর লেথাবী মনে করেন যে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবীর কোন কোন অংশের অলংকরণ প্রক্রিয়ায় মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ডেকোরেটিভ আর্ট হিসাবে মুসলিম ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অবদান ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাপকাঠিতে স্বীকার্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে হস্তলিখন শিল্পে মুসলমানরা অদ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এ শিল্পের সমৃদ্ধকরণ ও জনপ্রিয়তা বর্ধনে তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। লিপিকলাকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করণেও মুসলমানের অবদান অনন্য। হিট্টি বলেন, 'লিপিশিল্প সম্ভবতঃ আরবদের একমাত্র শিল্প যা আজও কনষ্টন্টিনোপল, কায়রো, বৈরুত ও দামিশকে খৃষ্টান ও মুসলিম লিপিকারগণ চর্চা করে থাকেন, যা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্রাচীনদের প্রবর্তিত যে কোন শিল্পের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।'

সংগীতে মুসলমানদের অবদান

ইসলামে সংগীত বৈধ-অবৈধ নিয়ে মতানৈক্য আছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)সহ বহু বিদগ্ধ আলিম একে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম গাজালী (র.) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে সংগীতকে অনুমোদন দেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কিমিয়ায়ে সা' আদাত' গ্রন্থে সূক্ষ্ম ও দার্শনিক বক্তব্য রেখেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর মতে কোন মুসলমান অপর মুসলমানের বাদ্যযন্ত্র নষ্ট করে দেয়া বৈধ হলেও এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বস্তুতঃ বেশীরভাগ সংগীত মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায় বলে পরবর্তীতে বহু সংখ্যক ইমাম এর ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর বিধান বর্ণনা করেছেন। এসব বিধি নিষেধ সত্ত্বেও ইসলামের প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মুসলমানরা সংগীতে প্রভূত অবদান রেখেছেন এবং সংগীতের উৎকর্ষ সাধনে বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছেন।

ইসলামের আবির্ভাব পূর্বে আরবে সংগীতের জোর প্রচার ছিলো কিন্তু তা ছিল কলুষিত। গ্রীক ও রোমান সভ্যতায়ও সংগীতের ভাল কদর ছিল। পরিবেশের এ পটভূমিতে আরব মুসলমানরাও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপরও মুসলমানরা অসংখ্য দেশ, বিশেষ করে রোম, পারস্য, চীন, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার মতো দূরাঞ্চলসমূহ জয় করে তথাকার শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি কিছু না কিছু আকৃষ্ট হয়। এর ফলে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে সাথে তারা সংগীত বিদ্যার নানা প্রশাখায় জড়িয়ে পড়ে।

রাসূলে করীম (সা.)-এর তিরোধানের তিন যুগ যেতে না যেতেই খোদ মক্কা-মদীনায় সংগীতের চর্চা শুরু হয়। গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের আমদানী রফতানী হত। উমাইয়া আমল থেকে সংগীত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে। উমাইয়া খলীফাদের অনেকেই সংগীতের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। কারবালার প্রধান নায়ক ইয়াজীদ গান বাদ্যের সাতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি আবাদ নামক মক্কার প্রসিদ্ধ গায়কের গান শুনে তন্ময়ে নাচতে আরম্ভ করতেন। Arab Civilization

এর লেখক Joseph Hell লিখেছেন, দ্বিতীয় ওয়ালিদও সংগীতের এমন ভক্ত ছিলেন যে, তিনি চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়তেন। ঐতিহাসিক ভন্ ক্রেমার মাবাদের শিষ্য ইবনে আশাকে সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাকে একবার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একটি অশ্ব উপহার দেন।

আরবদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সংগীতের প্রচলন ছিলো। দক্ষিণ আরববাসীদের ছিলো নিজস্ব গানের বাদ্যযন্ত্র। ইয়াজীদ বিদেশ হতে অনেক বাদ্যযন্ত্র আমদানী করেন। উমাইয়া আমলে মদীনার শিল্পী তুয়ায়েজকে 'সংগীতের জনক' বলা হতো। তিনিই প্রথম আরবী গানে ছন্দ প্রবর্তন ও খঞ্জনির সাহায্যে গান গেয়েছিলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ছিলেন সাদ বিন মিসজাহ, ইবনে মুহারিক, গারিদ এবং মেয়েদের মধ্যে জামিলা অন্যতম। আতা অবিরাবা ছিলেন 'তসরীগ' নামক সংগীতের নমুনা আবিষ্কারক। উমাইয়া আমলে ইউনুছ কাতেব নামক একজন ইরানী সংগীতজ্ঞ আরবী গীতসমূহ সংগ্রহ করেন এবং কিতাবুল কিয়ান নামক প্রথম একটি সংগীত সুর পুস্তক প্রণয়ন করেন।

আব্বাসীয় আমলে সংগীতের স্বর্ণযুগ সূচিত হয়। আব্বাসীয় খলীফা হারুন ও মামুন সংগীতের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এ সময় আবুল ফারাজ ইস্পাহানী আরবীতে ২১ খণ্ডে এক অতুলনীয় সংগীত প্রণয়ন করেন। তিনি এতে ১০০ প্রকার স্বরলিপি চিহ্নিত করে এর প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিস্তৃতি আলোকপাত করেন। রাজধানী বাগদাদে বহু সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সংগীত সম্পর্কিত অনেক গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়।

ইব্রাহীম ও ইসহাক মাওসালী নামক দু'জন সংগীত ও সুরশিল্পী সে যুগের শ্রেষ্ঠ সুরকার ছিলেন। খলীফা আল ওয়াসিক নিজেই ছিলেন এক মহান সংগীত প্রতিভা যিনি প্রথম বীণার ব্যবহার ও ১০০ প্রকার সুর উদ্ভাবন করেন। খলীফা মুনতাসীর ও মুতাজিদ-সংগীতের সমঝদার ছিলেন। শাহাযাদী ও উচ্চ বংশীয় মহিলারাও সংগীত জলসার আয়োজন করতেন এবং সংগীত চর্চা করতেন। তাদের জলসায় শত শত গায়ক-গায়িকা যোগ দিত।

খলীল ইতিহাসের বিখ্যাত ছন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। এসময় সংগীত বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিখ্যাত বেশ কটি বই অনূদিত হয়। শফী উদ্দিন সুবিন্যস্ত সুর প্রণালী আবিষ্কার করেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, আরব স্বরগ্রাম ১৭ ভাগে বিভক্ত ছিল। বারটি প্রধান নমুনার মধ্যে ৬টি এবং বহু কারিগরী পদ্ধতি ইরান হতে আনা হয়েছিল।

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আলকিন্দি সংগীত সম্পর্কে ৭টি গ্রন্থ লেখেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে। তাহলো-

১. The Essentials of Knowledge in Music

২. On the Melodies এবং

৩. The Necessary Book in Composition of Melodies.

মুসলিম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে ফারাবী নিজে সংগীত শিল্পী ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা আজকালকার সংগীত পাঠকদেরও মুগ্ধ করে। তিনি ধ্বনির নীতি ব্যাখ্যা করে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেন এবং গ্রীক সংগীতের ত্রুটিসমূহের সমালোচনা করেন। ফারাবীর 'মুসকী আল কাবীর' সংগীত জগতের অনবদ্য সৃষ্টি। তার পরে ইবনে সীনা আরবীয় সংগীতে অবদান রাখেন। তিনি সংগীত শিল্পের ভূমিকা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তাঁর স্বর রচিত গ্রন্থ 'সিফা' ও 'নিজাতে' সংগীত প্রসংগে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তৎকালে সংগীতে আরো যাদের কাজ ছিল তাঁদের মধ্যে আহমদ, মনসুর, আবুল ওয়াফা, ইবনে বাইলাভ, মুহাম্মদ উল্লেখযোগ্য। ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের মধ্য দিয়ে সংগীত তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ লেখকদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়।

একাদশ শতকে সংগীত, জ্ঞানের শাখায় অন্তর্ভুক্ত হয়, যা নিয়ে মুসলিম দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা গবেষণায় ব্যাপৃত হন। এ মেরুকরণে যথেষ্ট অবদান রাখেন ইমাম গাজালী, ইস্পাহানী, ইবনে বাজা, ইবনে রুশদ প্রমুখ দার্শনিক, পণ্ডিতগণ।

মিশরের ফাতেমীয়রা আব্বাসীয়দের চেয়ে কম সংগীত পাগল ছিলেন না। কায়রোর বিশ্বখ্যাত 'দারুল হিকমায়' অন্যান্য সকল বিষয়ের সাথে গান বাদ্যও শেখানো হতো। তথাকার আবুস সাত (মৃ. ১১৩৪) আলামূদ্দীন কায়সার (১২৫১ খৃ.) এবং ইবনে হিশাম (১০৩৯ খৃ.) সংগীত প্রসংগে লিখিত গ্রন্থাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

ইউরোপে মুসলিম স্পেনের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেভিল প্রাচ্যের দামিশকের স্থান লাভ করেছিল। বলা হয় স্পেনের কার্ডোবা ছিল গ্রন্থের আর সেভিল ছিল সংগীত বাদ্যের নগরী। স্পেনের শাসকদের মধ্যে হিশাম ও দ্বিতীয় আবদুর রহমান সংগীতের শ্রেষ্ঠ উৎসাহদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আবদুর রহমান কর্ডোবায় সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বাগদাদের নির্বাসিত গায়ক জিরাবকে আপন দরবারে স্থান দান করেন। জিরাব ছিলেন একজন ঐতিহাসিক

প্রতিভা ও মহান-সংগীতজ্ঞ। মিশরের মামলুক সুলতানেরা খৃষ্টানদের ক্রুসেডের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় মগ্ন থাকলেও গান বাদ্যের প্রচলন ছিল। লেনপুন History of Egypt গ্রন্থে লিখেছেন, সুলতান মনসুর তখনকার বিশ্বখ্যাত হাসপাতাল মরিস্তানে নিদ্রাহীন রোগীর মানসিক প্রশান্তির জন্য সংগীতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে আরবে ইসলাম আগমনের প্রথম শতকেই। এখানেও ইসলামী কৃষ্টি কালচারের বৈপ্লবিক প্রসারের সাথে সাথে সংগীতের চর্চা শুরু হয়। ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করেছেন, উপমহাদেশের সংগীত মুসলমানদের কাছে চির ঋণী। কারণ তাঁরা সংগীতকে এক চরম মরণদশা হতে রক্ষা করেন।

সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতের শাসকদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ এর সময়কালে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে সংগীতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রধানত আধ্যাত্মিক ভাবধারা ছিলো এর উপপাদ্য। আলাউদ্দীন খলজীর সময় বাহরুজ ও চাংগী প্রমুখ শিল্পী রাজ আসন অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের (১২৬৬-৮৬ খৃ.) সময়কাল ছিল সংগীতের উৎকর্ষের মূল কাল। উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি ও সংগীতকার আমীর খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খৃ.) চেষ্টায় গজল ও আধ্যাত্মিক সংগীতের প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়।

আমীর খসরু গজল, কাওয়ালী, ভালবাসা, খেয়াল, তারজা ইত্যাদি গানের শিল্পী ছিলেন। নিজস্ব কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়ে তিনি সংগীতের ইতিহাসকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন যা মধ্যযুগের প্রথমার্ধে আর দেখা যায়না। তিনি প্রাচীন একতাল, চৌতাল, ব্রহ্মতালের স্থলে আটমাত্রা ও ছয়মাত্রার কাহারবা ও দাদরা তান সৃষ্টি করেন। তাছাড়া সরপরদা, ইসন, জিলফ, মুজিব, আজগরী, উশশাখ, মাওয়াফিক, ঋষণ, ফরখান, ফিরোদোস্ত প্রভৃতি মিশ্ররাগিনী এবং নিগার, বাসিত, সাহানা ইত্যাদি সংগীত আমদানী করে সংগীত ভূবনে এক বিপ্লব সাধন করেন। তিনি ১৭টি নতুন রাগ ও তিনতার বিশিষ্ট সেতার ও তবলা আবিষ্কার করেন। তাকে উপমহাদেশের সংগীত ভূবনের 'তোতাপাখি' বলা হয়। আমীর খসরু উর্দু, ফারসী ও অন্যান্য ভাষায় ৫ লক্ষাধিক কবিতা ও ভাব সংগীত রচনা করেন যা তাঁর ৯৯টি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

সম্রাট মুবারক শাহ, মুহম্মদ তুঘলক, সম্রাট আকবর, আদিল শাহ, হুসেনশাহ ও সম্রাট শাহজাহান সংগীতের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন। সংগীত সাধনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আকবরের নাম বিশিষ্টতার দাবী রাখে। আকবর ২০০ ইরানী সুরের

ঐক্য সাধন করেন। এমনিতেই এখানকার সংগীত ইরান ও আরবের যথেষ্ট প্রভাবাধীনে ছিলো।

মিয়া তানসেন সংগীত জগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি হিন্দু ছিলেন। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতি ও সংগীতের বিকাশে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রামতনু থেকে তিনি হয়ে যান আতা হোসেন। সংগীতে বুৎপত্তি ও খ্যাতি অর্জনের প্রেক্ষিতে তাঁকে "তানসেন' বা সুর সম্রাট উপাধী দেয়া হয়। ফলে এ নামে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাদশাহ আকবরের রাজসভার ৩০/৪০ জন গুণী পণ্ডিতদের সাথে তাঁর স্থান ছিল অন্যতম। তাঁর সৃষ্ট রাগের মধ্যে দরবারী, কানাড়া, মলহার, টোডী, সাবাং রাগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইরান-তুরস্কের বহু সংগীত শিল্পী আকবরের দরবারে সমাদর পেয়েছিল। তিনি নিজেও গাইতে এবং সুন্দর করে নাকারা বাজাতে পারতেন। আইন-ই আকবরীর লেখক আবুল ফজল লিখেছেন- 'আকবরের গায়করা সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। এরা সপ্তাহে একদিন করে পালা করে গান করতো।' তিনি আকবরের ছত্রিশ জন গায়ক ও বাদ্যকারের নামোল্লেখ করেছেন।

লেনপুল বাবর ও হুমায়ুনের সংগীত প্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। জাহাঙ্গীর সংগীতে তেমন অনুরক্ত না হলেও খুররমদাদ, তানসেন পুত্র বিলাস খাঁ, চাতার খাঁ, হামজা প্রমুখ শিল্পী তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলো। এছাড়া জৈনপুরের সুলতান হুসেন খেয়াল ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাগের উদ্ভাবক ছিলেন। কাশ্মীরের জয়নুল আবেদীন সঙ্গীত প্রিয় রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিক টেভার্ণিয়ার বলেন- শাহাজাহান কতেক হিন্দী গান রচনা করেন। তা এত মধুর ছিলো যে সূফী চিত্ত তা শুনে আপ্লুত হতেন। এভাবে সংগীত মুসলমানদের হাতে অসামান্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময় হতে সংগীতের অবনতি আরম্ভ হয়। প্রথমে তিনি এর ভক্ত হলেও পরবর্তীতে ইমাম শাফেয়ীর (রা.) কিছু গ্রন্থ পাঠ করে সংগীতের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং সংগীতজ্ঞদের অন্যত্র পুনর্বাসিত করেন। মোগল সম্রাজ্য ও অযোধ্যার পতনের পর ভারতীয় সংগীতকলারও পতন আরম্ভ হয়।

মুসলমান শাসকদের সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল সংগীত গ্রন্থ রচিত হয় তার মধ্যে সিকান্দর লোদীর শাসনামলে 'লাজহাতে সিকান্দরী' জৈনপুরের ইব্রাহীম শাহ রচিত 'সংগীত শিরোমনি' বিজাপুরের ইব্রাহীম আদিল রচিত 'নওরস' ফকির

উল্লাহর রাগদর্পণ, মির্জা ফখরুদ্দীনের 'তোহফাতুল হিন্দ' ও 'সামসুল আসওয়াত' আইনে আকবরী উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত গ্রন্থে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, চান্দ, মার্গ, ভৈরো, ভৈরবী, সোহানী, সিন্দ, পিলু, খেয়াল, কাওয়ালী ইত্যাদি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সংগীতের মাত্রা রাগ সুর এবং বাদ্যের মধ্যে টপ্পা, তারানা, চটকা, জনতাঙ্গ ইত্যাদি রয়েছে।

উপমহাদেশের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাঁশী, কানাই, তানপুরা, খীচক, সুরনা, কানুন ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। প্রাচীন আরবে লিউট বাদ্য বেশি ব্যবহৃত হত। এছাড়া বেহালা, তাম্বুর, গীটার, রুবার, নাক্কারা, সেতার ইত্যাদির ব্যবহার পাওয়া যায়। মুসলমানরা বহু ধরনের বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে ঝুণামী, নুঝা, সিতার, সারাই, নাক্কারা, তবলা, দিলরুবা, রুবার, সরোদ, সারেঙ্গী অন্যতম।

উপমহাদেশে সংগীতের উন্নয়নে মুসলমানদের অন্যান্য অবদান রয়েছে। ইংরেজরা দেশ দখলের পর যখন এখানকার সংস্কৃতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সংগীতের রক্ষা হয়। খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর ও বাংলার গভর্ণর শাহ সুজা মোগল দরবারের দু'জন নামকরা সংগীত শিল্পী মিসরী ও রঙ্গর খানকে ঢাকায় আনেন। ফলে ঢাকা বাংলা সংগীত ও সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তাছাড়া উপমহাদেশে শুদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার যুগ প্রবর্তক মুসলিম সংগীতকারগণের হাত ধরে এখনো প্রবাহমান।

মুসলিম চিত্রশিল্প

সৃজনশীল সাহিত্যকলার মধ্যে চিত্রকলা শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছে। 'চিত্রকলা' র ইংরেজী শব্দ Painting সাধারণত রং ও তুলির সাহায্যে কাগজ, ক্যানভাস অথবা দেয়ালে চিত্রাংকনকে চিত্রকলা বলে। উইলিয়াম গউন্ট বলেন, সমান্তরাল পৃষ্ঠদেশে উজ্জ্বল রং এবং বলিষ্ঠ রেখার মাধ্যমে যখন কোন জীবিত অথবা নির্জীব বস্তুর প্রতিকৃতি বা ছবি অংকন করা হয় তখন সেটা হয় চিত্রকলা। চিত্রকলা প্রধানত দুই প্রকার ঃ ফ্রেসকো (Fresco) বা দেওয়াল চিত্র এবং মিনিয়েচার (Miniature) বা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র। হার্বার্ট রীডের মতে, পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে একটি চিত্রের সৃষ্টি হয়, যথা রেখার ছন্দ (rhythm of line), সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয়বস্তু (massing of form), স্থান বা পরিসর (space), আলো ও ছায়া (light and shade) এবং রঙ (colour)। চিত্রশিল্পে অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে ইঙ্গিতসূচক (suggestive), প্রতীকধর্মী (symbolic), প্রকাশধর্মী (expressionistic), ভাবধর্মী (impressionistic), বাস্তবধর্মী (realistic), ক্ষুদ্রাকৃতিকরণ (fore of rear shortening), হ্যালো (halo/nimbas) শেডিং (shading), প্রফাইল (profile), থৃ. কোয়াটার ভিউ (Three quarter view), মডেলিং (modelling), কাল্পনিক (imaginary) প্রকৃতিবাদী (naturalism) অন্যতম রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

চিত্রশিল্পের ইতিহাস অনেকটা মানব জাতির সূচনার ইতিহাস থেকে শুরু হয়। মুসলিম চিত্রকলার যে নতুন অধ্যায় চিত্রকলার ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে তা বিভিন্নভাবে তার পূর্বতন চিত্রকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তবুও বেশ কিছু নতুন ধারা মুসলিম চিত্রকলায় যোগ হয়েছে। বেশ কড়াকড়ি ও উত্থান পতনের মধ্যে দিয়েই মুসলিম চিত্রকলার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং উৎকর্ষে সাফল্য শিখরে উপনীত হয়েছিল। ধর্মের নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও চিত্রকলা বেড়ে উঠেছিল এবং নতুন ধারণা ও যোজনায় ব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

মুসলিম চিত্রকলা ও ধর্মের আপত্তি

পবিত্র কুরআনে চিত্রকলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কুরআনের ব্যাখ্যাতাগণ কোন কোন আয়াতের রূপক অর্থ নির্দেশ করে এ শিল্পের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। তাঁরা যে সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেন

তন্মধ্যে সূরা মায়েদার ৯৫নং আয়াতে 'আনসাব' তথা প্রতিমা নির্মাণ অর্থের জের টানেন। উক্ত আয়াতে আনসাব এর নিন্দা করা হয়েছে। একই সূরায় 'তাইর' বা মরিয়ম পুত্র ঈসার অলৌকিকভাবে পাখি প্রাণ দান করার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ধর্মবেত্তাদের মতে প্রাণ দান করা আল্লাহর গুণ, সুতরাং চিত্রকররা বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকনের মাধ্যমে এই গুণের অংশীদার হতে পারেনা। সূরা হাশর এর ২৪ আয়াতে 'মুসাব্বর' তথা গঠনকারী শিল্পী হিসাবে আল্লাহর মহান গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোন সৃষ্টি, স্রষ্টার এ গুণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, যারা করবেন তারা শিরকের সমতুল্য কাজ করবেন।

মহানবী (সা.)-এর হাদীসে চিত্রকরদের শাস্তির কথা এবং মহানবী কর্তৃক প্রতিকৃতি অংকনে নিরুৎসাহিত করার বিভিন্ন ঘটনা ধর্মবেত্তাগণ উল্লেখ করেন। তা সত্ত্বেও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু হাদীসে চিত্রশিল্পের প্রতি মৌন সমর্থন রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরে ঢুকে ৩৬০ মূর্তি ভঙ্গ করা হলেও নবীর নির্দেশে ঈসা ও মরিয়মের একটি ছবি অক্ষত রাখা, নবীপত্নী কিশোরী আয়েশার পুতুল নিয়ে খেলা করা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ হাদীসে আছে। এভাবে সুস্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞার অভাবে মুসলিম চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়। ৬৯৫ খৃ. খলীফা আবদুল মালিক প্রথম যে আরবী মুদ্রা চালু করেন তাতে তাঁর ছবি ব্যবহৃত হয়। এ ঘটনায় চিত্রকলার প্রাথমিক চর্চা যে অনতিকালেই শুরু হয় তা প্রমাণিত। চিত্রকলার বিষয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয় তাবেয়ী পরবর্তী আমলে। ত্রয়োদশ শতকের ধর্ম তাত্ত্বিক নওয়ায়ী প্রথম এ সম্পর্কে কার্যকরী ঘোষণার প্রয়াস পান।

ধর্মীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও মোটামুটি পাঁচটি কারণে মুসলিম চিত্রশিল্প বিকাশ লাভ করে। সেগুলো হল ঃ

১। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার অভাব;

২। ত্রয়োদশ শতকের আগে কোন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা না জানার কারণে বহুদিন ধরে চিত্রশিল্প চর্চিত হতে থাকে;

৩। মৃৎপাত্র, কার্পেট, বালিশ, কুশন ইত্যাদি বিভিন্ন পাত্রে প্রতিকৃতি অংকনের প্রতি শিথিল মনোভাব;

৪। মুসলিম রাজন্যবর্গের অনুরাগ, উদারতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা;

৫। পৃষ্ঠপোষকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন আকবর চিত্রকলার চর্চাকে আল্লাহর উপলব্ধির উপায় মনে করতেন।

মুসলিম চিত্রকলার উৎস

মুসলিম চিত্রকলার প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় ফ্রেসকোর মাধ্যমে। মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তারা ইরাক, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করলে বিজিত রাজ্যের চিত্রকলার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসেন। বিজিত অঞ্চলের অনেক চিত্রশিল্পী মুসলমান হলেও তাদের প্রাচীন শিল্পধারাকে ত্যাগ করতে পারেননি। এভাবে চিত্রকলার ছয়টি ধারার প্রভাব ও অবদান মুসলিম চিত্র শিল্পের বিকাশে উৎস হিসেবে কাজ করে। এগুলো হল ঃ বাইজেন্টাইন, ম্যানিকিয়ান, সাসানীয়, চীনা, কপটিক এবং ভারতীয়।

আরবরা সর্বপ্রথম প্রাচ্য দেশীয় হেলেনিষ্টিক সভ্যতার অধিকারী বাইজেন্টানদের সংস্পর্শে আসে। তাদের সহায়তায় উমাইয়া শাসকগণ স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে। গ্রীক গ্রন্থ আরবী অনুবাদের সময় অমুসলিম বিষয়বস্তু বাইজেন্টাইন রীতিতে চিত্রায়ন, খৃষ্টান চিত্রকরদের মুসলিম চিত্রকলার ছবি অংকনে অংশগ্রহণ এবং মুসলিম শিল্পীদের বাইজেন্টাইন অনুকরণ-এ তিনভাবে প্রধানত বাইজেন্টাইন প্রভাব মুসলিম চিত্রকলায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

শিল্পকলার অসাধারণ পৃষ্ঠপোষক ও উত্তরাধিকার ম্যানিকিয়ান চিত্রকলা মুসলিম চিত্রকলার অন্যতম উৎস। ম্যানিকিয়ান ধর্মের প্রচারক মনি শিল্পকলার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন। ১৯০৪ সালে তুরফানের দেওয়াল চিত্র আবিষ্কৃত হলে তাদের চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া বেজেকলিক ও কোচের গুহাচিত্রে ম্যানিকিয়ান চিত্রলিপির নিদর্শন রয়েছে।

আব্বাসীর শাসনামলের সূচনা হতেই মুসলিম চিত্রশিল্পে সাসানীয় প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণ ও দখলের পর থেকে চীনা প্রভাব অনুপ্রবেশ করে। দখলদার বাহিনী পশ্চিম চীনের চিত্রশিল্পীদের সাথে করে নিয়ে আসে, চীনা কারু ও চারু শিল্পের আমদানীও শুরু হয়। মিশরে বাইজেন্টাইন চিত্রশিল্পীদের মাধ্যমে কপটিক রীতি কৌশল অনুসরণ শুরু হয়। উল্লেখ্য, প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্যের উপকরণের সংমিশ্রণে কপটিক রীতির উদ্ভব ঘটে। উপমহাদেশে মুসলিম চিত্রকলার ভারতীয় রাজপুত চিত্ররীতির প্রভাব বহুলাংশে পরিদৃষ্ঠ হয়। হুমায়ুন ও আকবরের সময়কালে ইন্দো-মোগল চিত্রকলার উদ্ভবে রাজপুত রীতি কৌশলের অবদান অপরিসীম।

মুসলিম চিত্রকলার বিষয়বস্তু

মুসলিম চিত্রকলার সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা দুষ্কর। চিত্রিত পাণ্ডুলিপির অসংখ্য মূল্যবান সংগ্রহ মোঙ্গলেদের বাগদাদ ধ্বংস এবং রক্ষণশীল

সমাজের বিষ চোখে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও এই চিত্রকলার বিষয়বস্তু দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু এবং ধর্ম বহির্ভূত বিষয়বস্তু।

খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো ইসলাম চিত্রকলাকে ধর্ম প্রচারের বাহন অথবা ভক্তের মনে ভক্তি জাগরণের উপায় হিসেবে মনে করেনি। যীশুর জীবনালেখ্য বাইজেন্টাইন শিল্পের মূল উৎস এমনকি মাইকেল এঞ্জেলো সিসটাইন চ্যাপেলের (১৫০৮-১৫১১ খৃ.) মোসাইক অংকনে ধর্মীয় প্রভাব এবং অনুভূতিতে আলোড়িত না হলে অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি করতে পারতেন না।

মুসলিম চিত্রশিল্প ধর্মীয় অনুভূতি বিগর্হিত হলেও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর চিত্রায়ন ইলখানী যুগ হতে আরম্ভ করে সাফাভী রাজত্বের শেষ পর্যন্ত শিল্পকলাকে কেবলমাত্র গভীরতা এবং ব্যাপক বিস্তৃতিই দান করেনি, বরং চিত্রকরদের স্বকীয় রীতির বহিঃপ্রকাশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে পরিগণিত হয়। মোঙ্গল প্রভাবে নবী-রাসূল হতে শুরু করে মিরাজ, বুরাক, পীর, দরবেশ, সাধু সন্নাসীর ছবি অংকিত হতে থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে অংকিত খ্যাত পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে রশিদুদ্দীনের 'জামে আত্ তাওয়ারিখ' (১৩০৭-১৪খৃ.) আল বিরুনীর 'আছারারুল বাকীয়া' (১৩০৭-০৮ খৃ.) মিরখন্দের 'রওজাতুস্ সাফা' (১৫৯৫ খৃ.) 'কিসাসুল আম্বিয়া' (১৪৩৪ খৃ.)

ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়া বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয় সংশ্লিষ্ট ছবিতে। জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, সাহিত্য, মহাকাব্য, ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে চিত্র সংযোজিত হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিতে রাশিচক্র, জীবজন্তু ও মানুষের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন যন্ত্রের ছবি অংকিত হয়েছে। ইলখানী (তাব্রিজ) স্কুলে অংকিত 'মুনীস আল আহরার' (১৩৪১ খৃ.) জালাইরীতে অংকিত 'কিতাবুল বুলহান' (১৪০৯) আবদুর রহমান আস্ সুফীর 'আল কাওয়াকিব আস্ সাবিতা' এ বিষয়ে অন্যতম।

জীববিদ্যা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে ইবনে বখতিয়াসুর 'মানাফিউল হইওয়ান' (১২৯৭-৯৯ খৃ.) কাযউইনীর 'আযায়েবুল মখলুকাত' চিত্রবালী; উদ্ভিদ ও যন্ত্রবিজ্ঞানে 'খাওয়াস আল আসজাব' আল জাজারীর 'অটোমেটা'; চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'মেটেরিয়া মেডিকা' (১২২৪ খৃ.) গ্যালেনের অনুবাদ 'বুক অব আনটিডোটাস' আল রাজীর 'মুফীদ আল খাস' অন্যতম।

সাহিত্য বিভাগের চিত্রাবলীর মধ্যে গদ্যে রচিত 'কালিলা ওয়াদিমনা' হারিরির 'মাকামাত' আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর 'কিতাবুল আগানী, মোঘল যুগের 'দাস্তানে

আমীর হামজা' আনওয়ারে সুহাইলী' বাহার-ই-হায়াত উল্লেখযোগ্য। কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ফেরদৌসির 'শাহনামা' সুলতান আহমদ জালাইয়ের 'দিউয়ান' খাজু কিরমানীর কয়েকটি কাব্য সংকলন, সাদাকা বিন আবুল কাশেম সিরাজীর 'কিতাব সামাক-আয়য়ার', নিযামীর 'খামাসা', 'খসরু ও শিরীন', সাদীর গুলিস্তা, বুস্তা, হাফিজের 'দিউয়ান' জামীর খামাসা ও ইউসুফ জুলাইখা' আমীর শাহীর 'গজল' অন্যতম। এসকল গ্রন্থের মধ্যে অমর কাব্য ফেরদৌসির 'শাহনামা'র অতুলনীয় মিনিয়েচারসমূহ মুসলিম চিত্রকলার বিবর্তনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। ১৪২৯-৩০ খৃ. 'শাহনামা' চিত্রিত হয় তৈমুরী যুগে।

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে রাজা বাদশাহদের জীবনী, যুদ্ধ, মৃগয়া ও প্রেম সংক্রান্ত অসংখ্য মিনিয়েচার চিত্রিত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী চিত্রায়িত হয়েছে তন্মধ্যে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়েছে আল বিরুনীর 'আল আছরারুল বাকিয়া' (১৩০৭-৮), আত্ তাবারীর 'তারীখুর রসুল ওয়াল মুলক' রশীদ উদ্দীনের 'জামে আত্ তাওয়ারিখ' (১৩০৭ খৃ.) মোঙ্গল জাতির ইতিহাস গ্রন্থাদি ইলখানী চিত্রশালায় তাব্রিজে চিত্রায়িত হয়। চিত্র সমৃদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে যুয়াইনীর 'তারিখ-ই জাহান ওসা' শরফুদ্দীন আলী ইয়াজিদীর 'জাফরনামা', 'তৈমুর নামা', 'তুযুক-ই বাবর', 'আকবর নামা', তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী', 'রজমনামা' অন্যতম।

মোঘল চিত্রশালায় অংকিত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপির স্থান রয়েছে। বল্মীকির রামায়ন মহাভারত, নল দয়মন্তী ও রসিক প্রিয় এই চিত্রশালার পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম।

এসব বিষয়বস্তুকে ধারণ করে মুস্লিম চিত্রকলা অগ্রসর হয়। মেসোপটেমীয়, ইলখানী, জালাইরী তৈমুরী, সাফাভী, মোঘল প্রভৃতি চিত্রকলার অভ্যুদয় ঘটে যা চিত্রকলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

মেসোপটেমীয় চিত্রকলা

মিশরে সর্বপ্রথম ফাতেমী রাজবংশের পৃষ্ঠাপোষকতায় চিত্রকলা শুরু হয় এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সময়কাল চিহ্নিত ছিল। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে আব্বাসীয় বংশের আবির্ভাবে মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। এসময় বাগদাদকে কেন্দ্র করে যে চিত্রশিল্পের চর্চা হয় তাকে মেসোপটেমীয়, বাগদাদ অথবা সেলজুক চিত্রকলা নামে অভিহিত করা হয়।

বাগদাদ মসুল, দিয়ারবকর, আলোপ্পো ইত্যাদি অঞ্চলে চর্চিত শিল্পকলা এতে অন্তর্ভুক্তির কারণে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্ররীতির কারণে সমষ্টিগতভাবে এসব চিত্রকলাকে মেসোপটেমীর চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত করতে গবেষকরা একমত হন।

মেসোপটেমীয় চিত্রকলার দু'টি বিপরীতধর্মী শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। ১. খৃষ্টান বাইজেন্টাইন শিল্পরীতি, ২. সেলজুক মিনাইরীতি। মেসোপটেমীর চিত্রকলার যেসব চিত্রশালা বিশেষ অবদান রেখেছে বাগদাদ, মসুল, দিয়ারবকর তাদের অন্যমত।

বাগদাদ চিত্রশালার চিত্রিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপির মধ্যে ডায়স্কারাইডসের 'মেটিরিয়া মেডিকা'র আরবী অনুবাদ (১২২৪ খৃ.) অন্যতম। বাইজেন্টাইন সম্রাট অষ্টম কনষ্টানটাইন স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমানকে এ ভেষজ শাস্ত্রের উপর লিখিত যে গ্রীক পাণ্ডুলিপি উপহার দেন তা আরবী অনুবাদ করেন হাসান বিন সাপরুত এবং নিকলাস এরপর ডায়স্কারাইডসের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি অনুবাদও চিত্রিত হয়। তন্মধ্যে ১২২৪ খৃ. চিত্রিত আবদুল্লাহ আল ফজলের 'মেটিরিয়া মেডিকো' সবচেয়ে প্রাচীন। এই পাণ্ডুলিপির ৩০টি মিনিয়েচার বার্লিংটন হাউসে প্রদর্শিত হয়। এ চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হল, সমান্তরাল তৃণখণ্ডের দীর্ঘ রেখা দ্বারা সমতল ভূমি, চিত্রের উভয় পাশে প্রতীক ধর্মী বৃক্ষলতার দ্বারা উদ্যান প্রদর্শনের রীতি কৌশল, হ্যালো, রঙিন ও নকশাকৃত পোষাক পরিচ্ছেদ ব্যবহার এ পরিপ্রেক্ষিতের অভাব।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিত্রিত গ্যালেনের যে পান্ডুলিপি ভিয়েনার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে এবং প্যারিসে আরেকটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও এগুলোকে মেসোপটেমীয় প্রভাব ও সেলজুক পারস্য রীতির মিশ্রণ বলা হয়েছে। 'কালিলা ওয়া দিমানা' (১২৮০) চিত্রাবলীতে এই রীতির প্রভাব সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছে। সিফার হারিরির 'মাকামাত' মুসলিম চিত্রকরার এক নতুন দিগন্ত প্রদর্শন করেছে। খৃষ্টান প্রভাব কমিয়ে পারস্য শিল্পকলার উপাদান সংযোজন এই চিত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মেসোপটেমীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য

১। এ চিত্রকলা পাণ্ডুলিপি ভিত্তিক। ১১৯৭ খৃ. থেকে এ ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এর পূর্বে কিছু দেয়ালভিত্তিক চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

২। এ চিত্রকলার বেশীর ভাগই আরবীতে লিখিত ও অনূদিত।

৩। উজ্জ্বল গাঢ় রংয়ের ব্যবহার এই চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রং ব্যবহার হত এবং এগুলো পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় সমতলভাবে রং করা হতো।

৪। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দ্বি-মাত্রিকতা। দ্বি-মাত্রিকতা হল চিত্রের গভীরতা না থাকা। অবশ্য পরে ত্রি-মাত্রিকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৫। বাস্তবের চাইতে বেশী সুন্দর পোষাক পরিচ্ছেদ ও নকশা ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। একক ধর্মী বস্তুর ব্যবহার এবং কপটিক ডিজাইনের অনুসরণ।

৭। মেসোপটেমীয় চিত্রকলা ছিল শিক্ষার প্রসারে ব্যবহৃত।

৮। এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাস্তবতার চাইতে কল্পনা ও আবেগ বেশী কাজ করেছে।

৯। এ চিত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা অনেকটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যেমন একটি বন বুঝাতে গেলে সেখানে একটি গাছ একটি হরিণ ও একটি পাখির চিত্র আঁকা হত। অথচ একটি বনের জন্য এটি অস্বাভাবিক।

১০। এই চিত্রশিল্পের পাণ্ডুলিপিগুলোর মূল গ্রন্থাদি মৌলিক নয়।

১১। পাণ্ডুলিপি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বৃহৎ ক্যানভাসও ছোট করা হয়েছে।

ইলখানী চিত্রকলা

১২৫৮ খৃ. হালাকু খাঁ'র বাগদাদ আক্রমণের ফলে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে এবং ইলখানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন রাজধানী হয় 'তাব্রিজ'। এ সময় থেকে মুসলিম চিত্রশিল্পে মেসোপটেমীর প্রভাব বিলোপ প্যায় এবং চীনা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গাজান খানের আমলে তাব্রিজে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি চিত্রকলা একাডেমী। ক্রমে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে এই একাডেমি। স্থানীয় শিল্পীগণ ছাড়াও চীনা চিত্রকররা তাব্রিজে বসে নিজস্ব রীতি ও উপাদানের মাধ্যমে চিত্র অংকন করেন। এভাবে ব্যাপক চীনা প্রভাবাধীন যে চিত্রকলা গড়ে উঠে তা ইলখানী চিত্রকলা নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইলখানী চিত্রকলার অন্যতম প্রধান পাণ্ডুলিপি ইবনে বখতিয়সু'র 'মানাফি আল হায়ওয়ান'। ত্রি-মাত্রিক পটভূমি বাস্তবধর্মী প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং চীনা বিষয়বস্তুতে নির্মিত এই চিত্রে প্রথম চীনা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আল বিরুনীর 'আল বাকিয়া' ইলখানী চিত্রপিঠের একটি অন্যতম পাণ্ডুলিপি। ১৩০৭ সালে চিত্রিত রশিদ উদ্দিনের জামে আত্ তাওয়ারি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। ইলখানী চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফেরদৌসীর সুবিখ্যাত শাহনামার (১৩০০) অসংখ্য চিত্রিত

পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। এসব চিত্রকলার বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রিয় অশ্ব রাকস ও রুস্তমকে ধরে রাখার চেষ্টা, দৈত্যরাজ জাহাহ্কে তীরবিদ্ধ করতে উদ্ধত রুস্তম, বারদার বানী কায়দাফা ও সিকান্দর। চীনা বৈশিষ্ট্য এতে প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন ঃ মেঘখণ্ড, শিরোভূষণ, মুখাবরণ, চীনা পোষাক পরিচ্ছদ, ঘোড়ার মডেল, ফ্যালকন, পর্বত ইত্যাদি।

ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'কালিলা ওয়া দিমানা' পাণ্ডুলিপি ইলখানী চিত্রশিল্পে বিশেষ অবদান রেখেছে। পারস্য চিত্রকলার ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে এ পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয়েছে যার কারণে চিত্ররীতি ও কৌশলের বিবর্তনে এর চিত্রাবলী বিশেষ তাৎপর্যবহ। এসব ছবির মধ্যে যেগুলোতে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে তন্মধ্যে, চার বন্ধু, চোর ও বিচারকের গল্প, স্বচ্ছ জলে কুকুরের প্রতিবিম্ব, সিংহ ও ষাঁড়ের গল্প, কাছিম ধৃত ও তার বন্ধু কাক ও হরিণের পালায়ন, বাজপাখী ও খরগোশ, সিংহের দরবার, বানর রাজা ও কাছিম প্রভৃতি মিনিয়েচার উল্লেখযোগ্য। ইলখানী চিত্রকলার মেসোপাটেমীর চীনা এবং সাসানীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

জালাইরী চিত্রকলা ও খাজু কিরমানী

১৩৩৫ খৃ. ইলখানীদের পতন হলে চুপানিদ ও জালাইরী নামক দুটি মোঙ্গলীয় জাতির শাখা তাব্রিজ ও বাগদাদ দখল করে। ক্রমে জালাইরীরা উত্তর ইরাক ও পশ্চিম পারস্যে জালাইরী বংশের শাসনদন্ড গ্রহণ করেন। তারা চিত্রকলার অব্যাহত সমর্থন দান করেন। এ সময় মূলতঃ চীনা ও পারস্য ধারা পরিব্যপ্ত হয়। কাযউইনীর 'আজায়েবুল মখলুকাত' (১৩৮৮) রশীদ উদ্দিনের 'মোঙ্গল জাতির ইতিহাস' হুসায়নের 'কিতাবুল বুলহান (১৪০১) সুলতান আহমদ জালাইরীর 'দিওয়ান' (১৪০২) এসময়ের নিদর্শন। খাজু কিরমানির 'দিওয়ান' (১৩৯৬) এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র পাণ্ডুলিপি। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কিরমানীর এ পান্ডুলিপি নিঃসন্দেহে মুসলিম চিত্রকলার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ড. এস এম হাসান লিখেন ঃ খাজু কিরমানীর মিনিয়েচারগুলি মুসলিম চিত্রাবলীর বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এতে পূর্ববর্তী শৈল্পিক গুণাবলীর সুষ্ঠু সমন্বয়ই ঘটেনি বরং পারস্য রীতি ও কৌশলের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ তৈমুরী স্কুলের সূচনা ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে অংকিত এই চিত্রাবলীর মাধ্যমে হয়। সে সমস্ত উপকরণ পারস্য চিত্রশিল্পকে অসাধারণ মর্যাদা এবং অত্যুৎকৃষ্ট সাফল্য দান করেছে তা খাজু কিরমানীর চিত্রাবলীতে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে... খাজু কিরমানির মিনিয়েচারগুলি প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম পারস্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী

অংকনের সূচনা করে এবং এর উপাদানগুলি সুষ্ঠ আঙ্গিকে ও বিন্যাসে পুষ্ঠ হয়ে পরবর্তীকালের পারস্য চিত্রকলার একটি বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়।

তৈমুরী চিত্রকলা

তৈমুরী চিত্রকলা (১৩৮৬-১৫০২) পারস্য চিত্রশিল্পে রেনেঁসা যুগের সূচনা করে। তৈমুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর তৈমুরের অবদান এক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত। তৈমুরী চিত্রকলাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ তাব্রিজ, সিরাজ ও হিরাত।

তাব্রিজ চিত্রকেন্দ্রের চিত্ররীতির ধারক বাহক পাণ্ডুলিপিগুলো হচ্ছে 'শাহ্নামা' (১৩৮৯), যুয়াহনীর তারিখ-ই জাহান (১৪৩৮), নিজামীর 'খসরু ও শিরিন' (১৩৯৬-১৪৩০) ইত্যাদি, সিরাজ চিত্রপীঠের 'গুলবেনকিয়ান' কাব্য সংকলন, ইসকেন্দার' সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রিত 'কবিতা সংকলন', নিজামীর 'খামাসা' (১৪১০-২০), মাহমুদ আল হুসাইনের 'কাব্য চয়নিকা' (১৪২০) বডলীন গ্রন্থ (১৪২০) ইত্যাদি, হিরাট চিত্রপীঠে অংকিত 'সিরাজ নামা, (১৪০৬), শাহ্নামা (১৪৪০), হুসাইন মির্জার 'দিওয়ান' (১৪৮৫), আমীর খসরুর 'দিওয়ান' প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি এ যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তৈমুরী চিত্রকলার প্রধান শিল্পী খলিল ও আমীর শাহী। এ যুগের চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ প্রাণী জগতের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তবধর্মী চিত্রায়ন, টেকস্টের সাথে চিত্রের সমন্বয়; মনোমুগ্ধকর ও রোমান্টিক পরিবেশ, সর্পিল নদী, মুকুলিত পুষ্প, দুর্বাঘাস, সাইপ্রাস বৃক্ষ; প্রাণচাঞ্চল্য ও প্রাণোচ্ছল প্রতিকৃতি বলিষ্ঠ রেখা ও পোষাক পরিচ্ছদে শিরস্ত্রাণ, বর্মের ব্যবহার; প্রগাঢ় ও উজ্জ্বল রং, রীতি কৌশলে প্রকাশ ও বাস্তবধর্মী মডেলিং চাঁদ ও তারার সাহায্যে রাতের দৃশ্য অংকন, গতিময়তা, অলংকরিক পদ্ধতি।

সাফাভী চিত্রকলা ও কামাল উদ্দীন বিহ্যাদ

মুসলিম চিত্রকলার স্বর্ণযুগে যে সকল প্রভাবশালী চিত্রকরের আবির্ভাব ঘটে তন্মধ্যে শীর্ষস্পর্শী চিত্রকর ছিলেন কামাল উদ্দীন বিহ্যাদ (১৪৪০-১৫২৪) সুলতান হুমায়ুন মীর্জার রাজত্বকালে (১৪৬৮-১৫০৬) এ যুগের সূচনা হয়।

বিহ্যাদের শিল্পকর্ম সাধারণভাবে তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. ১৪৬৭-১৫০১ পর্যন্ত হিরাত চিত্রকলার পরিচালক হিসাবে রচিত কর্ম।

২. ১৫০৭-১০ পর্যন্ত সায়বানা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রিত শিল্পকর্ম; এবং

৩. ১৫১০-১৫১৪ পর্যন্ত শাহ্ ইসমাইলের অধীনে শিল্প চর্চা।

বিহ্যাদের চিত্রকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পারস্য চিত্রকলাকে মঙ্গোলীয় চিত্রকলার ঐতিহ্য থেকে অব্যাহতি দান করেন। ভিঞ্চি, এঞ্জেলা, রাফায়েল প্রমুখ যেমন ইউরোপীয় চিত্রশিল্পে রেনেঁসার জন্ম দিয়েছিল, তেমনিভাবে মধ্য এশিয়ার মুসলিম চিত্রশিল্পের রেনেসাঁর অগ্রদূত ছিলেন কামাল উদ্দীন বিহ্যাদ। ব্রাউন বলেন ঃ Bihjad was the Rafael of the east.

বিহ্যাদের শিল্পকর্মের মধ্যে শেখ সাদীর বুস্তার ৫টি মিনিয়েচার (১৪৮৮/৮৯), নিযামীর খামাসার মিনিয়েচার (১৪৯২), শরফুদ্দীন আলী ইয়াজদীর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী চিত্রাবলী, হুসাইন মীর্জার প্রতিকৃতি, উজবেক নেতা সায়বানা খানের প্রতিকৃতি প্রভৃতি প্রভূত খ্যাতির অধিকারী তাঁর শিল্পকর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ জটিল বিষয়বস্তুর সুনিপুণ ও চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস, বিষয়বস্তুর সাথে পটভূমির অপূর্ব সমন্বয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশের রীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের জীব ও আঁচড়, রংয়ের ব্যবহারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নতুন রংয়ের প্রয়োগ, বিভিন্ন শেডের ব্যবহারে প্রকট উজ্জ্বলতাকে স্তিমিত করে মোলায়েম পরিবেশ সৃষ্টি; কার্পেট, তাবু স্থাপত্যিক ঐতিহ্য ইত্যাদিতে আলংকরিক রীতি প্রয়োগ, জ্যামিতিক, লতা পাতার নকশা ও আরবী লিপির ব্যবহার অন্যতম।

বিহ্যাদ এবং তাঁর ছাত্রদের হাতেই পরবর্তীতে সাফাভী চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা ঘটে। তৈমুর বংশের পতনের পর বিহ্যাদ সাফাভী সম্রাট শাহ ইসমাঈলের অধীনে চাকুরী নেন এবং এর কয়েক বছর পরই মারা যান। তাঁর অবর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ যথাক্রমে আগা মিরাক, সুলতান মুহম্মদ, মীর সৈয়দ আলী, খাওয়াজা আবদুস সামাদ, ওস্তাদ মুহাম্মদী, রেজাই আব্বাসী প্রমুখ সাফাভী চিত্রকলাকে এগিয়ে নেন এবং চিত্রকলার স্বর্ণযুগকে প্রলম্বিত করেন।

সাফাভী চিত্রকলার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। শাহ্ ইসমাঈলের পৃষ্ঠপোষকতায় তাব্রিজে আগত হিরাটের প্রখ্যাত কামাল উদ্দীন বিহ্যাদ এবং তাঁর সহকর্মীদের কর্ম প্রথমযুগের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় যুগ চিহ্নিত করা হয়, শাহ আব্বাসের আমলে ইস্পাহানে রাজধানী স্থানান্তর করা হলে রেজাই আব্বাসীর নেতৃত্বে চিত্রকলা যে স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে সে যুগকে। বিহ্যাদের কিছু শিষ্য হিরাট থেকে বুখারায় এসে তাঁদের ওস্তাদের রীতিতে চিত্রকলা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মাহমুদ মুযাহিব ও তাঁর শিষ্য এবং আবদুল্লাহ প্রমুখ এ তৃতীয় যুগকে সমৃদ্ধ করেন।

প্রাথমিক যুগে সাফাভী চিত্রশালায় পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নের পাশাপাশি কিছু পাণ্ডুলিপিতে বিচ্ছিন্ন ছবিও চিত্রায়িত হয়। পরবর্তী সাফাভী যুগেও ব্যাপক হারে পাণ্ডুলিপি চিত্রায়িত হতে থাকে। বুখারা চিত্রশালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পাণ্ডুলিপি চিত্রের মার্জিনে বিভিন্ন জীবজন্তু লতাপাতা ও মানুষের প্রতিকৃতি সম্বলিত ছবি অংকন। সাফাভী চিত্রকলা তৈমুরী চিত্রকেন্দ্রের উত্তরাধিকার বহন করেছে বিহ্যাদের মাধ্যমে। ক্যুহনেল বলেন ঃ তৈমুরী আমলে বিশেষ করে হিরাটে যে পাণ্ডুলিপি উৎপাদন শিল্পের ধারার সূচনা হয়, সাফাভী আমলে তার পূর্ণ সমৃদ্ধি ঘটে। এই আমলে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন একটি শক্তিশালী জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।'

মোঘল চিত্রকলার প্রাথমিক যুগ

সাফাভী চিত্রশিল্পের হাত ধরে মোগল চিত্রকলার যাত্রা শুরু হয়। মোগল বাদশাহ হুমায়ুন ১৫৪৫ খৃ. পারস্য থেকে বিহ্যাদের ছাত্র খাওয়াজা আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলীকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। এখানে এসে মোগল চিত্রশিল্পের সূচনা করেন।

মোগল চিত্রশিল্পের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ ইন্দো-পারস্য পর্যায়; ২. স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণযুগ; এবং ৩. অধঃপতনের যুগ।

মোঘল শাসনের শুরু থেকে আকবর পর্যন্ত প্রথম যুগ ধরা হয়। বাবর মোগল চিত্রকলার বিকাশে প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে না পারলেও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন তাঁর শিল্পানুরাগী মন ও মননশীল চিন্তাধারাকে পরবর্তী মোগল শাসকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে। তদীয় পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খৃ. শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে পারস্যে দীর্ঘ ১৫ বছর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসময় তিনি প্রবলভাবে সাফাভী আমলের চিত্রকলার সান্নিধ্য লাভ করেন ও মুগ্ধ হন। ফলে ১৫৫৫ খৃ. যখন তিনি আবার দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন, তখন ফেরার পথে পারস্য থেকে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও আবদুস সামাদকে সাথে নিয়ে আসেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মীর সৈয়দ আলী দাস্তানে আমীর হামজা পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে মোঘল চিত্রশিল্পের সূচনা করেন। পুনঃ সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যে ১৫৫৬ খৃ. হুমায়ুন মৃত্যু বরণ করেন, আর মোগল শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের হাতে 'আইনে আকবরী' পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে মোঘল চিত্রকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে।

১৫৬৪ সালে আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে যে শহর নির্মাণ করেন সেখানে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্যের উল্লেখিত দুই শিল্পগুরু ক্রমে এই

চিত্রশালার অধ্যক্ষের পদ বরণ করেন এবং স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম অনেক চিত্রশিল্পী এখানে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে খসরু বেগ, খসরু কুলী কর্মাদাস, গোবর্ধন বাসাওয়ান, দাসওয়ান্ত, কেসু, মুকুন্দ, লাল, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ব্রাউনের মতে, আকবরের চিত্রশালায় এক থেকে দেড়শত জন বেতনভুক্ত চিত্রশিল্পী কাজ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যেমন পারস্য, তুর্কী, মধ্য এশিয়া, কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী শিল্পীদের অংশ গ্রহণে আকবরের চিত্রশালায় ইন্দো-পারস্য যুগের সূচনা করে।

আকবর আমলের চিত্রকলা প্রধানতঃ পাণ্ডুলিপি ও প্রতিকৃতি চিত্রায়ন এ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁর সময়ে যে সকল আকর্ষণীয় পাণ্ডুলিপি চিত্রিত হয় তন্মধ্যে, দস্তানে আমীর হামজা (১৫৭৫), চেঙ্গিস নামা, জাফর নামা, তৈমুর নামা, বাবুর নামা, শাহনামা, আকবর নামা, আয়ারদানিশ, বাহারিস্তান; হিন্দু বিষয়বস্তুর মধ্যে রজমনামা, নল দয়মন্তি, রামায়ণ, মহাভারত, আনোয়ারে সুহাইলী, কালিলা ওয়া দিমনা অন্যতম। আর প্রতিকৃতি অংকনের মধ্যে ছিল সম্ভ্রান্ত লোকদের ছবি, হাতির যুদ্ধ, সাধু ফকির ও পশু-পাখির প্রতিকৃতি ইত্যাদি।

এ সময়ের চিত্রশিল্পে বিহযাদীয়, রাজপুত এবং কিছুটা ইউরোপীয় প্রভাবও কাজ করেছে। তাই এর বৈশিষ্ট্যও ভিন্নতর, যেমন ঃ

১. একাধিক শিল্পী দ্বারা মিনিয়েচার অংকন;

২. প্রতিটি চিত্র দু'জন শিল্পী দ্বারা অংকন;

৩. একজন স্কেচ করতেন, আর মুখ্য শিল্পী রং-তুলির সাহায্যে তা সম্পন্ন করতেন।

জাহাঙ্গীর ও মোঘল চিত্রকলা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল চিত্রকলা স্বর্ণদ্বারে উপনীত হয়। মোগল চিত্রকলার এটি ছিল গৌরবময় যুগ। জাহাঙ্গীর নিজে একজন উঁচু দরের শিল্প সমালোচক ছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই লিখেন ঃ 'চিত্রশিল্পের অংকন ও উহার বিচার আলোচনায় আমি এতদূর পারদর্শিতা অর্জন করেছিলাম যে, মৃত অথবা জীবিত যে কোন শিল্পীর অংকিত যে কোন শিল্প-চিত্র আমার সম্মুখে হাজির করা হলে শিল্পীর নাম বলে দেওয়ার পূর্বেই আমি নিমিষে বলতে পারতাম- এটা অমুক শিল্পীর অংকিত,

আকবরের আমলে মোঘল চিত্রশিল্প ইন্দো-পারস্য রীতিতে গড়ে উঠেছিল, জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় তা বিলুপ্ত হয়ে মোগল চিত্ররীতির ধারায় প্রবাহিত হয়। ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী লিখেন ঃ 'জাহাঙ্গীর ছিলেন চিত্রশিল্পের প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র তিনি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে শিল্পীদের উৎসাহ বৃদ্ধি

করতেন। যুবরাজ হিসাবেই তিনি হিরাটের আগা রিজা নামে শিল্পীকে চিত্রাংকনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বহু বিদেশী শিল্পীকে তিনি তাঁর শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। জাহাঙ্গীর পারসিক চিত্রশিল্পীদের নিয়োগ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর আমলে চিত্রশিল্পে পারসিক প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।'

সম্রাট জাহাঙ্গীর বিভিন্ন চিত্রকলার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চিত্রকরগণ চিত্রায়ন করে যেতেন। ব্রাউনের মতে, জাহাঙ্গীরের শিল্পরুচি ও মননশীলতা মোগল চিত্রকলাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার জন্য সহায়তা করেছে। তাঁর আমলে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ফারুক বেগ, মুহাম্মদ নাদির, মুহাম্মদ মুরাদ, আগা রেজার পুত্র আবুল হাসান, ওস্তাদ মনসুর, তাঁরাচাদ, মনোহর বিষন দাস, গোবর্ধন প্রমুখ।

জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রকলা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

১. মিনিয়েচার বা পাণ্ডুলিপি চিত্রাবলী;

২. পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি অংকন; এবং

৩. প্রাকৃতিক দৃশ্য।

পাণ্ডুলিপি চিত্রের মধ্যে 'খামাসা' (১৬০৫) এবং 'তুজুখ-ই জাহাঙ্গীরী' (১৬০৫-২৩) অন্যতম। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী'-র অন্তর্ভুক্ত অসাধারণ চিত্রাবলীর মধ্যে 'দরবার মিছিল' (১৬০৫), 'কাবুল থেকে প্রত্যাগমন' (১৬০৭), উদ্যান দৃশ্য (১৬১০), শাহজাদা খুররমের বিবাহ দৃশ্য (১৬১০), মঈনুদ্দীন চিশতির মাজার জিয়ারত (১৬১৩), গোলাব-পাশী (১৬১৪), শাহ আব্বাসের সাথে আলম খান (১৬১৮/১৯), খান আলমের প্রত্যাগমনে দরবার অনুষ্ঠান (১৬১৯), শাহজাদা খুররমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সাক্ষাতকার (১৬১৭), আগ্রার দিওয়ানে খাসের দরবার দৃশ্য (১৬২০), জাহাঙ্গীর ও খুররমের আলিঙ্গন (১৬২২) এবং মৃগয়ার দৃশ্য সিংহ বধ (১৬২৩) অন্যতম।

প্রতিকৃতি অংকনে জাহাঙ্গীরের আমল এক চূড়ান্ত যুগে উপনীত হয়। Stanly clark বলেন ঃ Perhaps the most remarkable portrait of all is the well known draueing of a dying man in the Bodleian Library Oxford. জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্দেশিত (১৬১৮) টুপী পরিহিত উস্কখুস্ক শ্মশ্রু বিশিষ্ট মৃত পথযাত্রী বন্ধু এনায়েত খানের চিত্রাংকনের দৃশ্য পরিকল্পনায় মানসিক পরিবেশে সৃষ্টি, ভাব-ব্যঞ্জনা রঙের প্রাণস্পর্শী প্রয়োগ ধর্মীতা ও রেখার বলিষ্ঠতায় শিল্পী যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই দুর্লভ। প্রতিকৃতির প্রতি আজীবন আকর্ষণের দরুন সম্রাটের শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে।

প্রতিকৃতি বিভূষণে জাহাঙ্গীর দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। Brown এর ভাষায় ঃ The inventor of the portrait jewel.

জীবজন্তু পশুপাখি ও প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে এসময় অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়। ওস্তাদ মনসুর তুর্কী মোরগের এক অতুলনীয় প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে আবুল হাসান উড়ন্ত ইঁদুরের মত বহুবর্ণ বিশিষ্ট এক দুর্লভ প্রাণীর চিত্র অংকন করেন। মনোহর কর্তৃক আঁকা একটি চিত্রে জাহাঙ্গীর একটি কাল মৃগ পরিচালনা করছেন। হ্যাবেলের মতে এটি, (One of the finest generic picture of the mughal school) ওস্তাদ মনসুর কাশ্মীরের প্রায় এক শতাধিক ফুল অংকন করেন। সবুজ লাল বর্ডারে ঘেরা ডান ও বাম পাশে সোনালী মার্জিন সহ লাল পুষ্প মুকুলিত চিত্রের সমারোহ মোঘল চিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রিত চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বাস্তব ধর্মী চিত্র;

২. হ্যালো ও ভারতীয় পাগড়ীর ব্যবহার;

৩. দাড়িযুক্ত মুখাবয়ব;

৪. পাতাযুক্ত গাছ ও ফুলের ব্যবহার;

৫. সম্রাটের প্রতিকৃতিতে হাতে কবুতর, ফুল ও তলোয়ার ইত্যাদি শোভা পেত;

৬. মানুষ, জীবজন্তু ও পাখির প্রাণবন্ত প্রতিকৃতি অংকন;

৭. সম্রাটের মুখাকৃতির ০.৭৫ ভাগ দেখা যেত, অন্য অংশ দেখা যেতোনা;

৮. প্রতিকৃতি ছিল পূর্ণ পৃষ্ঠার ও চিত্রের চতুর্দিকে হাশিয়া অঙ্কিত হতো;

৯. উজ্জ্বল গাঢ় রংয়ের ব্যবহার, সাদা, কালো সোনালী রংয়ের প্রাধান্য।

জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল চিত্রকলার অধঃপতন শুরু হয়। শাহজাহান চিত্রকলার চাইতে স্থাপত্য নিয়েই অধিক আগ্রহী ছিলেন। আওরঙ্গজেব স্বভাবতই শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তদুপরি তাঁর সময় থেকে সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় মোগল চিত্রকলা সম্পূর্ণরূপে রাজকীয় দরবারী এবং ধর্মীয় অনুভূতি বহির্ভূত ঐহিক শিল্পকর্ম। সলোমনের ভাষায় ঃ 'এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে গীতিকাব্য যে অবদান রেখেছিল, ভারতীয় শিল্পকলায় মুঘল চিত্রকলা অনুরূপ অবদান রাখতে সমর্থ হয়।'

গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান

লাইব্রেরী তথা গ্রন্থাগার হলো জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মানদণ্ড। একটি জাতি শিক্ষা, সহিত্য শিল্প ও মননে কতটুকু সমৃদ্ধ তা লাইব্রেরীর অবস্থান পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায়। ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিধিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও তার লালন এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মধ্য যুগে মুসলিম সভ্যতার সোনালী অধ্যায়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা সত্যিকার অর্থে সেই পরিচিতি বহন করেছিল। মুসলিম লাইব্রেরীসমূহের ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান করে।

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয় ও নির্দেশনা লাভ করে। অশিক্ষার আঁধারে নিমজ্জমান আরব জাতিকে এই নির্দেশনা দান এবং মহানবীর (সা.) সরাসরি তত্ত্বাবধান অতি অল্প সময়ে এক নতুন যুগের সূচনা করে জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন ঃ "আরব উপদ্বীপ আর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি সংলগ্ন ভূখণ্ড এই এলাকায় ইসলামের আলো প্রাপ্তির আলো বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির কোন নাম-নিশানাও দেখা যায়নি। কবিতা, বক্তৃতা, আর বিচারমূলক জ্যোতিষই ছিল প্রাক-ইসলামী আরবদের জনপ্রিয় চর্চার বিষয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কোন সেবকই ছিল না। কিন্তু জাতির জাগ্রত কর্মশক্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী যোগ করল নতুন উদ্দীপনা। এমনকি তার জীবনকালেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, যা পরবর্তীকালে বাগদাদ, সালেরনো, কায়রো ও কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।... অবশ্য কেবল হিজরী দ্বিতীয় শতকেই মুসলমানদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা একাগ্রভাবে শুরু হয়, আর এর প্রধান উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আরবদের শহরে বসতি স্থাপন থেকে।"

অষ্টম খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের পাদপীঠ পর্যন্ত তারা যে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে তা বহু শতাব্দী

মানবজাতিকে উপকৃত করে। এই আলোর মাঝেই আধুনিক সভ্যতার জন্মলাভ ঘটে। ক্রুসেডারদের অনমনীয়তা এবং স্পেনের পতন ইউরোপীর সভ্যতার বিকাশের দ্বার খুলে দেয়। পৃথিবীর বহু জাতি-রাষ্ট্রকে সভ্যতার পথ প্রদর্শন করে। Humbold লিখেন ঃ The Arabs were admirabey suited to act the part of mediators and to influence the nations from the Euphrates to the Guadalquivir and Mid Africa. Their unexampled intellectual activities mark a distinct epoch in the history of the world, 'মধ্যস্থতা করার এবং ইউফ্রেটিস হতে গোয়াডাল কুইভার ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের জাতিবৃন্দকে প্রভাবিত করার জন্য আরবদের অদ্ভুত যোগ্যতা ছিলো। তাঁদের অনন্য সাধারণ জ্ঞান-সাধনা জগতের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি করেছে।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে বহু নতুন দেশ মুসলমানদের হাতে আসে। প্রথম খলীফা আবু বকর (৬৩২-৬৩৪ খৃ.) এর আমলে কুরআনের বিক্ষিপ্ত সংগ্রহ বিশ্বস্ততার সাথে একত্রিত করা হয়। হযরত উমারের (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) খিলাফতকাল পর্যন্ত এই প্রথম মুসলিম গ্রন্থটি লিখিতকারে হযরত হাফসার (রা.) নিকট থাকে। ইত্যবসরে পারস্য এবং বাইজান্টাইন বিজিত হয়। সাসানীয় আমলে পারস্য ছিল এক উন্নত সভ্যতার লীলাভূমি। খৃষ্টীয়, গ্রীক ও সিরীয় বিজ্ঞান-দর্শনের উত্তরাধিকার পারস্যের মাধ্যমে আরবদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য, পারস্য সংস্কৃতি যে আরবদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রফেসর ড. আহমদ আমীন তাঁর সুবিখ্যাত 'দুহাল ইসলাম' গ্রন্থে এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন।

৬৪১ খৃ. মুসলমানরা পারস্য বিজয় সম্পন্ন করে। বাইজান্টাইন সাম্রাজের গোঁড়া সরকার জাস্টিনিয়ান ৫২৯ খৃ. গ্রীক জ্ঞান চর্চার সর্বশেষ স্কুলটি বন্ধ করে দেন। ফলে সেখানকার শিক্ষকরা পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গ্রীক শিক্ষকগণের মাধ্যমে পারস্য হয়ে মুসলিম আরবরা গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ লাভ করে। তাই মুসলিম গ্রন্থাগারে প্রথম শোভা বর্ধন করে যে সকল অমূল্য গ্রন্থ তা ছিল বিদেশী। চিন্তাধারার অমূল্য ফসল গ্রীক-পারস্য উত্তরাধিকার। আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে তাই বৈশ্বিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল মুসলিম শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের প্রাথমিক রূপায়ন। পাশ্চাত্যের অসংখ্য মনীষী এসেছেন এখানে শিক্ষা লাভের জন্য। ইংরেজ লেখক স্বীকার করেন ঃ ইসলামী ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগে মুসলমানগণ সেই মধ্যপ্রাচ্য, মুরীয় স্পেন এবং পর্তুগালে বহু সংখ্যক উন্নতমানের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এসব শিক্ষায়তনের

গ্রন্থাগারসমূহ শুধু মুসলমানদের নিজস্ব পুঁথি-পুস্তকে নয়, গ্রীক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলীতেও পূর্ণ। এসব শিক্ষায়তন গোটা মুসলিম জাহানের নিকট তো বটেই খৃষ্টান তথা গোটা পাশ্চাত্য জগতের ছাত্র সমাজের নিকটও ছিল আকর্ষণীয়। পাশ্চাত্য জগতের খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দ যেমন– টলেডোর মাইকেল স্কট, ডানিয়েল মুবলী, বাথের এডেলার্ড, রবার্টাস এংলিকাস প্রমুখ অনেকেই এ সব ইসলামী শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। (J. B. Trend; The legacy of Islam, p-28)

মুসলিম লাইব্রেরীসমূহের ঐশ্বর্য বর্ণনার পূর্বে একটি সন্দেহ ও অপপ্রচারের অপনোদন হওয়া জরুরী। কেননা এই তথাকথিত ঘটনাটি মুসলিম আদর্শের পরিপন্থী। দ্বিতীয় খলীফা উমার দি গ্রেট (৬৩৪-৬৪৪ খৃ.)-এর শাসনামলে আমর বিন আসের নেতৃত্বে মিশর বিজিত হয়। অভিযোগ যে, মিশরের শহর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়কালে খলীফা উমার সেখানকার এক প্রচীন দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সমেত লাইব্রেরীর সংগ্রহ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করান। ঐতিহাসিক আবদুল লতীফ বাগদাদী (১১৬২-১২৩১ খৃ.) এবং ইবনুল কিফতি (মৃ. ১২৪৮ খৃ.) প্রমুখ এর বিবরণের সূত্র ধরে পাশ্চাত্যে এই ঘটনা প্রচারিত হয়। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ এ ঘটনা যে অসত্য অপবাদ তা প্রমাণ করেছেন। তাদের প্রধান যুক্তি হল মিশর বিজয়ের সমসাময়িক কোন লিখিত ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। ঘটনার দীর্ঘ ছয় শতাব্দী পর উক্ত লেখকরা তা উল্লেখ করেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে দেখানো হয়েছে এই লাইব্রেরী উমারের বিজয়ের বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। টলেমি সোটরের পুত্র টলেমি ফিলাডেল ফাস (২৮৫-২৪৭ খৃ. পূর্ব)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর গ্রন্থগারিকের ক্যাটালগ পরীক্ষা করে দেখা যায় খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি বিলুপ্ত হয়। ৪৭ খৃ. পূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজারের আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণকালে সম্ভবত এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। Ruth Stellhorn Mackensen Background of the Nistory of Moslem Libraries (America Journal of Semetic Languages 1935) রচনায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, ওই কাহিনীর কোনই ভিত্তি নাই। M. N. Roy লিখেন St Cyril যিনি হাইপেরিয়ার বিখ্যাত মেলায় বাগদেবীকে কলঙ্কিত করেছিলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের প্রকৃত ধ্বংস হয়েছিলো তারই হাতে। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়াতেই এ ঘটনা ঘটে। তিনি আরো লিখেছেন ঃ 'কায়রোর গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ছিলো

এক লক্ষেরও বেশী, কর্ডোভাতে ছিলো তারও ছয়গুণ। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারের ধ্বংসের জন্যে দায়ী করে ইসলামের অভ্যুত্থানকে হিংস্র ধর্মান্ধতার অগ্ন্যুৎপাতরূপে বর্ণনা করার যে অপবাদ তা কত অসত্য। যারা সুমহান বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠায় ও সংরক্ষণে পেয়েছেন অপরিসীম আনন্দ, তাঁরাই যে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে নির্মমভাবে আগুন ধরিয়েছেন, যাঁরা মহামূল্য সম্পদ রক্ষা করে মানবজাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে রয়েছেন তারাই যে সে সম্পদ ধ্বংসের কাজে ইন্ধন যুগিয়েছেন একথা যে বিশ্বাস করে তাকে হয় ধর্মনিষ্ঠ, না হয় সহজ প্রতারিতই বলতে হবে। নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস পাঠ করলে যখন তা নানাবিধ কিংবদন্তী দূর করে দেয় আর বিদ্বেষপ্রসূত গাল-গল্পকে নিরুৎসাহিত করে তখন ইসলামের অভ্যুত্থান মানবজাতির পক্ষে অশুভ না হয়ে বরং আশীর্বাদ বলেই মনে হয়।'

মহান খলীফাগণের অন্যতম হযরত উসমান (রা.)-এর সময় (৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) কুরআনের কপিগুলো সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে একটি পরিশীলিত রূপ দেয়া হয়। ৬৫১ খৃ. সম্পূর্ণ হওয়া ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের সম্পাদকগণের প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত ওহী লিখক হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.)।

বিশেষ জ্ঞানবেত্তার অধিকারী হযরত আলী (রা.) ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মহীরুহস্বরূপ। তাঁর খিলাফতকালে (৬৫৬-৬৬১ খৃ.) তারই নির্দেশে আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। আলী (রা.)-কে বলা হত জ্ঞানের মিউজিয়াম। দীওয়ানে আলী নামক একটি কাব্য সংকলনও আছে তাঁর। দুর্ভাগ্য, তাঁর শাসনামল ছিল মুসলিম জাহানের এক দুর্যোগকাল আর শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এতে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু জ্ঞান-সাধনায় তিনি যে অসামান্য দান রেখে গেছেন তার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

খিলাফতে রাশেদার পর আসে উমাইয়া আমল (৬৬১-৭৫০ খৃ.) এক অন্তর্বর্তী কাল। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চেয়ে ভূখণ্ড বিজয় এবং রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ও শক্তি অর্জনই ছিল উমাইয়া শাসনামলের মূল বৈশিষ্ট্য। যদিও যতটুকু অনুর্বর এই সময়কে মনে করা হয় ঠিক ততটুক নয়। লেখকদের লেখার উপাদান হিসাবে স্বল্প আয়ুর- 'প্যাপিরাস' ব্যবহার এ সময়কার নিদর্শনের ঘাটতির একটি কারণ হতে পারে। শামসুল হক লিখেছেন ঃ সাহিত্য কর্মের স্বল্প নমুনা এবং ইতিহাসবেত্তাদের বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও কিন্তু এ যুগকে যতটা বন্ধ্যা বলে মনে করা হয়, ততটা বন্ধ্যা এ যুগ ছিল না। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে মুসলমানেরা মিশর জয় করেন। মিশরে তখন লেখার উপাদান হিসাবে

প্যাপিরাসের বহুল ব্যবহার ছিল। প্যাপিরাসের জনপ্রিয়তা মুসলমানদের মুগ্ধ করেছিল। তারাও তখন লেখার কাজে প্যাপিরাস ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগের সাহিত্য-কর্মের নমুনা না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল প্যাপিরাসের বহুল ব্যবহার। প্যাপিরাস ছিল ক্ষণস্থায়ী। সিরিয়া, ইরান ও পারস্য দেশের আবহাওয়া প্যাপিরাস সংরক্ষণের অনুকূলে ছিল না। মিশর থেকে যেসব প্যাপিরাস সংগৃহীত হয়েছিল, তাদের প্রায় সবই ছিল দলিল-দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও হিসেব-নিকেশ। হস্তলিখিত যে প্রাচীন পুঁথিটি আজও বর্তমান আছে, সেটি প্যাপিরাস পুঁথি। সেটি ৮৪৪ সালের এবং তার পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র সাতাশ।' (উদ্ধৃত, Mackesen; পূর্বোক্ত)

উমাইয়া আমলে কিছু হাদীসের সংকলন রচিত হয়, এর মাধ্যমে গ্রন্থ রচনার ধারা সূচিত হয়েছিল। মালিক ইবনে আনাস (মৃ. ৭৫৯) রচিত হাদীস সংকলন 'মুয়াত্তা' এর শ্রেষ্ঠ, সাঈদ ইবনে আরুবা (মৃত্যু ৭৩৩ খৃ.), আবদুল মালিক ইবনে জুরাইজ প্রমুখ। স্মর্তব্য, মহানবীর (সা.) সাহাবায়ে কিরামের বিরাট একটি দল জ্ঞান সংগ্রহ ও প্রদানের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে হাদীস, সিরা ও মাগাযী রচনার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তার মূল্যবান উৎস ছিলেন সাহাবায়ে কিরামগণ। তাদের উত্তরসূরী হিসাবে তাবেয়ী এবং তাবা তাবেয়ীনগণের ভূমিকা ছিল মূল রথ চালকের। ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, 'ইসলামের প্রাথমিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সাহাবাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ আরবের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান বিস্তারের জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ইয়েমেন ও বাহরায়েনেও শিক্ষিত লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত ওমরের রাজত্বকালে যে সমস্ত দেশ ইসলামের পতাকাতলে আসিয়াছিল, সেখানে তিনি রাসূলে করীমের (সা.) পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনেক শিক্ষাবিদ পাঠাইয়াছিলেন। হযরত আবু বকরের সময় মুয়াজ বিন জাবালকে সিরিয়ায় পাঠান হইয়াছিল। সাহাবাগণ যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই তারা জ্ঞানের আলোক বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তারা হাজার হাজার লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনেক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হযরতের সাহাবাদের পর তাহাদের সঙ্গীগণ এই ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখেন। মহান সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনা ইসলামে গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। হাদীসের নিজস্ব মূল্য ছাড়াও এটি আইন, বিচার, ইতিহাস ও জীবনী, সর্বোপরি গবেষণা ও সাহিত্যের অন্যতম উৎস হিসেবে আজও বিবেচিত হয়।

বিশিষ্ট পাশ্চাত্য গবেষক Brockelman উমাইয়া যুগের গদ্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় কিছু লেখক ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (মৃ. ৭২৮ খৃ.), আবিদ বিন সারিয়া, আবু মিখনাফ (মৃ. ৭৪৪ খৃ.) আয্ যুহরী এবং তাঁর শিষ্য আল আসিরী প্রমুখ। এ সময়কার গদ্য গ্রন্থের যে সকল নিদর্শন আজও টিকে আছে তা হল, আসাদ বিন মূসা বিন ইব্রাহীমের (মৃ. ৪৯ খৃ.) 'কিতাবুস শুহদ' মুহাম্মাদ বিন শিরীনের (মৃ. ৭২৮ খৃ.) 'কিতাবুল গাওয়ামী' এবং মুহাম্মাদ বিন আলী বিন ওমর আস্ সলীমের 'কিতাবুল ইশারা ফি ইলমিল ইবারা'। উমাইয়া শাহজাদা খালিদ বিন ইয়াজিদ (মৃ. ৭০৪ খৃ.) জ্ঞান-সাধনায় একটি বিশিষ্ট নাম। ড. এম আবদুল কাদের উল্লেখ করেছেন, এই খালিদ বিন ইয়াজিদ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর গোড়াপত্তন করেন। এর নাম ছিল 'খিজানাতুল কুতুব'। উমার বিন আবদুল আজীজ খলীফা হলে (৭১৭-৭২০ খৃ.) তিনি এই গ্রন্থগারের পুস্তকসমূহ আগ্রহী পাঠকদের ধার দেওয়ার আদেশ দেন। H. A. R. Gibb তাঁর Studies on the civilization of Islam (1962) গ্রন্থে লিখেছেন যে, উমাইয়া খলীফাগণ ইতিহাস চর্চার উৎসাহ দিতেন। সে যুগে দামেস্ক ও ইরাকে যে দলীল ও নথি সংরক্ষিত ছিল তা জানা যায়। এসব নথি থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে সংকলকরা কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করেছিল।

আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খৃ.) নিঃসন্দেহে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে আল মনসুর বাগদাদ নগরীর পত্তন করেন এবং নতুন রাজধানী হিসেবে একে ঘোষণা দেন। আর বাগদাদ নগরীর যে বিশেষত্ব কিংবদন্তী হিসেবে গড়ে উঠেছে তার কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ হিসেবে তৎকালে এর অবস্থান। প্রভাবশালী আব্বাসীর খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ, অনুবাদ লালন ও গবেষণায় বাগদাদ এক অত্যুজ্জ্বল বাতিঘরের মর্যাদা লাভ করেছিল। আল মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানচর্চার প্রতি পরিপোষকতার মুসলিম সমাজে পুস্তক-প্রীতি আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এই বিপুল সংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাইতুল হিকমা' -রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত প্রথম বৃহদাকার লাইব্রেরী। আরবদের অগাষ্টাস খ্যাত খলীফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩) এর আমলে বায়তুল হিকমা গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরী হিসাবে পূর্ণাঙ্গ জৌলুশপ্রাপ্ত হয়।

খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯)-এর দরবার অলংকৃত করেছিলেন অনেক পণ্ডিত গবেষক। অমর ঐতিহাসিক আল ওয়াকেদী (৭৩৬-৮১১ খৃ.) তাঁদের

অন্যতম। একবার তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাবলী বাগদাদ থেকে তাইগ্রীস নদীর অপর পারে নিয়ে যেতে ছয়শত বাক্সসহ একশত বিশটি উটের প্রয়োজন হয়েছিল। বায়তুল হিকমায় ফার্সী, গ্রীক, মিশরীয়, কালদীয়, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ সংগৃহীত হত। তাঁর উজির ইয়াহিয়া বার্মাকী বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের বাগদাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

আল মামুন (৮১৩-৮৩৩) আব্বাসীয় শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল যেন। বিদেশী বিশেষ করে গ্রীক অনুবাদের ঝর্ণাধারা এ সময় প্রবাহিত হয়। খোদাবক্স উল্লেখ করেন, একমাত্র গ্রীক রচনাবলী অনুবাদ করতেই তিনি তখনকার তিন লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। বিশ্বের যেখানেই থাকুক, তিনি বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ সংগ্রহে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছেন। বিদেশী গ্রন্থ সংগ্রহ মাত্রই তিনি ইহুদী, পার্সী, খৃষ্টান, মুসলিম নির্বিশেষে পণ্ডিতদেরকে তার অনুবাদে নিযুক্ত করেছেন। একবার তিনি রোমের শাসক কায়সরকে লিখলেন যে, এ্যারিস্টটলের বইসহ অন্যান্য কোন বই রোমে থাকলে তা যেন বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখনকার মুসলিম দুনিয়ার প্রতিপত্তির কারণে খলীফার একটি সাধারণ চিঠি ও অন্যান্য দেশের শাসকদের কাছে ফরমানের মর্যাদা পেত। যা হোক, চিঠি পেয়ে রোম-প্রধান পুস্তকের খোঁজে লেগে গেল। শেষতক এক পাদ্রীর সূত্রে মজবুত বাক্সবন্দী কিছু দর্শন গ্রন্থ পাওয়া গেল তালাবদ্ধ অবস্থায়। খৃষ্ট ধর্মের ক্ষতি হবে আশংকায় এ পুস্তকগুলো এভাবে রাখা হয় এবং প্রত্যেক রোমান সম্রাট এতে একটি করে তালা বাড়িয়ে গেছেন। কায়সার এ সকল নিষিদ্ধ পুস্তক পাঁচটি উটে বোঝাই করে বাগদাদ পাঠিয়ে স্বস্তি লাভ করেন। আল মামুন এই অমূল্য ধন পাওয়া মাত্র দার্শনিক আলকিন্দিকে এগুলির অনুবাদে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনায় মামুনের দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহের নেশা প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ চাইতে লগলেন। সৌজন্যস্বরূপ আসতে লাগলো জ্ঞানের অমূল্য সব সংগ্রহ। শিবলী নোমানী লিখছেন ঃ "আর্মেনিয়া, মিসর, সিরিয়া, কাব্রিস ও অন্যান্য স্থানে দূত পাঠানো হল এবং লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হল দর্শনভিত্তিক বই-পুস্তক যেখানে যা পাওয়া গেল তা সংগ্রহের জন্যে। এই সময়ে কেস্তা বিন লোকা নামক বিখ্যাত এক দার্শনিক রোমে পৌছলেন এবং বহু দর্শনের পুস্তক সাথে নিয়ে এলেন। মামুন এ খবর পেয়ে তাকে ডেকে 'মানমন্দির' এর অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত করলেন। সহল বিল হারুন নামক এক পার্সী ডাক্তারকে

নিযুক্ত করলেন মুজুসী সভ্যতার মূল্যবান বই পুস্তকগুলো অনুবাদ করার জন্য। মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভেতরই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিল।... এ যুগে যেসব বই-পুস্তক অনূদিত হয়েছিল তা গ্রীক, ফার্সী, কালভী, কিবতী ও শামী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। যেসব রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে মামুনের বন্ধুত্ব ছিল, তাঁরাও উপঢৌকন পাঠাতে গিয়ে মামুনের রুচি মোতাবেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে পাঠাতেন। ভারতের এক রাজা তাঁর দেশের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী দোবানকে মামুনের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন।"

বায়তুল হিকমা ছিল বাগদাদের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। গ্রন্থাগার অংশের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল মানমন্দির। এখানে বিজ্ঞানীরা দিনরাত নিরলস গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ও বিজ্ঞানী। সহল বিন হারুন, সাঈদ বিন হারুন, হুনাইন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৮৭৩), মুসা আল খারিজমী (৭৮০-৮৫০ খৃ.) প্রমুখ বিজ্ঞানী এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১২৫৬ খৃ. মোঘলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের উপস্থিতি বর্তমান ছিল।

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে দাইলাম নামক পার্বত্য এলাকার অধিবাসী ছিলেন আবু ওয়াহ্‌ইয়া। তিনি এবং তাঁর তিন পুত্র এক সময় আধিপত্য বিস্তার করে দখল করেন ইস্পাহান, খুজিস্তান প্রভৃতি এলাকা। ৯৪৫ খৃ. তাঁরা শিরাজে আধিপত্য বিস্তার করে। তখন বাগদাদের খলীফা ছিলেন আল মুসতাক্‌ফি (৯৪৪-৯৪৬ খৃ.)। এ দুর্বল ও অথর্ব খলীফার উপস্থিতির কারণে আহমদ ইবনে বুওয়াহ্‌ইয়া বাগদাদে এসে কার্যত ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং মুইজুদ্দৌলাহ্ উপাধি ধারণ করে নেপথ্য খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে বুওয়াহীয়ারা শতাধিক বছর (৯৪৫-১০৫৫ খৃ.) আব্বাসীয় ক্ষমতার নেপথ্যে ছিলেন এবং ইচ্ছামত খলীফা নির্বাচন ও সিংহাসনচ্যুত করতেন। তারা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী, ফলে সুন্নী খেলাফতে নিজেদের মতবাদ প্রচারে এগিয়ে আসেন। তাঁরা তাদের রাজধানী শিরাজকে দ্বিতীয় বাগদাদে পরিণত করেছিলেন। এ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনেক ক্ষণজন্মা মনীষী ও বিদ্বান। উজির আবুল ফজল ইবনুল আমিদ (মৃ. ৯৭১ খৃ.) ছিলেন এরকম একজন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে মিশকাওয়াহ ছিলেন তাঁরই লাইব্রেরীয়ান। এতে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শতাধিক উট বোঝাই গ্রন্থাদি ছিল।

বুওয়াহী শ্রেষ্ঠ শাসক আদাদুদদৌলাহ (৯৪৯-৯৮২ খৃ.) রাজধানী শিরাজে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রাসাদ-সংলগ্ন এই লাইব্রেরীতে ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর বই। মুসলিম জাহানের সুবিখ্যাত ভৌগোলিক আল মুকাদ্দেসী এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, গ্রন্থাগারটি একটি গ্যালারী বিশেষ। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট, একজন লাইব্রেরীয়ান আর একজন পরিদর্শক। সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন বই ছিল না যা, আদাদুদদৌলাহর গ্রন্থাগারে স্থান পায়নি। একটি লম্বা কক্ষে গ্রন্থগারটি অবস্থিত ছিল, সঙ্গে ছিল গুদাম ঘর। শাহজাদা গ্রন্থাগার কক্ষ ও গুদাম ঘর বরাবর সুদৃশ্য কাষ্ঠ দ্বারা তিন গজ চওড়া ও মাথা সমান উঁচু মাচান নির্মাণ করেছিলেন আর মাচানের শীর্ষ থেকে নিচ পর্যন্ত ছিল বইয়ের তাক। ঐ তাকে সজ্জিত ছিল বই, প্রতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য পৃথক তাক, আর বিষয়ভিত্তিক ক্যাটালগে লেখা ছিল বইয়ের নাম। কীর্তিমান ব্যক্তিরাই কেবল এখানে প্রবেশের অধিকার পেতেন। আমি নিজে গ্রন্থাগারের উপর-নিচে দেখেছি। তখনো ওখানকার সবই ছিল সুবিন্যস্ত। সে সময় আমি প্রতিটি কক্ষে কার্পেট দেখেছি-ছিল বাতায়ন কক্ষ। এর চতুর্দিকে পরিবেশিত ছিল পানিবাহিত পাইপ। এ পাইপের মাধ্যমে কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে প্রবাহিত হত পানি।

শিরাজের এই গ্রন্থাগারটি কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে আদাদুদ্দৌলহর প্রতিষ্ঠিত আল নজফের হায়দরী গ্রন্থাগার আজও টিকে আছে। এটি বর্তমান হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের (রা.) মাজারের সম্পত্তি। মাজারের পূর্বপার্শ্বে একটি বড় কক্ষে এটি অবস্থিত। এতে প্রবেশ করতে হলে শেখের অনুমতি নিতে হয়। জৌলুশ হারানো এ গ্রন্থাগারে বর্তমানে আছে বহু মূল্যবান আরবী ও ফার্সী হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। আদাদুদ্দৌলাহর পুত্র শরফুদ্দৌলাহ (৯৮২-৯৮৯ খৃ.) পিতার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন এবং বহু লাইব্রেরী নির্মাণ করেন।

বুওয়াহী উজির ইসমাঈল বিন আব্বাদ (৯৩১-৯৯৫ খৃ.) যিনি 'সাহিব' নামে বেশী খ্যাতিমান, ছিলেন অসাধারণ এক গুণী পুরুষ। তিনি 'মুহিত' নামক যে আরবী অভিধান লিখেছিলেন তার কিয়দংশ আজও বিদ্যমান। ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কে তার লিখিত প্রবন্ধের একটি পাণ্ডুলিপি প্যারিসের বিবলিয়থেক ন্যাশনালে সংরক্ষিত আছে। তার যে গ্রন্থাগার ছিল তাতে একমাত্র ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেই গ্রন্থ ছিল চারশত উট বোঝাই পরিমাণ। Mehdi Nakosteen উল্লেখ করেছেন যে, সাহিবের গ্রন্থাগারটি পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহ দানের জন্য তিনি প্রত্যেক পণ্ডিতকে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত দান করতেন। হাজী

খলিফা লিখেছেন, এই গ্রন্থাগারে এক লক্ষ সতের হাজার বই ছিল। স্মর্তব্য, এই বিশাল গ্রন্থাগারকে ঘিরে এক বিশেষ বিদ্বৎ মহল গড়ে উঠেছিল। পারস্যের বহু গ্রন্থ তাকে উৎসর্গ করা হয়। সুলতান মাহমুদ গজনবীর বুয়াহীয়া শাসক আদাদুদ্‌দৌলাহকে (১০২৯ খৃ.) আক্রমণের সময় এই গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধিত হয়। শোনা যায় কতেক গ্রন্থ তিনি পুড়িয়েছিলেন এবং কতেক নিজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নিয়ে যান। বাকীগুলো বারবার মোঙ্গল আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বা লুট হয়েছিল।

একই বংশের উজির আবু নসর ইবনে আরদশী (মৃ. ১০২৫) নিজস্ব গ্রন্থাগারের পাশাপাশি সাহিত্যামোদীদের জন্য বাগদাদে এক ক্রটি শিক্ষা একাডেমী স্থাপন করেন। মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এটি বেশিদিন টেকেনি। বুওয়াহী আমলে ইখওয়ানুস সাফা নামক একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা ও সত্য অনুসন্ধানই ছিল এদের উদ্দেশ্য। এ সংঘ ৫১ খণ্ডে একটি মূল্যবান বিশ্বকোষ রচনা করেন। ৯৭০ খৃ. প্রকাশিত এই বিশাল জ্ঞানগত প্রয়াস সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলেও বা মুসলিম সমকালীন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম না হলেও জ্ঞান জগতের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাগদাদে সেলজুক সুলতানদের শাসনামলে (১০৩৭-১৩০০ খৃ.) মহাত্মা নিজামুল মুলক (১০১৭-১০৯২ খৃ.) ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তিনি বিভিন্ন পদে ৩০ বছরের অধিক কাল দেশ, দ্বীন ও জ্ঞানের সেবা করেন। তৎকালীন দুনিয়ার সেরা বিদ্যাপীঠ 'নিজামিয়া মাদ্রাসার' গৌরবময় প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানেও প্রচলিত 'দরসে নিজামীর' স্রষ্টা নিজামুল মুলক বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও নিজের আয়ের এক-দশমাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতেন। প্রখ্যাত সংস্কারক ও দার্শনিক ইমাম আলগাযালী (১০৫৮-১১১১ খৃ.) তাঁর অনুরোধে নিজামিয়া মাদ্রাসায় চার বছরকাল চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। বিখ্যাত এই শিক্ষায়তনটি মোগল আক্রমণের পরও টিকে ছিল।

নিজামুল মুলক মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে প্রচুর বইপত্র দান করেছিলেন। বইপত্র ক্রয় এবং নানা উৎস থেকে জমা হওয়া স্ফীত গ্রন্থ সম্পদ এই লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেছিল। অনেক সুধী ব্যক্তি এখানে গ্রন্থ দান করে যেতেন। ইবনুল আসীর লিখেন, ঐতিহাসিক মুহীউদ্দীন ইবনু নজর আল বাগদাদী (মৃ. ১২৪৫ খৃ.) নিজামিয়াকে প্রচুর বইপত্র দান করে গিয়েছিলেন। ১১১৬ খৃ. অগ্নিকাণ্ডে বইগুলি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। অন্যত্র সরিয়ে ফেলায় এ ক্ষতি থেকে বেঁচে যায় গ্রন্থাগারটি।

খলিফা আল নাসির (১১৮০-১২২৫ খৃ.) একটি নতুন গ্রন্থভবন নির্মাণ করে দেন। ফলে নিজামিয়া গ্রন্থাগার মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও মূল্যবান গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। ইবনুল জাওযী দেখেছেন, এ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে ৬০০০ গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত আছে। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাই মাসোহারার বিনিময়ে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। হিজরী নবম শতাব্দীর শুরুতে নিজামিয়া কমপ্লেক্স বিলুপ্ত হয়ে যায় রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়ে।

সমসাময়িক কালে বাগাদাদে ছত্রিশটি গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিল 'দুটি প্রতিষ্ঠান। একটি নিজামিয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার যা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যটি মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার। ঐতিহাসিক খোদাবক্স জানিয়েছেন, নিজামিয়া মাদ্রাসার খ্যাতির বিপরীতে আল মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগার নির্মিত হয়েছিল। আব্বাসীয় খলিফারা বাগদাদে সে সকল জৌলুশপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ বিখ্যাত ভবন হলো এই ভবন। খলিফা মুস্তানসার বিল্লাহ (১২২৬-১২৪২)-এর নামানুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি নিজেই এর ভিত্তি স্থাপন ও নির্মাণ কাজ তদারক করেছিলেন। ১২৩৩ খৃ. নির্মাণ শেষ হয় এটির। সাম্প্রতিককালে এর ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল। ১৯৬৯ সালে এই ধ্বংসাবশেষ সংস্কার করে যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে। সরাসরি সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্মিত হওয়ায় মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসা ছিল এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় এর লাইব্রেরী ভবন। মসজিদ, হাসপাতাল ৪টি, বক্তৃতা মঞ্চ, ওজু ও গোসলের বিশাল ব্যবস্থা, রন্ধনশালা, পৃথক লাইব্রেরী ছাড়াও আরো বেশ কিছু আনুষঙ্গিক ভবন এবং জমিজমা ছিল প্রচুর। মাদ্রাসার উদ্বোধনী দিনেই খলীফা তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এখানে দান করেন। এরপর নানাভাবে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুতুবউদ্দীন বলেছেন, মুস্তানসিরিয়ায় যত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছিল অত সম্পদ আর কোন মাদ্রাসার ছিল না। এক বর্ণনায় এই গ্রন্থাগারের হেফাজতে আশি হাজার পুস্তক ছিল উল্লিখিত হয়েছে। খলীফার প্রাথমিক দানই ছিল আট হাজার। আল মাকরিজি বলেন, এখানে 'কিতাবুল ইয়াসারের' একটি কপি ছিল। এটি চেঙ্গিসখানের অনুশাসন বিষয়ক রচনা। হাজী খলিফা লিখিত ১৪ খণ্ডের 'তারিখে বাগদাদ' এখানে সংরক্ষিত ছিল।

মুসতানসিরিয়া গ্রন্থাগারের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হালাকু খাঁ'র বাগদাদ আক্রমণের সময় এটি রক্ষা পেলেও তিনি মুসতানসিরিয়ার অধিকাংশ গ্রন্থ নিজ রাজধানী মারাগায় নিয়ে যান, তার অনুরাগ ভাজন বিজ্ঞানী নাসির উদ্দীন আল

তুসীর গ্রন্থাগারে মূল্যবান এ সংগ্রহের অনেকটা স্থানান্তরিত হয়। তুসীর গবেষণার জন্য ১২৫৩ সালে এখানে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে যে বিশাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার অধিকাংশ গ্রন্থই বিভিন্ন স্থান থেকে লুট করা। বলাবাহুল্য যার অধিকাংশই এসেছিল বাগদাদ থেকে। মারাগাতে চার লক্ষ গ্রন্থের বিপুল সমাহার ছিল।

মিশরের কায়রোতে 'ফাতিমীয় লাইব্রেরী' মুসলিম জাহানের সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। চল্লিশটি কামরায় সকল ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই এতে সংরক্ষিত ছিল। ফাতিমী খলিফা আবদুল আযীয (৯৭৫-৯৯৬ খৃ.) ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে কায়রো শহরে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। Nakosteen এর মতে, আযীযের গ্রন্থাগারে কমপক্ষে এক লক্ষ বই ছিল। তবে এতে ছয় লক্ষ বাঁধাই করা বই ছিল বলে অনুমান। তন্মধ্যে ২৪০০ টি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কুরআন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারীর (৮৩৮-৯২৩) ইতিহাস গ্রন্থের কপি ছিল ১২০০ টি, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ১৮০০০ টি, আল খলীলের বিখ্যাত অভিধান কিতাবুল আইনের কপি ছিল ৩০ টি, প্রখ্যাত লিপিকারদের ২৪০০ টি মুশাক তার অন্যতম আকর্ষণ। আল মাকরিজি লিখেছিলেন, এতে ১৬ লক্ষ গ্রন্থের সম্ভার রয়েছে। অবশ্য সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এই গ্রন্থাগার যে বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়করবস্তু তা একাধিক বর্ণনাকারীর জবানীতে পাওয়া যায়। তবে আল আযীযের পুত্র আল হাকিম (৯৯৬-১০২১) যে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন তার সাথে কায়রোর ফাতেমীয় লাইব্রেরী একীভূত করা হয়। ফলে এটি পরে 'দারুল হিকমা'র খ্যাতির সাথে লীন হয়ে যায়।

আল হাকিমের ২৫ বছরের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কীর্তি 'দারুল হিকমা' তথা জ্ঞান কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। ১০০৪ খৃ. এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। কথিত যে, আল মামুনের 'বায়তুল হিকমার' গৌরব নিষ্প্রভ করতে এটি নির্মিত হয়েছিল। বইপত্র সংগ্রহের দিক থেকে দারুল হিকমাহ সেরা স্থানে পরিণত হয়েছিল। শিয়া মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হলেও বৃহত্তর কাজে এর কর্মভুক্তি ঘটে। সকল শ্রেণীর দর্শক ও পাঠকদের জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল। বিশেষ সুবিধা ছিল আগ্রহী পাঠকদের কাগজ, কলম ও কালি নিজ খরচায় দেয়া হতো। এখানে প্রায়ই বিতর্ক, বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হতো। আল মাকরিজি বর্ণনা করেছেন, গ্রন্থাগার ভবন ছিল কার্পেট দ্বারা সুসজ্জিত। বহু চাকর ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সার্বক্ষণিক কাজ করত, যাদের পেছনে বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল দুইশত দীনার, জ্ঞান জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের ১৬ লক্ষ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি 'দারুল হিকমা'র শোভা বর্ধন করেছিল।

১০৬৮ খৃষ্টাব্দে উজির আবুল ফারাজ সৈন্যবাহিনীর বেতন দেওয়ার জন্য ২৫টি উট বোঝাই বই লুণ্ঠন করে ১ লক্ষ দীনার মূল্যে বিক্রি করে দেন। এর কয়েকমাস পরে তুর্কী বাহিনীর আক্রমণে লাইব্রেরীটি সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত হয়। বইয়ের পাতা দিয়ে সৈন্যরা চুলায় আগুন ধরায়, বাঁধাই চামড়া খুলে জুতা ইত্যাদিতে ব্যবহার করে স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপি পুড়ে দেয়া হয়, নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। লেনপুল লিখেন, বইয়ের স্তূপীকৃত একটি স্থানকে বহুদিন 'বইয়ের পাহাড়' নামে পরিচয় দেয়া হতো। এত কিছুর পরও ফাতিমীয় শাহজাদা নব উদ্যমে বই সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। ১১৭১ খৃ. গাজী সালাহউদ্দীন যখন কায়রো প্রবেশ করেন তখন তিনি রাজপ্রাসাদে একলক্ষ বিশ হাজার বই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এগুলি কাজী আল ফাজিল এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখকদের দিয়ে দেন। এছাড়া বহু গ্রন্থ ত্রিপোলী, সিউটা প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

খলীফা আল মুইজের বিখ্যাত সেনানায়ক জওহর আল সিকিলী ৯৭২ খৃ. কাররোয় আল আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রাচীন ও গৌরবময় এই জ্ঞানকেন্দ্র আজও জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল অনেক সাধারণ লাইব্রেরীও। ১৩৯৫ খৃ. জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন আলী কায়রোয় 'মাহমুদিয়া লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দানপত্রের শর্তানুযায়ী লাইব্রেরীর কোন বই বাইরে নেয়া যেতো না। তা সত্ত্বে ১৪২৩ খৃ. দেখা গেলো এর এক-দশমাংশ পুস্তক খোয়া গেছে। এজন্য অধ্যক্ষ পদচ্যুত হন।

মুসলমানরা স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে যে শিক্ষা ও সভ্যতার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা একটি বিরাট মাইলফলক হিসাবে কাজ করে। বিখ্যাত মনীষী Roger Bacon মুসলিম স্পেনে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বলেন ঃ Spain set to all Europe the example of the civilized and shinning empire, students flocked from Germany, France and England to drink from the fountain of learning which flowed in the cities of the Moors alon... whatever makes a kingdom great and prosperous, whatever tends to refinement and civilization was found in Muslim Spain. স্পেন সমগ্র ইউরোপে এক সুসভ্য ও গৌরবোজ্জ্বল সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হতে ছাত্ররা জ্ঞানের যে উৎস কেবল মুরদের নগর হতে প্রবাহিত হত, তা

থেকে পান করার জন্য দলে দলে সমেবেত হত। ... যা কিছু একটি রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী ও গৌরবান্বিত করে, যা কিছু শিষ্টাচার ও সভ্যতার সৃষ্টি করে– তার সব কিছুই মুসলিম শাসিত স্পেনে পাওয়া যেত।

স্পেনে মুসলিম শাসনামলে (৭১২-১৪৯২ খৃ.) যে ধরনের সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা কয়েকশত বছর পরেও ইউরোপে দেখা যায়নি। স্পেনের বড় বড় শহরগুলোতে অসংখ্য লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল। কেবল কর্ডোভা শহরে ৭০ টি লাইব্রেরী ছিল, অথচ মুসলিম বিতাড়নের কয়েকশ' বছর পর অষ্টাদশ শতকে খৃষ্টান রাজধানী মাদ্রিদে কয়েকটি লাইব্রেরীও তারা গড়ে তুলতে পারেনি।

স্পেনে লাইব্রেরী গড়ার কাজ শুরু হয় প্রাচ্য থেকে আনীত বই দিয়ে। দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি কেন্দ্র হতে দলে দলে সংগ্রাহক পাঠানো হতো সাম্রাজ্যের তরফে। তারা যে কোন মূল্যের বিনিময় পাণ্ডুলিপি পুস্তক বা অনুলিপি সংগ্রহ করে আনতো স্পেনে। স্পেনের বই সংগ্রহের জন্য কেন প্রাচ্যের উপর নির্ভর করতে হলো? তার উত্তর হলো, ইউরোপে তখনো কাগজের ব্যবহার শুরু হয়নি। তারা সে মান্দাতার যুগের প্যাপিরাসে লিখতো। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শামসুল হক লিখেছেন ঃ মুসলিম জাহান যে বিপুল সাহিত্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে পেরেছিল, তার অন্যতম কারণ তাদের লেখার উপাদান প্যাপিরাস বা ভেলাম অপেক্ষা সস্তা ও উন্নতমানের ছিল। অষ্টম শতকে খলীফা হারুন অর রশিদের আমলেই বাগদাদে ও সিরিয়ার দামেস্কে, ত্রিপোলি ও হামায় কাগজ কল স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কাগজ আবিষ্কার নিঃসন্দেহে বইয়ের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক ঘটনা। ইউরোপ সেই সময় লেখার উপাদান থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিল, অথচ মুসলিম জাহানে তখন লেখার উপাদানের কোন অভাব ছিল না। কাগজ তৈরীর কৌশল আয়ত্তে আসার ফলে সেখানে সাহিত্য–সংস্কৃতির জোর হাওয়া বইছিল এবং বইপত্র রচনায়ও বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্পেনকে প্রাথমিক পর্যায়ে বইয়ের জন্য প্রাচ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছিল।

স্পেনে অসংখ্য ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল। পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্যের সাথে এখানে বইও নিয়ে আসতেন। পুস্তক ব্যবসা এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। বই আমদানী ছিল অন্যতম একটি ব্যবসা।

আমীর দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৮৫২ খৃ.) এবং দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৯৭৬ খৃ.) ছিলেন অতিশয় বিদ্বেৎসাহী শাসক। তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাকামের খ্যাতি

আজো বিশ্ববিশ্রুত। প্রথম আবদুর রহমান ও তৃতীয় আবদুর রহমান ছিলেন নিজেরা কবি ও বিদ্বান পৃষ্ঠপোষক।

ঐতিহাসিক Dozy-এর উদ্ধৃতি Never had so learned a prince reigned in Spain. হাকামের মতো এত অধিক সুপণ্ডিত নরপতি স্পেনে আর রাজত্ব করেনি। হাকামের লাইব্রেরী পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম বড় ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল। তাঁর আদেশে বহু দেশে সংগ্রাহকরা ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েও কোন পুস্তক ক্রয় করতে না পারলে উহা অনুলিপি করে আনা হত। এমনকি গ্রন্থ লেখা হওয়ার পূর্বেই তিনি তা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। কেউ কোন গ্রন্থ রচনার মনস্থ করেছেন শুনলেই তিনি তার কাছে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে অনুরোধ করতেন, যাতে গ্রন্থের প্রথম কপি খলীফার কাছে পাঠানো হয়। ফলে পারস্য ও সিরিয়ার লিখিত গ্রন্থ তথাকার ছাত্র-শিক্ষকরা পড়াবার আগেই হাকামের কাছে পৌঁছে যেত। ইরাকের ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ আরব চারণ কবিদের সম্পর্কে একটি ইতিহাস লিখছেন জানতে পেরে আল হাকাম তাঁকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন। ফলে লেখক উক্ত গ্রন্থের প্রথম কপি সহ খলীফার প্রশংসাত্মক কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ আজও অক্ষত রয়েছে।

ইবনে খালদুন হাকামের অতুলনীয় জ্ঞানপিপাসা এবং গ্রন্থ–প্রেমের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি অনধিক চার লক্ষ বই সংগ্রহ করেছিলেন। যার গ্রন্থ তালিকাই সমাপ্ত হয় কেবল ৫০ খণ্ড পুস্তিকায়। Lane poole লিখেন ঃ By such means he gathered together no fewer than four hundred thousand ooks, and this at a time when printing was unknown and every copy had to be pair-fully transcribed in the fine clear hand of the professional copyist. মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এমন এক যুগে পেশাজীবী লিপিকারদের দিয়ে এত বড় সংগ্রহ এক বিস্ময় বটে। হাকাম নিজে প্রত্যেকটি গ্রন্থ সাগ্রহে পড়তেন এবং গ্রন্থের প্রথমে বা শেষে গ্রন্থকারের পরিচিতি, জন্ম, মৃত্যু এবং নিজের মন্তব্য তথা টীকা ভাষ্য লিখে রাখতেন, যাকে পরবর্তীতে সত্যিকার প্রামাণ্য টীকা হিসাবে মর্যাদা দেয়া হতো। Dozy জানিয়েছেন ঃ All of these volumes Hakam had read and most of them he annotated ... no one was more learned in literarty history than Hakam and his annotations were always hold authoritatve.

হাকামের পর উজীর আল মনসুর (৯৭৬-১০০২) রাজনৈতিক কারণে গোঁড়াপন্থীদের খুশী করতে গিয়ে কিছু মূল্যবান দর্শনের গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন।

স্পেনের বহু স্থানে আরো অনেক লাইব্রেরী ছিল। গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ সংলগ্ন লাইব্রেরী, সেভিল, টলেডো, মালাগা, ভ্যালেনসিয়া প্রভৃতি শহরে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল রাজধানী কর্ডোভাতে ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল। সেভিলের শাহী গ্রন্থাগার বহু সমৃদ্ধ ছিল। ইবনুল আব্বার উল্লেখ করেছেন যে, সেভিলে রাস্তার উভয় পাশেই সারিবদ্ধ বইয়ের দোকান ছিল। এ সকল বিশেষ ও গণগ্রন্থাগার ছাড়াও প্রচুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল। ইবনে ফুতায়েস, আবু আবদুল্লাহ আল হাজরামী (মৃ. ১০০৫-৬), আবু ওয়ালিদ ইবনে আল মসুল, মনসুরের ক্রীতদাস ফাতিন, আর্কিডোনার প্রখ্যাত লিপিকার কাশিম বিন সাঁদা (মৃ. ৯৫৮ খৃ.), আবু আলী আল গাসানী, আল জাহানী (মৃ. ১০০৪), তরতোসার ইয়াহিয়া বিন মালিক বিন আয়িজ (মৃ. ৯৫৮), কর্ডোভার মুহাম্মাদ বিন আজম ইবনুল সবুনী (মৃ. ১০০২), আবু বকর বিন জাকওয়া (মৃ. ১০৪৩), ইবনে আওয়াল আল মা'আফিরী (মৃ. ১১১৮), ইবনে মুখতার (মৃ. ১১৪০), কর্ডোভার আহমদ বিন মুহাম্মদের কন্যা আয়েশা (মৃ. ১০০৯), উমাইয়া সভাসদ পত্নী-রাজিয়া (মৃ. আনু ঃ ১০৩২), জাফরের কন্যা খাদিজা, ইবনুল আহদাব (মৃ. ১০৪৫), আবু বকর ইবনুল আরাবী মুহাম্মাদ ইবনে খায়ের, আল রাজী, কাজী ইবনুল হাজাজ আল লাখমী (মৃ. ১২০৪), বাদাজোযের অধিবাসী আবু মুজাফফর বিন আল আফতাজ প্রমুখ পণ্ডিতগণ গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব মূল্যবান লাইব্রেরী।

টলেডোর বনু জু-উল নু শাসকরা নিজেদের শাহী গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল ইবনে মায়মুন, আবু আমীর ইবনে ইব্রাহীম, ইবনুল হিলালী (মৃ. ১০৬৬), লিপি-বিশারদ ইবনুল শেখ (মৃ. ১০৪৮), ইবনুল খাত্তাব (মৃ. ১০৪৬), ইবনুল হাতিমুল তামিমী (মৃ. ১০৭৬) সারা গোসার ইবনে সন্দুর বিন মানতিল (মৃ. ১১০৬), ইবনে মাতরুহ, ইবনে সিদর (মৃ. ১১৫৩) প্রমুখ এবং ভালেনসিয়ার অধিবাসী আবদুল্লাহ আল মারাউশী (মৃ. ১০৯৪), আলী বিন হুদায়েল (মৃ. ১১৬৮), ইবনে আইশুন উল মা'ফিরি (মৃ. ১১৭৮) ইবনুল ফারাজ (মৃ. ১১৭১), কাজী আবদুল হক ইবনে ইয়াসিন (মৃ. ১১৩৫) সহ আরো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল।

দেশব্যাপী এই গ্রন্থপ্রীতি এবং গণ গ্রন্থাগারের সম্পদ রাজনৈতিক বর্বরতায় অনেকটা ধ্বংস হয়ে যায়। বিজ্ঞান বিষয়ে বহু আরবী গ্রন্থ তখন ল্যাটিনে অনূদিত হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের হাতে স্পেনের পতনে স্পেনের মুসলমানদের মতো এই বইয়ের ভাগ্যেও অমানিশা নেমে আসে। লী এর মতে, ১৪৯২ সালে খৃষ্টানদের

গ্রানাডা জয়ের পর, কার্ডিনাল জিমিনিস ৫০০০ দুর্লভ বই ভস্মীভূত করেন। Nicholson বলেন, তিনি মুসলমানদের সাতশত বছরের সংস্কৃতি একদিনে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করে জিমিনিস স্বর্ণ, রৌপ্য ও দুর্লভ চিত্রখচিত কিছু বই আলকালা গ্রন্থাগারের জন্য রেখে বাকী সব ধ্বংস করেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, বিশ লক্ষ আরবী বই ধ্বংস করা হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ প্রতিষ্ঠিত 'এস্কুরিয়াল লাইব্রেরীতে' শেষতক যে সকল আরবী বই ছিল ১৫৭৪ খৃ. জুন মাসে তা পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং ৮ হাজার বই ধ্বংস করা হয়। একশ' বছর পরে মাইকেল কাসিরী যখন এই লাইব্রেরীর আরবী গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন তখন তিনি সবেমাত্র ১৮২৪টি পুঁথির সাক্ষাত পেয়েছিলেন। অনুমান, এগুলি কোনমতে রক্ষা পাওয়া গ্রন্থের অবশেষ অংশ।

এতসব ধ্বংসযজ্ঞের পরেও বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম লাইব্রেরীসমূহের বিক্ষিপ্ত অংশ বর্তমান রয়েছে। আধুনিক ক্যাটালগে এগুলির তালিকা, অনুবাদ এবং গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অনেক পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদ এ সকল বিষয়ের ওপর লিখেছেন। ফ্রান্স, ইটালী, ইংল্যান্ড, ল্যাটিন দেশসমূহ বিশেষ করে ভিয়েনায় বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আজও বর্তমান আছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে মিশরের খোদাভিয়া, তুরস্কের ইস্তাম্বুল লাইব্রেরী যাদুঘর, ইরাক, মদীনা, দামিস্কের জাহিরিয়া লাইব্রেরী তিউনিসের বড় বড় মসজিদ লাইব্রেরী, ইয়েমেনের সানায় ইমাম ইয়াহিয়ার বিশাল সংগ্রহ, নজদ ও কারবালার সমাধি ভবন সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীসমূহে বেশ কিছু দুর্লভ গ্রন্থ মুসলিম গৌরবের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাঁকীপুরের খুদাবক্স্, লাইব্রেরী রামপুরের নওয়াব লাইব্রেরী বোম্বাইয়ের মোল্লা ফিরোজ লাইব্রেরীতেও মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে।

বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে কোন সময় মুসলিম জাতির প্রশাসনের ইতিহাস থাকলে সেখানে স্বভাবতই তাদের জ্ঞানের পরিচয়বাহী লাইব্রেরীর অস্তিত্ব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উপমহাদেশে কয়েকশ' বছরের মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি যে উদার পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস আমরা জানি তা সেই কাহিনীরই অপভ্রংশ। প্রায় সকল মোগল শাসক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের দরবারে জ্ঞানী-গুণীর কদর ছিল কিংবদন্তীর মত। হুমায়ুন লাইব্রেরীর পাঠকক্ষ থেকে নামার সময় সিঁড়িতে আছড়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। আকবরের নবরত্নের কথা সুবিদিত। জাহাঙ্গীর নিজের জীবনী লিখতেন, শাহজাহান সুকুমার মনের

অনেক অধিকারী ছিলেন, আওরঙ্গজেব সাতশত আলেমের তত্ত্বাবধানে বিশাল কীর্তি 'ফতওয়ায়ে আলমগীরি' সংকলন করিয়েছিলেন। মোটকথা, সকল দেশেই যেখানে মুসলমানের পদার্পণ ঘটেছে সেখানে এই চিত্রগুলো পাওয়া যাবে।

প্রাচীনকাল থেকে কালক্রমে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার মুসলমানদের হাত হয়ে আরব সভ্যতার মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগে পৌঁছেছে। ইসলামের সামগ্রিক চিন্তাধারাকে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিতে যারা ছোট করে দেখতে অভ্যস্ত তারা বিরাট এই দায়িত্ব পালনকে অস্বীকার করেন। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতিতে মুসলিম জাতির যে অবদান, তার একটি চিত্র মাত্র এই নিবন্ধে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এর সামগ্রিক অবদান যে আরো ব্যাপক তা এম এন রায়-এর একটি উক্তিতেই স্পষ্টতঃ ইসলাম ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, মানব সভ্যতার অগ্রগতির অপরিহার্য সহায়। নতুন সমাজ সম্বন্ধের বাণী নিয়ে এর আদর্শ গড়ে উঠলো আর তার ফল হলো মানব মনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু ইসলাম যেমন প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণ প্রাকার ধ্বংস করে সেখানে আপনার ঠাঁই করে নিয়েছিলো, তেমনি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা কালক্রমে তাকেও ছাড়িয়ে গেলো। তাই দেখা যায়, নবতম পারিপার্শ্বিকের ফলে যার জন্ম, ইসলাম তারই হাতে তার চিন্তাজগতের কর্তৃত্ব তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এ কথা অবধারিত সত্য, ইসলাম যে তত্ত্ব ও আদর্শবাদের জন্ম দিয়েছে তাই কালে কালে জগতে নানা সমাজ বিপ্লবে সহায়তা করলো। জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে সে তত্ত্ব ও আদর্শবাদ হলো বিজ্ঞানের নিরীক্ষা ও পরীক্ষা আর দর্শনের যুক্তিবাদ সমাজে নতুন বিপ্লবের বীজ বাঁচিয়ে রাখার যে গৌরব, ইসলামী সংস্কৃতিই সে গৌরবের একমাত্র অধিকারী।'

মুসলিম মুদ্রার ক্রমবিকাশ

মানব সমাজে মুদ্রার প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়না। তবু বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের জনক হিরোডটাসের মতে, লিভীয় জাতি এশিয়া মাইনরে সর্বপ্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রবর্তন করে। সেটা সত্য হলে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে প্রাচ্যে এই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু স্ট্রাবো ও এ্যালিয়ানের মতে আরগোজের শাসক ফীডোন এ্যাজিনো দ্বীপে সর্বপ্রথম রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সে যাই হোক ইতিহাসবিদরা মোটামুটি একমত যে, খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্যে এবং পরে পাশ্চাতে মুদ্রা ব্যবহার শুরু হয়।

ইসলামের অভ্যুদয়পূর্ব পারস্যের সামানীয় এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুটি প্রধান শক্তি হিসাবে বিরাজ করছিল। উভয় সাম্রাজ্যেরই ছিল নিজস্ব মুদ্রা। ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে সরকার এবং সংগঠন না থাকায় কোন মুদ্রার প্রচলন ছিলনা। দক্ষিণ আরবের হিমারীয় বংশের পতনের সাথে সাথে হিমারীয় মুদ্রার অবসান ঘটে। ব্যবসা সূত্রে আরবরা সিরিয়া, ফিলিস্তিন হতে বাইজেন্টাইনী মুদ্রা এবং সাসানী সাম্রাজ্য শাসিত ইরাক ও পারস্য হতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেশে আমদানী করতো। এগুলোর মাধ্যমেই আভ্যন্তরীণ ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা চলতো। মুদ্রাগুলো পরিচিত হতো 'দিনার' ও 'দিরহাম' বলে।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, প্রাক-ইসলামী যুগের মতোই মহানবী (সা.) দিনার ও দিরহামের প্রচলিত পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। এসব মুদ্রায় খৃষ্ট ধর্মীয় ক্রুশ এবং প্রতিকৃতি থাকায় পরে তা ঘষে প্রবর্তন করা হয়। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী জানিয়েছেন, 'আবদুল মালিকের মুদ্রা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দিরহাম ও দিনার বিশেষ প্রক্রিয়ার ঘষা অবস্থায় লেনদেনের জন্য প্রচলিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও এই নীতি অব্যাহত ছিল। ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী লিখেন, 'মহানবী এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি ও প্রতীক চিহ্নের সংশোধন সাপেক্ষ বাইজেন্তীয় ও সাসানীয় মুদ্রা মিসকলে পরিমাপের ভিত্তিতে ধাতব মূল্যমান নির্ণয় করে ক্রয়-বিক্রয় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।'

মুসলমানদের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের চিন্তা ভাবনা ইসলামের প্রথম যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ধাতব মুদ্রায় বিভিন্ন জালিয়াতির কারণে হযরত উমর (রা.) উটের চামড়ার মুদ্রা চালু করার জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য উটের বংশ লোপ পাওয়ার আশংকায় তা আর হয়নি। সরকারীভাবে মুদ্রা প্রবর্তনের আগেকার অন্তবর্তী সময়ে সাময়িক মুদ্রা প্রচলনের আরো কিছু প্রচেষ্টা চলে। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) "আল্লাহ্ আকবর" লিপি সম্বলিত দিরহাম মুদ্রা সাময়িকভাবে চালু করেন। আবদুল মালিকের প্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের আদেশক্রমে তাঁরই ভ্রাতা মুসআব বিন যুবাইর হিজরী ৭০/৬৮৯ খৃষ্টাব্দে পারসীয় মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এই মুদ্রার একপিঠে "বিসমিল্লাহ" অপর পৃষ্ঠে "বারকাত" শব্দ উৎকীর্ণ করেন। পাহ্লবী এবং আরবী এই দ্বিভাষায় এটি ছিলো গোলায়িত মুদ্রা। আবার আবদুল্লাহ বিন যুবাইর যে মুদ্রা চালু করেন তার একপৃষ্ঠে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অপর পৃষ্ঠে "আমরুল্লাহি বিল্ আদলি ওয়াল ওয়াফায়ী" আরবী বাক্য উৎকীর্ণ হয়। তাঁরই অনুমোদনক্রমে এবং খিলাফতকালে (৬১-৭৩ হি./৬৮০-৬৯২ খ্রী.) প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক টাকশাল হতে তাদের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

মুসলিম মুদ্রা বিকাশের ইতিহাসে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) (৬৬১-৬৮০ খৃ.) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে ডাক বিভাগের উন্নতি সাধনের সাথে সাথে মুদ্রার ব্যাপারে চিন্তা শুরু হয়। ৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং মুদ্রার সর্বপ্রথম ক্রুশের পরিবর্তে শ্মশ্রুমণ্ডিত আরব বেদুঈন পোষাক পরিহিত খলীফার ছবি পরিবেশিত হয়। তাঁর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আরবীয় মুদ্রা প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৯৫-৭০৫ খৃ.) মুসলিম মুদ্রার প্রথম আদর্শ সংস্করণ প্রবর্তন করেন। মুসলিম ভূখণ্ডে এটিই প্রথম জাতীয় মুদ্রা। ড. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম লেখেন, "মু'য়াবিয়াই প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত করেন। আবদুল মালিকের সময় সুনির্দিষ্ট পরিমাপের স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে 'দীনার' ও 'দিরহাম' প্রস্তুত করা হয়। মুদ্রাগুলিতে কালিমা ও টাকশালের নাম লেখা থাকত।" ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন ঃ "খলীফা আবদুর মালিকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ছিল জাতীয় টাকশাল নির্মাণ এবং আরবী মুদ্রার প্রচলন। ৬৯৬-৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দামেস্কে একটি জাতীয় টাকশাল স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ আরবী অক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট এবং সর্বজনস্বীকৃত একক মুদ্রামানের দিনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, দিরহাম

বা রৌপ্যমুদ্রা ও ফালুস বা তাম্র মুদ্রা সমগ্র রাজ্যে প্রচলন করেন। কুফা অধিকৃত হইলে হাজ্জাজ সেখান হইতে রৌপ্য মুদ্রা ছাপান। উল্লেখযোগ্য যে, দিনার শব্দটি বাইজেন্টাইন দিনারিয়াম এবং দিরহাম সাসানীয় ড্রাকমা শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম মুদ্রা প্রচলনে বাইজেন্টাইন এবং সাসানীয় প্রভাব ছিল। সমগ্র দেশে একটি সর্বজন স্বীকৃত নির্দিষ্ট একক মুদ্রামানের দিনার, দিরহাম ও ফালুস মুদ্রিত হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রা তৈরী ও নির্বাহের ক্ষমতা লাভ করে। মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারটি ত্রুটিমুক্ত হইলে অবাধে জাল মুদ্রা তৈরী অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রতিটি মুদ্রায় কলেমা, মুদ্রাঙ্কনের তারিখ, টাকশালের নাম লিখা থাকিত। জাতীয় টাকশাল স্থাপন এবং বিশুদ্ধ আরবী মুদ্রা প্রচলন দ্বারা শাসন ব্যবস্থার আরবীকরণে সহজতর হয়।”

খলীফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। বালাযুরীর মতে, সর্বপ্রথম ৭৪ হি./৬৯৩ খৃ. আবদুল মালিক দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা চালু করেন। ক্রেসওয়েলের মতে, ৬৯২ খৃষ্টাব্দে আর মুদ্রাতত্ত্বের ঐতিহাসিক জন ওয়াকারের মতে, দীনার ৬৯৬ খৃ. এবং দিরহাম ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে, ফালুস তথা তাম্র মুদ্রা সম্ভবত ৭০০ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। তবে আবিষ্কৃত মুদ্রার তারিখ হিসাবে ৭৭ হিজরী দীনার এবং ৭৯ হি. পূর্ব দিরহাম পাওয়া যায়না।

খলীফা আবদুল মালিকের পর তাঁর পুত্র আল্ ওয়ালীদের (৭০৫-১৫ খৃ.) রাজত্বকালে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহু অঞ্চল মুসলমানদের হাতে আসে। ভারতের সিন্ধু উপকূল হতে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রার ব্যাপারে আল্ ওয়ালীদ পিতার নীতিই অনুসরণ করেন। মুসলিম মুদ্রার আকার, উৎকীর্ণ লিপি একই থাকে, মুদ্রার তারিখ নতুন করে যোগ হয় কেবল। নতুন নতুন টাকশাল স্থাপিত হয়। মুদ্রা ব্যবস্থা যাতে জাল কারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খলীফাদের গভীর দৃষ্টি ছিল। উমার বিন আবদুল আজীজের (৭১৭-২০ খৃ.) আমলে এক মুদ্রা জালকারীকে খলীফার সামনে হাজির করা হয়। তাকে শাস্তি এবং উদ্ভাবিত যন্ত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। হিশাম বিন আবদুল মালিকের (৭২৪-৪৩ খৃ.) সময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এই সময় ওয়াসিত টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। উমাইয়া খিলাফতের পতন পর্যন্ত (৭৫০ খৃ.) আবদুল মালিকের সংস্কারকৃত মুদ্রা বৈশিষ্ট্য অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য যে, উমাইয়া শাসনামলে ১৩০ টির বেশী টাকশাল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহে অবস্থিত ছিল।

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম যুগে উমাইয়া যুগের মুদ্রা বৈশিষ্ট্য অনেকটা অব্যাহত থাকে উৎকীর্ণ লিপির কিছুটা তারতম্য ব্যতীত। উমাইয়া আমলে মুদ্রায় খলীফার নাম থাকতো না কিন্তু আব্বাসীয় খলীফা আল্ মামুনের সময় সর্বপ্রথম মুদ্রায় "আল্ ইমাম" উপাধি মুদ্রিত হয়। এ যুগে মুদ্রায় ওয়াজর এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম উৎকীর্ণ হতেও দেখা যায়। আব্বাসীয় আমলে মুসলিম মুদ্রার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন খলীফা হারুনুর রশিদ (১৭০-৯৩ হি.)। সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের টাকশাল হতে মুদ্রা মুদ্রিত হত। মুদ্রার গঠন সৌষ্ঠব এবং শিল্পগত মান উৎকীর্ণ লিপিতে ঐতিহাসিক তথ্য এসব মিলিয়ে এ সময় মুদ্রার অনেক উন্নতি হয়। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি দীনার মুদ্রায় প্রথম নিজের নাম উৎকীর্ণ করেন। ইতিপূর্বে আলমাহদী (১৫৮-৬৯ হি.) দিরহাম মুদ্রায় নিজের নাম ছাপান।

খলীফা আর মুতাসিম (২১৮-২২৭ হি.) হতে আল মুতী (৩৩৪-৬৯ হি.) পর্যন্ত মুদ্রা বৈশিষ্ট্য পুর্ববৎ ছিল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খলীফার নামের সাথে, তাঁর পুত্র বা পদস্থ আমীরের নাম মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মুদ্রায় আরবী লিপি ব্যবহৃত হতো। যেমন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকা লাহু', 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' প্রভৃতি আরবী হস্তলিপি অহরহ ব্যবহৃত হতো। উল্লেখ্য যে, কোন কোন আব্বাসীয় খলীফা মুদ্রায় প্রথম প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেন। যেমন খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিকৃতি মুদ্রায় অংকিত হয়। খলীফা মুকতাদীরের (২৯৫-৩২০হি.) অশ্বারোহণ অবস্থায় প্রতিকৃতি মুদ্রার অংকিত করা হয়েছিল। মুতাওয়াক্কিলের (২৩২-২৪৭হি.) মুদ্রার এক পিঠে খলীফার প্রতিকৃতি এবং অপর পিঠে এক ব্যক্তিকে উঠ টানা অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ২৪১ হিজরীতে এটা মুদ্রিত হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এরকম মুদ্রা উপহার কিংবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য করা হতো। বিভিন্ন ষ্টাইলে মুদ্রার আরবী লিপিসমূহ ইসলামী ক্যালিওগ্রাফী চর্চার নিদর্শন। ডক্টর আবদুর রহমান লিখেন ঃ "উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের মুদ্রালিপি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির আরেক নিদর্শন। তখন মুদ্রা ছিল সোনার দিনার রূপার দিরহাম এবং ফুলুস। এ সকল মুদ্রায় ক্ষুদ্রাকারের অনেক ঐতিহাসিক চিত্র হস্তাক্ষরে মুদ্রিত থাকতো। এসব ঐতিহাসিক চিহ্নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুসলিম শিল্প ঐতিহ্যের নিদর্শন লক্ষণীয়। সোদেরি নিলাম হলে এসব মুদ্রার নিলাম হয়। এসব মুদ্রায় অঙ্কিত, মুদ্রিত বা খোদিত শিল্প

এবং হস্তলিপি ৭৭ হিজরীর পরে উমাইয়া খলীফা আব্‌দ্ আল-মালিক দ্বারা তৈরী হয়। আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন আরবী হস্তলিপি অঙ্কিত ষাট হাজার মুদ্রা সুইডেনে রক্ষিত ছিল। রাশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের বাইরে এটাই হচ্ছে সর্বাধিক আরবী লিপি খোদিত মুদ্রা।

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে মুসলিম মুদ্রার যে আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব লাভ করে তা পরবর্তী মুসলিম দুনিয়ায় অনুসৃত হয়। বিভিন্নাঞ্চলে অঞ্চলভিত্তিক পরিবর্তন ছাড়া মূল বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। যেমন ঃ উমাইয়ারা স্পেন বিজয় করার কয়েক বছর পর ৭১৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে আরবী ও ল্যাটিন লিপিযুক্ত দীনার মুদ্রিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দ্বিভাষিক মুদ্রায় মুখ্য পিঠে 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' এবং অপর প্রান্তে মুদ্রণ তারিখ ও টাকশালের নাম উৎকীর্ণ হয়েছিল।

ফাতেমীয়, তুর্কী, গজনবী, উসমানী-তুর্কী, মোঙ্গল, ভারতীয় এবং মুঘল আমলে বিভিন্ন দেশে মুসলিম অধিকার ও শাসনকালে মুদ্রার ব্যাপক উন্নতি হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম জাতির উত্থান এবং প্রভাব এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাদের উত্থানপর্ব হতে আজ পর্যন্ত এই প্রভাব অব্যাহত আছে। সুতরাং মুদ্রার ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার ক্রমবিকাশে মুদ্রা ব্যবস্থার যে ক্রম উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলিম মুদ্রা একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থায় ও মুসলিম দেশগুলোর মুদ্রায় যে আরবী বাক্য ব্যবহার, মসজিদ, ঐতিহাসিক স্থান পরিকীর্ণ হয় তা একটা শৃংখলিত ধারাবাহিকতার ফল। এটা মুসলমানদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আদর্শিক রূপায়ণ বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিশ্বকোষ প্রণয়নে মুসলমান

'বিশ্বকোষ' বলতে সাধারণত সকল প্রকার জ্ঞানের আধারকে বুঝানো হয়। জ্ঞানের সকল সম্ভাব্য বিষয়কে গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট বর্ণমালা অনুসরণ করে ধারাবাহিক বর্ণনা আধুনিক বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বকোষের ইংরেজী প্রতিশব্দ Encyclopaedia যা গ্রীক enkylios (চক্রাকারে) ও paidcia (শিক্ষা) শব্দদ্বয়ের মিলিত রূপে আবির্ভূত।

জ্ঞানের বহুবিধ শাখার উপর যে গ্রন্থে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হয় তাকে বিশ্বকোষ নামে চিহ্নিত করা হলেও এক বা একাধিক সমগোত্রীয় জ্ঞান শাখার তথ্য সংকলনকেও 'বিশ্বকোষ' নামে অভিহিত করা যায়।

বিশ্বকোষ জাতীয় রচনার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রাচীন গ্রীসের মহামতি প্লেটোর শিষ্যদ্বয় Speusippus (খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩৩৯) এবং মহাজ্ঞানী এরিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এ ক্ষেত্রে নিদর্শন রেখে গেছেন। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক রচনার খণ্ডিত কিছু অংশ রক্ষা পেয়েছে আর এরিষ্টটল শিষ্যদের জন্য তাঁর সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তথ্যাবলী সম্বলিত বিষয় পরম্পরায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখে গেছেন। প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান Marcus Terentius Varro (১১৬-২৭ খৃ. পূ.) Disciplinarum Libri IX নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। রোমের পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Historia Naturalis নামে একটি বিশাল গ্রন্থ সংকলন করেন ৩৭ খণ্ডে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলোর মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, সেভিলের বিশপ Isidore (অনুমানিক ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁর রচিত Originum sive. Etymologiarum libri xx গ্রন্থে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী সংকলন করেন। ফরাসী লেখক Vincent of Beauvais (১১৯০-১২৪৬ খৃ.) রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতকের সকল বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন William Canton এর Myrrour of the World (১৪২২-১৪৯১) উক্ত গ্রন্থেরই অনুবাদ এবং সর্বপ্রাচীন ইংরেজী ভাষায় বিশ্বকোষগুলোর অন্যতম।

Encyclopaedia তথা বিশ্বকোষ শব্দটি আধুনিক অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৩৩৮) এর ল্যাটিনে রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta গ্রন্থে। ১৬৩০ খৃ. এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আধুনিককালে প্রচুর বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে অনেকগুলো ভাষায়। তার খ্যাতি এবং গুণ মানে সম্ভবতঃ Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২) এবং Encyclopaedia Americana (১৮২৯) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় মুসলমান পণ্ডিতগণের বিশ্বকোষ প্রণয়ন নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁরা অসামান্য অর্জন যোগ করেছেন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে।

মধ্যযুগে যথার্থ অর্থে যখন বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অমানিশা নেমে আসে ঠিক সেই ক্রান্তিকালে ইসলামের আবির্ভাব। জ্ঞান বিজ্ঞানের এক অশ্রুতপূর্ব মহান দলীল আল কুরআন অতি অল্প সময়ের মাঝে বর্বর আরবদের করে নেয় আরব সভ্যতার কারিগররূপে। এই একটি মাত্র গ্রন্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম জাতি এক শতাব্দী যেতে না যেতে রাজ্য বিজয়ের সাথে সাথে জ্ঞান জগতের বিজয় কাজও শুরু করে এবং দশম একাদশ শতাব্দীতে আরব সভ্যতার স্বর্ণ সময়ের নেতৃত্ব প্রদান করে। কুরআনের এই অসামান্য প্রভাব সম্পর্কে Dr. Hartwig Hersehfeld তাঁর 'New Researcher in to the Composition and Exegesis of find the Quran' গ্রন্থে (১৯০৬) বলেন ঃ We must not be surprised to find the Quran regarded as the fountain head of all the sciences. Every subject connected with heaven or earth, human life, commerce and vareous trades are occasionally touched upon and this gave rise to the production of numerous monographs for ming commentaries on part of the holy book. In this way the Quran was responsible for great discissuons, and to it was also indirectly due the marvellous development of all branches of science in the Moslim world.

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাও এ ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে- The Saracens inspired by the most enthusiastie teachings of their Holy pdrophet devoted themselves heart and soul to the cause of the world-wide education and calture. (Saracenic Contributions to the Evolution of Modern Europe : G. M. Hilali, prose)

অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের ভূমি-আধিপত্যের সাথে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধিপত্যের যুগও শুরু হয়। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা, স্থাপত্য, শিক্ষা, সংগীত ও শিল্পকলায় তাদের সোনালী ফসল সভ্যতার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। ইউফ্রেটিস হতে গোয়াডাল কুইভার ও মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে তাদের অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে Humbold বলেন ঃ The Arabs were admirably suited to act the part of mediators and to influence the nations from the eupherates to the Guadalquivir and Mad- Africi. There unexampled intellectual activities mark a distinct epoch in the history of the world. এ ক্ষেত্রে Max-Neuburger এর মন্তব্য তুলে ধরা যায়– Islamic civilization, which is its prime surpassed that of ancient Rome in animation and variety and all its predecessors in comprehensivenes, lasted until the commencement of the eleventh century. এ মন্তব্যে ইসলামী সভ্যতা যে ব্যাপকতায় অন্য সকল প্রচীন সভ্যতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এ সময় প্রচুর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও গ্রন্থাদি রচিত হয় যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তী কয়েকশত বছরের দুনিয়ার পাঠ্য হিসাবে অনুসৃত হয়েছিল। মুসলিম বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বিশ্বকোষ রচনার প্রয়াস এ সময় হতেই শুরু হয়।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বকোষ রচনার কাজ শুরু। সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজী (৮৬৫-৯২৫ খৃ.) অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'কিতাবুল হাবী' নামক চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ তার সর্ববৃহৎ অবদান। তিনি ৩৫ বছর চিকিৎসক হিসাবে অতিবাহিত করেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু মৌলিক অবদান সংযুক্ত করেন। Prof. Browne এর মন্তব্য Al-Raji was the most original and respectable physicixn of Islam. He is the author of works that are informe by personal knowledge and experience and usful books.

আল-রাজীর চিকিৎসা বিশ্বকোষ ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত। ইবনে খল্লিকানের মতে, এটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর পুরাকালের চিকিৎসা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে এটি বিবেচিত। হিব্রু, ল্যাটিন, ইংরেজী বহুভাষায় বহুবার অনূদিত। ১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদ থেকে এর তৃতীয় সংস্করণ বের হয়। এই কোষ গ্রন্থ সম্পর্কে W. A. Greenhill উল্লেখ করেন ঃ 'Not with standing defects, the

Continens of Rhazeer is univssally admitted to be one of the most valuable and interesting medical works of antiquity though it might at first sight appear to be one of the most repulsive.

আবু উমার মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদ রাব্বিহী (৮৬০-৯৪০) ছিলেন কর্ডোবার অধিবাসী। তিনি 'আল ইক্‌দুল্ ফরীদ' নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ড এক একটি মণি মুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। এতে কবিতা, ছন্দ, অলংকার, বক্তৃতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিক রচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক আবু নাসের আল ফারাবী (৮৭৩-৯৫০ খৃ.) 'কিতাব ইয়াহ্ইয়া আল উলুম' (Encyclopaedia of Science) নামক একটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ রচনা করেন। এটি তার অমানুষিক পরিশ্রম ও শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম হৃদ্যতার প্রমাণ। এতে তিনি সমকালীন সকল বিজ্ঞান বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্য মূল আরবী গ্রন্থটি পাওয়া যায়না। গ্রন্থটির একটি সংশোধিত সংস্করণ ১৯৩২ সালে ছাপা হয়। উসমান আমীনকৃত ২য় সংস্করণ ১৯৪৯ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'ইখওয়ানুস্ সাফা' বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে সত্য সন্ধানী একদল চিন্তাশীল মুসলমানের দ্বারা বসরায় এই ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর ৫১/৫২ খন্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ তাঁরা সম্পাদনা করে সম্ভবতঃ ৯৭০/৯৬১ খৃ. প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় এই বিশদ রচনার রচয়িতাদের নাম গোপন ছিল। মুসলমানদের মাঝে উদার ও মুক্তবুদ্ধির মানুষ সৃষ্টি করাই তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যায়েদ ইবনে রিফা ছিলেন ইখওয়ানুস সাফার পঞ্চ রত্নের প্রধান। ইখওয়ানুস সাফার বিশ্বকোষটি 'রাসায়েলে ইখওয়ানুস সাফা' নামে পরিচিত। ভ্রাতৃসংঘ ও তার অবদান সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী উল্লেখ করেছেন ঃ 'তাঁদের ব্যবস্থা ছিল সত্যিকার ও উচ্চতর অর্থে সারগ্রাহী। তাঁরা কোনো চিন্তার ক্ষেত্রকে তুচ্ছ করেননি; তাঁরা সব বাগিচা থেকেই পুষ্প চয়ন করতেন। তাঁদের দার্শনিক কল্পনাগুলি সামান্য অতীন্দ্রিয়তার দ্বারা রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের উপর তাঁদের মতামত অত্যন্ত কার্যকর আর প্রবলভাবে মানবিক ছিল। তাঁদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁরা পৃথিবীকে

দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সেকালের জ্ঞান সংক্ষেপ, যার সামগ্রিক নাম ছিল 'রাসাইল-ই-ইখওয়ানুস্ সাফা ওয়া খুল্লানুল ওয়াফা'। এই রিসালাসমূহ মানবিক অধ্যায়নের প্রত্যেকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায়, প্রাকৃতিক ভূগোল, সঙ্গীত আর বলবিদ্যায়, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন, আবহাওয়া বিদ্যা আর ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল তৎকালীন সমস্ত বিজ্ঞান ও দর্শনের এক জনপ্রিয় বিশ্বকোষ।

আবুল ফারাজ আলী ইবনুল হুসাইন আল ইস্পাহানী (৮৯৭-৯৬৭ খৃ.) রচিত 'কিতাবুল আগানী মূলতঃ সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষে সমকালীন সময় পর্যন্ত আরবী কবিতার সুর সংযোজনায় সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসহ রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম ২০টি খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. এবং শেষ খণ্ডটি ১৮৮৮ সালে মিশরে ছাপা হয়।

বিশ্বকোষ রচনার ইতিহাসে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ আল কাতিব আল খারেজমীর (মৃ. ৯৯৭ খৃ.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এম আকবর আলী লিখেন ঃ 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া (Encyclopaedia) প্রণয়ন করবার দাবী করতে পারে আবু আবদুল্লাহ। তার 'মাফাতিহুল উলুম'-ই পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং সর্বপুরাতন এনসাইক্লোপিড়িয়া।'

আবু আবদুল্লাহ খুব সম্ভব বল্‌খে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমকালে কোন রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বুঝা যায় এবং খোরাসানে বসবাস করতেন। এছাড়া তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। আবু আবদুল্লাহ'র বিশ্বকোষ 'মাফাতিহুল উলুম' এ বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হল দেশীয় বা আরবীয়; অন্যটি হল বিদেশীয় তথা গ্রীস-পারস্য ও অন্যান্য স্থানে যার প্রথম উৎপত্তি। ব্যবহার তত্ত্ব, আইন, দর্শন, ব্যাকরণ, সেক্রেটারিয়েট, ছন্দ প্রকরণ, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতি বিজ্ঞান, সংগীত, বল বিজ্ঞান ও রসায়ন প্রভৃতি বিষয় এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত তথ্যের সমাবেশও ঘটেছে এতে। গ্রন্থটি ১৮৯৫ খৃ. Von Vloten কর্তৃক লিডেন থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আবু আবদুল্লাহর আজীবন জ্ঞান সাধনায় নির্মিত এই সৌধ এর পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধন করতে এগিয়ে আসেন আবুল ফারাজ মোহাম্মদ ইবনে আবি ইয়াকুব আল

ওয়াররাক্ আন নাদিম আল বাগদাদী (মৃ. ৯৮৫/৯৮৮/৯৯৫ খৃ.)। তিনি 'ইবনে নাদিম' হিসাবেও সুপরিচিত। তাঁর 'ফিহ্রিস্তুল উলুম' (জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে রচিত অমূল্য বিশ্বকোষটি বেশ খ্যাতির অধিকারী এবং বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে নাদিম তাঁর গ্রন্থে সমস্ত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। বিস্ময়কর যে, তিনি প্রত্যেক পুস্তকের আকার, পৃষ্ঠা, কভার ইত্যাদির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্বেকার ও তৎকালীন সকল পণ্ডিতদের যথাযথ পরিচয় ও তাদের কার্যকলাপ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্রকেলম্যান 'ফিহ্রিস্ত'কে অতীব মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'আবুল ফারাজ এই ফিহ্রিস্তে তৎকালীন সময়ের সকল প্রকার আরবী পুস্তকের, তা মৌলিক রচনাই হোক বা অনুবাদই হোক একটি তালিকা প্রদান করেছেন। এতে তিনি প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের লিখন পদ্ধতির কথা বর্ণনা করে বিভিন্ন ধর্মের প্রেরিত পুস্তকের কথা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। পরে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আলোচনা রয়েছে। কুরআন থেকে শুরু করে গুপ্তবিদ্যা পর্যন্ত কোন বিষয়ই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি প্রত্যেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে সেই ভাগে লেখকের নাম, জীবনী এবং কার্যকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ইতিহাসের জন্যে এতে শুধু আরব-ইরানের নয়, প্রায় সমস্ত প্রাচ্যের বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ হয়েছে। ফিহ্রিস্তের বর্ণনা ছিল ভাবাবেগ মুক্ত। এ গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার অসংখ্য গ্রন্থ চিরতরে হারিয়ে গেছে, গ্রন্থগুলো যে রচিত হয়েছিল তা ফিহ্রিস্ত-এর বিবরণের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি। বহুবার মুদ্রিত এই বিশ্বকোষ boyar Dodoutge কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয় এবং মুদ্রিত এবং The Phirist of al-Nadim শিরোনামে। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ২ খণ্ডে নিউইয়র্ক ও লন্ডনে Columbia University Press কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়।

জেরুজালেমের অধিবাসী মোতাহ্হার ইবনে তাহির আল মুকাদ্দেসী 'কিতাবু বাদওয়াত্ তারিখ, নামে একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। জেরুজালেমের সন্তান হলেও তিনি সিজিস্তানের বাস্তেই নামক স্থানে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর বিশ্বকোষের বিশেষত্ব হলো তৎকালীন এবং তদ্পূর্বেকার সভ্যতা ও কৃষ্টি নিয়ে

বিশদ বিবরণ। মুসলিম প্রধান্যের যুগে মুসলিম সুধীবৃন্দ ছাড়া ইহুদী ও পারসীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা এর অন্যতম কৌতুহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য।

আবু হাইয়ান আলী আত্ তাওহীদী (মৃ. ১০২৩ খৃ.) রচনা করেন 'আল মুকাবাসাত' নামক একটি বিশ্বকোষ। বিভিন্ন বিদ্যা সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের উপর এতে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বোম্বে, শীরাজ এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

ইসমাঈল আল জুরজানী (মৃ. ১১৩৯ খৃ.) রচিত 'জাখিরা আল খারিজম শাহী' ৯ খণ্ডে বিভক্ত বিখ্যাত চিকিৎসা বিশ্বকোষ, পরে এতে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। ফার্সী ভাষায় এটি প্রথম Medical Encyclopaedia এবং এই অমূল্য রচনার জন্যই আল জুরজানী অমর হয়ে রয়েছেন। এলগুড এই রচনা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'The importance of this work lies not merely in its contents, which are taemselves a masterful, concise and easily understood exposition of the whole system of medicine as was thught in his day but rather in the language in which it was written. Al-Jurjani did for persian science what the Bible did for the English prose.'

সিসিলির মুসলিম পণ্ডিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল ইদরীসী (১০০৯/১১০০-১১৫৬/১১৬৬ খৃ.) মুসলিম বিশ্বের এক অসাধারণ ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি 'নুযহাতুল মুশতাক ফি ইকতিরাকীল আফাক' বা 'কিতাবুল রোজার' নামক একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এই বিশ্বকোষে ৭০টি মানচিত্র সংযোজন নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। ভৌগলিক অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে।

ভৌগলিক আবদুল্লাহ আল হামাবী (১১৭৯-১২১৯ খৃ.) রচিত 'মুজামুল বুলদান' বিশ্বকোষটি ১৮৬৬ খৃ. laipzig-এ ছাপা হয়। আল হামাবী রচিত 'মুজামুল উদাবা' (ইরশাদুল আরীব ইলা মারিফাতিল আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন, যা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে margoluth কর্তৃক প্রকাশিত হয়। S. F. Mahmud তাঁর The Story ot Islam গ্রন্থে লিখেন ঃ The greatest geographer of them all was yakut Ibn Abdullah who wrote two dictionaries, one geographical and other literary. The geographical dictionary Mujamul Buldan was a great achievement. অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ R. A. Nicholson 'মুজামুল বুলদান' সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন- A store horse of geographical information the value of which it would be impossibie to overestimate. (দ্র. A literary history of the Arabs)

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খৃ.) ছিলেন সিরিয়ার কাজী। তাঁর জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ওয়াফাতুল আয়ান ওয়া আনবাইয্ জামান' একটি মূল্যবান অবদান। এতে ৮৬৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পেয়েছে। তিনি পাশ্চাত্যে বেশ গুরুত্বের অধিকারী।

ইবনুল কিফ্তী (১১৭২-১২৪৮ খৃ.) রচিত 'আখবারিল উলামা বি আখবারিল হুকামা' নামক বিশাল গ্রন্থে ৪১৪ জন চিকিৎসক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

মঙ্গোল যুগের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দীন আত্তূসী (১২০১-১২৭৪ খৃ.) গ্রীক ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন। হালাগু খাঁ-র আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করেন। জোতির্বিজ্ঞানে 'আত্ তাযকিরাতুন নাসিরিয়া' তাঁর বিশ্বকোষ সদৃশ্য একটি মূল্যবান সংযোজন।

পারস্যের ভৌগলিক জাকারিয়া আল কাজবীনী (১২০৩-১২৮৩ খৃ.) বিশ্বকোষতুল্য দুটি গ্রন্থ যথাক্রমে 'আজায়েবুল মখলুকাত ওয়া গারায়েবুল মওজুদাত' এবং 'আজায়েবুল বুলদান' রচনা করেন।

শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে আহমদ আন্ নুওয়ায়রী (মৃ. ১৩৩১ খৃ.) মিশরের মামলুক সুলতান কালাউনের (১২৯৩-৯৪ এবং ১২৯৮-১৩০৮ খৃ. ১৩০৯-১৩৪০) রাজত্বকালে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বিশাল ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত 'নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনুনিল আদাব' এক অসামান্য কীর্তি। গ্রন্থটি মোট পাঁচ অংশে বিভক্ত ১. জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান, ২. মানবজাতি তাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ, ৩. প্রাণী জগত, ৪. উদ্ভিদ জগত এবং ৫. ইতিহাস।

দামিস্কের ইবন ফাদ্লিল্লাহ আল উমারী (১৩০১-১৩৪৯ খৃ.) মিশর সম্রাট কালাউনের গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর বিরচিত 'মাসালিকুল আবছার ফা আমালিকিল আমসার' সুপরিচিতি। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'মাশাহীর মামালিক উব্বাদ আস সালীব'।

ফিলিস্তিনি পণ্ডিত সালাহুদ্দীন খলীল আস্ সাফাদী (১২৯৭-১৩৬৩ খৃ.) তাঁর 'আল ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত' নামক জীবনী বিশ্বকোষে ১৪ হাজারের অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনুল বায়তার (মৃ. ১২৪৮) স্পেনে খ্যাতি লাভ করেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং ঔষধ প্রস্তুতকরণ প্রকৌশলবিদ হিসাবে। ১৪০০ প্রকারের ঔষধের বিবরণ সম্বলিত

'কিতাবু জামি আদ্‌বিয়াতিল মুফরাদাত' একটি উদ্ভিদ বিদ্যার অনন্য বিশ্বকোষ। রোগ এবং তদ্‌অনুসারে পথ্য সেবনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তাঁর ১০ অধ্যায়ে বিভক্ত 'কিতাবুল মুগনী ফিল আদবিয়াতিল মুফরাদা' গ্রন্থে।

মিশরীয় বিজ্ঞানী আদ্‌ দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এর নাম 'কিতাবু হায়াতুল হায়ওয়ান'। একই দেশীয় আহমদ আল কাল্‌ কাশান্দী (১৩৫৫-১৪১৮) ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রশাসন সম্পর্কে 'সুবহুল আশা ফী সিনাআতিল ইন্‌শা' নামে বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হতে ১৪ খন্ডে (১৯১৩-২২ খৃ.) প্রকাশিত হয়। ইবনুল আকফানী (মৃ. ১৩৪৮/৪৯ খৃ.) ৬০টি বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে 'এরশাদুল কাসিদ ইলা আসনাল মাকাসিদ' রচনা করেন।

সুবিখ্যাত তুর্কী পণ্ডিত হাজী খলিফা (মৃ. ১৬৫৮ খৃ.) তাঁর 'কাশ্‌ফুজ্‌ জুনুন' গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। সমসাময়িক সময়ে জ্ঞাত সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসলিম জাহানের বহু খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের আরো অনেক রচনা বিশ্বকোষের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে। পারস্যের জরোষ্ট্রীয় বংশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী ইবনে আব্বাস বিরচিত ২০ খণ্ডের বিশাল 'কিতাবুল মালেকী' তাঁর অমর সৃষ্টি। কে. আলী লিখেন ঃ তিনি 'আল কিতাব আল মালিকী' নামে যে বিশ্বকোষ লিখেছেন, তা ল্যাটিন জগতে Liber Regeus নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে ঔষধের সূত্র ও ব্যবহার আলোচিত হয়েছে।' ১৪৯২ সলে ষ্টিফেন কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে এটি প্রকশিত হয়। আলী ইবনে আব্বাস রচিত (মৃ. ৯৯৪ খৃ.) এই গ্রন্থের প্রথম ১০ খণ্ডে তত্ত্বীয় বিষয় এবং শেষ ১০ খণ্ডে তত্ত্বীয় ব্যবহারিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাশ্চাত্যে বহুবার অনূদিত ও পঠিত হয় ব্যাপকভাবে।

মহাবিজ্ঞানী ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) রচিত চিকিৎসা ও শল্য বিদ্যা সম্পর্কিত এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ 'আল কানুন ফিত্‌ তীব' এক অসামান্য প্রভাবশালী গ্রন্থ। মেডিকেলের 'বাইবেল' নামে সুপরিচিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica তে লেখা হয়েছে, কানুন গ্রন্থ হিপোক্রাটস ও গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছিল। ৫ খণ্ডে বিভক্ত 'আল কানুন' ১৭ শতক পর্যন্ত ইউরোপের মেডিকেল কলেজসমূহে অবশ্য পাঠ্য ছিল। A. C. Crombic লিখেন ঃ It saw

many latin editions, fifteen during the last thirty years of the fifteenth century and further twenty during the sixteenth century. Several more were printed in seventeeth century.

আধুনিক কালে বহু মুসলিম দেশে বহু উন্নত ধরনের বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। একালে বিশ্বকোষ রচিত হয় সাধারণত বিশিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে। জ্ঞান বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে বিশ্বকোষ রচনায় যে ধরনের পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধান দরকার হয়, যেকালে এক একজন মাত্র মনীষী কিভাবে যে এত বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। মুসলিম যুগের অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনার এ এক অসামান্য নিদর্শন।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বকোষের মধ্যে 'দাইরাতুল মা-আরিফ' 'Encyclopaedia of Islam' উল্লেখযোগ্য। 'দাইরাতুল মা-আরিফ' সংকলন করেন বুতরুস আল বুস্তানী (১৮১৯-১৮৮৩) এবং তাঁর পুত্রদ্বয় সালীম আল বুস্তানী (১৮৪৭-১৮৮৪) এবং সুলায়মান আল বুস্তানী- (১৮৫৬-১৯২৫)। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত এর ১১টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। বিংশ শতকে মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী 'দাইরাতুল-মা-আরিফ আল কারনিল ইশরীন' ১০ খণ্ডে রচনা করেন। এছাড়া আরো বহু বিশ্বকোষের নাম উল্লেখ করা যায়, সাম্প্রতিককালে উর্দু ও বাংলা ভাষায়ও অনেক বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে।

শিল্পে মুসলিম স্পেন

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে শিল্পকে কেন্দ্র করে। দেশে দেশে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবসমূহ অর্থনৈতিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতির সাথে নিজেদের সভ্যতার কাতারে দাঁড় করিয়েছে। তাই বর্তমান বিশ্বে শিল্প হচ্ছে সভ্যতার অপরিহার্য ভিত্তি। আর এই শিল্প ক্রম প্রসারমান হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ক্রমলগ্নে।

বর্তমানের পশ্চিমা দেশগুলো কোন না কোন শিল্পের মাধ্যমেই প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আরবসহ অন্যান্য দেশে বিশেষ করে খনিজ শিল্প সমৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্রমশ: বিবিধ শিল্প গড়ে তোলার কাজে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এক কথায় আমরা ইউরোপকে আধুনিক শিল্পের প্রাণ বলে ধরে নিই। কিন্তু তারা সর্বপ্রথম মুসলমানদের কাছ থেকেই শিল্প এবং শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান পেয়েছে। ইতোপূর্বে তারা ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনগ্রসর জাতি। ইউরোপে মুসলিম উৎকর্ষতার প্রাণকেন্দ্র স্পেনই প্রথম তাদের দেখিয়েছিল সভ্যতার আলোকমশাল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের উচ্চশিখরে যখন স্পেনীয় মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানীগণ গভীর নিমগ্ন, ঠিক তখনই ইউরোপের অবস্থা বর্ণনা করেছেন খৃষ্টান ঐতিহাসিক ষ্টানলি লেনপুল- "....When our saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was unformed and such accomplish ments as reading and writing were almost confined to a few monk we can to some extent realize the extra-ordinary civilization of the Moors... all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners."

লেনপুল, তখনকার ইউরোপের অজ্ঞানতা ও বর্বরতার কথা- বলেছেন। এডওয়ার্ড গীবন আরো সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছেন- "লন্ডনের রাস্তাগুলো যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, সে সময় স্পেনের রাজধানী কর্ডোবার রাজপথ থাকত আলোতে উদ্ভাসিত।"

শুধু স্পেন নয়, মুসলিম শাসিত অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও শিল্প এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছিল। মুসলিম শাসিত পশ্চিম এশিয়ায় শিল্প ও বাণিজ্যের এমন উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে, ষোল শতকের আগে পশ্চিম ইউরোপ তা কল্পনাও করতে পারতোনা।

আরবদের শিল্পকর্ম ও বিকাশ সম্বন্ধে ডক্টর আসকার ইবনে শায়খ জানিয়েছেন, 'মাটি খুঁড়ে উত্তোলন করা হত সোনা-রূপা-লোহা-পারদ-সুর্মা-গন্ধক-অংশুল খনিজ পদার্থ এবং মার্বল ও বহুমূল্য পাথর। ডুবুরীরা মুক্তা তুলে আনত পারস্য উপসাগর থেকে। তখনকার দিনে শিল্পের পরিধি সীমিত ছিল হস্তশিল্পের ও কুটির শিল্পের পর্যায়ে; এসবের অনুশীলন স্থল ছিল শিল্প কর্মীদের বাড়ীঘর কারিগরদের দোকানপাট ও সংগঠিত সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ। যান্ত্রিক উদ্ভাবনী দক্ষতায় আরবরা তখন সুনাম অর্জন করেছে রাজতন্ত্রীয় শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে। জলঘড়ি নির্মাণ তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। ফরাসী সম্রাট শার্লেমেনের কাছে এক জলঘড়ি উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন খলীফা হারুন অর-রশীদ।"

গোটা মুসলিম বিশ্ব শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ থাকলে ও ইউরোপীয়রা স্পেন থেকেই এর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। কেননা ইউরোপের মধ্যে স্পেনই ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র এবং শিল্প-বিজ্ঞানে অতুৎকৃষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ইউরোপীয় খৃষ্টানদের দীর্ঘমেয়াদী ক্রুসেডের ফলে একদিন স্পেন খৃষ্টানদের হস্তগত হয় (১৪৯২ খৃষ্টাব্দ)। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় শিল্প বিজ্ঞান তাদের হাতে আসে। পরবর্তীতে এর দুতি ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিম দুনিয়ায়। টয়েনবি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ "ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে।" ক্রুসেডারদের নৃশংসতা ও দুঃসাহসিকতাই পাশ্চাত্যে আবিষ্কার যুগের পথ উন্মোচিত করে। Pro: Atiya সেটাই উল্লেখ করেন- "The adventurous spirit of the cross-bearers ultimately brought forth the age of exploration and discovery."

ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার, সুগন্ধি দ্রব্য মশলাদি, উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। খৃষ্টানদের ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার অনিবার্য ফল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের অনুপ্রবেশ। এজন্য হিট্টি ক্রুসেডকে প্রতীচ্যের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন।

মুসলিম স্পেনের শিল্প সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা থাকে তাহলে বুঝা যাবে শিল্পে তারা কতদূর অগ্রগতি লাভ করেছিলেন। স্মর্তব্য যে, আমরা প্রায় এক হাজার বছর পূববর্তী স্পেনের কথা বলছি। তখনকার সময় তারা যে প্রাগ্রসর চিন্তা ও কর্মের গভীর স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা আজকের অধুনা সভ্যতার সাথে কতো সাজুয্য রাখে তা চিন্তনীয় ও বিস্ময়কর বিষয়!

স্পেন মধ্যযুগের শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রাজধানী কর্ডোবা চামড়া শিল্প ও স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর শিল্প-কারখানাসমূহ দুই লক্ষ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সহায় ছিল। এছাড়া বস্ত্র শিল্প, রেশম, পশম এবং ধাতব শিল্পেও তারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

মুসলিম স্পেনের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড ছিল কৃষি শিল্প। বর্তমানেও কৃষি শিল্প হচ্ছে অন্যান্য শিল্পের প্রাণ। কোন না কোনভাবে শিল্প কারখানাগুলো কৃষি কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল।

ভূমি সংস্কার ও উৎপাদনমুখী নীতি এবং সেচ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে কৃষি শিল্প অত্যন্ত লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম শাসনের শেষভাগে 'গোয়াডাল কুইভার' নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ১২ হাজার কৃষকপল্লী। জমি সেচের জন্য তৈরী হয়েছিল পাথরের তৈরী জলাধার, একটি জলাধারের ক্ষেত্রফল ছিল ৩ মাইল এবং গভীরতা ১৫০ ফুট। ইলসির বাঁধ ছিল ৪২ ফুট উঁচু, ১৫০ ফুট প্রশস্ত এবং দৈর্ঘ্য ২৬৫ ফুট। মুরসিয়ার সেতু ছিল ৭৫০ ফুট লম্বা এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। পাকা ড্রেনের মাধ্যমে পানি বিভিন্ন জমিতে সরবরাহ করা হতো। অনেক সময় বন্ধুর পাহাড় কেটে নর্দমা তৈরী হতো। আধুনিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হতো। এজন্য কৃষকের আস্তাবলের অদূরে থাকতো বিভিন্ন বিষ্ঠা পঁচানোর জন্য পাকা চৌবাচ্চা। কৃষির উন্নতির জন্য হাজার বছরের পূর্বেকার স্পেন বর্তমান যুগের কতো কাছাকাছি ছিল তা বিস্ময়কর!

কৃষি শিল্পে স্পেনের বৈপ্লবিক উন্নতি ও সাফল্য লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত এক ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখেছেন ঃ "অনাবাদী ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে তারা যে সকল উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন, যদি আমরা ইউরোপীয়রা আরবগণকে এগুলোর আবিষ্কারক মেনে নিই তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তারা কৃষিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছিয়েছেন।

চামড়া শিল্পে তারা উন্নতি লাভ করেছিল। চামড়া দিয়ে নানা সৌখিন জিনিস তৈরী, বই বাঁধাই, ঘোড়ার জিন, জুতা, সৈনিকের বেল্ট ইত্যাদি জিনিস প্রস্তুত হত।

কর্ডোবা চামড়া রং করা ও তদ্বারা ব্যবহার্য বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রস্তুতে প্রসিদ্ধ ছিল। চামড়াজাত দ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী হতো।

রেশম, পশম, বস্ত্রশিল্পে স্পেন সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছিল। বয়নশিল্প এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, একটি প্রদেশের ৩ হাজার গ্রামে রেশমশিল্পের জন্য গুটি পোকার চাষ হত দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালে। রাজধানীতেই ছিল কেবল ১৩০০০ তাঁত শিল্প পরবর্তীকালে সেভিল ও আলমেরিয়া বয়নশিল্পে কর্ডোবার খ্যাতি ম্লান করে দেয়। উন্নতমানের মিহি সুতীবস্ত্র, রেশম-সিল্ক ও লিনেন ইত্যাদি বস্ত্র বয়নে স্পেনের বয়ন শিল্পীরা খুবই পারদর্শী ছিলেন। রাজধানীতে ছিল এরকম ১০ হাজার বয়ন শিল্পী। সুন্দর ও মনোরম রুচিসম্মত পোষাক তৈরীতে স্পেনীয় দর্জিদের সুখ্যাতি ছিলো যথেষ্ট। দেশী বস্ত্র চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করে অর্থ ও সুনাম অর্জিত হত।

মুসলিম স্পেনের বস্ত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ইংরেজরা স্বীকার করেন। সেখানে ১৫১ হিজরীতে শুধু আসবেলিয়ার ১৬ হাজার বস্ত্র কারখানা উন্নতমানের কাপড় তৈরী করত। এ গুলোতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিক কাজ করত।

রেশম শিল্পে স্পেনীয় আরবরা এতটাই উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন যে, সাধারণ লোকেরা পর্যন্ত রেশমী পোষাক ব্যবহার করতো। অথচ খৃষ্টান ইউরোপে রেশম বস্ত্র মহামূল্যবান বলে বিবেচিত হতো। ডক্টর এম, আবদুল কাদের উল্লেখ করেছেন "আন্দালুসিয়ায় যে সকল শিল্পকার্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তন্মধ্যে রেশমী বস্ত্রাদি বয়ন অন্যতম।"

গ্রানাডা ও জায়েনের হাজার হাজার একর জমিতে তুতেঁর চাষ করা হতো। এলভিড়ার রেশম ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। জায়েনের ৩০০ গ্রামের অধিবাসী রেশম শিল্পে নিয়োজিত ছিল। সেভিলের ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক রেশম কারখানায় কাজ করত। আলমেরিয়ায় ছিল ৮ হাজার তাঁত। স্পেনীয়দের তৈরী উন্নত ও টেকসই রেশমী বস্ত্র ছিল কারুকার্য খচিত। বিভিন্ন প্রকার পাকা রং দ্বারা এসব ছাপা হতো।

ধাতব শিল্পে মুসলিম স্পেন চরম উন্নতি লাভ করেছিল। লোহা, ইস্পাত, সীসা, তামা, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর দ্বারা নানান নিখুঁত প্রতিকৃতি তৈরী হত। লোহা ও ইস্পাত সহ অন্যান্য ধাতুর কারখানা গড়ে উঠে। সমরাস্ত্র বিশেষ করে শিরস্ত্রাণ ও তলোয়ার তৈরীতে স্পেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করে। লৌহ কপাট ও কারুকার্য খচিত লণ্ঠন নির্মাণে তাদের স্থান ছিল সুউচ্চে।

উমাইয়া যুগে স্পেন অত্যন্ত শিল্পোন্নত ছিল। উৎপাদিত কাঁচামাল ও দ্রব্যাদির দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা এই শিল্পোন্নয়নের মূলে ছিল। শিল্পে বিবিধ

আনুকুল্যের ফলে একক, যৌথ এবং অংশীদারিত্বে কারখানাসমূহ গড়ে উঠে। মহিলারাও শিল্পে অংশগ্রহণ করতেন। দেশের প্রধান খাদ্য গম ছিল বলে আটার কল ছিল দেশের সবখানেই। পানির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিলগুলো পরিচালিত হত। একমাত্র গোয়াডাল কুইভার নদীর দ্বারা পরিচালিত হয় ৫ হাজার কারখানা। তেল, মদ্য, কাঠ, চামড়া কাপড় ইত্যাদি শিল্পে কারখানায় স্পেন ছিল সমৃদ্ধ।

লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা কৃষি শিল্পের ও গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হত। লম্বা সীসার পাইপ তৈরী করা হত পানি সরবরাহের জন্য। ডক্টর এম. আবদুল কাদের লিখেছেন ঃ সাত মাইল দূরত্ব এক অত্যুচ্চ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে সুদূর সিয়েরার স্রোতস্বিনীসমূহ হতে শহরে পানি আসত। সীসক নির্মিত নলের ভিতর দিয়ে তা বিভিন্ন মহল্লায় চালান যেত। বহু ঘটনাবহুল যুগের বিপর্যয় এবং ৯০০ বছরের ও অধিক কালের অবিশ্রান্ত ব্যবহারজনিত ক্ষয়প্রাপ্তির পরেও খলীফা ২য় হাকিমের জলযন্ত্রগুলি অদ্যপি প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। তার নির্মিত মর্মরের চৌবাচ্চাগুলি এখন খৃষ্টানদের পানি যোগাচ্ছে।

লোহা, পিতল, পাথর এবং অলংকারাদির উপর নয়নাভিরাম্ কারুকাজ বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পী রূপে স্পেনীয় আরবদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। মসজিদ, প্রাসাদসমূহ যা আজকের দিনেও বর্তমান আছে পর্যটকেরা তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। অলংকার ও গহনা তৈরীতে স্পেনীয় স্বর্ণকার মনিকার ও জহুরীরা এতই নিপুণ ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তারা এক রত্তি সোনাকে পিটিয়ে ৩০ ফুট পাতে পরিণত করতে পারতো। এছাড়া খোদাই কাজে জ্যামিতিক কৌশল এবং লিপিকলাতে বিচিত্র অঙ্গসৌষ্ঠবের ব্যবহার এখনো সাক্ষী হয়ে মিউজিয়ামসমূহে অটুট রয়েছে। কাঁচ, পিতল, গজদন্ত, তরবারীর বাটে সূক্ষ্ম কারুকাজ তাদের অপরিমেয় দক্ষতা ও রুচির পরিচয় বহন করে।

মুসলিম স্পেনের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প সুষমা পৃথিবীকে তথা ইউরোপকে যেমন নতুন সভ্যতার পথ দেখায়, তেমনি নানান বস্তুগত আবিষ্কারেও তারা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। যদিও মুসলমানদের বহু আবিষ্কার আজ পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের টিকেটে পরিচিত হচ্ছে। নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক গবেষক এবং কোন কোন পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ একথা নির্বিঘ্নে স্বীকার করেছেন। যান্ত্রিক শিল্পের উদ্ভাবনে স্পেনীয় মুসলমানরা যে অবদান রেখেছে তার কিছুটা তুলে ধরছি।

কাগজ বর্তমান সভ্যতার প্রধান রক্ষাকবচ। মুসলমানরা ৭১২ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দ দখলের পরই চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেয়।

স্পেনের মুসলমানরা কাগজ তৈরীর কারখানা স্থাপন করে ৯৫০ খৃষ্টাব্দে। মুসলিম বিশ্বের প্রথম কাগজ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে।

অথচ ইউরোপ মহাদেশ কাগজ কল আবিষ্কার করে মাত্র দু'শো বছর আগে। অর্থাৎ মুসলমানদের ১ হাজার বছর পর ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের বরার্ট লুই নামক ভদ্রলোক কাগজের কল আবিষ্কার করেন।

স্পেনের 'সাতেবা' শহরে উন্নতমানের কাগজ প্রস্তুত হত এবং বিভিন্ন শহরে কাগজ রপ্তানী করা হতো। শুধু তাই নয়, গুটেনবার্গকে ছাপাখানার উদ্ভাবক বলে ইউরোপীয়রা মনে করেন। অথচ তাঁর প্রায় ৪ শত বছর পূর্বে স্পেনীয় আরবরা প্রথম মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, হিজরী চতুর্দশ শতকের সুলতান নাসিরের প্রধান উজীর আবদুর রহমান বিন বদর শাহী হুকুমনামা লিখে ছাপাবার জন্য পাঠাতেন এবং শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে সেই কপি প্রেরণ করতেন।

মানুষের আকাশে উড়ার প্রথম বিশেষ ধরনের পাখা আবিষ্কার করেন স্পেনের হাকীম আব্বাছ বিন ফারনাছ। বাহুতে এই পাখা লাগিয়ে মানুষ সহজে আকাশে উড়ে যেত। ঘর্ষণ ও পালিশ শিল্পের সাথে স্পেনীয় আরবদের নাম জড়িয়ে আছে। তারাই হালকা, গাঢ় রং আবিষ্কার ও জাহাজে করে বিদেশে রপ্তানী করেন। মুসলমানরাই প্রথম হারুনুর রশীদের আমলে ঘড়ি আবিষ্কার করে। গাবেয়ে উন্দুলুস গ্রন্থে স্পেনে ফারনাছ কতৃক দেওয়াল ঘড়ি সাদৃশ্য ঘড়ি উদ্ভাবনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া কর্ডোবার বিজ্ঞানীরাই প্রথম জলঘড়ি আবিষ্কার করেন। জলবিন্দু পড়ার সাথে সাথে ঘড়ির কাঁটা কিভাবে আবর্তিত হতো তা আশ্চর্যের ব্যাপার আজকালও। টেলিগ্রাম, দিকদর্শনযন্ত্র, ৩২ ফুট উর্ধে পানি তোলার উপযোগী নলকূপ স্পেনের বিজ্ঞানীরাই প্রথম নির্মাণ করেন।

কামান ও বারুদ স্পেনীয় আরবদের আবিষ্কার। এসব কামান তারা গ্রানাডা দুর্গের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করত। এর স্বাক্ষর স্পেনের যাদুঘরে অদ্যাবধি সংরক্ষিত আছে। স্পেনীয় শিল্প উৎকর্ষতার বহু প্রমাণ আজও লন্ডন, বার্লিন, মাদ্রিদ ও কায়রোর যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে।

পরিশেষে, একজন খৃষ্টান ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি "ইসলামী তমদ্দুনের যুগে স্পেনে চার কোটি লোক কারখানায় কাজ করত। আজ ইউরোপের উন্নতির যুগেও ইহার পরিমাণ মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ। ইসলামী যুগে স্পেনে অনেক শহর আবাদ করা হয়েছে।"

ভারতীয় সংস্কৃতি ও মুসলমান

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে মুসলিম শাসন বলবৎ ছিলো। এই দীর্ঘ সময়ে ইসলাম তথা আরব সভ্যতার যে ছোঁয়া লেগেছিলো ভারতের গায়ে তা তার সংস্কৃতির উন্নয়নে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে। অসংখ্য জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর পাদপীঠ ভারত বহুকাল ধরে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল। তৎকালীন নিজস্ব পরিমণ্ডলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচরণ ছিল। তারা যেমন নিজেরা বহির্বিশ্বে প্রচার ও বিকাশমুখী ছিলো না, তেমনি বাইরের কিছুকেও গ্রহণ করতো না। একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থিত ছিল। কিন্তু আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সংস্কৃতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করে।

ইসলাম-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল অহমবোধ ও আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ। প্রখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ আল বিরুনী বলেন ঃ "ভারতীয়দের অবিচল বিশ্বাস যে, ভারতই শ্রেষ্ঠ। ভারতীয়রাই শ্রেষ্ঠ জাতি, ভারতীয় রাজপুরুষরাই শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ, ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।" ভারতীয় বিদ্বানমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন ঃ জ্ঞান কার্পণ্য তাদের স্বভাব এমনকি স্বজাতির নিম্নবর্ণ থেকেও শাস্ত্র জ্ঞান সযত্নে তারা লুকিয়ে রাখে। সুতরাং ভিন্ন জাতির কথা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে ভারত ছাড়া আরও দেশ আছে। আছে আরও বহু জাতি এবং তাদেরও রয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞান-এটা তাদের কল্পনারও বাইরে। এমনকি পারস্য ও খুরাসানের জ্ঞানী-গুণীদের সম্পর্কেও তারা বিস্ময় জড়িত অজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

ভারতের কুম্ভকর্ণ এই দরজায় আরবদের করাঘাত তাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। তাদের সহস্র বছরের অভিজ্ঞান ভেঙে যায়। নতুন যুগে প্রবেশ করে ভারত। একজন প্রখ্যাত গবেষক তাই লিখেন ঃ "ভারতের সহিত আরবী মুসলমানদের সংশ্রবকালে ভারত একরূপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল। ভারতবাসী মনে করিতেন, তাহাদের এ নিঃসঙ্গ জীবন পরিপূর্ণ জীবন। এই আত্মতৃপ্ত ও আত্মসমাহিত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে অপরিপূর্ণতা বিরাজ করিতেছিল। তাহা

তখনও ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া ধরা পড়ে নাই। ভারতে আরবী মুসলমানদের আগমনে, ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্বলতা ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া ওঠে। মুসলিম সংস্কৃতিকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় ভারতীয় মন-মানস এই সময় হইতে আপন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও স্বাভাবিকভাবেই সজাগ হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিতীয় ঃ আরবী মুসলমানদের আগমনেই ভারতের সহিত বহির্জগতের প্রকৃত যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় এবং ভারতের নিঃসঙ্গতা ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রাচীনতম কাল হইতে অমূল্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও শ্রমজাত সম্পদের অধিকারী হইলেও আপন নিঃসঙ্গতার জন্য এই সমস্ত সম্পদের বিষয় ভারত বিশেষভাবে অবহিত ছিল না। আরব বণিকরাই ভারতের এই সম্পদ একদিকে স্বয়ং ভারতের নিকট এবং অন্যদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এইরূপে জগতের নিকট ভারতের পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে তাহার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবী মুসলমানেরই এই অপূর্ব অবদান।

৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয় আপাত নিষ্ফল বিজয় মনে হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হতে পারে যে, সিন্ধুর আরব অভিযান ইসলামের ইতিহাসে একটি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির ওপর এ অভিযানের প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পেষণ, বৌদ্ধধর্মের কণ্ঠরোধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দুরাবস্থা সিন্ধুতে মুসলিম আগমনকে উৎসাহিত করেছে। সিন্ধু বিজয়ের পরেই মুহাম্মদ বিন কাসিম শাসন পদ্ধতিতে আরব বিজেতাদের চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করেন। "তিনি ব্রাহ্মণদের ওপর করলেন বিশ্বাস স্থাপন আর দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার দিলেন তাদেরই ওপরে তাদেরই দিলেন তাদের মন্দিরাদি মেরামতের অবাধ স্বাধীনতা আর আগের মতোই আপন ধর্ম চর্চা করার পূর্ণ অধিকার। রাজস্ব সংগ্রহের ভার রইলো তাদেরই হাতে আর স্থানীয় আদিম শাসন-পদ্ধতি চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরই করলেন নিযুক্ত। তবুও ভারতের প্রাণে এ বিজয় দাগ কাটতে পারেনি। কেননা বিচিত্র বিপুল জনগোষ্ঠির মাঝে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধর্ম হিসাবে ইসলামী বিজয় তখন ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটা এক মাইলফলক হিসাবে রয়েছে। এই সূত্রে ধরেই পরবর্তীতে প্রথমোক্ত পরিচিতি লাভ ঘটে ভারতের প্রাণে ইসলাম ধর্মের। ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী লিখেন ঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব অধিকার

সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। আরব অধিকৃত সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বসবাসের চাল আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্র শিল্পের জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল। আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের জ্ঞান ইউরোপীয় দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।"

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট যে সম্পর্ক আরব এবং ভারতবর্ষের মধ্যে চলছিল সিন্ধু বিজয়ের অব্যবহিত পর হতে তা দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকে। উপমহাদেশে বাণিজ্যই ছিল আরবদের প্রভাব বিস্তারের মূল ক্ষেত্র। এখানে বাণিজ্য ছাড়াও ধর্ম প্রচার ছিল তাদের অন্যতম কর্ম। তাদের এখানে বসবাস এবং এতদঞ্চলের মানুষদের সাথে মেলামেশার ফলে ভারতীয়দের নতুন নতুন অভিজ্ঞান লাভ হয়। এ সময় অনেক ধর্মপ্রচারক সূফী ভারতে আগমন করেন। তাঁদের চরিত্র মাহাত্ম্য, সরল জীবনধারা এবং ইসলামের শাশ্বত ও সাম্যবাদী জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে মানুষ। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের পথ সুগম হতে থাকে। একাদশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে যখন তুর্কী মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করে তখনও সূফীরা ভারতে ছিলো। সুতরাং মূল ক্ষেত্রটা তাঁরাই প্রস্তুত করছিলেন। ভারত থেকেই বাংলায় সূফীরা আগমন করেছিলেন। উপমহাদেশে মুসলিম অভ্যুদয়ের ইতিহাস লিখতে গেলে তাই সূফীদের অসামান্য অবদান উল্লেখ করতে হয়। প্রফেসর এনামুল হক লিখেছেন ঃ 'ভারত তখনও স্থায়ীভাবে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় নাই, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হইতেই ভারতে সূফী প্রভাব পড়িয়াছিল এবং মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তিনি আরো লিখেন ঃ "আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে সূফী প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ভারতের নানা স্থানে ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ আগমন করিতে থাকেন। সূফীদের আগমনের সময় যে আরো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো এমন বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রোলান্ডসন বলেন, সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে আরবরা মালাবার উপকূলে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করেন। স্টাক যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ এটা কারো অজানা নয় যে, সপ্তম শতকের পরে পারসিক ও আরবীয় বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করেন। এ ধরনের বসতি স্থাপন মালাবর উপকূলেই খুব ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য। একশ বছরের মধ্যেই তারা মালাবরে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বণিক

হিসাবে তারা এখানে বসতি স্থাপন, ভূমি লাভ ও প্রকাশ্য ধর্ম পালনে অবাধ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই সুযোগে তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে মুসলমানরা ধর্ম প্রচারেও ব্রতী হয়। রক্ষণবাদী হিন্দুরা এতে সাড়া দেয়। তাদের এই সাড়ার পেছনে যে বড় কারণ ছিল তা হলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদসমূহের মধ্যে সংঘাত চলছিল। হিন্দু মতবাদ আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান–পতনের কাল।

দশম শতকের শুরুতে মাসুদী (৯১৬ খৃ.) যখন ভারতে আসেন তখন তিনি দশ সহস্রাধিক আরব মুসলমান এখানে দেখতে পান। ইবনে হওকল (৯৬৮ খৃ.) ফমহল, সিন্দন, সেইমূর, ক্যাম্বায়া প্রভৃতি স্থানে জামে মসজিদ দেখতে পেয়েছেন। আরো অনেক বর্ণনা থেকে জানা যায়, মাহমুদের অভিযানের আগেই ইসলাম ভারতের মাটিতে ভিত্তি পেয়ে যায়। ১০০০ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে অভিযান শুরু করেন। ১২০০ সাল হতে দিল্লীতে যে তুর্কী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা বহু শতাব্দী যাবত নানা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। এবার আর কোন শক্তিই মুসলিম আধিপত্যকে রুখতে পারেনি। তার প্রকৃত কারণ একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই প্রখ্যাত গবেষক গোপাল হালদার জানিয়েছেন ঃ .... যাহাদের সম্মুখে পৃথিবী দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেইদিন ভারতবর্ষে সিন্ধু জয়ের পরে আর অনেককাল অগ্রসর হইতে পারিল না। মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল–অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে তাহা প্রবেশ পথ পায় নাই। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনে মুসলমানেরা এদেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই কথাটি স্মরণীয় ঃ ইসলাম ইরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুর্ধষ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ তাহা ভারতবর্ষে বিজয়ের পথ পায় নাই। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়াও সেখানেই ঠেকিয়া গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় যখন সুপ্ত প্রায় বৌদ্ধধর্ম ও ইউনানী খ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়া তুর্ক, তাতার, মুগল জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও ইসলামের প্রবেশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইল। কারণ এই মধ্য এশিয়ার জাতিরা বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই। প্রবেশের পরে বার বার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে। স্থান এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল না। কারণ, এবার তাহারা এক নতুন গর্বে গরীয়ান

হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই, তাহার নাম ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মান্ধতা।"

ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর পুরো ভারত-মানস এক নতুন প্রাণনায় জেগে ওঠে। মুসলিম বিজয় ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বাহ্যিকভাবে এর ফলে সবকিছু ওলট–পালট হয়ে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি এবার এক বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ইসলামের প্রাণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করার মত শক্তি তার ছিল না। গবেষক বলেন ঃ "একদিক হইতে বলিতে পারা যায় ভারতীয় জীবনধারার ও সংস্কৃতিধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয় রাষ্ট্র শক্তির কাছে নয়, ইসলামের আত্মসচেতনার নিকটে। ...... ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে। তবু ইসলামের জন্ম আরবে সে যুগের সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমেটিকে প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে ও ইসলাম নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে তাহার গায়ে ভারতের দাগ ও যেন পড়িল না।"

ভারতে ধর্মীয় সংস্কৃতির যে জঘন্য রূপ ধর্মীয় আধিপত্যবাদ ইসলামের সাম্য ও প্রগতিশীলতার কাছে তা মাথা নত করে। একই ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে যে কৌলিন্য ও ভেদপ্রথা বিদ্যমান ছিল তার প্রেক্ষিতে দলিতরা স্বভাবতই ইসলামী শিক্ষার সহায়তা লাভ করে। 'ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহা অন্যকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া লয়। তাই ইসলামের বিজাতীয় ও বিজেতা প্রচারকের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করিল না। এজন্যে দলিত হিন্দুরা সহসা ইসলামের ছায়াতলে স্থানে নিল। শত জাত-পাতের দঙ্গল ডিঙ্গিয়ে একই কাতারে সবাই শামিল হল। এ যেন এক অদ্ভুত পুনর্জাগরণ। প্রচণ্ড মুসলিম-বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত হ্যাভেল তার Aryan Rule in India গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "হিন্দু সমাজ জীবনে মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু'রকমে-জাতিভেদের গোঁড়ামিকে এ যেমন একদিকে শক্ত করেছে তেমনি তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের চোখের সামনে তা এঁকেছে এক প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি, শুদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। য়ুরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তাজগতে এও তুলেছে তরঙ্গাভিঘাত, জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় মানুষের আর অনেক মৌলিক প্রতিভার। পুনর্জাগরণের মতোই এও ছিলো আসলে এক

পৌর আদর্শ মোটের উপর এরই ফলে গড়ে উঠলো বাঁচার আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা।" তার সাথে সুর মিলিয়েই প্রখ্যাত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট, কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কমরেড এম. এন. রায় লিখেন ঃ ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো, তার কারণ তার পেছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিলো শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শনই সমাজ দেহে এনেছিলো বিরাট বিশৃঙ্খলা, আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।

ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম সংশ্লিষ্টতার অনেক বৈশিষ্ট্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। আগে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিলো না। হিন্দু শাসিত সাম্রাজ্যগুলি ছিল কয়েকটি স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টি। এদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক জাতীয়তা ছিলো না । ভাষা, শাসন পদ্ধতির ছিলো না কোন ঐক্য। অথচ বাদশাহ্ আকবর হতে মুহাম্মদ শাহ্ পর্যন্ত (১৫৫৬-১৭৪৯) শাসনামলে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানে এক সরকারী ভাষা, একই শাসন পদ্ধতি ও একই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। সর্বশ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয়। শাহী সাম্রাজ্যের বিশটি সুবা একই শাসনযন্ত্রের সাহায্যে একই রীতিতে শাসিত হত। সমস্ত সরকারী দলীল দস্তাবেজ, পাট্টা, সনদ ফরমান, চিঠিপত্র, রসিদ ফারসীতে লিখিত হত। সাম্রাজ্যে একই মুদ্রানীতি, মুদ্রার একই নাম ও আকার ছিল। সুতরাং এই বিরাট রাষ্ট্রের যে কোথাও গেলে বুঝা যেত এটা একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাষ্ট্র। সর্বভারতীয় শাসনকাঠামো এই প্রথম একটি শক্তিশালী আধুনিক ভিত্তি লাভ করে। গবেষক উল্লেখ করেছেন ঃ "পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্রের কেন্দ্রহীন ভারতীয় সমাজের ওপর ইহারা স্থাপিত করেন নিজেদের এক শাসন ব্যবস্থা। মুসলিম রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী প্রভৃতি আমলাদের নাম ও পদবী এবং রাজপথে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে, হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়। ঠিক ঐরূপে রাজপুরুষদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দা, খেতাব লেখাৎ উর্দি কুর্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী সকলেই লাভ করিল-উহা আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী পোষাক ও কায়দা-কানুন। এই দুই দিকেই ইহারা ভারতীয় ঐক্যের রূপকে তাই পুষ্ট করিয়া তোলেন।"

ভারতীয় সাহিত্য মুসলমানদের কাছে চির ঋণী। বিজেতারা অন্যভাষী হলেও স্থানীয় ভাষাকে প্রথম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাকে শক্ত ভিত্তি ও সাহিত্যিক রূপ প্রদানে তাদের অবদান নিয়ে অনেক গ্রন্থও

রচিত হয়েছে। গোপাল হালদার জানাচ্ছেন ঃ ইহাদের আসরে দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; ভারতবাসীর সাহিত্য সৃষ্টি আর প্রধানত দোভাষায় আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম সৃষ্টি লাভ করিল। বাংলায় ইহার প্রমাণ পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর মহাভারত লেখানো। বস্তুত হোসেন শাহের সভাতে বাংলা কাব্যের পুষ্টি, বাংলার আমলা-মুনসি প্রভৃতি ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মধাম। তাহার পরে আসে আকবরের পরবর্তী মুগল যুগ এবং চৈতন্য যুগ ও বৈচিত্র যুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দিতে আমরা পাই মালিক মুহাম্মদ জৈসীর "পদ্মাবৎ" কবীরের দোহাবলী আর তুলসী দাসের রামচরিত মানস মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের যে অবদান তা অবিস্মরণীয়। হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞরা যেখানে এই ভাষা চর্চাকারীকে নরকবাসী হওয়ার কারণ মনে করতেন সেখানে মুসলিম পরিপোষকতায় এ ভাষা নতুন প্রাণ ফিরে পায়। মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহলে নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহবান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন হিন্দু রাজাগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।"

ইতিহাস সাহিত্যে ভারতীয়দের তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। কাল নিরূপণ শাস্ত্রে হিন্দুদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। মুসলিম শাসনের পূর্বে তারা আদৌ কোন প্রকৃত ইতিহাস রচনা করেনি। সংস্কৃত ভাষায় মাত্র ৪টি রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত রক্ষিত আছে যা অত্যন্ত আগোছালো ও সন-তারিখবিহীন। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা মুসলমানরা প্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ প্রদান করেন এবং ইতিহাস রচনার প্রতি প্রকৃত পথ দেখায়। সন-তারিখের দিকটা ভারত নির্ভুলভাবে মুসলমানদের কাছে থেকে শিখে। ধর্মীয় দিক দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অসংখ্য দেবদেবীর আড়ালে বহু চিন্তাশীল হিন্দু সংস্কারক মধ্যযুগে একেশ্বরবাদের নীতি প্রচার করে গেছেন। কিন্তু বহুত্ববাদ ও কুসংস্কারের আড়ালে তা চাপা পড়ে যায়। মুসলমানদের দ্ব্যর্থহীন একেশ্বরবাদ উপস্থিতির ফলে হিন্দু ধর্মের পুরোধাদের পূর্বতন চিন্তাধারা নতুনভাবে উৎসাহিত হয় এবং মুসলিম আদর্শ হিন্দুদের কুসংস্কারের উপর দ্রাবক রূপে কাজ করে। ফলে অনেক উদারবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। "ইসলামের বলিষ্ঠ

ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি আর এক নতুন রূপও পরিগ্রহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফেলিল।

ভারতীয়দের সাধারণ রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, কথা, চালচলন প্রভৃতিতে প্রচুর মুসলিম প্রভাব পরিদৃষ্টি হয়, যা আজ পৃথক করে দেখার অবকাশ নেই। ভূমিব্যবস্থা, অফিস-আদালত, খাওয়া-দাওয়া, জমি-জমা বন্দোবস্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম ছাপ একাত্মে লীন হয়ে গেছে। একজন প্রখ্যাত লেখক জানিয়েছেন তাই- "লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কতভাবে জমা হইতেছিল" তাহার ঠিকানা নাই। যুদ্ধবিদ্যার সনাতন পদ্ধতি ও কৌশল না জানার কারণে ভারতীয়রা বার বার বিদেশীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। মুসলমানরাই প্রথম তাদের যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন কৌশল, নতুন পরিকল্পনা শেখায় তাদের। ভারতে প্রথম কাগজ মুসলমানরাই আনে। কৃষি সমাজের উন্নতিতে এবং চারুকারু শিল্পের উন্নতিতে মুসলিম অবদান কালোত্তর খ্যাতি পেয়েছে। যদুনাথ সরকার তঁর India through the Ages গ্রন্থে লিখেছেন, শাল, কার্পে, মসলিন অন্যদিকে অলংকার, মিনা, বিদ্‌রিব কাজ প্রভৃতি মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম কারু শিল্পীর হাতে গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন হিসাবে এই সব কাজের তুলনা নেই।

স্থাপত্যে মুসলমানদের বিস্ময়কর কাজ হয়েছিল ভারতে। আজো সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজমহলসহ শত শত স্থাপত্য শৈলী কালের গৌরবগাঁথা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় স্থাপত্যের সাথে মুসলিম স্থাপত্যের যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট। গম্বুজ খিলান, মিনার, প্রাচীর পাত্রে লতাপাতা ও আরবী হরফের অলংকার তা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। এগুলো ভারতীয়রা আগে জানত না। গবেষকের ভাষা :

Thanks to the strength of their binding properties it was possible for the Muslim builders to achieve effect gre-andeur such as the Indians had never dreamt of."

মুসলিম স্থাপত্যগুলি ছাড়াও হিন্দুদের বিভিন্ন প্রাসাদ ও ধর্মীয় স্থানে এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল। ড. তারা চাঁদ লিখেছেন : "হিন্দু রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও স্মৃতিসৌধগুলি আর বিশুদ্ধ প্রাচীন শৈলীতে নির্মিত হচ্ছিল না। তারা শুধু মুসলিম স্থাপত্যকলার নানা উপাদানই যুক্ত করেনি, একটা নতুন চেতনায় উন্মেষও ঘটিয়েছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল পুরনো নান্দনিক বোধ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।"

ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের চক্ষু দুয়ার যে মুসলমানরাই খুলে দিয়েছিল তা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের রাজনীতি, শাসন-পদ্ধতি, সমাজ, অর্থনীতি ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পে মুসলিম যুগের দান কতোভাবে যে যুক্ত হয় তা ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা অসম্ভব। সংক্ষেপে এই আলোচনায় তা কিছুটা প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অনেক ভারতীয় ইতিহাস লেখক মুসলিম যুগকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এ যুগের নতুন সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে বিতর্কিত করেছেন, করেছেন অস্বীকারও। এ যেন এক জঘন্য হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ। মনস্বী ও প্রভাবশালী কয়েকজন মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনেও এরা পিছপা হননি। তবে ভারতের বিবেক একেবারে মরে যায়নি। সত্যসন্ধানী কিছু গবেষক প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচন করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও লেখনী ইতিহাসের ধুম্রকুঞ্জ থেকে সঠিক বক্তব্যকে আলোকিত করেছে। ভারতীয় কিছু অসাধু ইতিহাস লেখকদের এই ধৃষ্টতার প্রতি ইংগিত করে ভারতের প্রখ্যাত সংবাদিক ও সাহিত্যিক খুশবন্ত সিংহ লিখেন : "আমাদের মুসলিম শাসকবর্গের প্রতি আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলি যে কতদূর অসাধু হয়েছে, বর্তমান প্রজন্ম তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা অধিকাংশই হিন্দু খাদক, বিগ্রহ সংহারক ও তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তকারীরূপে চিত্রিত। আমি যদি আপনাদের বলি যে, এই কালো চিত্রগুলো সত্যের বিকৃতি, মুসলিম অবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করার জন্য ভেবে-চিন্তে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হয়েছে- তাহলে আপনাদের অধিকাংশই আমাকে বিশ্বাস করবেন না। কাজেই আমি আপনাদের সুপারিশ করি, "ইসলাম য্যাণ্ড ইন্ডিয়ান কালচার" শিরোনামে প্রকাশিত উড়িষ্যার রাজ্যপাল বি. এন. প্যান্ডে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতার একখানি সংকলনের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন।"

ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে আজো যে দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস তা প্রধানত তাদের হীনমন্যতা, ক্ষুদ্রতা ও গোঁড়ামীর ফসল। কম্যুনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও লেনিনের সহচর এম এন রায় লিখেছেন : "শত শত বৎসরব্যাপী দুটো সম্প্রদায় একসঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো অথচ পরস্পরের সভ্যতা-সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টাই করলো না, পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যি এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না। পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না।

ভারতীয় অধিবাসীদের কল্যাণে এবং বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সততার স্বার্থে, তাদের এ বিরূপ মনোভাবের নিরসন অপরিহার্য কর্তব্য। ভারতবর্ষ ইতিহাসে যে চরম পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সম্যক উপলব্ধির গুরুত্ব আজ অপরিসীম হয়ে উঠেছে।"

পরিশেষে বলা যায়, মুসলমান ও ভারতীয় সংস্কৃতির যে অবস্থান তার প্রতি উদাসীনতা ও কোপ দৃষ্টি ভারতের ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। এই প্রেক্ষিতে চমৎকার এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। "রঙীন চশমা না চড়িয়ে একেবারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস পড়লে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উদ্ধৃত আচরণ উপহাস্য মনে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাসকে অপমানিত করেছে আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও ব্যাহত করেছে। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইল। এমনকি আজো তার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতীত ঋণের বোঝা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হন না। দুর্ভাগ্য আমাদের, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে পারেনি, কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার ছিল না।"

মুসলিম শিল্পকলা : বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

কোন জাতির উন্নতি, অগ্রগতি এবং সভ্যতার বিনির্মাণ কৃতিত্ব বিচার করতে হলে শিল্পকলায় তাদের অবদান অবশ্য বিচার্য বিষয়। শিল্পকলায় উন্নতি লাভ করা ছাড়া কেউ আজো সভ্যতার নির্মাতা হতে পারেনি। বলা যায়, সেই বিচারের মানদণ্ডে এটি একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু শিল্পকলা কি- বস্তুত পক্ষে তার কোন সংজ্ঞা দেয়া যায়না। এটি এমন এক ব্যাপক বিষয় যাকে সমকালীন উপাদান দিয়ে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে সময়ের প্রেক্ষাপটে তা আর সেখানে স্থিত থাকেনা। সময়, অভিজ্ঞতা, চর্চা এবং বিনির্মাণের সাথে সাথে শিল্পকলা নতুন নতুন চৌহদ্দীতে প্রবেশ করে। তাই সবসময়ই এর সংজ্ঞা দেয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

'শিল্প' বা (Art) শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ এখনও নির্ণীত হয়নি। কিন্তু (Art) বলতে আমরা এমনকিছু সৃষ্টিকেই বুঝি, যা আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক নন্দলাল বসুর ভাষায় : 'শিল্প হল কল্পনা। রেখার রঙে রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। প্রকাশের জন্যে করন কৌশলের প্রয়োজন আছে; সে হল উপায়, উদ্দেশ্য নয়; করণ-কৌশলের জ্ঞান শিল্পের প্রেরণাও নয়।' এখানে করণ কৌশলের কথা বলা হলো, আধুনিক চিন্তাবিদ ও শিল্পতত্ত্বের মতে এটা ছাড়া শিল্পের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ লিখেন : 'সীমাবদ্ধ অর্থে আর্ট বা শিল্প বলতে এখন বুঝায় সেই সব জিনিসকে গড়বার বা সৃষ্টি করবার কৌশলকে অথবা সৃষ্ট জিনিসগুলোকেই, যা আমরা চোখে দেখে পরিতৃপ্তি পাই। চোখে দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় এমনসব বস্তু যথা, ছবি, মূর্তি, হর্ম্য-এরাই বিশেষভাবে আমাদের শিল্প সম্পর্কীয় ধারণার এলাকায় পড়ে। সুন্দর নকশা করে বোনা একটা বস্ত্রও আমাদের অনেকের কাছে শিল্প। ... বাস্তব ক্ষেত্রে করণ-কৌশলকে বাদ দিয়ে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়না। প্রত্যেক শিল্পীকে কষ্ট করে আয়ত্ব করতে হয় করণ-কৌশল। 'কলা' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ এখনও সুনির্দিষ্ট হয়নি। তবে সংস্কৃত ভাষায় কলা বলতে নৃত্য, গীত, অভিনয় প্রভৃতি চৌষট্টি রকম বিদ্যাকে বোঝাতো। শব্দগত দিক থেকে 'শিল্প' ও 'কলা' এক অর্থবোধক। কিন্তু বাংলায় এখন শিল্পকলা বলতে শিল্পবিদ্যা বুঝায়। যার লক্ষ্য এমন কিছু সৃষ্টি করা যা আমাদের সৌন্দর্যবোধে অথবা শিল্পবোধে সাড়া জাগাতে পারে।'

এই উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা শিল্পকলার একটা ধরণা পাচ্ছি। এখন যদি বলা হয় কোন কোন মাধ্যমে শিল্পকলার প্রকাশ ঘটে। সাধারণত শিল্পকলাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। ভাষা চর্চার যেমন দুটো দিক আছে একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক, আর অন্যটা অর্থ লাভের দিক। তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে। - একটা আনন্দ দেয় আর একটা অর্থ দেয়। এই দুটো ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দ লোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবন যাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয় অর্থাগমনেরও পথ করে দেয়।

অনেকে শিল্পকলাকে এভাবে ভাগ করে দেখতে চাননা। কিন্তু সাধারণভাবে চারুকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলাই হলো এর প্রধান মাধ্যম। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এভাবে অগ্রসর হবো। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের পর বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে শিল্পকলার যে উৎকর্ষ এবং নতুন বৈশিষ্ট্য ধারণা লাভ করে, তাই এই নিবন্ধের বিবেচ্য বিষয়।

শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রে বহুকাল থেকেই ধর্মের সম্পর্ক ছিল। অতীতে শিল্পকলার ও ধর্মের বিকাশ ঘটেছে এক সূত্রে। যখন জগতে কোন নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছে, তখন সেই ধর্মতকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা অনুভব করেছেন নতুন ধরনের কিছু সৃষ্টির। ফলে শিল্পকলা নিয়েছে বিশিষ্ট মোড়। শুধু অতীত কেন সভ্যতার চরমোৎকর্ষের বর্তমান সময়েও ধর্ম-শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগায়। একজন সমালোচক তাই লিখেছেন : পৃথিবীর বহু দেশে বর্তমানেও ধর্ম-বিশ্বাসই শিল্প-প্রেরণার উৎস। তিব্বত ও ভূটানে শিল্প বলতে আমরা বুঝি একমাত্র শাস্ত্রীয় ভজন পূজন সম্বন্ধীয় আচরণবিধি। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের যে লামাবাদ আছে তার উপর ভিত্তি করে তানকা নামক এক প্রকার চিত্রশিল্পের জন্ম হয়েছে। ভূটানের প্রধান শিল্প হচ্ছে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকদের নানা ধরনের প্রতিকৃতি।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তী আরব এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে এই ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন আর কোন গোপন বিষয় নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্মের তুলনা নেই বললে অত্যুক্তি করা হয়না। তাই অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে শিল্পকলার বিকাশেও ইসলাম যোগ করেছিল এক নতুন মাত্রা, নতুন নির্দেশনা। প্যারিস থেকে প্রকাশিত Introduction To Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'বিজ্ঞানের বিকাশে কুরআন মজীদে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে, তেমনিভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে শিল্পকলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। বস্তুত পক্ষে কুরআন মজীদ মুসলমানদের শিল্পকলা চর্চায় উৎসাহিত করেছে। যেমন সুন্দর সহীহ্‌ভাবে কুরআন তিলাওয়াত থেকেই সুললিত উচ্চারণের একটা শাখার উদ্ভব হয়েছে। আবার কুরআন সংরক্ষণ প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালিওগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিখন এবং বাঁধাই শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছে। মসজিদ নির্মাণ শৈলী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আর্কিটেকচার বা স্থাপত্য এবং অলংকরণ শিল্পের।

পবিত্র কুরআনে সৌন্দর্য চর্চার অনেক ইংগিত রয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির পরিপাটী নকশা এবং আকাশ, তারকারাজি, বৃক্ষপত্র প্রভৃতির ব্যবহারে যে সুষমা এবং সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে তা শিল্প চর্চার জন্য উৎসাহ দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন'। তিনি আরো বলেছেন, 'সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে। এমনকি তুমি যদি কাউকে হত্যা কর। তাহলেও সেই কাজটি করতে হবে সুন্দর ও রুচিসম্মতভাবে।' ইসলামের এই সৌন্দর্য চেতনা শিল্প ও সুকুমার কলা চর্চাকে অনুমোদন করে। অবশ্য মূর্তিমান শিল্পের চর্চাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। প্রাণীর প্রতিকৃতি অংকনও সে নিষিদ্ধ করেছে। তাই বলে শিল্পের সম্ভাবনা উবে যায়নি। বরং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে মুসলমান শিল্পীদের হাতে। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ লিখেন : মূর্তিমান শিল্পের ব্যাপারে ইসলামে যে বিধি নিষেধ রয়েছে তা কখনো মুসলমানদের শিল্পচর্চাকে ব্যাহত করতে পারেনি, বরং তাদের হাতে বিমূর্ত শিল্পচর্চার যে বিকাশ ঘটেছে তা খুবই বিস্ময়কর। উদাহরণ হিসাবে মদীনার মসজিদে নববী, জেরুজালেমের মসজিদ, ইস্‌তাম্‌বুলের সুলায়মানিয়া মসজিদ, আগ্রার তাজ মহল, গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ এবং এ জাতীয় আরো কতগুলো কীর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমানরা ছবি আঁকার পরিবর্তে ক্যালিওগ্রাফিকে গ্রহণ করেছে একটি শিল্পকর্ম হিসাবে। বলতে গেলে এটি তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

মুসলিম তথা ইসলাম প্রভাবিত শিল্পকলা সন্নিহিত এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে হাজার বছর ধরে লালিত হয়। ইসলামী শিল্পকলা সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ও অমুসলমান দক্ষ স্থাপতি, চিত্রকর, লিপিকার ও কারুশিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পবোধ ও সৃজনশীল শিল্পকর্মকে বোঝায়। আঞ্চলিক, জাতিগত, সময়ের ব্যবধান এবং স্থানীয় প্রভাবে এই শিল্পকলার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও একটি সুষমামণ্ডিত ও সুসংহত রূপরেখা দেখা যায়, যাকে Unity of diversity বলা যায়। এ কারণে ইসলামী শিল্পকলা কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে

এবং বিভিন্ন চারু ও কারুশিল্পের মাধ্যমে এক রসোত্তীর্ণ শিল্পকলার পর্যায়ে পৌঁছায়। কেবলমাত্র স্থাপত্যই নয়, চিত্রকলা, লিপিশৈলী, মৃৎপাত্র, কারুশিল্প, বয়নশিল্প, স্থাপত্যিক অলংকরণ, ধাতবশিল্প প্রভৃতিতে ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ ঘটে।

ইসলামী শিল্পকলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. মণ্ডন বা অলংকরণ ধর্মী

২. লিপিকলা বা ক্যালিওগ্রাফী

৩. মিনার কাজ

ইসলামী শিল্পকলা অলংকরণধর্মী হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। ফুল, পাতা, গুল্ম ও বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার-আকৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নকশাকলা। এটা প্রাচ্যের সনাতন ঐতিহ্যবাহী। আরবরা ফুল, লতা-পাতা বিশেষ করে আঙ্গুর লতার নকশা করতো বিভিন্নভাবে। পরবর্তীতে তা আরো সমৃদ্ধ আকারে মুসিলম শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। মুসলিম শিল্পকলার একান্ত সম্পদ Arabisque [এ্যারাবেস্কু] তারই সুসংহত রূপ। পাশ্চাত্যে 'এ্যারাবেস্কুর' প্রভাব লক্ষণীয়। ড. আবদুর রহমান জানিয়েছেন : এ্যারাবেস্কু এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টানদের গীর্জার দেয়াল, দরজা, জানালা এমনকি পোষাক পরিচ্ছদে এ্যারাবেস্কু অনুসরণে কারুকাজ কর হয়। স্পেন, ইতালী, গ্রীস ও মাল্টায় এই এ্যারাবেস্কু কারুকাজ বেশি দেখা যায়।

মরুচারী আরবে তাঁবু এবং গালিচার মাধ্যমে বয়ন শিল্পের প্রেরণা এসেছে, মৃৎপাত্রে সঞ্চিত পানির আধার এক সময় শিল্পবোধের মাধ্যম হয়ে গড়ে উঠেছে। ব্রিটানিকা লিখেছে 'গালিচা, কাপড় ও মৃৎপাত্রের উপর ফুল, লতা-পাতা, জ্যামিতিক আকার-আকৃতি ও অবিমিশ্র রঙ দিয়ে নকশা করা সহজ ও স্বাভাবিক ইসলামী শিল্পকলা তাই ভৌগলিক কারণেও হয়েছে মণ্ডন বা নকশাপ্রধান (decorative)। মসজিদের গায় মুসলিম শিল্পীরা যে নকশা এঁকেছেন তাও মনে করিয়ে দেয় গালিচা ও মৃৎপাত্রের নকশার কথা।'

Rozer Fre তাঁর এক বইয়ে এসম্পর্কে লিখেন : মুসলিম শিল্পকলার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার ফুল ও জ্যামিতিক মণ্ডন পদ্ধতির প্রাণশক্তি। কোথায় এবং কিভাবে এই অলংকরণ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে তা সহজে বলা যায়না । তবে মনে হয়, প্রাচীন মিশর-এর আদিভূমি।

অতি পরিচিতি গ্রীক-রোমক খেজুর জাতীয় পাতার নকশা থেকেও এর বিশিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে ধরা যায়। কিন্তু যে নকশাকলা ছিল অনমনীয়, মুসলিম শিল্পীদের হাতে তার গঠন কাঠিন্য কেটে গিয়ে তার মধ্যে ফুটে উঠে এক গতিময়তা।

মুসলিম শিল্পকলার মধ্যে যা তাদের একান্ত নিজস্ব এবং নতুন দান তা হলো হস্তলিপিকলা তথা ক্যালিওগ্রাফী। প্রফেসর জিয়াউদ্দিন তাঁর Muslim Calliography গ্রন্থে লিখেন : মুসলমানগণ যে সকল শিল্পের চর্চা করতেন, তার মধ্যে হস্তলিপিই ছিল সর্বাধিক রুচিসম্মত। আরেকজন গবেষকের ভাষ্য- 'মুসলিম শিল্পকলার মধ্যে লিপিকলা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত। আরবদের মত অন্য কোন জাতি লিখন পদ্ধতিকে শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে গভীর মনোনিবেশের সথে ব্যবহার করেনি। আরবদের হাতে এই লিপি কলার উদ্ভব এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশ ঘটে, কিন্তু পারস্যবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইহা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

ইসলামে জীবজন্তুর ছবি এবং ভাস্কর নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলমানরা হস্তলিপির প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করে। অধিকন্তু এই বিষয়ে কুরআন এবং মহানবী (সা.) উৎসাহ প্রদান ছিল এই শিল্পের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক। আরবী বর্ণমালা সমান্তরাল এবং লম্ব স্বভাবের। ফলে বিভিন্ন লতা-পাতার কারুকাজ লিপিচাতুর্যে অক্ষরের সাথে সঙ্গতি রেখেই করা যায়। এই দিকটি ক্যালিওগ্রাফীকে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রেখেছে। ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী লিখেছেন : 'মুসলিম শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অলংকরণ ও সাজ-সজ্জার বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে আরবী সুন্দর হস্তলিখন শৈলী যুগ যুগ ব্যাপী প্রভুত অবদান রেখেছে। প্রয়োজনবোধে আরবী বর্ণমালা সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বিধি অলংকরণের ক্ষেত্রে উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আরবী বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড এবং আনুভূমিক ও বক্রাকৃতি রেখা বর্ধিত ও হ্রাস করে শিল্পীগণ অলংকরণের পরিমণ্ডলে সৌন্দর্যের এক মনোরম ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু আরবী অক্ষরের আনুভূমিক ও অর্ধাবৃত্তাকৃতি রেখা দ্বারা অলংকরণের এক একটি ইউনিটের জন্য বর্গাকৃতি পরিসর বৃত্তাকার, ত্রিভূজাকার ও ডিম্বাকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শিল্পীগণ অলংকরণ প্রক্রিয়ায় গতি ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন এবং দর্শকদের নিকট সাজসজ্জাকে উপভোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন। চিত্রকলার ন্যায় সুন্দর হস্তলিখন দ্বারা সৃষ্ট সারি তার পটভূমির সাথে এক সুসামঞ্জস্য সমতা রক্ষা করে চলেছে। অলংকরণ প্রয়োজনে সৃষ্ট হস্তলিখন শিল্পের সারিতে এক সজীব প্রাণস্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। কাজেই কেবলমাত্র লিখন শিল্পের কার্যকারিতা হিসেবে আরবী হস্তলিখন শিল্প বিকাশ লাভ করেনি, বরং অলংকরণ ও সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে তা সমাদৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যে বিমূর্ত শিল্পের জন্ম মুসলিম লিপিকলাকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা ক্যালিওগ্রাফী শিল্পে মুগ্ধ হয়ে তার আদর্শেই

বিমূত শিল্পের জন্ম দিয়েছেন। বিমূর্ত শিল্পে ফিগার নেই, ফরম এসেছে। শিল্পীরা ক্যালিওগ্রাফীর আদলে ফরম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে। বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ডিয়ান, কান্ডিনেস্ক্রীর চিত্রে ক্যালিওগ্রাফীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

পাশ্চাত্যের বিশ্বখ্যাত শিল্পী যার ছবির বিষয়বস্তু ছিল নগ্ননারী, তিনিও একসময় ইরানের কারুশিল্প, গালিচার রং এবং ডিজাইনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, মাতিস রমণীর দেহ বাদ দিয়ে ইরানের গালিচার রং ও নকশা তার ক্যানভাসে স্থান দিয়েছিলেন। মাতিস নিজেই বলতেন : 'একটি সার্থক চিত্রই হচ্ছে সার্থক নকশা'। শিল্পী পল ক্লী চিত্রকর্মে, যেমন তার 'ডকুমেন্ট' ছবিটি মূলত আরবী অক্ষরের আদলে কতগুলো আবৃতির সমাবেশ, তার রেখাঙ্কনেও রয়েছে আরবী লিখন পদ্ধতির প্রভাব।

মুসলিম স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র এবং বিভিন্ন মাধ্যমে মিনা করা মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্যে, চিত্রকলা এবং লিপিকলার পাস্পরিক ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। 'মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি স্বীয় আলঙ্করিক সৌকর্যে সমুজ্জ্বল। এর ব্যাপকতা বৈপরীত্য, বর্ণাঢ্য রঙ্গের সমাবেশ রেখার ঐন্দ্রজালিক পরিমণ্ডল এক মোহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। মুসলিম কারিগর, নকশাবিদ, সূত্রধর, কারুশিল্পী বিভিন্ন উৎস থেকে স্বজ্ঞানে অথবা অবচেতনে নানা ধরনের নকশা দ্বারা ইমারত সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত উপকরণের ব্যবহার মুসলিম অলংকরণ শুধু সমৃদ্ধই হয়নি বরং সুষ্ঠু সমন্বয় ও প্রকৃত ভারসাম্য সৃষ্টির ফলে ইহা রসোত্তীর্ণ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছে। প্যাপাডোপোলা বলেন : It is only just to aknowledge that in all their various domains the craftsmen of Islam created objects of consummate refinement in which they exploited with prodigious skill their full repertory of motifs while remaining faithful to the more profound aesthetic principles of Muslim art.

অলংকরণ এবং চিত্রকলার যুগপৎ ব্যবহার স্থাপত্যশৈলীকে করেছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। উদাহরণত ইরানের অনেক স্থপাত্যকর্মের কথা উল্লেখ করা যায় যা দর্শকদের মুহূর্তে কাছে টানে। তাদের অলংকরণ পাশ্চাত্যকে করেছে প্রভাবিত। ড. মুফজুল্লাহ কবীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন : প্রাসঙ্গিক গবেষক মন্তব্য করেছেন : 'প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শিল্প অলংকরণের শিল্প। স্থাপত্যকর্ম ধর্মীয় হোক অথবা জাগতিক হোক অলংকরণের প্রাচুর্যই একে কল্পনাবিলাস অথবা পারলৌকিক

বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। কঠিন প্রাচীর প্লাষ্টারের আবরণে এবং টালির অলংকরণে ঢাকা পড়ে, খিলান ও খিলানযুক্ত ছাদের নীরেট বাস্তবতা ব্যাপক ফুলের অলংকরণ মহিমামণ্ডিত হয়। গম্বুজগুলিকে এমন উজ্জ্বল বর্ণালোকিত অন্তহীন নকশায় ভরিয়ে তোলা হয় যে দেখে মনে হয় আতশবাজির খেলা চলছে। আবার প্রাচীর গুম্বুজ ও ছাদকে এমনভাবে এ্যারাবেস্ক ডিজাইনের সাহায্যে আচ্ছাদিত করা হয় যে এগুলোকে জড়ানো সুদৃশ্য লেইসের কাজ বলে মনে করা হয়। মুসলিম চিত্রকলার মধ্যেও এ বাস্তবতা বিবর্জিত রূপ প্রাধান্য পেয়েছে।

মুসলিম শিল্পকলার পরিধি মাপা খুবই দুষ্কর। অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটেছিল তার সদর্প ও বৈশিষ্ট্যময় বিচরণ। কাঁচ শিল্প, কাঠ শিল্প, বয়ন শিল্প, আসবাব পত্র, গজদন্ত প্রভৃতি মাধ্যমে তারা লাভ করেছিল উল্লেখযোগ্য সফলতা। কার্পেটের মাধ্যমে মুসলিম শিল্পকলার অনন্য সুষমা প্রকাশিত হয়। ধাতব শিলা, চীনা মাটি এবং মৃতশিল্পের মত মাধ্যমেও এটি উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল। এতগুলো মাধ্যমে বিচরণ করেও মুসলিম শিল্পকলা একটা সাযুজ্য বজায় রাখত। শিল্পের প্রাণধ্বনি অনুরণিত হতো বলেই তার দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছিল। তাই এটিং হাউসনের মতে, ইসলামী শিল্পের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য এর বিভিন্ন অংশের মধ্যকার সামঞ্জস্য।

মুসলিম শিল্পকলার উপর বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মূলতঃ এর উপাদান চারটি। সেগুলো হল-

১. উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা
২. জ্যামিতিক আকৃতি ও রেখা
৩. আরবী বর্ণমালা
৪. বিশুদ্ধ অবিমিশ্র রঙ

জীব জগতের চিত্রাংকনে ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করলে কয়েকজন শিল্পী মহানবীর (সা.) কাছে জানতে চাইলেন, হে নবী! এতদিন আমরা চিত্র এঁকেই জীবিকা নির্বাহ করতাম। তিনি বললেন, তোমরা লতা-পাতার ছবি আঁকো।' মূলতঃ এই অনুমোদনের পর মুসলিম দুনিয়ার শিল্পীরা নানা প্রকার তরুলতা-ফুলের ছবি তাদের চিত্রে ব্যাপকভাবে স্থান দিতে থাকে। খেজুর পাতা, আঙ্গুর লতা তাদের চিত্রে এমন সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে মাতিস প্রমুখ পাশ্চাত্য শিল্পীরা তা থেকে নিয়েছেন উপাদান। 'মুসলিম শিল্পের অভিব্যক্তি ঘটেছে মূলত উদ্ভিদের মাধ্যমে যা প্রকৃত লতা-পাতায়, ফুল কিংবা বিমূর্ত এ্যারাবেস্কের রূপ ধারণ করতো।

স্মর্তব্য যে, বর্তমানে মুসলিম চিত্রকলায় ব্যাপক জীব ছবি ব্যবহৃত হয়। জীব ছবি ব্যবহারের বৈধ-অবৈধ প্রশ্নে ইসলামের অন্তর্নিহিত কোন বক্তব্য কাজ করছে কিনা তা নিয়ে গবেষকরা মতামত রেখেছেন যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি আঁকা বিশেষভাবে শুরু হয় মঙ্গোলদের প্রভাবে ইরানে। মুগলদের মাধ্যমে এই ধারা ভারতে প্রবেশ করে। বাদশাহ আকবরের আমলে ছবি আঁকার বৈধতা নিয়ে উলামারা প্রশ্ন তুললে তিনি উত্তরে বলেছিলেন : আমার মনে হয় চিত্রকলার মাধ্যমে বিধাতার মাহাত্ম্যকে অনেক অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করা সম্ভব। শিল্পীরা যখন কোন প্রাণীর ছবি আঁকতে বসেন, তখন তার বিভিন্ন অবয়বের ছবি আঁকতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, এই ছবি আঁকা কত কঠিন। প্রাণ দান করা দূরে থাক- শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ঠিকমত আঁকতেও শিল্পীদের যথেষ্ট সাধনা করতে হয়। এর ফলে নিশ্চয় শিল্পীদের মনে আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতার উপর বাড়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; তাঁরা বুঝতে পারেন, যে আল্লাহ প্রাণ দান করেছেন, তাঁর ক্ষমতা কত অপরিসীম। এর ফলে সম্প্রসারিত হয় শিল্পীদের প্রজ্ঞা।

মুসলিম স্থাপত্যসমূহে জিউম্যাট্রিক্যাল ডিজাইন বা জ্যামিতিক ফর্মের নকশা, ত্রিভূজ, বৃত্ত, চতুর্ভূজ ব্যবহৃত হয়েছে। ফুল, লতা-পাতা বিষয়বস্তুমুখী রূপায়ণের অনুপাত ও পরিপ্রেক্ষিতের যথাযথ প্রয়োগে জ্যামিতিক নকশায় সুষ্ঠু ছন্দোময় রেখায় উজ্জ্বল রং -এর ব্যবহারে আবহ সৃষ্টি করা। মুসলিম শিল্পীরা মসজিদ অলংকরণ পানপাত্রে, জায়নামাযে এই ফরম ব্যবহার করেছেন। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের দিকপাল পাবলো পিকাসো যিনি কিউবইজমের স্রষ্টা, তাঁর ছবির জিউম্যাট্রিক্যাল ফর্ম মুসলিম শিল্প থেকেই নেয়া। উল্লেখ্য, তিনি এক সময়কার মুসলিম সভ্যতার পাদপীঠ স্পেনের আন্দলুসিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মসজিদের মিনার, মেহরার, ছাদ, বহির্ভাগের নয়নাভিরাম ডিজাইন, মিম্বর, গম্বুজ, ফোয়ারা প্রভৃতিতে জ্যামিতিক বিভিন্ন ফর্ম সবখানেই দৃশ্যমান।

আরবী হরফের চ্যাপ্টা সমান্তরাল এবং লম্ব স্বভাবের কারণে তা বিভিন্ন অলংকরণের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া আরবী অক্ষরের একাধিক লিখন পদ্ধতি থাকায় তা আরো সুবিধা প্রদান করেছে শিল্পীদের। শিল্পে আরবী বর্ণের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার মুসলিম শিল্পকলার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদ্ধতি ইউরোপের অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগীদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। তারা এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বাস সংক্রান্ত আরবী বাক্য খৃষ্টান শাসকদের দ্বারা তাদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন অষ্টম শতাব্দীর

মারসিয়ার খৃষ্টান শাসক অফফা তাঁর মুদ্রায় কুফিক লিখন পদ্ধতিতে কালিমা উৎকীর্ণ করেন। একইভাবে নবম শতকে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি আইরিশ ক্রুশের মধ্যস্থলে কুফিক লিখন পদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ' উৎকীর্ণ হয়েছে। সাধু পিটারের গির্জার সুউচ্চ প্রবেশ পথের প্রাচীর গাত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস উৎকীর্ণ হয়েছে। মধ্য যুগের ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ডের স্থাপত্য অলংকরণ প্রক্রিয়ায় আরবী হস্তলিখন শিল্প প্রভূত প্রভাব রেখেছে। প্রফেসর লেথারী মনে করেন যে, ওয়েস্ট মিনিষ্টার এ্যাবীর কোন কোন অংশের অলংকরণ প্রক্রিয়ায় মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের বৈশিষ্ট্যময় ছাপ বিদ্যমান।

আর মুসলিম শিল্পকলায় বর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে নকশা কলার অঙ্গ হিসাবে। প্রধানতঃ বর্ণের সৌন্দর্য এবং কোন জিনিসের বাস্তবতাকে ভালভাবে চিত্রিত করার জন্য অবিমিশ্র রঙের ব্যবহার হয়েছে। অবিমিশ্র আলোছায়া বিহীন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুসলিম শিল্পকলা একটা সময়ে কেবল আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ছিলো তা নয়, পাশ্চাত্যকেও করেছে প্রভাবিত, যার কিছু কিছু তথ্য এই নিবন্ধের স্থানে স্থানে দেয়া হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম এবং স্থাপত্যে প্রাচ্যের প্রভাব দৃশ্যমান। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান লিখেন : বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনেকেই প্রাচ্যের জীবন থেকেই এবং প্রাচ্যের শিল্পবোধ থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন শিল্পের জন্ম দিয়েছেন। যেমন মাতিস এবং পল ক্লী। মাতিস রঙিন কাগজের কাট আউট দিয়ে আরব্য উপন্যাসের অনেক কাহিনী রচনা করেছেন, আবার পল ক্লী রাত্রিকালে মসজিদের অভ্যন্তরস্থ আলোকসজ্জা থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুনভাবে রঙের ব্যবহার এনেছিলেন তার ছবিগুলোতে।

সবচেয়ে বড়ো কথা ধর্মগত কারণে নয় শিল্পের গুণগত উৎকর্ষের কারণে মুসলিম তথা ইসলামী-শিল্পকলা এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। মুসলমানদের যুগপৎ অবদানের বিশাল জগতের সাথে এটা সামঞ্জস্যশীল বৈকি। পাশ্চাত্য মনীষী Sedillot-এর স্বীকারোক্তি- The vast literature, Which exixted during that period, the multifarious productions of genius, the precious inventions, all of which attest a marvellous activity of intellect, justify the opinion that the Arabs were our masters in every thing. They furnished us, on the one hand, inestimable meterials for the history of the Middle Ages, with travels, with the happy idea of biographical dictionaries; on the other, an industry without equal, architecture magnificent in execution and thought, and important discoveries in Art.

তথ্যপঞ্জী

প্রথম পর্ব

[বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম অবদান]

১. Scientific Indications in the Holy Quran: by a Board of Researchers. IFB, 1995

২. Hazrat Muhammad (s): Encyclopaedia of Seerah by Afzalur Rahman. অনুবাদ, ইফাবা / ১৯৮৯

৩. The Spirit of Islam : Syed Ameer Ali, অনুবাদ, মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ইফাবা/১৯৯৩

৪. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ঃ এম আকবর আলী, বিভিন্ন খণ্ড

৫. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস ঃ কে আলী / ১৯৮১

৬. মুসলিম কীর্তি ঃ ড. এম আবদুল কাদের, ইফাবা / ১৯৮৮

৭. একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনা ঃ সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন/১৯৯৬

৮. উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন ঃ হাসান বুক হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ/১৯৮৪

৯. History of Arabs : P. K. Hitti, London, 1972

১০. The Bible The Quran and Science : Dr. Maurice Bucaille. USA, 1978

১১. বিজ্ঞান না কোরান ঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বগুড়া/১৯৮১

১২. আল বিরুনী ঃ এম আকবর আলী, ইফাবা / ১৯৮২

১৩. জাবির ইবনে হাইয়ান ঃ এম আকবর আলী, ইফাবা, / ১৯৮০

১৪. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান ঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ২ খণ্ডে, ইফাবা, / ১৯৯৬, ১৯৯৭

১৫. মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা ঃ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, ইফাবা / ১৯৯৯

১৬. Introduction to Islamic Civilisation : R.M Savory, Cambridge University Press./1977

১৭. Al-Tibb Al-Islam : Hakim Mohammed Sayeed. IFB/1981

১৮.আরব জাতির ইতিহাস ঃ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড / ১৯৭২

১৯. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ সম্পাদনা পরিষদ কৃত, ইফাবা, বিবিধ খণ্ড

২০. দুহাল ইসলাম ঃ ড. আহমদ আমীন, প্রথম খণ্ড, মুহাম্মদ আবূ তাহের মেছবাহ অনূদিত, ইফাবা / ১৯৯৪

২১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ ৩২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা/ ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা

২২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা ঃ ড. আবদুল আজীজ দূরী, এ. কে. এম ইয়াকুব আলী অনূদিত, বাংলা একাডেমী / ১৯৮২

২৩. পয়গামে মুহাম্মদী ঃ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, ইফাবা / ১৯৯২

২৪. Introduction To Islam : by Dr. Muhammed Hamidullah. অনুবাদ, মুহাম্মদ লুতফুল হক, ইফাবা/ ১৯৯৫

২৫. কুরআনের ইতিহাস দর্শন ঃ ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, অনুবাদ সিরাজ মান্নান, ইফাবা/ ১৯৮৭

২৬. বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান ঃ নূরুল হোসেন খন্দকার, ইফাবা ১৯৮৮

২৭. ইবনে খালদুন ঃ আখতার-উল-আলম, ইফাবা / ১৯৮৯

২৮. সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা.) ঃ ইবনে ইসহাক, শহীদ আখন্দ অনূদিত, ইফাবা / ১৯৯২

২৯. ইসলামী রেনেঁসার অগ্রপথিক (১ম খণ্ড) ঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, আবু সাঈদ ওমর আলী অনূদিত, ইফাবা / ১৯৮৭

৩০. স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস ঃ এ এইচ এম শামসুর রহমান, ১৯৭৭

৩১. গোলামানে ইসলাম ঃ আহমদ সাঈদ, মুজীবুর রহমান অনূদিত / ১৯৯১

৩২. সীরাতে ইব্নে হিশাম ঃ আকরাম ফারুক অনূদিত / ১৯৯২

৩৩. তবকাত-ই-নাসিরী ঃ মীনহাজ-ই-সিরাজ, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী / ১৯৮৩

৩৪. The Eternal Message of Muhammad (Sm.): by Abd-al-Rahman Azzam, আবু জাফর অনূদিত/১৯৮৫

৩৫. ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি ঃ গাজী শামছুর রহমান, ইফাবা / ১৯৮১

৩৬. ফিকাহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঃ আবু ছাইদ আবদুল্লাহ / ১৯৮৮

৩৭. ইসলামী আইনের সংকলন ঃ তানযীলুর রহমান, হাফেজ মঈনুল ইসলাম অনূদিত, ইফাবা / ১৯৮৪

৩৮. সীরাতে নুমান ঃ শিবলী নোমানী, আবদুল জাব্বার সিদ্দিকী অনূদিত, ইফাবা / ১৯৯০

৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর ফিকাহ ঃ ড. হানাফী রাজী, সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ইফাবা / ১৯৮৮

৪০. The Islamic Law of Nations : by Majid Khaddury, আবু জাফর অনূদিত, ইফাবা/ ১৯৯৪

৪১. ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন ঃ শহীদ আবদুল কাদের আওদা, কারামত আলী নিযামী অনূদিত, ইফাবা / ১৯৮৬

৪২. আল মামুন ঃ শিবলী নোমানী, আখতার ফারুক অনূদিত / ১৯৭৬

৪৩. Islam : Its Mearning and Message : Khurshid Ahmed, অনুবাদ নূরুল আমিন জাওহার / ইফা, ১৯৯৫

৪৪. ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রূমী ঃ সোলায়মান আলী সরকার, বাংলা একাডেমী / ১৯৮৪

৪৫. ইকবাল মননে অন্বেষণে ঃ ফাহমিদ উর রহমান / ১৯৯৫

৪৬. Muslim World and the West : K. H. Cradle, edited and transtated by Akhter-ul-Alam, 1987

৪৭. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত ঃ আশকার-ইবনে শাইখ / ঢাকা, ১৯৯৪

৪৮. ইকবাল দেশে বিদেশে ঃ এম রহমান সঙ্কলিত, ইফা / ১৯৮৮

৪৯. মহানবীর (স.) প্রতিরক্ষা কৌশল ঃ জেনারেল আকবর খান, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, ইফাবা /১৯৮৪

৫০. The battle fields of Prophet Muhammed (Sm.): by Muhammad Hamidullah, অনুবাদ, ইফা / ১৯৯১

৫১. আরব নৌবহর ঃ সৈয়দ সুলায়মান নদভী, হুমায়ুন খান অনূদিত

৫২. সোনালী যুগের মুসলিম নৌ শক্তি ঃ আবদুল ওয়াহেদ সিন্ধি, হাসান রহমতী অনূদিত, ইফা / ১৯৮৪

৫৩. Encyclopeadia of Islam : London

৫৪. মহানবী ঃ ড. ওসমান গণি, কলিকাতা / ১৯৮৮

৫৫. The Moors in Spain : Stanley Lanepoole, 1959

৫৬. A Short history of the glorious Moslem civilisation : Abdul Latif Khan, Chittagong/1924

৫৭. মুসলিম স্পেন ঃ সরকার শরীফুল ইসলাম, ইফাবা / ১৯৮৭

৫৮. The Historical Role of Islam : by M. N. Roy, আবদুল হাই অনূদিত/ঢাকা, ১৯৯০

৫৯. Main Springs of Western Civilization : by Abdul Hameed Siddiqui, এ.কে.এম নাজির আহমদ অনূদিত, ঢাকা / ১৯৮২

৬০. সাগর বিজয় ও আমেরিকা আবিষ্কারে মুসলমান ঃ বাসার মঈনুদ্দীন/ইফাবা

দ্বিতীয় পর্ব
[প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলমান]

১. আল কুরআনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রযুক্তি ভাবনা ঃ এম আকবর আলী, প্রবন্ধ, ঈদ সংখ্যা রোববার / ১৯৯৯

২. Scientific Indication in the Holy Quran : by a Board of Researchers. IFB/1995

৩. Muslim Contribution to the Development of the Chemical Science and their Technologies, by Dr. Manzoor-i-Khuda. A Journal of Baitush Sharaf Islamic Research Institute. June/1985

৪. বিকাশমান মানব সভ্যতা ও ইসলাম ঃ ড. আশকার ইবনে শাইখ / সিরিজ নিবন্ধ, মাসিক অগ্রপথিক/১৯৯৬

৫. Islamic Science and Technology : Ahmad Y. al Hasan & Donald R Hill.

৬. মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা ঃ মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার / ১৯৯৯

৭. প্রযুক্তির জনকেরা ঃ নাসরীন মুস্তাফা, সিরিজ নিবন্ধ, অগ্রপথিক, ২০০০/০১

৮. Science, Technology and Development in the Muslim World : Ziauddin Sardar, London/1977

৯.আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী, শামছুল হক অনূদিত, ইফাবা / ১৯৮৬

১০. Topography of Dacca : James Taylor, অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী / ১৯৭৮

১১. ইসলামী শিল্পকলা ঃ এবনে গোলাম সামাদ/বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

১২. Hazrat Muhammad (sm.) : Encyclopaedia of Scerah by Afzalur Rahman অনুবাদ ইফাবা / ১৯৮৯

১৩. ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি ঃ মুহাম্মদ আলমগীর, ইফাবা/ ১৯৮৭

১৪. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস ঃ কে আলী, ঢাকা/ ১৯৮১

১৫. Education in Muslim India : by S. M. Jafar অনুবাদ রশীদ আল ফারুকী, বাংলা একাডেমী / ১৯৮৮

১৬. বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) ঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ / ১৯৯৩

১৭. মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা ঃ আশকার ইবনে শাইখ / ১৯৮৮

১৮. Social and Cultural History of Bengal : by Dr. M.A. Rahim, মোঃ আসাদুজ্জামান অনূদিত বাংলা একাডেমী / ১৯৯৫

১৯. Social History of the Muslims of Bengal : by Dr. Abdul Karim, মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

২০. The Indian Musalmans : W.W. Hunter. এম আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা /১৯৯৪

২১. ইসলামী শিল্পকলা ঃ ড. সৈয়দ মাহমুদুল ইসলাম, ঢাকা / ১৯৮৯

২২. মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প ঃ ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী / ১৯৮৯

২৩. মুসলিম স্থাপত্য ঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী, ইফা / ১৯৮১

২৪. আরব স্থাপত্য ঃ এ বি এম হোসেন / খান ব্রাদার্স, ১৯৯৯

২৫. Influence of Islam on Indian Culture : by Dr. Tara Chand, এস মুজিবুল্লাহ অনূদিত, ইফাবা / ১৯৯১

২৬. Muslim Architecture in Bengal : A. H. Dani / AS.P

২৭. Medieaval India Mohammadan Rule, Edited by Stenely Lanepoole, অনুবাদ, ইফাবা / ১৯৮০

২৮. বিশ্বখ্যাত বাঙালি স্থপতি (প্রবন্ধ) ঃ অহরহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

২৯. মনীষা মঞ্জুষা ঃ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (তৃতীয় খণ্ড) / ১৯৮৪

৩০. ভারতের ইতিহাস কথা ঃ ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা / ১৯৮৫

৩১. সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ গোপাল হাওলদার, কলিকাতা / ১৯৬৫

৩২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা / ১৯৯১

৩৩. Memoirs of Gaur and Pandua : by M. Abid Ali Khan Maldahi, অনুবাদ ইফাবা / ১৯৮৭

৩৪. Islam and Indian Culture : by Dr B. N. Pandey শান্তিময় রায় অনূদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা / ১৯৯৪

৩৫. সংস্কৃতি চর্চায় ও গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান ঃ শামসুল হক, ইফাবা / ১৯৯২

৩৬. বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ঃ এম, আকবর আলী, বিবিধ খণ্ড

৩৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ প্রথম খণ্ড, ইফাবা / ১৯৯৫

৩৮. Saracenic Contributions to the Evolution of Modern Europe : Dr. Gulam Maqsud Hilali, হিলালী রচনাবলী (প্রথম খন্ড), রাজশাহী / ১৯৮১

৩৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ এপ্রিল-জুন/ ১৯৯৩

৪০. The Spirit of Islam : Syed Ameer Ali (অনুবাদ) / ১৯৯৩

৪১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান ঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, দ্বিতীয় খণ্ড, ইফাবা / ১৯৯৭

৪২. মুসলিম কীর্তি ঃ ড. এম আবদুল কাদের, ইফাবা / ১৯৮৮

৪৩. The Historical Role of Islam : M. N. Roy (অনু) / ১৯৯০

৪৪. আল মামুন ঃ শিবলী নুমানী, আখতার ফারুক অনূদিত / ১৯৭৬

৪৫. ইসলামের ইতিহাস ঃ ড. সৈয়দ মাহমূদুল ইসলাম / ১৯৯০

৪৬. শিল্পকথা ঃ নন্দলাল বসু, বিশ্বভারতী কলিকাতা / ১৩৫১ বাংলা

৪৭. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ ঃ মফিজুল্লাহ কবীর, বাংলা একাডেমী / ১৯৮৭

৪৮. মুসলিম সঙ্গীত কলার বিকাশ ঃ সৈয়দ শহীদ উদ্দীন আহমদ / ইফা

৪৯. শিক্ষা দর্শন ঃ ড. খোন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলা একাডেমী / ১৯৮০

৫০. মুসলিম জাহান ও পাশ্চাত্য জগত ঃ কেনেথ এইচ ক্র্যাডল, অনুবাদ, সম্পাদনা আখতার-উল-আলম, ইফা/১৯৮৭

৫১. আরব জাতির ইতিহাস ঃ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম/১৯৭২

৫২. The World of Islam : Thames and Hudson. London.